অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

দশম খণ্ড

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রথম প্রকাশ

মে ১৯৬৪

প্রকাশক

অবনীন্দ্রনাথ বেরা

বাণীশিল্প

১৪এ টেমার লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

অক্ষর-বিন্যাস

অতনু পাল

কম্পিউটার টুডে

৭৭ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০৫

মুদ্রাকর

রবি দত্ত

ইম্প্রেসন হাউস

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০৯

সহ সম্পাদক

অজয় সরকার

প্রচ্ছদ

প্রণবেশ মাইতি

একশো পঞ্চাশ টাকা

প্রাসঙ্গিক

রচনাবলীর দশম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের সমস্ত গল্প ও সমস্ত নাটিকা রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। চারটি নাটিকা ও সাতাশিটি গল্প। লেখকের প্রথম নাটিকা ছাপা হলেও প্রকাশিত হয়নি, কালক্রমে, তার ছাপা কপি ও মূল পাণ্ডুলিপি দুইই হারিয়ে যায়, বর্তমানে তার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাকে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না।

লেখক ছোটদের জন্যও তিনটে গল্প লিখেছিলেন এবং বহু বছর পর সম্প্রতি বড়দের জন্য আর একটি গল্প, নীলনয়নীর উপাখ্যান, সে-চারটি অন্য এক খণ্ডে স্থান পেয়েছে। তিনটে কাব্যনাট্যও লিখেছিলেন তিনি, তার দুটি শেষ খণ্ডে স্থান পেয়েছে, তৃতীয়টি ছড়ার আঙ্গিকে লেখা, ছড়া-সঙ্কলন 'রাঙা ধানের খই-'এর অন্তর্ভুক্ত, তা স্থান পাবে রচনাবলীর ছড়া-সমগ্র খণ্ডে।

রচনাবলীর যে সমস্ত খণ্ডে অন্নদাশঙ্করের বিভিন্ন গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেখানে লেখকের গল্পের বিভিন্ন সাধারণ লক্ষণ ও প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে এখন আমরা তাঁর গল্প সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করে সার্বিক মূল্যায়ন করবো। তাঁর গল্পকে বিচার করবো তাঁর কথাসাহিত্যের অঙ্গ ও অংশ হিশেবে। দেখাবো নাটিকাগুলির সঙ্গে তাঁর এক পর্যায়ের গল্পের সম্পর্ক ও যোগসূত্রকে। সাহিত্যিক আদর্শের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক বলে বড়দের জন্য লেখা তাঁর কাব্যনাট্য দুটির কথাও ছোটগল্প তথা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে আসবে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে লেখকের গল্প একাধিক পর্যায়ের ভিতর দিয়ে গেছে। 'বিভিন্ন বয়সে আমি বিভিন্ন ধরনের গল্প লিখেছি। দশ বারো বছর অন্তর অন্তর, আমার লেখার ধারা বদলে গেছে। এটা কেবল বাইরের দিক থেকে নয়। ভিতরের দিক থেকেও।' প্রথম পর্যায়ে তাঁর গল্প মূলত ঘটনামূলক, বাস্তবের বাইরের দিক নিয়ে লেখা, সেগুলো বুদ্ধিদীপ্ত ন্যারেটিভের। কিছুটা ব্যঙ্গাত্মকও। জীবনের কৌতুককর দিক, মানুষের চরিত্রের অসঙ্গতি ইত্যাদি তার উপজীব্য। গল্পগুলি খুবই পাঠযোগ্য ও সুখপাঠ্য। তাঁর নাটিকাগুলি এই পর্যায়ের গল্পের সমতুল্য।

তবে গল্পের প্রমোদমূল্য সম্পর্কে লেখকেব আগ্রহ চিরকালই কম বলে, ক্রমে ব্যঙ্গ, কৌতুক কমিয়ে তিনি আরও গভীরে যেতে চেষ্টা করলেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে বিভিন্ন ইমোশনের প্রাধান্য ঘটলো। বিশুদ্ধ ও উন্নত আবেগ ও আবেগময়তার।

তৃতীয় পর্যায়ে লেখক অনুভব করলেন তাঁর গল্পের উপজীব্য হবে আবেগের চাইতে বেশি কিছু, কোনো না কোনো বিশেষ উপলব্ধি। এই গল্পগুলিতে এলো বাস্তবের ভিতরের দিকের কথা, 'বাস্তব বলে আমরা যাকে জানি তা সত্য হতে পারে, কিন্তু অন্তঃসত্য নয়। কোথায় তার অন্তঃসার তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করতে হবে। আর বহিঃসৌন্দর্যই সব নয়। অন্তঃসৌন্দর্য অন্বেষণ করতে হবে।' এই প্রকার গল্পে শুধুই কাহিনী নয়, এক প্রকার অন্তর্দর্শনেরও প্রতিফলন ঘটলো। একদম প্রথম দিককার লেখাতেও লেখক গভীর সারল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যে তুচ্ছ বস্তুকেও সত্যের মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলতে পারতেন। আর এখন সুগভীর ভাববস্তুকে সত্য-প্রেম-সৌন্দর্যের যৌথ মহত্ত্বে বিচিত্র করে তুললেন।

চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ে লেখক কতকটা জীবনস্মৃতি জাতীয় গল্পে হাত দিলেন। এগুলি কিছুটা বিবরণপ্রধান ও ঘটনামূলক হলেও নিছক গল্প এগুলো নয়, দেশ কাল ও জনতার বিভিন্ন ভাবনা ও সমস্যার কথা এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। 'তবে তা যাতে নিছক বিবরণী না হয়ে পড়ে সেটা আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। কোথায় তার নিগূঢ় অর্থ, সূক্ষ্ম তাৎপর্য—এই আমার জিজ্ঞাসা।

গল্পে এরই উত্তর পেতে ও দিতে চাই।' এই পর্যায়টিও শেষ হয়ে গেল 'বিনা প্রেমসে না মিলে' (১৯৭৬) গল্প দিয়ে। এর পর গল্প আর তিনি লেখেননি। আঠেরো বছর পর আবার একটি গল্প লিখলেন তিনি, নীলনয়নীর উপাখ্যান, ১৯৯৪-র পুজোয়।

লেখকের সমগ্র কথাসাহিত্যের যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ এককভাবে তাঁর ছোটগল্পেরও তাই। তাঁর উপন্যাসের মতো তাঁর গল্পেরও কয়েকটি মূল থিম রয়েছে: মানবপ্রকৃতি, সত্যান্বেষণ, শাশ্বত প্রেম ও চিরন্তনী নারী, রূপদর্শন ও সৌন্দর্যের অন্বেষণ, ব্যক্তির দেশের বা জাতির রিনিউয়াল। তাঁর অনেকগুলি গল্প আসলে বড়গল্প অথবা উপন্যাসধর্মী, বড় মাপের থিমকে গল্পের পরিসরে ঢোকানো। গল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিন্যাস এক ও অভিন্ন—জীবনের সত্যকে সাহিত্যে আনা, মেকি উদ্ভাবন না করা, 'লেখকদের বানাবার ক্ষমতা(ও) সীমিত। জীবনের কাছে বাধ্য হয়ে হাত পাততে হয়। (তাছাড়া) আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি ফ্যাক্ট্ ইজ স্ট্রেন্জার দ্যান ফিকশন। তথ্য হচ্ছে কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর।'

কিন্তু একেবারে প্রথমদিন থেকেই তিনি জানেন, উপন্যাস ও ছোটগল্প দুই স্বতন্ত্র জাত। যদিও উভয়ের প্রাণ একই জায়গায়। যেমন তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। কিন্তু প্রকৃতিতে প্রভেদ। লেখকের রূপকল্প অনুসারে বলা যায় এই প্রভেদ হলো এইরকম—

১. উপন্যাস পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবেশদ্বার খুলে দিয়ে বলে, বিচরণ কর, আলাপ কর, প্রেমে পড়। আর ছোটগল্প একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখিয়ে পাঠককে বলে, যথেষ্ট দেখলে, আর দেখতে চেয়ো না।

২. ঔপন্যাসিক ক্রমাগত সুতো ছাড়তে থাকেন, মাছকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপরে ডাঙায় তোলেন। ছোটগল্পকার জাল ফেলে তখনি তুলে নেন।

৩. ছোটগল্প হাউইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে গিয়ে দপ্ করে নিবে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সময়সাপেক্ষ, তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে, সূর্যাস্তে যেমন।

লেখকের নিজস্ব ভাষ্য অনুসারে তাঁর গল্পরীতি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা যাক। প্রমথ চৌধুরীর বিবেচনায় ছোটগল্প প্রথমত ছোট হওয়া চাই, তারপর তা গল্প হওয়া চাই। তাঁর এককালীন মন্ত্রশিষ্য অন্নদাশঙ্করের গল্পে গল্প ও কল্প থাকলেও ('কল্প না হলে গল্প হয় না'), তা আকারে ছোট নয় প্রায়ই, মাঝারি ও বড় গল্প তুল্য।

ছোট মাঝারি বড় যাই হোক না কেন গল্প তাঁর ঝুলিতে হাজার হাজার আছে। চাকরি জীবনে অসংখ্য গল্প শুনেছেন তিনি, সত্য বলে বিশ্বাস করে রায়ও লিখেছেন, সত্যকে মিথ্যা বলে অবিশ্বাসও করেছেন। চোখ কান খোলা রাখলে গল্প প্রতিদিন ঘটতে দেখা বা শোনাও যায়। কিন্তু সব গল্প শোনবার মতো হলেও লেখবার মতো নয়। অসাধারণের উপরেই তাঁর ঝোঁক। অসাধারণ চরিত্র বা অসাধারণ ঘটনার উপর।

যদিও তথ্য হচ্ছে কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর, একটু কারিগরি করে তথ্যকেই যদি গল্প বলে চালিয়ে দেওয়া যায় পাঠকরা ধরতেই পারবেন না যে ওটা তথ্য কিন্তু তাতে গল্পের প্রকৃতি রক্ষিত হবে না। তা হবে নিছক একটা বিবরণী। তাকে গল্পের প্রকৃতি দিতে হলে কারিগরিই যথেষ্ট নয়। গল্পমাত্রেরই একটা না একটা পয়েন্ট থাকে। সেটা খুবই সূক্ষ্ম। সমস্ত গল্পটাই সেই পয়েন্টটুকুর জন্যই তাৎপর্যবান। সেটুকু যদি বাদ যায় তা হলে গল্প ঠিক ওতরায় না। সেইজন্য বেশ কিছু কল্পনার খাদ মেশাতে হয়। 'হয়কে নয় করতে হয়। নয়কে হয়। পুরুষকে নারী বানাতে হয়। নারীকে পুরুষ। দেশ থেকে চলে যেতে হয় বিদেশে। বিদেশকে টেনে আনতে হয় দেশে। পুরাতনকে করতে হয় সাম্প্রতিক। সাম্প্রতিককে পরাতে হয় পুরাতন বেশ।'

উপন্যাসে চরিত্রের মডেল লাগে। ছোটগল্পে সাধারণত লাগে না। তবে মডেলকেও পুরোপুরি

অনুসরণ করা হয় না। 'আমার এক একটি চরিত্র একাধিক মডেলের অনুসরণ। আবার একই মডেল থেকে একাধিক চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। সনাক্তকরণের পথ খোলা রাখিনি।'

তাঁর গল্পের ক্রমবিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই নিতান্ত ঘটনাপ্রধান বা পরিস্থিতি-নির্ভর গল্প লেখা আর লেখকের লক্ষ্য নয়। 'কোথায় তার মীনিং বা নিগূঢ় অর্থ? এই হয় আমার জিজ্ঞাসা। তা বলে একটা মরাল নীতির উপর আমার ঝোঁক নয়। টলস্টয়ের সঙ্গে এখানে আমার মত মেলে নি।' তাই তিনি অনুসরণ করেছেন যে তলস্তয় আর্টিষ্ট তাঁকে, যে তলস্তয় মরালিষ্ট তাঁকে নয়।

গল্প লেখা তাঁর কাছে তাঁর সার্বিক সাহিত্যসাধনারই এক অপরিহার্য অঙ্গ, যে সাধনা তাঁকে পরিপূর্ণ মুক্তি এনে দেবে। 'বেশ কিছুদিন থেকে আমার লেখার উদ্দেশ্য সৃষ্টির দায় থেকে মুক্তি। রসের দায় থেকে মুক্তি। রূপের দায় থেকে মুক্তি। এই মুক্তির আস্বাদন পেলেই আমি তৃপ্ত। নয়তো অতৃপ্ত। এক-একটা গল্প যদি উতরে যায় তা হলে তার মতো মুক্তি আর নেই। সেই প্রাপ্তি পরমা প্রাপ্তি। নিন্দা প্রশংসা, লাভ লোকসান অবান্তর। তেমন আস্বাদন যে প্রত্যেকবার পেয়েছি তা নয় কিন্তু কয়েক বার।'

বেশ বোঝা যাচ্ছে এখানে লেখক নান্দনিক মুক্তির কথা বলছেন এবং এই উক্তি বুদ্ধিজীবীর চেয়ে বড় এক মানুষের, এক হৃদয়জীবীর। এইভাবে লিখতে গেলে গোটা মানুষটাকে লাগে, তৃপ্তি অস্তিত্বের সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে হয়। এবং লেখার মধ্য দিয়ে যা লেখকের কাম্য তা হলো চূড়ান্ত চরম পরম কিছু। 'আমি বিশ্বাস করি, eternal বলে একটা কিছু আছে।'

কখনো তা চরম আনন্দ—'আমি তার (জগতের) আনন্দলীলার সাক্ষী হব। আনন্দ! আনন্দ! চারদিকে আনন্দ! আমি সেই আনন্দ পারাবারের মীন। যেদিকেই সাঁতার কাটি সেদিকেই আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন আর কিছু নেই। আনন্দের ভিতরে আমি, আমার ভিতরে আনন্দ।'

কখনো তা পরম প্রেম—'ভালোবেসে না পাওয়াটা অন্যায় নয়, কিন্তু পেয়ে না ভালোবাসাটা অন্যায়। না ভালোবেসে পাওয়াটাও অন্যায়। অন্যায় না বলে বলতে পারা যায় প্রেমের ঋণ। সেসব প্রেমের ঋণ শোধ হবে কী করে? ভাবতে ভাবতে মনে উদয় হয় এই ভাব যে, অমিয়া (স্বকীয়া) কে আরো বেশি করে ভালোবাসলেই সে ভালোবাসা ভগবানের কাছে পৌঁছবে ও সে প্রেমের উদ্বৃত্ত তাঁর মারফৎ যাদের পাওনা আছে তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে।'

কখনো তা পরমা রূপের অন্বেষণ—' ও (সৌন্দর্যদেবী) আছে। ওর পথ গেছে এই ক্লেদের ভিতর দিয়ে। এই আস্তাকুড়ের উপর দিয়ে। এইসব মাজা-ভাঙা পুরুষের, এইসব পড়ে-যাওয়া নারীর দ্বারা আচ্ছন্ন গিরিসঙ্কট দিয়ে। ওর পথ হচ্ছে এই পথ। এই পথে আমি ওর পথেরই পথিক হয়েছি। ওরই দর্শন পাব বলে। ও আমার আগে আগে চলেছে। উড়ে চলেছে মাটি না ছুঁয়ে ক্লেদ না ছুঁয়ে অন্তরীক্ষে। ও যেন সূর্যকন্যা তপতী। আর আমি ওকে ধরবার জন্যে মাটিতে পা ফেলে জলকাদায় নেমে ডাঙায় পা তুলে ছুটে চলেছি ভূতলে। আমি যেন রাজা সংবরণ। দৃষ্টি আমার ঊর্ধ্বমুখীন। ওর আর আমার উভয়েরই পথ এই ভীষণ কুৎসিত অশুভ অমাবস্যার ছায়াপথ। ও যেন আমার চোখে ধুলো ছুঁড়ে মারে, যাতে আমি ওকে দেখতে না পাই, চিনতে না পারি। কিংবা ধুলো আপনি ওড়ে ওর গতিবেগের হাওয়ায়। আমি অন্ধকার দেখি। সেই অন্ধকারের নাম নিষ্ঠুর বাস্তব। যে বাস্তব আমাকে নিত্য অভিভূত করে নিত্য নূতন অপরাধে। স্তব্ধ হয়ে ভাবি এই তমসার অপর পারে কি ও আছে? ডাকলে কি ওর সাড়া পাব? চোখ মেলে আমি ওর দেখা পাইনে। তবু চোখ আমার ওর উপরেই। এর উপরে নয়। না। তোমার এই নিষ্ঠুর বাস্তব আমার দৃষ্টি হরণ করে না। দৃষ্টিকে পীড়া দেয় যদিও। আমার দৃষ্টি একে প্রতিনিয়ত অতিক্রম করে। আমার মন একে ছাড়িয়ে যায়। আমার পা একে মাড়িয়ে যায়। এর সম্বন্ধে আমার মোহ নেই। আমি একে ভালো বাসিনে। একে ভালো বলিনে। শুধু একে মেনে নিই। নিষ্ঠুর বাস্তব, তোমাকে আমি মানি। কিন্তু

তুমিই শেষ কথা নও। তোমাকে আমার চোখের উপর ছুঁড়ে মেরেছে যে, আমার দৃষ্টি তারই প্রতি নিবদ্ধ। ও (সে) আমার একান্তই আপন। আমি ওর। ওর সঙ্গেও আমার নিত্য সম্পর্ক। এমন দিন যায় না যেদিন আমি ওর উড়ে চলার ধ্বনি শুনতে না পাই। (সমস্ত) কোলাহলকে ছাপিয়ে ওঠে ওর পলায়নধ্বনি। নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে আমার নিত্য সংঘর্ষ। তা সত্ত্বেও আমি অপরাজিত। আপন ভুজবলে নয়। ওর রক্ষাকবচ ধারণ করে। আমি শান্ত। আমার পরিত্রাণের পন্থা পলায়নে নয়, পলায়মানার পশ্চাদ্ধাবনে।'

শুধু চরম আনন্দ, পরম প্রেম, পরমা রূপের অন্বেষণ প্রভৃতি সমুচ্চ মিষ্টিক অনুভূতি নয়, লেখকের 'ইটার্নাল' হতে পারে আরও প্রমূর্ত ও আরও বস্তুবাদী কোনো ভাব বা রূপও, যেমন চূড়ান্ত দায়িত্বের বা সব শেষের জনের রূপকল্প বা ভাবপ্রতিমাও।

চূড়ান্ত দায়িত্ব—'কাসাবিয়াঙ্কার কাহিনী মনে পড়ে? আমিও সেইরকম একটা জ্বলন্ত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। জাহাজের গায়ে গোলা পড়ছে। জাহাজের প্রতি অঙ্গে আগুন। অবধারিত মরণ। সকলেই পালাচ্ছে। আমাকেও বলছে পালাতে। আমি কিন্তু আমার পদতলভূমি থেকে ভ্রষ্ট হব না। এক চুলও নড়ব না। বাপুজীর আদেশ, আমাকে স্বস্থানে স্থির থাকতে হবে। তার মানে, জীবনের বিশেষ একটি পোজিশনে। আমরা বরাবরই গঠনের ও সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। শান্তির সময় পাটাতন পরিষ্কার করি, সংগ্রামের সময় আগুনের সঙ্গে মোকাবিলা করি। দগ্ধ হবার ভাগ্য থেকে তো কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে না। ওই দগ্ধ হওয়াটাই আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা।'

সব শেষের জন—'সব শেষের জন বলতে ওই একজনই ছিল আমার সামনে। ওর চেয়ে অক্ষম, ওর চেয়ে অবনমিত, ওর চেয়ে শোষিত মানুষ শত শত আছে কিন্তু একই সঙ্গে অক্ষম তথা অবনমিত তথা শোষিত একটি মানুষকে প্রত্যক্ষ করলে তো বলব, এই আমার সব শেষের জন। (তাছাড়া) আমি বিশ্বাস করি যে ওর জীবনই আদর্শ জীবন। ও কাউকে শোষণ করে না। কারো কাছে বিবেক বাঁধা দেয় না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন আনে দিন খায়। কাল কী খাবে তা চিন্তা করে না। যীশুখ্রীস্ট যেমনটি চেয়েছিলেন। আর গান্ধীজী যেমনটি চান। যীশু যাদের বলেছেন সব শেষের জন ও হচ্ছে তাদেরই একজন। ও একটা প্রতীক। কিংবা একজন প্রতিনিধি।'

এটা বিশিষ্ট ভাবে লক্ষণীয় যে লেখকের শ্রেষ্ঠ অনুভূতির উদাহরণগুলিই আবার লেখকের শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পেরও দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ অনুভূতি সমুচ্চ হলে এই লেখকের শিল্পরূপও সর্বোৎকৃষ্ট হয়। বস্তুত উপরে যে উদাহরণগুলি দিয়েছি তার প্রথম তিনটি অনুভূতির মহীয়ানত্বে ও ভাষার ঐশ্বর্যে মন্ত্র বা স্তোত্রের মর্যাদা পেয়েছে। এই সমস্ত অনুচ্ছেদ তাই বারবার পড়ার মতো, প্রতিদিন পাঠের যোগ্য।

রচনাবলীর নবম ও এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গল্পের বিষয়বস্তু তথা ভাববস্তুর দিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক—

মীন পিয়াসী : মানুষ রূপের সায়রে রসের সরোবরে ডুবে আছে। তবু তার তৃষ্ণার অবধি নেই। সে আনন্দলহরীতে ভাসে ডোবে সাঁতরায় খেলে। কিন্তু বারবার পান করেও পিপাসা তার মেটবার নয়।

ও : পরমা রূপ, চোখ ও মন থাকলে রসিকের, নয়ন জুড়ায় ও হৃদয়-ভরায়।

হাজারদুয়ারী : হাজারদুয়ারী জীবনের ন'শ নিরানব্বইটি দ্বার খোলা, কিন্তু একটি দ্বার বন্ধ, আর সেই একটা মহলই অন্য সব ক'টা মহলের সমবেত ঐশ্বর্যের চেয়ে ঐশ্বর্যময়। ওটাই আসল দরজা, ওটা বন্ধ থাকা মানে বন্দী হয়ে থাকা। ওই বন্ধ দুয়ার অবারিত হলে মুক্তি পরিপূর্ণ হবে। দ্বার খোলার আগে দৃষ্টি খোলে। দ্বার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বেশ খানিক দূর দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমে দৃষ্টি আরো খোলে, আরো খোলে। অবশেষে হয়তো দুয়ারও একদিন খুলে যায়।

জন্মদিনে : প্রেমের ঋণ শোধ হয় যেভাবে।

রাবণের সিঁড়ি : লোকে যদি স্বর্গে যেতে না চায়, যদি চায় স্বর্গই চলে আসুক স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে। কার জন্যে স্বর্গের সিঁড়ি! মানুষের জন্যেই তো। সেই সিঁড়ি গড়তে হলে, নতুন স্বর্গ গড়তে গেলে স্বপ্ন দেখার বয়সেই আরম্ভ করতে হয় ও পদে পদে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। হতে হয় অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা।

সোনার ঠাকুর মাটির পা : আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের সমাজ এখন সোনার ঠাকুরের আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু পা দুটি তো মাটির। সেই শ্রমিক আর সেই কৃষক। তাদের না আছে পুঁজি, না আছে জমি। সোনার ঠাকুর এক দিন দেখবেন যে তাঁর মাটির পা আর বইতে পারছে না। এমন মাথাভারী ব্যবস্থা কেউ কি পারে বইতে? তখন মাটির পা দুটি পড়ে গেলে, গলে গেলে, সোনার ঠাকুরটিও যে টলে পড়বেন!

আঙিনা বিদেশ : মানুষকে ধর্মমতের দরুন অবিশ্বাস করতে নেই। যাকে রাখো সেই রাখে।

স্বস্ত্যয়ন : সত্যটা কী সেটা নিশ্চিতভাবে জানাও একপ্রকার স্বস্ত্যয়ন। নেতি নেতি করেও সত্যকে জানা যায়। এমনি করেও স্বস্ত্যয়ন সাঙ্গ হতে পারে।

সব শেষের জন : He also serves who stands and waits.

বিনা প্রেমসে না মিলে : মানুষকে যে ভালোবাসে সে তার অন্তরে স্থিত ভগবানকেও ভালোবাসে। কেউ ভগবানকে ভালো বাসতে বাসতে মানুষকে ভালোবাসে, কেউ মানুষকে ভালো বাসতে বাসতে ভগবানকে। বিনা প্রেমসে না মিলে পরমাত্মা। এ জগৎ যাঁর দেহ তিনিই পরমাত্মা। পরমাত্মার সঙ্গে ব্যক্তির আত্মার সম্পর্ক অমৃতের সঙ্গে অমৃতের পুত্রের। তাঁর পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে নেওয়া, তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টি মিলিয়ে নেওয়া, ঈশ্বরবাদী ব্যক্তির এই ধর্ম ও কর্ম। মেলাতে পারা কিন্তু সহজ নয়। কোন্‌টা যে তাঁর ইচ্ছা আর কোন্‌টা নয় কেমন করে জানা যাবে?

লেখকের ওই সর্বশেষ গ্রন্থিত গল্পে লেখকের অন্যতম প্রতীকী চরিত্র মাস্টার মশায় এই প্রশ্নের উত্তরে মুচকি হেসে বলেছেন, বড়ো কঠিন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা ও দেওয়ার জন্য লেখককে হয়তো আর একটি উপন্যাস লিখতে হবে। তাহলে লেখকের রচনার (অন্যতম) প্রধান (এক) ভাববস্তু সংহত সবিশেষ ও সুনির্দিষ্ট রূপ পাবে।

গল্পের পরিপূরক হিশেবে এইভাবে উপন্যাস লিখতে হয় ও হয়েছে কখনো-কখনো অন্নদাশঙ্করকে। যেমন তাঁর নাটিকাগুলি এক পর্যায়ের গল্পের অনুপূরক পরিপূরক বা সম্পূরক। সেগুলি তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পাবলীর সঙ্গে যেন এক প্রকার বিপ্রতীপ সম্পর্কে আবদ্ধ। গল্পগুলি সিরিয়স, নাটিকাকটি ক্যামিও। গল্পগুলি ধারাবাহিক বিকাশের, নাটকগুলি স্ট্যাকাটো ধরনের। গল্পগুলি জীবনধারণ ও জীবনমরণ সমস্যার গল্প, নাটককটি ঝামেলা ও মুশকিল আসানের নাটক।

এই নাটিকাগুলি স্বাদে ও মেজাজে লেখকের প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ 'প্রকৃতির পরিহাস' পর্যায়ের গল্পের সমতুল্য। তেমনি ব্যঙ্গ কৌতুক অসঙ্গতি নিয়ে মুচকি-হাসির লেখা। কখনো কখনো পরশুরামের কথা মনে পড়ে। ছড়ানাটিকা 'জনরব'ও এই গোত্রের। তেমনি কমিক। শ্লেষাত্মক হলেও আসলে দিলখোলা ও প্রাণখোলা।

লেখক নিজেদের নাটক বলতে যে প্রকার নাটকের কথা বলেছিলেন এই নাটিকাগুলি সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যার অন্য নাম কমিউনিটি থিয়েটার। আমাদের যেমন সার্বজনিক বারোয়ারি পূজা, ইউরোপে তখন তেমনি কমিউনিটি থিয়েটার। নাটিকাগুলিতে সেই আদর্শেরই প্রতিফলন।

আমরা বারবার বলেছি অন্নদাশঙ্কর শুধু কথাসাহিত্যিক নন, তিনি হলেন জীবনশিল্পী। নিজের জীবনকেই তিনি শিল্প করে তুলেছেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আরো ভালোভাবে বাঁচতে শিখেছেন ও আরো ভালোভাবে বাঁচার প্রতিফলন পড়েছে নিজের রচনায়। তাঁর প্রধান চরিত্রগুলিও অনেকেই চেয়েছে জীবনশিল্পী হতে, জীবনকে পরতে পরতে পর্বে পর্বে আপন হাতে সাজাতে। তাঁর বহু গল্পেরই বিষয় এই জীবনশিল্প ও জীবনদর্শন, জীবন-ধারণ প্রসঙ্গ ও জীবন-মরণ সমস্যাই সেখানে বিবেচ্য। 'সাহিত্য তো কেবল জীবনের প্রতিকৃতি নয়, জীবনের সমালোচনাও বটে।' জীবনের জয়গানের কথা ঘোষিত হয়েছে বলেই তাঁর কাব্যনাট্য দুটিকে আমরা রচনাবলীতে ছোটগল্পের সঙ্গে একই সাথে আলোচ্য করলাম।

মন্দ নিবারণ বনাম কর্ম করণ—এই হলো 'নিবারণবাদী' কাব্যনাট্যটির বিষয়বস্তু। মন্দের নিবারণ করতে গিয়ে যদি কর্ম হতে বঞ্চিত হতে হয় তবে সেই ক্ষতি অপূরণীয়। মন্দ মন্দ বলে ধন্ধ হলে ভালোও যে ব্যাহত হয়। 'মন্দ হলো মন্দ হলো এই যদি অন্ধ হয়ে ভাবি / ত্রস্ত হয়ে ব্যস্ত হয়ে ভালোরও হারিয়ে ফেলি চাবী।' তাই অকালে হস্তক্ষেপ করতে নেই, জীবনপ্রবাহকে বয়ে যেতে দিতে হয়, তারপর জীবন নিজেই ভালো-মন্দ বিচার করে রায় দিতে ও ব্যবস্থা নিতে পারবে। 'মন্দ তুমি চিনবে কী দেখে?/ আগে তো করতে দাও কাজ কিছু সরল বিবেকে। / আগে তো করতে দাও কাজ কিছু, যদি তারপর / কর্ম তার মন্দ হয় খুঁড়বে সে আপন কবর।' অর্থাৎ এখানে জীবননীতির কথাই বলা হয়েছে : 'যেখানে চরম ক্ষতি সেখানে পরম প্রতিকার।'

'রাতের অতিথি' কাব্যনাট্যে লেখক জীবনদর্শন ও জীবনশিল্পের আরো একটু গভীরে গেছেন, এর বিষয়বস্তু হলো : বাঁচতে শেখা : 'জানি নাকো আমি কত দিন আছি / বাঁচতে শিখব যত দিন বাঁচি।' কার কাছে তিনি বাঁচতে শিখবেন? 'ধর্ম না যদি বাঁচতে শেখায় / তারে নিয়ে আমি করব কী, হায়! / ইহকালে যদি না জানি বাঁচতে / কেন যাব কৈবল্য যাচতে?'

তাই ধর্ম নয়, তিনি যাবেন আর কারুর কাছে। 'ধর্ম যদি-না বাঁচতে শেখায় / শিল্পের কাছে যাব পুনরায়। / দিবসরাত্রি সৃষ্টি যে করে / রসমাধুর্য বৃষ্টি যে করে / জীবন কি তার কখনো ফুরায়! / পেয়ালা যে তার ভরে পুনরায়।'

জীবনশিল্পের সেই রূপরেখাটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—'তবে তাই হোক, আমার ধর্ম / সব ছেড়ে দিয়ে শিল্পকর্ম। / আসবে না ফিরে তরুণ সময় / অন্তর হবে তারুণ্যময়। / প্রথম যৌবনের হলো ইতি / দ্বিতীয় যৌবনের হবে স্থিতি।'

জীবনশিল্পের এই কাঠামো আমাদের পূর্বোক্ত জীবননীতির দিকেই ঠেলে দেয়—'উভয়ই সহায় তার—মঙ্গলা মঙ্গল / রূপান্তর সাধনের যে জানে কৌশল।'

তারপর জীবনদর্শনের দিকে—'এপারেই যারা জীবন্মুক্ত / সত্যের সাথে নিত্য যুক্ত / সমান তাদের ইহপরকাল / যেমন সকাল তেমনি বিকাল! / আমার মুক্তি নীরবে নিজনে / অপ্রতিমের প্রতিমা সৃজনে।'

অবশেষে জীবনধর্মের দিকেও—'আমি ধ্যান করি পরম রূপের / বীভৎসতাও তাঁরই হেরফের / তাঁকেই দেখেছি চোখ খোলা রেখে / তাঁকেই এঁকেছি হাতে কালি মেখে। / এ জীবনে তাঁরে দেখা আর আঁকা / এই তো মুক্তি। আর সব ফাঁকা।'

এইভাবে জীবনযাপন থেকে জীবনশিল্প থেকে জীবননীতি, জীবনদর্শন ও জীবনধর্মের সাধনায় মগ্ন থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় এক বহুমুখী জীবনবীক্ষার প্রবক্তা ও প্রতিভূ।

ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

দশম খণ্ড

কথা

বর

'পাবন সেন হাজরা! পাবন! তুমি লণ্ডনে!' বেণুদির জন্মদিনের উৎসবে ওই ছন্নছাড়া যুবককে আবিষ্কার করে রাঙাদি বিস্মিত ও সস্মিত হন।

করমর্দনের পর ওর হাতখানি ধরে ওকে বসিয়ে দেন আপনার একপাশে। 'তোমার কথা আমি এত শুনেছি যে তুমি আমার নিম চেনা হয়ে রয়েছ। বাকী ছিল শুধু মুখ চেনা। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বলব। পার্টির পরে।'

পাবন কিন্তু ভদ্রমহিলার নামটি পর্যন্ত জানত না। বেণুদির দিকে তাকাতেই তাঁর খেয়াল হয়। 'ওমা। তাও জান না? মিসেস বরাট আমাদের দেশের বিখ্যাত—'

বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার পি এল বরাটের সহধর্মিণী। রাঙাদি কথা কেড়ে নিয়ে নিজের গায়ে পেতে নিলেন। 'দূর! বিখ্যাত কিসের! বিখ্যাত যদি বল তো আমার বন্ধু সরোজিনী নাইডু। এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।'

তা শুনে চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল। অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা নিয়ে ছুটোছুটি করছিলেন বেণুদির স্বামী। এইচ গোস্বামী। ইনিও একদিন বিখ্যাত ব্যারিস্টার হবেন। আপাতত উকীল পরিচয়টা খণ্ডাতে বিলেত এসে মিডল টেম্পলে ভর্তি হয়েছেন। বেণুদিও নিয়েছেন বাংলা আর সংস্কৃত পড়ানোর কাজ। গোস্বামী—তার চেয়ে ভালো শোনায় বেণুস্বামী—এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়িয়ে একটু ফিক করে হেসে বললেন, 'রাঙাদি, শুধু কি দেশে, বিদেশের ইংরেজমহলেও আপনার নাম অনেকদূর ছড়িয়েছে। অবাক কাণ্ড! ওরাও বলে, রাঙ্গাডি!'

তা শুনে আবার একচোট হাসি। উৎসাহিত হয়ে বেণুস্বামী কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন। আক্ষরিক অর্থে নয়। 'কে না জানে আপনারা কর্তাগিন্নী কী একটা গোপনীয় মিশন নিয়ে এদেশে এসেছেন। একটি ছোট পাখী আমার কানে ফিসফিসিয়ে বলছিল মোতিলাল নেহরু—'

রাঙাদি তর্জনী মুখে তুললেন। 'চুপ চুপ! ও কী যা তা বকতে শুরু করলে, হেমেন্দর! তুমি কি জান না, সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। মণ্টেগু যখন সেক্রেটারি অফ স্টেট আর সিন্‌হা আণ্ডার সেক্রেটারি তখন ওঁকেও একটা পদ অফার করা হয়েছিল। উনি ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আমি নাম চাইনে, দাম চাইনে, পদ চাইনে, পদবী চাইনে, আমি চাই শুধু এইটুকু, আমার দেশের শাসনসংস্কার আইনের খসড়ায় যেন আমারও কিছু হাত থাকে।'

সকলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে লক্ষ করে তিনিও আরেক কদম এগিয়ে গেলেন। অবশ্য স্বস্থানে আসীন থেকে। 'তা বলে নেহরু কন্‌স্টিটিউশনে ওঁর কোনো হাত নেই। কেন যে ও রকম রটে! উনি এবার এসেছেন প্রিভি কাউন্সিলে হিয়ারিং উপলক্ষে। বছর খানেক থাকতে হবে। বাড়ি নেওয়া হয়েছে। উনি ন্যাশনাল লিবারল ক্লাবের পুরোনো মেম্বর। সন্ধ্যাবেলা হয় ক্লাবে যান, নয় হাউস অফ্ কমন্‌সে গিয়ে ডিবেট শোনেন। যার যা নেশা। তাই আজকের মতো প্রীতিকর অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে অক্ষম বলে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছেন।'

'ছি-ছি! ও কী বলেছেন, রাঙাদি! ওঁর মতো মান্য ব্যক্তির স্নেহ আশীর্বাদই পরম সৌভাগ্য।' বেণুদি দুই হাত একত্র করলেন।

'আমার কথা যদি বল,' রাঙাদির কথা তখনো শেষ হয়নি, 'আমি একজন সেকেলে ফেমিনিস্ট। মিসেস প্যাঙ্কহার্স্টের অনুচর হয়ে লড়েছি। এই যে মেয়েরা আজ ভোটের অধিকার পেয়েছে এর জন্যে সমস্তটা ধন্যবাদ কি বলড়ুইনের পাওনা?'

পাবন ততক্ষণ পাশে বসে উসখুস করছিল। অমন একজন জাঁদরেল মহিলার পাশে কি ও বেচারাকে মানায়? কোথাকার কে এক পাবন সেন-হাজরা! লণ্ডনে নবাগত বললেও চলে। পরনে সস্তা কন্টিনেন্টাল পোশাক। একঘর অতিথির ঈর্ষাকাতর চাহনি তাকে সূঁচের মতো বিঁধছিল। সে উঠি উঠি করে না পারে উঠতে, না পারে বসে থাকতে।

'গুড ইভনিং, রাঙ্গাডি' বলে উদয় হলেন এক ইংরেজ মহিলা, তাঁর পিছনে শশব্যস্ত গৃহস্বামী বেণুস্বামী। পাবন বুঝতে পারল যে এইবার স্বর্গ হইতে বিদায়। মানে মানে সরে পড়াই শ্রেয়। ইংরেজ মহিলাকে সে তার আসন অফার করতেই তিনি একবার আলগোছে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' তার পর রাঙাদির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। সেকালের গল্প।

এর পরে প্লেটে করে মিষ্টান্ন পরিবেশন। স্বদেশী বিদেশী দুই রকমই ছিল। সাহায্য করছিল পাবনের বন্ধু শ্যামল ও কান্তিমান এবং আরো কয়েকজন। তারা বাঙালীর মেয়ে। পরিবেশনের মাঝখানে কখন একসময় আরম্ভ হয়ে গেল রবীন্দ্রসঙ্গীত। সকলে জমজমাট হয়ে বসলেন। ওটা যেন উপাসনাগৃহ। আহার যাঁদের সারা হয়নি তাঁরাও প্লেট সরিয়ে রাখলেন।

স্মৃতি রায়চৌধুরীর কণ্ঠ। শুনতে শুনতে পাবনের মন চলে যায় কোন্ রূপের জগতে। যেখানে গুণী বসে তাঁর সুরেব জাল বুনছেন। হঠাৎ কী এক আবেগ এসে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। সে যেখানে বসেছিল সেটা দরজার একধারে। দরজাটা একটু ফাঁক করে সে চকিতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। বেশির ভাগেরই তখন ভাবে ঢুলু ঢুলু আঁখি। যাঁদের তা নয় তাঁরা গায়িকার দিকে তাকিয়ে। কেউ টের পায় না।

নিচের তলায়—দোতলায়—শ্যামল আর কান্তিমান দুই বন্ধুর ফ্ল্যাট। তারই ছোট একখানা পাশের ঘরে পাবনের লণ্ডনের ডেরা। লণ্ডনে সে মনের মতো বাসা খোঁজার আয়াস স্বীকার করতে চায় না বলে এইখানেই আপাতত থাকে ও খরচের অংশ বহন করে। খাওয়াদাওয়া বেণুদিদের সঙ্গে।

পাবনের ঘরখানা ছোট হলেও তার কাচের জানলাটা বেশ বড়। সেটা রাস্তার দিকে। বাতায়নের ধারে আসন পেতে বসে চোখ কান দুই খোলা রাখে পাবন। কান পেতে শোনে গানের পর গান। একবার মনে হলো রাঙাদিও কণ্ঠক্ষেপ করলেন। আশ্চর্য গলা, কিন্তু দম রাখতে পারেন না। 'ভাবনা আমার পথ ভোলে।' পথ ভুলতে ভুলতে কোথাকার ভাবনা কোথায় গড়ায়।

সৌন্দর্যের সরোবরে নিয়ত নিমগ্ন থাকতে চায় সে। এ সরোবর সতত পূর্ণ। 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়।' অদৃশ্য উৎস হতে নিত্য ঘটে এর পুনঃপরিপূর্ণতা। মনে মনে প্রার্থনা করে, 'তুমি চিরসুন্দর। তুমি সৌন্দর্যঘন। তোমার সৌন্দর্য সেই অদৃশ্য উৎস বা এই রূপের সরোবরকে রঙ্গ দিয়ে নিত্য ভরে রাখে। আমি ডুব দিই, তলিয়ে যাই, তল পাইনে, উঠে আসি। যতক্ষণ ডুবে থাকি ততক্ষণ অনুভব করিনে আমার ব্যথা। হয়তো ব্যথাও ব্যথার মতো লাগে না। সৌন্দর্যের রসায়ন তাকেও রূপান্তরিত করে।'

পাবন চুপচাপ একা থাকতে ভালোবাসে। আহত পাখী যেমন নিভৃতে থেকে আপনাকে সারিয়ে তুলতে চায়। কাউকে জানতে দেয় না কোন্‌খানে তার জখম। লাইট হাউসের মতো তার

মুখশ্রী বার বার আঁধার হয়ে যায়, বার বার জ্বলে ওঠে। অন্ধকারটা আলোর অভাব নয়। অবগুণ্ঠন। তার এই বিষাদ কতকাল দীর্ঘ হবে কে জানে!

বাইরে টোকা পড়তেই পাবনের হুঁশ হয়। 'আঁত্রে' বলে সে তৎক্ষণাৎ শুধরে নেয়। 'কাম ইন' বলার আগেই হেমেনদা প্রবেশ করেছিলেন। বললেন, 'শিগগির। রাঙাদি বাইরে দাঁড়িয়ে।'

'বেশ ছেলে যা হোক।' ঝঙ্কার শোনা গেল। 'গান ভালো লাগে না এমন মানুষ এই প্রথম দেখছি জীবনে। চল এখন, লক্ষ্মীটি। দিদিকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

গায়ে ওভারকোট চড়িয়ে পাবন চলল তাঁর সঙ্গে পায়ে হেঁটে। দূরত্ব এমন কিছু নয়। কীটস যে বাড়িতে থাকতেন তারই কাছাকাছি বরাটরা বাড়ি নিয়েছেন। হ্যাম্পস্টেড হীথের ধারে।

'শুনেছি ইউরোপের মিউজিয়ামগুলো তুমি গুলে খেয়েছ। আর ক্যাথিড্রালগুলো নাকি তোমার নখদর্পণে।' পথে যেতে যেতে রাঙাদি বললেন।

'কার কাছে ওসব শুনেছেন, রাঙাদি?' পাবন বলল সানন্দে অথচ সসঙ্কোচে। 'কিন্তু অভয় দেন তো আপনাকে দিদি না বলে মাসিমা বলে ডাকি।'

'কেমন করে জানলে যে তোমার মা আমাকে দিদি বলে বোন সম্পর্ক পাতিয়েছেন? হাঁ। সেই কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলুম। আমি তাঁকে চিনতুম না। তিনি অবশ্য আমার নাম জানতেন। কাগজে বেরিয়ে যায় যে আমরা প্রিভি কাউন্সিলে এ্যাপিয়াল করার জন্যে আবার বিলেত আসছি। তখন তোমার মা এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। বলেন, ছেলে চিঠিপত্র লেখে না। কোথায় থাকে, কী করে, কেউ জানে না। শোনা যায় মস্কো আর্ট থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। বোধহয় দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। আমরা যদি লণ্ডনের হাই কমিশনারকে ধরে একটা বিহিত করতে পারি।'

পাবন কী বলবে ভেবে পায় না। নীরবে শুনে যায়। পূর্ণিমা রাত্রি। কিন্তু লণ্ডনের আকাশ মেঘে আর ধোঁয়ায় অন্ধকার। বৃষ্টি টিপ টিপ পড়ছে। প্রখর শীত। অথচ বেশ তাজা লাগে হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে বেড়াতে। রাস্তা ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে। হাওয়া আসছে বনস্থলী দিয়ে।

'এদেশে এসে অবধি তোমার খোঁজ বড় কম করিনি।' রাঙাদি বলতে থাকলেন। 'কিন্তু কণ্টিনেণ্ট তো যাইনি। খাঁটি খবর পাব কার কাছে? সবই দোসরা তেসরা হাতের উড়ো খবর। কেউ বলে তুমি নাকি এক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছ, কেউ বলে তাকে বিয়ে করেছ, কেউ বলে সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, কেউ বলে তোমারি দোষ। আবার এমনও বলে, যে তোমার বরাত ভালো তুমি ওর মতো একটি দুষ্প্রাপ্য রত্ন জয় করে নিতে পেরেছিলে। কিন্তু পারবে কেন রাখতে?'

এর উত্তরে পাবন শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাঙাদি আঁধারে দেখতে পেলেন না তার মুখখানা আকাশের মতোই অন্ধকার। যদিও সে আকাশ পূর্ণিমার আকাশ।

পাবন ভাবছিল, ওই যে পূর্ণিমা ওকে যেন আমি অবিশ্বাস না করি। চাঁদ যদিও দেখতে পাচ্ছিনে তবু তার জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আভাস তো দেখতে পাচ্ছি। যদিও একটুখানি জায়গা জুড়ে ফুটে বেরোচ্ছে তবু তো জ্যোৎস্না। আর-কোনো তিথির জ্যোৎস্না নয়, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। পূর্ণতার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যদিও, তবু তো পূর্ণতা। আমি যেন বিশ্বাস না হারাই। বিশ্বাস না হারাই।

'পাবন', রাঙাদি বললেন, 'তোমার খবর তোমার মুখেই শুনব এখন। আজ নাই বা শোনা গেল। কিন্তু আমাকে না বলে আবার কন্টিনেন্টে পালিয়ে যেয়ো না।'

এতক্ষণে ও ছেলের সাড়া পাওয়া গেল। 'তেমন কোনো অভিপ্রায় নেই, রাঙা মাসিমা। বি-এ'তে আশাতীত ভালো করেছিলুম, বন্ধুরা বলল, চল অক্সফোর্ডে। এসে দেখি ঠাঁই নেই। এক বছর সবুর করতে বলে। সময় আর অর্থ নষ্ট করতে হলে বিলেতে কেন? ওই টাকায় ষ্ট্রাসবুর্গে

ফরাসী ও জার্মান শেখা যায় ও ফাঁকে ফাঁকে দেশ দেখা যায়। সেটাও তো শিক্ষার অঙ্গ। পরের বছর অক্স্ফোর্ড আমাকে স্মরণ করে। কিন্তু আমার জীবনে তখন এক ক্রাইসিস চলছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। হ্যামলেটের মতো দোদুল্যমান অবস্থা। ফলে অক্স্ফোর্ড হাতছাড়া হয়। এর জন্যে সবাই আমাকে দোষ দিয়েছে, আমিও দিয়েছি। কিন্তু যেটা হাতছাড়া হয় সেইটেই কি সবচেয়ে কাম্য।'

রাঙাদি চিন্তান্বিত হলেন। শুধু বললেন, 'ক্রাইসিসটা কী তা তো জানলুম না।'

'সেটা আরেক দিন শুনবেন। যদি শুনতে চান।' পাবন প্রতিশ্রুতি দেয়। 'আমার জীবনের গতি বদলে গেল। কিন্তু না গেলেই ভালো হতো এটা আর আমার মনে হয় না। এই তিন বছরে আমি আমার আপনাকে জেনেছি। এখন যদি কোনো আক্ষেপ থাকে সেটা কেরিয়ার ঘটিত নয়। কিন্তু সেটাও আরেক দিনের জন্যে তোলা রইল, মাসিমা।'

মিস্টার বরাট বাড়ি ফিরে মামলার কাগজপত্র নিয়ে বসেছিলেন। পাবনের পরিচয় পেয়ে বললেন, 'ওঃ তুমিই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ। এস, এস। তোমাকে একটা মজার কথা শোনাবার জন্যে কবে থেকে ছটফট করছি।'

ওদিকে মিসেসের চোখে নিষেধ। তিনি কফি তৈরি করে আনার ছলে প্রস্থান করলেন। পাবন তো মহাকৌতূহলী হয়ে কাঠের মতো বসে রইল।

'হাই কমিশনারের পার্টিতে,' বরাট সাহেব বলতে লাগলেন, 'তাঁর এডুকেশনাল অ্যাড্ভাইসারের সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় বলি, অক্স্ফোর্ড কেমব্রিজে আজকাল আমাদের ছেলেরা কেমন করছে? তার পরে জানতে চাই, আচ্ছা, সেন-হাজরা বলে একটি ছেলে অক্স্ফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে জায়গা না পেয়ে কন্টিনেন্টে চলে যায়। তার পরে তার কী হলো বলতে পারেন? ভদ্রলোক এক মিনিট ভেবে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠেন।'

বরাট নিজেও হাসি চাপতে পারলেন না। তার পর ভদ্রলোকের উক্তির পুনরুক্তি করলেন।

'He is the only fellow who ever rejected the advances of Magdalen.'

অপরের কাছে যা পরিহাস ভুক্তভোগীর কাছে তা হুল ফোটা। পাবন আগেও সয়েছে। এবারেও সইল।

বরাট এর পরে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ও রকম সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসে না। অধিকাংশের জীবনে প্রথমবারও আসে না। পেলে কি কেউ ছাড়ে? তুমি সেই দুর্লভ একজন। তোমার বাবা তো আহত হবেনই। লোকের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবেন? তুমিও তো তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দাওনি। দেশে ফিরে গিয়ে তুমি যদি সত্যি সত্যি কিছু করতে চাও তো এখনো সময় আছে। আইন পড়। এই আমার পরামর্শ। তোমার পিতারও।'

সেদিন কফির পেয়ালায় চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে পাবন বলল মেসোমশায়কে, 'দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন দেখবেন অক্স্ফোর্ডের চেয়ে স্ট্রাসবুর্গের আদর কিছু কম নয়। আর ব্যারিস্টারদের চেয়ে আর্ট ক্রিটিকদের মর্যাদা বরং বেশি। তা নিয়ে কিন্তু আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা অন্য কারণে। আর তার কোনো প্রতিকারও নেই।'

'দেশ স্বাধীন হলেও' মেসোমশায় হাসলেন, 'তোমাকে না খেয়ে স্বর্গে যেতে হবে পাবন। সেইজন্যেই বলছি মর্ত্যে থাকার একটা অবলম্বন চাই। আর্ট বলতে ওরা বোঝে প্রাচীন ভারতেরই রকমফের। আর ক্রিটিসিজম বলতে তারই সমর্থন।'

'তা হলে', পাবন বলল, 'দেশে ফিরে যাওয়া আমার হবে না। গেলে এমনি বেড়াতে যাব।'

'সেই আশঙ্কাই তোমার মা-বাবা করছেন।' এবার বললেন রাঙাদি।

তাঁরা কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না, সেও খুলে বলল না, কী নিয়ে তার ভাবনা। অন্য

কী কারণে। কেন তার কোনো প্রতিকার নেই।

সে অনেক কথা। কাকেই বা বলবে! কেই বা বুঝবে?

।। দুই ।।

দেবযানীর কী হলো তা তো সকলেই জানে। কচের কী হলো তা মহাভারতে নেই।

কচকে পাঠানো হয়েছিল অসুরদের দেশ থেকে মৃতসঞ্জীবনী শিখে আসতে। যাতে দেবপক্ষের মৃতরা বেঁচে ওঠে। কচ তো সহস্রবর্ষ পরে মৃতসঞ্জীবনী নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল মৃতদের একজনকেও প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারলেন না।

বললেন, বিদ্যাটা আমি জানি, শিখিয়ে দিতেও পারি, কিন্তু প্রয়োগ করতে অক্ষম। আমাকে গুটি কয়েক শিষ্য দেওয়া হোক। আর দেওয়া হোক একশ বছর সময়। তার পর দেখবেন একজনও বিনষ্ট হবে না।

কিন্তু এই একশ বছর কী হবে? সৈন্য অসহায়, বৈদ্য অসহায়, কিছুই করবার নেই। অসুরগুলো এনতার মারছে আর জিতছে। কোন্‌দিন স্বর্গে ঢুকে পড়ে। একশ বছর সবুর করছে কে?

দেবতারা অতীব অসন্তুষ্ট হলেন। বৃহস্পতিপুত্র, তুমি তা হলে এতদিন করলে কী?

দেবযানীর অভিশাপের কথা বলতে হলো সবাইকে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলেন না। আর করলেই বা কী? একটি নারীর অভিশাপে একটি পুরুষ এমন শক্তিহীন যে তার সামনে হাজার হাজার সৈনিক মরছে, সে জানে কেমন করে বাঁচাতে হয়, অথচ সাক্ষীগোপাল। এর চেয়ে ঢের ভালো হতো সে যদি আদৌ না জানত বাঁচাতে।

নারীর অভিশাপে এটাও একপ্রকার পুরুষত্বহীনতা।

দেবযানী এমন এক প্রতিশোধ নিল যা আর কোনো নারী কোনো দিন নেয়নি। এমন কি উর্বশী যে অভিশাপ দিয়েছিল অর্জুনকে সেও তেমন মারাত্মক নয়। মাত্র একটা বছর বৃহন্নলা হয়ে থাকতে হলো তাঁকে। সারা জীবন নয়। কিন্তু দেবযানীর অভিশাপে বেচারা কচ চিরটা কাল অসমর্থ হয়ে রইলেন। তাঁর শিষ্যরাও তাঁকে ছাড়িয়ে গেল। বেচারা কচ! বেচারা পুরুষ!

পাবনের বেলাও কি তাই হবে? নারীর অভিশাপ কি অব্যর্থ?

স্ট্রাসবুর্গ যখন সে যায় তখন জানত না সেখানে তাকে আটকা পড়তে হবে। মাস দশেক বাদে সেখানে তার কাজ সারা হলে সে প্যারিস ইত্যাদি ঘুরে অক্‌স্‌ফোর্ডে ফিরবে। তার বিশ্বাস অক্‌স্‌ফোর্ড তাকে ডাকবে। সত্যি একদিন ডাকল। কিন্তু ততদিনে তার জীবন আর একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিতে হলে আর একজনের মত নিতে হয়। আর একজন বলে বসল, যেতে নাহি দিব।

সেই অবুঝ নারীর জেদই জয়ী হলো। পাবন থেকে গেল। যাকে ভালোবাসত সে মেয়েটি আর্টিস্ট। তাকে দিল আর্টের দীক্ষা। তার রূপদৃষ্টি খুলে গেল। সে যেদিকে তাকায় সেদিকেই রূপ। সেদিকেই সৌন্দর্য। দু'জনে মিলে বেরিয়ে পড়ে। ক্যাথিড্রাল। মিউজিয়াম। স্টুডিও। শুধু একটি শহরের নয়। ফ্রান্সের, জার্মানীর, ইটালীর, বেলজিয়ামের, হলাণ্ডের, অস্ট্রিয়ার। মেয়েটি আঁকে। পাবন দেখে, ধ্যান করে, স্কেচ করে। ধীরে ধীরে আপনাকে জানে। হাতের পাঁচ হিসাবে একটা ডিগ্রী

বা ডক্টরেট তার চাই। সেটা অক্স্ফোর্ডের হলে আরো কাজে দিত। তা বলে স্ট্রাসবুর্গেরটাও ফেলনা নয়। কিন্তু তার সত্যিকার লক্ষ্য হলো সৌন্দর্যের স্থিতি। চিরকালের মতো।

এরিকা মেয়েটির নাম। দেখতে সুশ্রী। তার শ্রী তার অন্তরের প্রতিফলন। নিজের সাধনা তাকে বিভোর রাখে। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সে উদাসীন। তার মা নেই। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। হোম বলতে পিসির বাড়ি। পিসেমশায় পাবনের অধ্যাপক। পাবনকেও তাঁরা স্নেহ করেন। ভাই বোনের মতো মিশতে দেন। ওরাও তাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে। কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলে না যে ভালোবাসে। ব্যবহারেও পরিচয় দেয় না। শুধু চোখের আলোয় দেখতে পায় প্রেমের অশরীরী অস্তিত্ব। কোনো দিক থেকে কোনো অঙ্গীকার নেই। স্বীকৃতিটুকুও নেই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে এরিকা বলে পিসেমশায়ের ছাত্র। পাবন বলে, অধ্যাপকের নীস।

প্রথম বছরটা অর্থাভাব হয়নি। বাড়ি থেকে সাহায্য নিয়মিত পৌঁছত। দেশে থেকে টাকা আসা দ্বিতীয় বছর থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। বাবার আলটিমেটাম হলো, হয় অক্স্ফোর্ড, নয় লণ্ডনের ইন্ বা টেম্পল। অক্স্ফোর্ডের সঙ্গে আই সি এস সংযুক্ত থাকলে সোনায় সোহাগা। না থাকলেও চলবে। কিন্তু কন্টিনেন্টের ডক্টরেট। নৈব নৈব চ। ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে অচল। পাবন তাঁর আলটিমেটাম উপেক্ষা করায় তিনিও তার মাসোহারা আটক করেন। কী করে যে পড়ার খরচ জোটাতে হলো সে অনেক কথা। মাঝে মাঝে এরিকার কাছে ধার নিতে হয়েছে, পরে সে ধার শোধ করতে হয়েছে। ফরাসী ও জার্মান পত্রিকায় পর্যটনকাহিনী লিখে মন্দ পাওয়া যায়নি। তার পরে আর্টের উপর লিখে যশও কিছু হয়। এ সবেরই পিছনে এরিকার হাত। ফরাসী ও জার্মান রচনামাত্রেই তার দ্বারা সংশোধিত। থীসিস লিখতেও পদে পদে তার সাহায্য নিতে হয়েছে। তিনটি বছর কেটে যায় স্ট্রাসবুর্গে।

ডক্টরেট পাবার পর আর ওখানে থাকার কোনো মানে হয় না। পাবন চলে আসে প্যারিসে ভাগ্যপরীক্ষা করতে। তাই নিয়ে এরিকার সঙ্গে মনোমালিন্য। সে বলে, 'আমি ভাবতেই পারছিনে তোমাকে ছেড়ে কেমন করে আমার দিন কাটবে।' পাবন বলে, 'আমিও কি ভাবতে পারছি? কিন্তু প্যারিসে গেলে আমি আরো কিছু শিখব। শিল্পই এখন থেকে আমার জীবন। আমার জীবনে আর কী আছে, বল?'

'আর কি আছে, পাবন?' এরিকা তার চোখে চোখ রেখে বলে, 'আর কী আছে, তা কি মুখ ফুটে বলে দিতে হবে? কেন তুমি প্রপোজ করছ না?' পাবন এর উত্তরে বলে, 'কোন্ সাহসে করব? দেশে আমাদের অবস্থা ভালো, কিন্তু বাবা চটে রয়েছেন। আরো রাগ করবেন। ইউরোপে যে থাকব তারই বা উপায় কী? লিখে যা পাই তাতে বড়জোর একজনের চলে। তা ছাড়া,' পাবন আরো ভেবে বলে, 'আমার একটা সংকল্প আছে। একদিন না একদিন আমি দেশে ফিরে যাব ও মরা গাঙে জোয়ার আনব। আমি তো ইউরোপে তেমন কিছু ঘটাতে পারব না।'

তখন এরিকা বলে, 'বুঝেছি। তুমি মা-বাপের অমতে বিয়ে করবে না। করবে কেবল একটার পর একটা অ্যাফেয়ার। প্যারিসে তার অশেষ সুযোগ। ওইসবই হবে, হবে না শুধু মরা গাঙে জোয়ার আনা। তার জন্যে চাই আমার মতো একজনকে। তোমার কোন্ শুভকর্মে না আমি সহায় হয়েছি, পাবন? কেন তুমি এই পার্টনারশিপ ভঙ্গ করতে চাইছ?'

পাবন আঘাত পায়। এতদিন সে যা করেছে তা অ্যাফেয়ার নয়। একটার পর একটা তো অভাবনীয়। প্যারিসে না গিয়ে মিউনিকে বা রোমে গেলেও এরিকা ওই কথাই বলত। তা বলে কি সে আর কোনোখানে যাবেই না? সৌন্দর্যের সঙ্গে তার পরিচয় প্রগাঢ় হবে কী করে? একাধিক বার ওরা দু'জনায় প্যারিসে ঘুরে এসেছে। কিন্তু প্যারিসকে অমন করে চেনা যায় না। আপনার

করতে হয়।

প্যারিসের আকর্ষণ আর এরিকার আকর্ষণ। কোন্‌টা বেশি দুর্বার, কোন্‌টা কম? সেবার অক্‌স্‌ফোর্ডের সঙ্গে আকর্ষণ-পরীক্ষার এরিকার জয় হয়েছিল। এবার তার হার হলো। সে ক্ষমা করল না। আর পাবনও তো অক্‌স্‌ফোর্ড যেতে না পেয়ে ভিতরে ভিতরে অভিমান পুষছিল। বিদায়ক্ষণে ঘটে গেল একটা বিস্ফোরণ।

'তুমি! তুমি আনবে মরা গাঙে জোয়ার!' এরিকা বলল তির্যক হেসে। 'তুমি জান তুমি তা পার না। একদিন একটা রেখাও কি এঁকেছ যা শুদ্ধ হয়েছে, সাবলীল হয়েছে? সৃষ্টি তোমাকে দিয়ে হবে না। সৃষ্টিশীলতাই তোমার মধ্যে নেই।'

পাবন চমকে উঠে কাতরভাবে বলল, 'ও কী বলছ, এরিকা! ও যে অভিশাপ!' তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, 'ওতে কি আমার ভালো হবে? তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাস তো ও অভিশাপ ফিরে নাও।'

'না, না, অভিশাপ কেন দেব? তা কি আমি পারি?' এরিকা নরম হয়ে বলল, 'সৃষ্টি তোমার হাত দিয়ে হবে না, কিন্তু সৃষ্টিরহস্য তুমি ভেদ করবে। তোমার সংস্পর্শে যারা আসবে তারা সৃষ্টির প্রেরণা পাবে।'

প্যারিসে গিয়ে পাবন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। সেখানে যেন অষ্টপ্রহর মেলা বসেছে। মেলামেশার অন্ত নেই। কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। আলাপী মিলে যায় বিস্তর, কাজকর্মেরও সুবিধা হয়, রোজ থিয়েটার কিংবা কাবারে, যখন তখন কাফে। স্টুডিওগুলো চষে বেড়ায়, মিউজিয়ামগুলো মুখস্থ হয়ে যায়। শিল্পী ও শিল্পরসিক মহলে তার নামের কার্ডই তার পরিচয়পত্র। দুনিয়ার তামাম বিষয়ে কথায় কথায় ইশ্‌তেহার বার করা চাই। কবি ও কলাবিদ্‌রা তাতে স্বাক্ষর দেন। পাবন ধন্য হয়ে যায় যখন ইশতেহারগুলোতে তাকেও স্বাক্ষর দিতে বলা হয়। দেখ দেখি, প্যারিসে না এলে এমন ভাগ্য হতো কখনো?

একটু থিতিয়ে যাবার সময় যখন এলো তখন পাবন হৃদয়ঙ্গম করল যে সে আর্টিস্ট নয়। তার আঁকা ছবি কেউ কোনোদিন আর্ট গ্যালেরিতে বা মিউজিয়ামে দেখবে না। প্রদর্শনীতে দেখলেও সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাবে। প্রদর্শনী তো একটা দুটো নয়। শত শত। একের পর এক পরিদর্শন করতে করতে স্মরণশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছয়। কপাল ঠুকে একবার সে একটা প্রদর্শনী করেছিল। জনসমাগমও মন্দ হয়নি। বিক্রিও যা হলো তা খরচ ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পাবন স্বয়ং বুঝতে পারল ওসব এরিকার সঙ্গে ও এরিকার পরামর্শে আঁকা বলেই কোনো মতে জলচল। দ্বিতীয় বার প্রদর্শনী করতে তার হাত উঠল না। প্রদর্শন করার মতো কিছু থাকলে তো!

ল্যাটিন কোয়ার্টারে তার প্রিয় ভোজনাগার ছিল একটি রাশিয়ান রেস্তরাঁ। শ্বেত রাশিয়ানদের। সেইখানেই আলাপ হয়ে যায় মস্কো আর্ট থিয়েটারের ভাঙা দলের শিল্পীদের সঙ্গে। তাঁদের সৌজন্যে সে থিয়েটার ক্রিটিকের পাশ পায়। থিয়েটারে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে যেখানেই আসন নিক না কেন তার মনে বিভ্রম জন্মায় যে, সেও মঞ্চের জীবনের অংশীদার। সে শুধু দর্শক নয়। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে সে একপ্রকার আত্মীয়তা অনুভব করে।

সদর অন্দর দুই মহলেই তার প্রবেশ। গ্রীনরুমে গিয়ে সে সাজসজ্জা নিরীক্ষণ করে। দুটো একটা ইঙ্গিত দেয়। মেক-আপে ভীরুভাবে হাত লাগায়। বিরতির সময় মঞ্চে উঠে সেখানকার সেট নাড়াচাড়া করে। সেখানেও দুটো একটা ইঙ্গিত দেয়। এর পরে সে গিয়ে রিহার্সলে হাজির হয়। সেখানেও গায়ে পড়ে হস্তক্ষেপ করে।

সে যে আর্টিস্ট, কেবলমাত্র আর্ট ক্রিটিক নয়, এইভাবে সেটা জাহির করেই তার পৌরুষ।

মনে মনে বলে, এরিকা, তুমি যদি এখানে এখন থাকতে তা হলে দেখতে আমি এখনো যথেষ্ট শক্তি রাখি। মস্কো আর্ট থিয়েটারেও আমার খোদকারী খাটে। স্টানিস্লাভ্স্কি যদি জানতেন আমাকে ধন্যবাদ দিতেন।

এমনি করে সে একদিন মাদাম কর্সাকোভার সুনজরে পড়ে। সম্পর্কটা বিশুদ্ধ ভদ্রতার। তার থেকে একটু এগিয়ে বন্ধুতার। তার চেয়ে গভীর কিছু নয়। কিন্তু ঈর্ষাকাতর ভারতীয়দের মতে ওটা প্রেম। তাই যদি না হবে তবে পাবন কেন মাদামের গায়ে ফারকোট পরিয়ে দেয়? কেনই বা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে? এক একদিন ভিতর থেকেও? পাশাপাশি বসে আহার করেই বা কোন্ সুবাদে? কী এত বলবার আছে মাদামের কানে কানে? প্রায়ই তো বোকে উপহার দিচ্ছে।

তার জীবন ধন্য হয়ে যায় মাদাম যেদিন তাকে বলেন, 'আপনি আর্ট ক্রিটিক বলে পরিচয় দিলে হবে কী? আপনি আর্টিস্ট। রূপকথার বীস্ট যেমন ছিল ছদ্মবেশী রাজপুত্র আপনিও তেমনি ছদ্মবেশী শিল্পী।'

'তা হলে রূপকথার বিউটি কে?' কথাটা বলি বলি করে বলা হলো না। যদি আর কারো কানে যায়। তা ছাড়া সে এই সম্পর্কটিকে প্রেমে পরিণত হতে দিতে চায় না। দিলে শিকলির টানে ভালুকের মতো ঘুরবে ইউরোপের এক রাজধানী থেকে আরেক রাজধানীতে। মস্কো আর্ট থিয়েটার কোনো এক স্থানে স্থিতিবান নয়।

সেই দলটির সঙ্গে পাবনও এলো লণ্ডনে কিন্তু তাদের সঙ্গে লণ্ডন ছাড়ল না। সে তো ইংরেজীতেও লেখে। এদেশেও তার চেনা মহল ছিল। বন্ধুরা বলল, থেকে যাও। কর্সাকোভা তার হাতে চাপ দিয়ে নীরবে বিদায় নিলেন।

॥ তিন ॥

এসব কথা কি মা মাসীকে বলা যায়? না বোঝানো যায়? পাবন তাই এতদিন তার মাকেও লেখেনি। দিদিকেও না। রাঙাদিকে একদিন বলল রেখেঢেকে।

তিনি বিমর্ষ হলেন। 'এই তো! প্রেমে না পড়ে থাকতে পারলে না তো! কেন যে আমাদের ছেলেদের এ দুর্মতি হয়! কী আছে এদের মেয়েদের যা আমাদের মেয়েদের নেই? রূপযৌবন কি এদেশেই আছে? ওদেশে নেই? না, বাপু। ভাবালে।'

এর পরে একদিন তিনি বললেন, 'আইন পড়তে নারাজ শুনে তোমার মেসোমশায় চুপ করে বসে থাকেননি। মহারাজা গায়েকবাড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মহারাজার মিউজিয়ামের জন্যে তোমার মতো একজন জহুরীর দরকার। ইউরোপে মাঝে মাঝে আসবে, দেখে শুনে ছবি কিনবে, শিল্পদ্রব্য কিনবে। ভারতেও ঘুরে ঘুরে তাই করবে। কেমন সুখের চাকরি। মহারাজা তোমাকে ইণ্টারভিউতে ডেকেছেন। নামমাত্র ইণ্টারভিউ। সব ঠিকই আছে।'

আর কেউ হলে লাফিয়ে উঠত। বলত, 'আঁচাব কোথায়?' কিন্তু পাবন শুধু বলল, 'ভেবে দেখব।'

তার পর তার সেই ভেবে-দেখা আর ফুরোয় না। কয়েক সপ্তাহ গা-ঢাকা দেবার পর আবার

তার উদয়। 'কি হে, ভেবে দেখলে?'

'রাজা মহারাজাদের মনমেজাজকে আমি বড় ভয় করি, রাঙামাসী। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ। আমার পছন্দ হয়তো ওঁর পছন্দ হবে না। অমনি চাকরিটি যাবে। মুণ্ডুটি যে যাবে না সেইটুকু প্রোগ্রেস হয়েছে।' পাবন অনেক মাথা খাটিয়ে এই জবাবটি বানিয়েছিল।

প্রস্তাবটা লোভনীয়। আর সয়াজী রাও তো অতি সজ্জন। সে রকম কোনো আশঙ্কাই ছিল না। বরং ছিল মানবসৃষ্ট সৌন্দর্যের নিত্য সাহচর্য। সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার পাথেয়। স্বদেশের জন্যে কিছু করার সুযোগও। কিন্তু তা হলে তো দেবযানীর অভিশাপ প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হলো। ও যে আত্মিক পুরুষত্বহানি। রাজরোষের চেয়েও ভয়াবহ।

যেমন অক্‌স্‌ফোর্ডের আহ্বানের বেলা তেমনি বড়োদার প্রস্তাবের বেলা পাবনের কাজ হলো হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয়। 'টু বি অর নট টু বি'। দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা কেটে যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া আর হয় না।

রাঙাদি হাল ছেড়ে দেন। 'তোমার দেখছি কিসে নিজের ভালো হবে সে জ্ঞানটাই নেই। তোমার জন্যে কিছু করতে যাওয়া মিছে।'

তা বলে তিনি তাকে একেবারে বর্জন করলেন না। যখনি পার্টি দিতেন আর পাঁচজনের মতো তাকেও ডাকতেন। ইতিমধ্যে সে পাড়াবদল করে চেলসীতে উঠে গেছল। আর্টিস্টদের সংসর্গ যাতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পায়। আর্ট বই সম্পাদনার ভার তার উপর পড়েছিল। ভূমিকা ও টীকা লিখতে হয় তিনটে ভাষায়। এই নিয়ে চলে যাচ্ছিল একরকম।

রাঙাদির ওখানেই একবার এক পার্টিতে দেখা। মল্লিকার সঙ্গে। 'পাবন, এদিকে এসো। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। পতিতপাবন সেন-হাজরা। মল্লিকা সিন্‌হা।'

'উঁহু। হলো না, হলো না।' বেণুদি বলে উঠলেন। 'বিশিষ্ট শিল্পরসিক তথা বিদ্যানাগরিক ডক্টর সেন-হাজরা। বিখ্যাত অধ্যাপক পি কে সিন্‌হার রূপসী ও গুণবতী কন্যা মিস সিন্‌হা।'

পাবন যে মল্লিকার সঙ্গে দুটো কথা কইবে তার বন্ধু শ্যামলের ওটা সহ্য হলো না। সে ছোঁ মেরে পাবনকে নিয়ে গেল ও কানে কানে বলল, 'তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ। আর বাড়াতে যেয়ো না। মল্লীকে আমি চিনি। ও ধরা দেবার পাত্রী নয়।'

'তুমি ভুল করেছ, শ্যামল।' পাবন হেসে বলল, 'আমিই ধরা দেবার পাত্র নই।'

এমনিতেই ব্যাপারটা একটুখানি সামাজিকতার ঊর্ধ্বে উঠত না। মল্লিকাও ভুলে যেত পাবনকে। পাবনও মল্লিকাকে। কিন্তু শ্যামল যে অভিনয়টি করল তার ফল হলো বিপরীত। ওটা নাকি সে বেণুদির শিক্ষায় করেছিল। রাঙাদিও ছিলেন ওই চক্রান্তের মধ্যে। কেউ যদি পাবনকে ভুলিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে মল্লিকা। দেশে একবার যদি ফেরে তা হলে বাকীটা লজিক অনুসারে অনুসরণ করবে।

পার্টি থেকে বিদায় নেবার সময় পাবন বলল মল্লিকাকে, 'আবার কবে আমাদের দেখা হচ্ছে?'

'ইচ্ছা করলে কালকেই।' মল্লিকা আশা দিল।

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কাল আমি দশটার সময় দাঁড়িয়ে থাকব। গেটে।'

'আচ্ছা। আমার ভয়ানক কৌতূহল ভিতরে গিয়ে দেখতে।'

'বেশ তো। আমি দেখাব।'

শুনেও না শোনার ভান করলেন বরাটরা। গোস্বামীরা। শ্যামল ও কান্তিমান। আর পাবন প্রস্থান করল কোনো দিকে না তাকিয়ে। মল্লিকা তো বরাটদের অতিথি।

এরিকার অভিশাপের পর থেকে একটু একটু করে পাবনের মনে লালিত হচ্ছিল নবজাত একটি আইডিয়া। দেবযানীর শাপ মোচন করতে পারে দেবযানী স্বয়ং। তা যখন এ জীবনে সম্ভব নয় তখন তার একটিমাত্র বিকল্প আছে। আর একজন নারী আসবে, সে দেবে বর। তার বরও হবে অব্যর্থ। সে বলবে, তুমি সৃষ্টি কর। অমনি পাবন সৃষ্টি করবে।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম কি এক আধঘণ্টায় দেখা হয়? একটা দিন লেগে গেল শুধু গ্রীক রোমান ভাস্কর্য ও বাস্তুকলা পরিদর্শন করতে। মাঝখানে একঘণ্টা মধ্যাহ্ন ভোজন। কাছেই প্লেন ট্রী রেস্টোরাণ্ট। তার দেয়ালে একটা প্লেন গাছ আঁকা। সেখানে বেশি লোক যায় না। নিরিবিলি পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম কি একদিনে দেখা হয়? পরের দিনও দেখতে এলো মল্লিকা। আবার সেই রেস্টোরাণ্ট। তার পরের দিনও দেখতে এলো মল্লিকা। আবার সেই রেস্টোরাণ্ট। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। তার পরে শনিবার। মধ্যাহ্নভোজনের পর ওরা চলল কিউ গার্ডনস দেখতে। পরের দিন রবিবার। সেদিনও তাই। মল্লিকা এসেছে দেশ দেখতে। এই তার কাজ। দেশ দেখা হচ্ছে। রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার কথাও ছিল। মণ্টেসরি ট্রেনিং নেওয়া। সেটার জন্যে মাথাব্যথা নেই।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম শেষ করতে তিন সপ্তাহ লাগা বিচিত্র নয়। এটাও তো শিক্ষা। তার পর ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম। আরো তিন সপ্তাহ। শিক্ষা বইকি। এর পরে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালেরি। আরো দু' সপ্তাহ। তারপর টেট গ্যালেরি। আধুনিক চিত্রকলা। এমনি করে মাস তিনেক কোনখান দিয়ে কেটে গেল।

'আচ্ছা, ডক্টর সেন-হাজরা', মল্লিকা একদিন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যে আমার জন্যে এত সময় নষ্ট করছেন এর প্রতিদান আমি দেব কী করে? কী আছে আমার যা আপনার গ্রহণযোগ্য হবে?'

'তা যদি জানতে চান তবে আপনাকে সমস্তটা শুনতে হবে।' পাবন উত্তর দিল।

যে কথা সে মা মাসীকে বা দিদিকে বলতে সাহস পায়নি, চায়নিও, সে কথাই আগাগোড়া শুনিয়ে গেল এই মেয়েটিকে। কিছুই গোপন করল না, হাতে রাখল না। সে জানত যে মল্লিকা ধরা দেবার পাত্রী নয়। সেও নয় ধরা দেবার পাত্র। সম্পর্কটা বিশুদ্ধ বন্ধুতার।

'ওঃ এইটুকু আপনি চান! দুটি অক্ষরের একটি শব্দ! বর!' মল্লিকা বলল মৃদু হেসে।

'হাঁ, দেবী।' পাবন বলল শ্রদ্ধাভরে।

'আর আমি কী চাই সেটা জানতে চাইলেন না যে?' আরক্ত হয়ে সুধালো মল্লিকা।

'আপনি? আপনার কোনো অভাব আছে নাকি? শুনি?' বিস্মিত হলো পাবন।

'সেটিও দুটি অক্ষরের একটি শব্দ।' পাবন বোকার মতো ভাবছে দেখে মল্লিকা বলল, 'পারলেন না তো অনুমান করতে? সেটি আপনার ওই শব্দটিরই প্রতিধ্বনি।'

'বর!' অবাক হলো পাবন। 'আপনাকে কে আবার অভিশাপ দিল?'

'দূর! বর শব্দের কি একটাই অর্থ?' মল্লিকা রেগে উঠল।

'ওঃ বুঝেছি।' ডক্টর যারা হয় তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একটু দেরিতে হয়।

'কী বুঝলেন?' মল্লিকা হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল।

'আমি কিন্তু শুনেছিলুম', পাবন বলল সবিস্ময়ে, 'আপনি নাকি বিয়েই করবেন না।'

'কথাটা মিথ্যা নয়। যা পোহাতে হয়েছে আমাকে, তারপরে আমার দশা হয়েছে যেন ঘরপোড়া গোরুর। আর একটু হলেই আমি মরেছিলুম।' মল্লিকা শিউরে উঠল।

পাবনের আগ্রহ দেখে মল্লিকা শোনায় তার গল্প।

ছেলেবেলা থেকেই সে একটু উদাসীন প্রকৃতির। শাড়ি কিংবা জামা, গয়না কিংবা সেন্ট, পাউডার কিংবা রং কোনো দিন তাকে আকর্ষণ করেনি। কিন্তু সিঁথির সিঁদুর সম্বন্ধে তার একটা মোহ ছিল। শিবের কাছে সে মনে মনে বর প্রার্থনা করত। শিবের মতো বর। যাকে অন্তর থেকে ভক্তি করতে পারবে। কলের মতো নয়। দেখতে সুন্দর নাই বা হলো, নাই বা হলো ধনবান। কেই বা জানত শিবের বংশ পরিচয়?

বাবার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ছাত্ররা আসত। তিনি তাদের বুঝিয়ে দিতেন। বলে দিতেন কী কী পড়তে হবে। কারো কারো সঙ্গে তর্কও করতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল একটি ছেলে। যখন-তখন আসত। বাবার কাছে এমন সব বই ছিল যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেসব বই বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। সেসব বই সে চেয়ে নিয়ে পড়ত। বাবা তাকে ঢালা অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন যে, সে লাইব্রেরীতে বসে যতক্ষণ ইচ্ছা, যে বই ইচ্ছা পড়তে পারবে। পরে তিনি তাকে বাজিয়ে দেখতেন যে, সে সত্যি পড়েছে ও মনে রেখেছে। বাবাকেও সে বাজিয়ে দেখত। তিনি পড়েছেন, না শুধু সাজিয়ে রেখেছেন।

বাবা একদিন বললেন, ওই যে জগৎ ওই আমার ইস্পাতের উপযুক্ত। ওর সঙ্গে লড়ে সুখ আছে। বাবা ওকে ডাকতে আরম্ভ করলেন জগৎসিংহ বলে। ঠাকুমা বললেন, মল্লীর জন্যে আর পাত্র খুঁজতে হবে না। জগতের সঙ্গেই সম্বন্ধ কর। মা একটু 'কিন্তু' 'কিন্তু' করেন? কে ও? কাদের ছেলে? কোথায় ওদের দেশ? ভালো করে খোঁজখবর নিয়েছ? জগতের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল বাবার। ও যা পরিচয় দিয়েছিল তাই বেদবাক্য। এমনিতেই বাবা আত্মভোলা মানুষ। ইতিহাস নিয়ে মত্ত। জগৎ যেদিন এম-এ'তে ফার্স্ট হয় সেদিন উল্লাসে উদ্বাহু হন। হাঁ, জগৎসিংহ একদিন তাঁর চেয়ারে বসবে।

মাসকয়েক পরে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে যায়। মল্লিকার বি-এ পরীক্ষাটার জন্যেই যা দেরি। যথাকালে নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপা হয়ে বিলি হয়। ডাকে দেওয়া হয়। আজ বাদে কাল রান্না বান্না হবে, এমন সময় বাদ সাধল কৈকেয়ী। পুরুলিয়া বারের নামজাদা উকীল রসময়বাবু বাবার সহপাঠী ছিলেন। তিনি ছুটে এলেন কলকাতায়। বাবার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বললেন। বাবা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর চোখে আগুন জ্বলছে। জগৎটাকে পেলে তিনি খুন করবেন।

মল্লিকা তখন গায়ে হলুদের জন্যে তৈরি হচ্ছে। তার মা এসে গাছের মতো ভেঙে পড়লেন। জগৎ যে এমন করে দাগা দেবে, কে জানত। এত ভালো ছেলে, তলে তলে এত কপট। কোনো দিন কি বলেছে যে, চার বছর আগে তার বাবা তার বিয়ে দেন, কিন্তু বৌকে ঘরে নেন না। ছেলেকেও যেতে দেন না শ্বশুরবাড়ি। রসময়বাবুকে আরো টাকা দিতে হবে, আরো গয়না দিতে হবে, আরো হেঁট হতে হবে। কারণ ছেলে যে আরো যোগ্য হয়েছে ও দিন দিন হচ্ছে। অমন জামাই কি অত সস্তায় বিকোবে? রসময়বাবু তাঁর ক্ষমতার শেষ সীমায় যান। বলে দেন যে, আর পারবেন না। তখন তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে এই দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করা হয়। একেবারে কলকাতায়।

মল্লিকাও বজ্রাহত। কিন্তু আপনাকে সে সামলে নেয়। রসময়বাবুকে বলে, কাকা, আপনি বিজলীকে আসতে টেলিগ্রাম করে দিন। তার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। তার আসা চাই-ই। রসময়বাবু তো অবাক। কিন্তু তাঁকে কিংবা কাউকে ভেঙে বলে না মল্লিকা কী আছে তার মনে।

কন্যাকে সভাস্থ করার সময় বর-বাবাজী আবিষ্কার করে যে, এ মল্লিকা নয়, এ বিজলী। সে ভয়ানক চমকে ওঠে। কিন্তু গোলমাল করে না। কন্যাকর্তা অসুস্থ বলে, 'কাকা' রসময়বাবু সম্প্রদান

করেন। তারপর দানসামগ্রীর বেলা জগৎ নিজেই দাগা পায়। ওসব তো তার জন্যে নয়। ওসব মল্লিকার অনাগত বরের জন্যে তোলা থাকবে। শেষে রসময়বাবু কথা দেন যে, তিনি তাঁর জামাতার মনে কোনোরকম আফসোস রাখবেন না। বরকর্তাকে ঢেঁকি গিলতে হলো। ও ছেলেকে তৃতীয়বার বর সাজাবার সাহস তাঁর ছিল না।

এর পরে মল্লিকা একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে হরিদ্বার যাত্রা করে। তার মা-বাবা অনুমতি দেন। বেচারি কী নিয়ে থাকবে? পড়াশুনায় তো মন নেই। পাগল হয়ে যায়নি এই রক্ষা। বিয়ের কথা তোলে কার সাধ্যি। কুম্ভমেলার ভিড়ে একদিন হরিদ্বার থেকে সে হারিয়ে যায়। খবর পেয়ে তার বাবা রওনা হন তাকে খুঁজতে। অনেকদিন বাদে তার সন্ধান মেলে। তখন সে সন্ন্যাসিনী। মা শয্যা নিয়েছেন শুনে অবশেষে বাড়ি ফেরে। ইতিমধ্যে সে হয়েছিল সন্ন্যাসিনীদের সম্বন্ধে মোহমুক্ত। আর পুরুষজাতির যে পরিচয় সে ঘরের বাইরে গিয়ে পেয়েছিল, তার ফলে বীতশ্রদ্ধ। কেউ শিব নয়। কোথাও সে টিকতে পারে না। না ঘরে, না বাইরে। সে এখন না ঘরকা না ঘাটকা।

তাই তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে রপ্তানী করা হয়েছে সরাসরি কলকাতা থেকে লণ্ডনে। বাঙাদি তার ভার নিয়েছেন। বিলেতে যদি তার মন ফেরে। ভালো লাগে তো মণ্টেসরি ট্রেনিং নেবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে খুব ভালোবাসে।

পাবনের চোখ কখন এক সময় ঝাপসা হয়ে এসেছিল। সে চশমা খুলে নিয়ে চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, 'উদাসিনী রাজকন্যা, তোমার গুপ্ত কথা তো শুনলুম। তোমার জন্যে কী করতে পারি, তাই ভাবছি।'

'আর যাই কর,' মল্লিকা হেসে বলল, 'উপকার করতে চেয়ো না। দুঃখে-তাপে আমার মূল্য আমি বুঝেছি। আমার জন্যে যে আমাকে চাইবে, আমার রূপগুণ কুলশীলের জন্যে নয়, আমার পিতার ধনমান প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যেও নয়, তেমন কেউ যদি থাকে তবে আমিও ভেবে দেখব।'

'তুমি কি জগৎকে—' পাবন বলতে বলতে থেমে গেল।

'ভুলে গেছি কিনা জানতে ইচ্ছা কর? না ভুলে যাইনি। তবে সে ভালোবাসা আর নেই। হৃদয় এখন আমার হাতে ফিরে এসেছে। আমি ফ্রি।' মল্লিকা গম্ভীর।

'তুমি কি আশা কর তোমার জন্যে কেউ একজন তপস্যা করবে?' পাবন শুধায়।

'নিশ্চয়। এবার গৌরীর জন্যে তপস্যা।' মল্লিকা উত্তর দেয়।

তখন বসন্তকাল। শীতের মেঘবৃষ্টি কুয়াশার যবনিকা সরে গেছে। আকাশ অন্তহীন নীল। আলো ঝরে পড়েছে শতমুখে। বাতাসে হাজার ফুলের গন্ধ আর হাজার পাখীর কণ্ঠ। নতুন পাতায় পুরোনো গাছের ডাল ছেয়ে গেছে। চেনা যায় না যে, এই সেই রিক্তপত্র ছায়াশূন্য তরু। কত বড় একটা রূপান্তর ঘটে গেল ক'টা দিনে।

কেনউডে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের উপর আসন নিয়েছিল মল্লিকা ও পাবন। 'ওই যে রূপান্তর,' পাবন নীরবতা ভঙ্গ করল, 'ওর সঙ্গে ম্যাচ করবে তোমার-আমার দু'জনারই রূপান্তর। বসন্ত আসবে আমাদেরও জীবনে।'

মল্লিকা একবার পাবনের চোখে চোখ রেখে নামিয়ে নিল। তার অন্তরে দোলা লেগেছে। সে অনুভব করছে একটি পরম লগ্ন আসন্ন।

পাবন ভয়ে বলবে কি নির্ভয়ে বলবে? ইতস্তত করতে করতে হঠাৎ জোর করে বলে বসল, 'উদাসিনী রাজকন্যা, তুমি কি স্বর্গের দেবকন্যার মতো অভিশপ্ত কচকে বর দিয়ে ত্রাণ করতে পার না?'

'সানন্দে।' মল্লিকা বলল আবেগভরে, 'নাও, নাও, যে বর চাও সে বর নাও।'

মন্ত্রপাঠের মতো পাবন তার প্রতিধ্বনি করল। 'নাও, নাও, যে বর চাও সে সে বর নাও।'
(১৯৬৩)

হাজারদুয়ারী

ট্রেন তখনো দাঁড়িয়ে। কিন্তু ওভারব্রিজ দিয়ে নামতে নামতেই ছেড়ে দিল। যারা পারল তারা দৌড়তে দৌড়তে ধরে ফেলল। মোট মাথায় করে কুলীও ছুটছিল। সেও ধরে ফেলত। যদি না বাবুসাহেব ইশারায় বারণ করতেন।

তাঁকে তুলে দিতে এসেছিলেন তাঁর বন্ধু রাজীব। বললেন, 'আমারই দোষ। আমিই তোমাকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারিনি।'

মেঘবরণ বললেন, 'এই তো দেখলে কত লোক আমার চেয়ে জোরে পা চালিয়ে ট্রেন ধরে চলে গেল। তোমার দোষ নয়। আমিই অনিচ্ছুক। আমার মর্যাদায় বাধে। আমি এই হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি ঠেলাঠেলির যুগে এক এক করে কত ট্রেনই না ফেল করলুম। এই কি প্রথম, না এই শেষ! যেতে দাও, রাজীব। ভালোই হলো যে তোমার সঙ্গ আরো কিছুক্ষণ পাব।'

ফের সেই ওভারব্রিজ দিয়ে উঠতে হলো। রাজীব বললেন, 'পরের ট্রেন তো রাত বারোটার আগে নয়। ততক্ষণ এই স্টেশনে বসে থেকে করবে কী? তার চেয়ে চল আবার আমার বাড়িতে। ভালোই হলো যে ডিনারটা পথে মিস্ করতে হলো না।'

'না, না, বন্ধুজায়াকে দ্বিতীয়বার সারপ্রাইজ দিতে চাইনে।' মেঘবরণ মাথা নাড়লেন। 'সকালবেলা হঠাৎ তোমাদের ওখানে হাজির হয়ে যা চমক দিয়েছি তা তিনি হাসিমুখে নিয়েছেন। তা বলে একই দিনে দু'বার!'

কী ভাগ্যি এ স্টেশনে রিফ্রেশমেন্ট রুম ছিল। সেখানে গিয়ে ডিনারের অর্ডার দিলেন মেঘবরণ। দু'জনের। বললেন, 'রাজীব, তুমি বরং তোমার কর্ত্রীপক্ষকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিয়ে অনুমতি নাও। চোদ্দ বছর বাদে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এটাকে স্মরণীয় করার জন্যে এ স্টেশনে একসঙ্গে আহার করা যাক।'

রাজীব বললেন, 'পড়েছি মোগলের হাতে। খানা খেতে হবে সাথে। মোগল না হোক মোগলযুগের জমিদার। আসছেনও মোগলরাজ্য থেকে।'

তা শুনে মেঘবরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কেন লজ্জা দাও, ভাই? জমিদার বলে একজাতের ডাইনোসর ছিল। তারা এখন ফসিল হয়ে গেছে। আমিও কেন তাদের মতো ফসিল হতে যাব? আমার জীবনে অন্য কাজ আছে।'

সারাদিন ওঁরা শান্তিনিকেতন ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। কথাবার্তা যা হয়েছে তা কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী অবলম্বন করে। কিংবা পাকিস্তানের হিন্দুদের ঘিরে। অন্তরঙ্গ আলাপের নিভৃতি মেলেনি। ওয়েটিং রুমের ও পাশের বারান্দায় চেয়ার আনিয়ে নিয়ে বসা গেল। সামনে দু'গেলাস পানীয়।

'এ বয়সে আর ওসব পারিনে।' মেঘবরণ বললেন, হারানো ট্রেনের জন্যে আফসোস করে। 'সময় ছিল, কিন্তু বয়স ছিল না।'

'সময় ছিল মানে দৌড়বার সময় ছিল।' রাজীব বললেন প্রবোধ দিয়ে। 'কাজ কী, বাবা, ঘোড়দৌড় করে? শেষে কি বি ভি গুপ্ত হতে?'

প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ বিপিনবিহারী গুপ্ত নাকি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে দেখে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। দৌড়তে দৌড়তে পরের স্টেশনে তাকে ধরেন। কিন্তু উঠতে গিয়ে জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে যান।

পশ্চাদ্ধাবন কথাটার ছোঁওয়া লেগে মেঘবরণের মনে অন্য এক প্রকার ট্রেন চলতে শুরু করল।

'পশ্চাদ্ধাবন কি মানুষ শুধু ট্রেনেরই করে?' তিনি যেন আপনাকে আপনি বললেন। 'দেখনি কি কাউকে সাফল্যের পশ্চাদ্ধাবন করতে? ক্ষমতার পশ্চাদ্ধাবন? সম্পদের পশ্চাদ্ধাবন? নারীর পশ্চাদ্ধাবন? একদিন না একদিন নাগাল পায়। কিন্তু চিরদিনের মতো খঞ্জ হয়ে যায়। বুঝতেও পারে না যে বিকলাঙ্গ।'

'বিকলাঙ্গ?' রাজীব ভুল ধরলেন। 'তুমি বলতে চাও বিকলপ্রকৃতি। বিকল চরিত্র।'

'ছেড়ে দাও। কথা নিয়ে তর্ক করা তোমার সেই কলেজ জীবনের অভ্যাস। এখনো সেটা গেল না। পঁয়ত্রিশ বছর বাদেও।' মেঘবরণ বললেন স্নেহভরে। 'কী ব্রিলিয়ান্ট ছেলে তুমি ছিলে। তাই তো আজ এই পুণ্যতীর্থে এসে তোমার কথাই বিশেষ করে মনে পড়ল। আগে থেকে খবর দিতে পারিনি। আমাকে তুমি প্রত্যাশা করনি। তোমার গৃহিণী তো চোখেও দেখেননি। সারাটা দিন কী আদর আপ্যায়নই না করলে তোমরা দু'জনে! তোমরাও ছাড়তে চাও না। আমিও কি ছাড়তে চাই! সেই জন্যেই তো ট্রেনটা হাতছাড়া হলো। অবচেতন বোধ হয় চায় না যে আবার চোদ্দ বছরের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যদি ততকাল বাঁচি!'

'তা তুমি যে বোকার মতো পাকিস্তানেই থেকে যাবে কেমন করে জানব?' রাজীবের কণ্ঠস্বরে স্নেহ। 'আমি কিন্তু ভাবছি এই স্টেশনের ভোজনঘরের খানা কি তোমার মতো আমীরের মুখে রুচবে? খেতে কষ্ট হবে না তোমার?'

'ভেবো না, বাবলু।' মেঘবরণ প্রথম যৌবনে ফিরে গেলেন। 'তুমি তো জানো, যেখানে যা জোটে তাই আমি খাই। আমীরের সঙ্গে আমীরের মতো। ফকিরের সঙ্গে ফকিরের মতো। আহারটা আমার কাছে একটা সমস্যাই নয়। ডাইনিং আর ওয়াইনিং না করলে কি মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেশা যায়? যার কাছে যা শেখবার আছে তার কাছ থেকে তা আদায় করা যায়? তাই তো সাহেবদের সঙ্গে আমি সাহেব, মোগলদের সঙ্গে মোগল, বৈষ্ণবদের সঙ্গে বৈষ্ণব, বাউলদের সঙ্গে বাউল।'

'মনে আছে।' রাজীব বললেন, প্রথম যৌবনের নেশার ঘোরে, 'মনে আছে, সন্তু, আমাদের মেছো বাজারের মেসে তুমি কতবার আমার অতিথি হয়ে খেয়েছ। আবার কিড স্ট্রীটে প্রফেসার টেন্‌বীর ওখানেও নিমন্ত্রণরক্ষা করেছ। দুপুরে শুধু চীনে বাদাম খেয়ে আলাপ করতেও দেখেছি গোলদীঘির ধারে। এক্‌সকাবসনে একবার চা খেয়েই রাত কাবার করে দিলে। মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে শিককাবাব না সামিকাবাব খেতেও দেখা গেছে। কিন্তু বরাবরই তুমি মিতাহারী। সব কিছু আস্বাদন করবে, কোনোটাতে পেটপাও হবে না, কোনোটাতে আসক্ত হবে না। দ্বিতীয়বার চেয়ে নেবে না। আসলে মেলামেশাটাই তোমার উদ্দেশ্য। খানাপিনাটা তার উপায়। তোমার আসল ক্ষুধাটা ছিল শেখবার ক্ষুধা।'

মেঘবরণ তাঁর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন। দাড়িতে—শুধু দাড়িতে কেন, গোঁফেও পাক ধরেছে। মাথার চুলেও। বয়সের চেয়ে একটু বেশিই দেখায়। চিন্তার ছাপ তাঁর প্রশস্ত ললাটে। দীর্ঘকায় সুপুরুষ। মেঘ তো সব রকম রঙেরই হয়। মেঘবরণ কিন্তু শ্যামবরণ।

'সেই ক্ষুধার জ্বালায় তুমি সায়েন্স ছেড়ে আর্টস নিলে। ইকন্‌মিকস্ ছেড়ে ফিলসফি ধরলে। তোমাকে আমি পার্সিয়ান ক্লাসে আবিষ্কার করে তটস্থ হই। শুনলুম স্কুলেও তোমার পার্সিয়ান ছিল। ওটা তোমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। তেমনি পায়জামা পিরান। গান বাজনায় তোমার শখ প্রায় সাধানার মতো ছিল। কখনো দেখি সেতার নিয়ে বসে আছ, কখনো তবলায় চাঁটি মারছ, কখনো আবার পিআনোয় টুং টাং করছ। খেলার মাঠেও তোমার দেখা পাই। ফুটবল ক্রিকেট টেনিস হকী সব রকম খেলাতেই তোমার হাত পা খেলে। অথচ কোনোটাতেই তোমার জেতার দিকে নজর ছিল না। খেলার জন্যেই খেলা। জেতার জন্যে নয়। টেনিসে তোমাকে আমি রাম হারা হারিয়েছি। কিন্তু তোমার স্টাইল আমি পাব কোথায়?' রাজীব সেকালের মতোই তারিফ করতে লাগলেন।

'বাবলু', মেঘবরণ বললেন, 'তোমার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন মনে হয় আমার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর কমে গেছে। আবার আমি সেই বয়সে ফিরে গেছি। সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। কিন্তু তার পরের ইতিহাস তুমি বোধ হয় জানো না। বিলেত গিয়ে আমি নাচতে শিখেছিলুম হে! ওয়াল্‌টজ, ফক্‌স্‌ট্রট, চার্লসটন—ঐ যাঃ ভুলে যাচ্ছি, স্প্যানিশ না আর্জেন্টাইন কী যেন ওটার আদি। নাঃ মনে পড়ছে না। তুমি তো ও রসে বঞ্চিত।'

রাজীব ভেবে বললেন, 'ট্যাঙ্গো।'

'ট্যাঙ্গো।' মেঘবরণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ট্যাঙ্গো নাচতে নাচতে ঠ্যাঙ্গো অসাড়। ওদিকে বাবামশায় কেমন করে খবর পান। কেব্‌ল করেন। ঘরের ছেলে ঘরে ফির। শুনি আমার বিয়ে। দুটি পুত্তলিকার মন্ত্রপাঠ। অনুষ্ঠানের পর কর্তা লাগিয়ে দেন জমিদারির কর্মে। কাজ চলে যেত আপনার ছকে বাঁধা রাস্তায়। আমলারাই চালাত। আমি শুধু একটু লক্ষ রাখতুম আর সমঝিয়ে দিতুম যে মাথার উপর একজন আছে। তার পর ঘোড়ায় চড়তুম, শিকার করতুম, সাহেবদের সঙ্গে জুটে পিগ স্টিকিং করতুম, পোলোও খেলতুম বছরে এক আধবার। কোনোটাতে পেছ্‌পাও হইনি। কেউ বলতে পারবে না যে ভেতো বাঙালী।'

রাজীবেরও মন কেমন করছিল। তিনি বললেন, 'ভাই সন্তু, জীবনে অনেক কিছুই পেলুম। কিন্তু কলেজ জীবনে সেই যা পেয়েছিলুম তুলনা তার নেই। পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশই বা কোথায়! তোমরা কেউ এলে ও কথা বললে মনটা যৌবন বেদনায় ভরে ওঠে।'

মেঘবরণ আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন, 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি—'

রাজীব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে শেষবার দেখা তো ময়মনসিংহে।'

'হাঁ, বাবলু। তোমার ক্লাবে। তোমার রেসিডেন্সে যাবার ইচ্ছে ছিল। যেতে সময় পাইনি। দুর্গাবাড়িতে আমাদের জবর একটা সভা হয়। রাত এগারোটা বাজে। পার্টিশনের ঠিক আগে।' মেঘবরণ বললেন স্মরণ করে।

ক্লাবের সেই সন্ধ্যাটি রাজীবের মনে ছিল। বহুকাল পরে বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এক হাত টেনিসও হলো। মেঘবরণ হেরে গেলেন। তার পর ড্রিঙ্কস।

সেদিন কথায় কথায় রাজীব প্রশ্ন করেন মেঘবরণকে, 'পাকিস্তান হলে তুমি কী করবে? থাকবে না যাবে?'

'থাকব।' উত্তর দেন মেঘবরণ।

'কোন্ সাহসে থাকবে? কে তোমাকে রক্ষা করবে?' রাজীব উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন। 'আমরা সবাই তো যাবার মুখে।'

'মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুডনেস তো যাচ্ছে না। তার উপর আমার বিশ্বাস আছে।' মেঘবরণ ঘোষণা করলেন।

'পরে যদি সে বিশ্বাস না টেকে?' জেরা করেন রাজীবলোচন।

'সে বিশ্বাস আমার নিঃশ্বাস। রাগারাগি ও ভাগাভাগি কোন্ পরিবারে নেই? তা সত্ত্বেও কতক লোক থাকবে যারা মিলবে, মেলাবে, শান্ত হবে, শান্ত করবে।' মেঘবরণ আবেগের সঙ্গে বলেন, 'আমি যদি না মেলাই তো কে এদের মেলাবে? আমার সারা জীবনের ট্রেনিং তবে কিসের জন্যে? এত যে মেলামেশা করলুম তার সার্থকতা কী? কেনই বা মুসলমান ওস্তাদের কাছে গান বাজনা শেখা? পীরের কাছে সুফী সাধনার সঙ্কেত খোঁজা?'

চোদ্দ বছর কেটে গেছে। সেসব কথা যেই মনে এলো অমনি রাজীব বললেন মেঘবরণকে, 'আচ্ছা, সন্ত, এখনো কি তোমার মোহভঙ্গ হয়নি? তুমি ওপারেই থেকে যাবে?'

'মোহভঙ্গ!' অবাক হলেন মেঘবরণ। 'মোহভঙ্গ কিসের!'

'সেবার যে বলেছিলে মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুডনেসের উঁপর তোমার বিশ্বাস আছে। এখনো আছে কি?' রাজীব সুধালেন।

'মানবজাতি বলতে বোঝায় কত বিরাট এক জাতি যার বাস সারা দুনিয়া জুড়ে। মানবপ্রকৃতি বলতে বোঝায় কত সহস্র বর্ষের বিবর্তন যার পদে পদে সংযম ও সদাচার। কী এমন ঘটেছে যে আমি আমার সে বিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিয়ে এ পারে চলে আসব?' মেঘবরণ পাল্টা সুধালেন। তার পর নিজেই বলতে লাগলেন, 'বুঝলে, বাবলু যাদের নিয়ে আমি আছি তারা সহজ সরল মানুষ। পাটের মতো পাকা দাড়িও চোখের জলে ভেসে যায় যখন শোনে ছোটকুমার চলে যাচ্ছেন, আর ফিরে আসবেন না। তাদের বার বার বোঝাতে হয় যে, তাদের মতো কেউ তো আমায় ভালোবাসে না। যেখানে প্রেম সেখানে আমি। আর সেখানেই ভগবান।'

রাজীব শুনে মুগ্ধ হলেন। তবু বললেন, 'সত্যি করে বল দেখি, তোমার কষ্ট হয় না আপনার লোকদের ছেড়ে থাকতে? তোমাদের বাড়ির প্রায় সবাই তো এ পারে।'

বধূরানী স্বয়ং কলকাতাবাসিনী। পার্টিশনের পূর্ব হতেই। একটিমাত্র সন্তান। কন্যা। সেটিকে লোরেটোতে দেওয়া হয় কচি বয়সে। সেইসূত্রে তার মা থাকেন কলকাতায়। পীরনগর হাউসের এক অংশে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। পীরনগরে ফিরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে না থাকার তেমন কোনো কারণ নেই। কিন্তু পাকিস্তানী মুসলমানদের তিনি যমের মতো ডরান। আগেকার দিনের মতো পর্দার আড়ালে যেতেও তাঁর আপত্তি। গায়ে স্বাধীনতার হাওয়া লেগেছে।

মেঘবরণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'বিশাখার যখন এতই অনিচ্ছা তখন তাঁকে পীরনগরে টেনে নিয়ে যাওয়া অন্যায়। তা বলে আমি কিন্তু যখন তখন এ পারে এসে হাজিরা দিতে পারিনে। পুরুষমানুষ তার নিজের কাজ ছেড়ে থাকতে পারে কখনো? আমি একটা ওয়ার্কশপ খুলেছি। দিনরাত খাটি। প্রেমের পরিচয় শ্রমে। সেখানে হিন্দু মুসলমানে ভেদ নেই। আমাদের কর্মীরা প্রত্যেকেই অংশীদার। অংশীদাররা প্রত্যেকেই কর্মী। তুমি যে একশটা শেয়ার কিনেছ বলে অমনি ডিরেক্টার হবার যোগ্য হবে সে গুড়ে বালি। তোমাকেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনৎ করতে হবে। আমাদের থিওরি, শ্রমই হচ্ছে ধন। যে ধনের পিছনে শ্রম নেই তাকে আমরা পারতপক্ষে ঢুকতে দিইনে। দিলে যত শিগগির সম্ভব বিদায় করে দিই।'

।। দুই ।।

ইতিমধ্যে রিকশাওয়ালার হাতে রাজীব তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। কেবল যে মেঘবরণের সঙ্গে রাত বারোটা অবধি থাকার জন্যে অনুমতি চেয়েছিলেন তাই নয়, বধূরানীকে ট্রাঙ্ক কল করে ট্রেন ফেল করার কথা জানাতেও বলেছিলেন।

উত্তর পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন দুই বন্ধু। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর—'বেচারি বধূরানীর তুলনায় আমার কতটুকু বিরহ! তাঁকে জানিয়েছি।'

'একেই বলে সহধর্মিণী।' সুখ্যাতি করলেন মেঘবরণ। 'নিজের জন্যে চিন্তা নেই। স্বামীর বন্ধুপত্নীর জন্যে চিন্তা। আমি শতমুখে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তাকে নয় আমাকে। আমি ধন্য। আমি ধন্য।'

'থামো। থামো। ও কী নাটক আরম্ভ করলে, মেঘবরণ! মানুষ কি মানুষের জন্যে ওইটুকুও করবে না? ধন্যবাদ প্রত্যাশা করবে?' রাজীব আপত্তি জানালেন।

'মানুষের কাছে আমার অসীম প্রত্যাশা। আমার কাছেও মানুষের। প্রথম যৌবনে আমি কাউকে ধন্যবাদ দিতুমও না, কারো কাছ থেকে ধন্যবাদ নিতুমও না। প্রেমের নিয়মে সকলেই শাসিত। সবাইকে ঘিরে আছে ভগবানের প্রেম। তুমি কি প্রেমের জন্যেও ধন্যবাদ দেবে? ধন্যবাদ নেবে?' মেঘবরণ আপনিই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ' না। তুমি তা করবে না। এই ছিল প্রথম যৌবনে আমার স্থির বিশ্বাস।'

'আর আজ বিগত যৌবনে?' কৌতূহলী হলেন রাজীবলোচন।

'আজও একেবারে দেউলে হয়ে যাইনি।' মেঘবরণ আকুলভাবে বললেন। ' তবে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছি। যাদের আপনার ভাবতুম তাদের কাছ থেকেও। কেই বা আমার আপনার নয়? যাদের ঘরে জন্মেছি তারাই কি শুধু আপনার? যাদের ঘরে বিয়ে করেছি তারাই কি তাই বলে আপনার? যা বলেছিলুম, আঘাতের পর আঘাত পেয়ে এখন আমার এমন হয়েছে যে আমি কথায় কথায় ধন্যবাদ দিই। প্রত্যেকটি মানুষকে। নিজের স্ত্রীকেও। মেয়েকেও। অদ্ভুত! না? যখন হাতের কাছে আর কাউকে পাইনে তখন আপনাকে আপনি ধন্যবাদ দিই। আমি ধন্য। আমি ধন্য।'

রাজীব হেসে বললেন, 'আমাদের কলেজেও একটি ছেলে ছিল। নাম বোধ হয় মোহসিন আলি খান। সে যখন ক্রিকেটে ক্যাচ করত তখন উল্লাসে চিৎকার করত, থ্যাঙ্ক আই। থ্যাঙ্ক আই। মনে আছে?'

'আছে বই-কি। তোমার যা স্বভাব। তুমি গেলে ওর ইংরেজীর ভুল শোধরাতে। আর তোমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওই হলো কিনা সরকারী নমিনেশনে ডি এস পি। চাকরিতে যথেষ্ট সুনাম করে উচ্চ পদ থেকে অবসর নিয়ে ইয়াসিন এখন পাকিস্তানে বাড়ি করেছে। এখনো কোনো কিছুতে সফল হলে চেঁচিয়ে ওঠে, থ্যাঙ্ক আই। থ্যাঙ্ক আই। লোকটা ভালো।' মেঘবরণ তাঁর প্রশংসা করলেন।

অতীত প্রসঙ্গে দুই বন্ধু যখন পঞ্চমুখ রিফ্রেশমেন্ট রুমের বয় এসে সেলাম দিল। খানা তৈয়ার। মেঘবরণের খেয়াল হলো যে তিনি তৈরি নন। গেলেন বাথরুমে হাত মুখ ধুতে। রাজীবও।

'তা হলে,' ন্যাপকিনটা তুলে নিয়ে কোলের উপর পেতে মেঘবরণ বললেন, 'ঠিক সময়ে ডিনার ছিল আমার বরাতে। অবশ্য কলকাতায় ফিরে রাত দশটায় এর চেয়ে পরিপাটি আহার জুটত। কিন্তু ক্ষুধারও একটা নির্দিষ্ট লগ্ন আছে। সেটা পার হয়ে গেলে তার পরে যা হয় তার নাম কোনো মতে পেট ভরানো। তাতে তৃপ্তি নেই।'

'সময়। সময়ই হচ্ছে আসল।' মেঘবরণ বলে চললেন, 'সময় উত্তীর্ণ হতে দাও। দেখবে অমৃতেও অরুচি।'

রাজীব আন্দাজ করলেন যে মেঘবরণ আরো কিছু বলবেন, এটা তার ভূমিকা। চুপ করে সুপ খেতে লাগলেন।

'পীরনগর হাউস বিক্রি হয়ে গেছে, শুনেছ?' মেঘবরণ জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। শুনিনি তো। কবে?' বিস্মিত হলেন রাজীব।

'বছর পাঁচেক আগে। বাবা হঠাৎ মারা যান। শরিকেরা বলেন, আলাদা বাড়ি করব, টাকা চাই। যে যার অংশ বুঝে নিয়ে আলাদা আলাদা বাড়ি করেছেন। বিশাখারটা ঢাকুরিয়া লেকের ও ধারে। চিনতে অসুবিধে হবে না। গেটে লেখা আছে বধূরানী বাহাদুরা অফ পীরনগর।' মেঘবরণ হা হা করে হাসলেন না কাঁদলেন বোঝা শক্ত।

'বড় আর মেজ বধূরানী বেঁচে থাকতে,' রাজীবের মনে খটকা বাধল, 'ছোট হলেন বধূরানী বাহাদুরা অফ পীরনগর?'

'বড় বৌরানী বাস করেন বৃন্দাবনে। বড়দা সেখানে দেহরক্ষা করেছেন। শেষ বয়সে বৈষ্ণবদীক্ষা নিয়েছিলেন।' মেঘবরণ থেমে থেমে বললেন, 'আর মেজদা তো সাহেব, আগেকার দিনে বিলেত গিয়ে সাহেব জীবন যাপন করতেন, এখন তার উপায় নেই বলে আসামের চা বাগান কিনেছেন, সাহেবদের কাছ থেকে। তার পর প্ল্যান্টার জীবনে গা ঢেলে দিয়েছেন। মেজ বৌরানীকে মুখরক্ষার খাতিরে শিলঙে থাকতে হয়।'

'পরিবারটা তা হলে এমনি করে ভেঙে গেল।' রাজীবের মনে খেদ।

'দেশটাই ভেঙে গেল। তা পরিবার।' মেঘবরণ করুণস্বরে বললেন।

'তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত।' রাজীবের কণ্ঠে দরদ।

'আমার দুঃখ কিন্তু সেজন্যে নয়।' মেঘবরণ আস্তে আস্তে বললেন। যেন একটা গোপনীয় রহস্য ছিল আড়ালে।

'তবে কী জন্যে?' চুপি চুপি সুধালেন রাজীব।

'বলব।' মেঘবরণ অন্যমনস্ক হলেন।

রাজীব তখন আর তাঁকে খোঁচালেন না। আশেপাশে লোকজন ছিল। যদিও যে যার কাজে ব্যস্ত। প্রসঙ্গটা পালটে দিলেন।

'কলকাতায় তুমি আর ক'দিন থাকবে?' জানতে চাইলেন রাজীব।

'ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।' মেঘবরণ বললেন। 'তা ছাড়া ওদিকে আমার কারখানা দেখে কে? এতক্ষণ ভাঙনের কথা হলো। পরিবার ভেঙে যাওয়ার কথা। দেশ ভেঙে যাওয়ার কথা। এ যেন পদ্মার এক পাড় ভাঙা। কিন্তু পদ্মার আর-একটা পাড়ও তো আছে। সেটা তো গড়ছে। আমি সেই গড়ার দায় নিয়েছি। যে পরিমাণ ভেঙেছে সে পরিমাণ গড়ে ওঠেনি। তার জন্যে আমি একপ্রকার ক্ষুধা বোধ করি, বাবলু।'

'ক্ষুধা!' রাজীব আশ্চর্য হলেন।

'এই তো একটু আগে তুমি বলেছিলে আমার প্রথম যৌবনের ক্ষুধার কথা। শেখবার ক্ষুধা ছিল আমার আসল ক্ষুধা। এ বয়সে তেমনি এক ক্ষুধা আছে আমার। গড়ার ক্ষুধা। আমি এমন কিছু গড়ে দিয়ে যেতে চাই, যেটা আমার নিজের ছেলেদের জন্যে নয়। ছেলে অবশ্য নেই আমার। কিন্তু যারা আছে, তারাও তো ছেলে। তারাই ভাবীকাল। তারাই উত্তরপুরুষ। শ্রমের জন্যেও আমি একপ্রকার ক্ষুধা বোধ করি। যা গড়া হচ্ছে তা শ্রম দিয়ে। আমার শ্রমও তার সঙ্গে মিশেছে। তার

জন্যে আমার গর্ব কত!'

মেঘবরণ খাড়া হয়ে বসলেন।

রাজীব ধন্য ধন্য করলেন। 'সত্যি, সন্তু, তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' তিনি টেবিল অতিক্রম করে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করতে।

'পীরনগর একদিন একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সেণ্টার হবে। তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। যদিও সশব্দে ভেঙে পড়ছে হাউস অফ পীরনগর। আর-এক পঞ্চার মাতনে। একটা বংশের দুঃখ বা একটা শ্রেণীর দুঃখকে আমি আমার আপন দুঃখ বলে অশ্রুবর্ষণ করব না, বাবলু। নিচের দিক থেকে যারা উঠে আসছে, শ্রম দিয়ে পৃথিবীকে রূপান্তরিত করছে, তাদের সঙ্গেই আমি রয়েছি। তাদের সুখেই আমি সুখী।' মেঘবরণ উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন।

তিনি বরাবরই মিতাহারী। ইদানীং আরো। আহারের পর তাঁরা কফির পেয়ালা হাতে আবার সেই বারান্দায় গিয়ে বসলেন।

আকাশ তারায় তারায় ভরে গেছে। বারান্দা থেকে নেমে বাগানে পায়চারি করতে লাগলেন দুই বন্ধু। তার পর আবার বারান্দায় আশ্রয় নিলেন।

'এইবার ঘুমকে তাড়াতে হবে। ঘুম পেলেই পায়চারি। থকে গেলে বিশ্রাম।' মেঘবরণের ফরমূলা। 'শ্রমের পর বিরতি। বিরতির পর শ্রম।'

রাত যতই গভীর হতে থাকে আলাপও ততই গভীর হয়। মেঘবরণ বলতে আরম্ভ করেন—

'ছেলেবেলায় কোথায় যেন পড়েছিলুম। বোধ হয় আরব্য উপন্যাসে। এক যে ছিল রাজপুত্র। সে জন্মে অবধি দেখে আসছে তার চারদিকে বিশাল রাজপুরী। হাজারদুয়ারী। সে যে দুয়ারেই হাত দেয় সে দুয়ার খুলে যায়। সে ভিতরে ঢোকে দেখে কতরকম ধন রত্ন মণি মাণিক। ভোগ্য সামগ্রী। বিলাস দ্রব্য। গীতবাদ্য। জ্ঞানবিজ্ঞান।

মানুষ যা কিছু কামনা করে। ধ্যান করে। সন্ধান করে। দেখতে দেখতে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একটি কক্ষেই এত ঐশ্বর্য আছে যে দেখতে দেখতে জীবন ভোর হবে যাবে। তাই সে জোর করে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। নইলে আর সব কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখা হয় না। আয়ু অফুরন্ত নয়।

একদিন তার নজরে পড়ে একটি দুয়ার বন্ধ। হাত দিলে খোলে না। ঘা দিলেও খোলে না। হাজারদুয়ারীর ন'শ নিরানব্বইটি দুয়ার খোলা, কিন্তু একটি দুয়ার বন্ধ। সে বুঝতে পারে না কেন। অবাক হয়। মাকে জিজ্ঞাসা করে। মা বলেন, তোমার কাছে ন'শ নিরানব্বইটা দুয়ার খোলা। এই যথেষ্ট নয় কি? কেন তুমি ওই বন্ধ দুয়ারটা খুলে দেখতে চাও? রাজপুত্র বলে, আমি রাজপুরীর উজীর নই, আমলা নই, নফর নই, ভিখিরি নই। আমি খোদ রাজার ছেলে। রাজপুত্তুর। সবই তো একদিন আমার হবে। আমার জিনিস আমি বুঝে নিতে পারব না? তা হলে কি আমার স্বাধীনতার সীমা ওই পর্যন্ত? মা বললেন, কেউ কখনো ও ঘরে যায়নি। ও ঘরে বিপদ।

সকলের মুখে সেই একই কথা। ও ঘরে বিপদ। এখন পর্যন্ত কেউ ওই বন্ধ দুয়ার খুলে দেখেনি। কোনো রাজপুত্রই না। রাজপুরীতে কিসের অভাব যে সাধ করে বিপদের মুখে পড়বে! মানুষের জীবনে যা কিছু কাম্য তার প্রত্যেকটি পাওয়া যায় ন'শ নিরানব্বইটি ঘরে। মুঠো মুঠো পাওয়া যায়। লুট করলেও নিঃশেষ হয় না। কেন তা হলে বন্ধ দুয়ারে ঘা দিতে চাওয়া? রাজপুত্র এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করলে সকলে হাসে। কেউ কোনোদিন শুনেছে এমন কথা? ও যে আদ্যিকালের বন্ধ দুয়ার।

রাজপুত্রের ক্রমে প্রত্যয় হয় ওই যে বন্ধ দুয়ার ওই দুয়ারের ওপারে সত্যিকার জগৎ স্বাধীন জগৎ। ওই দুয়ারটা এক হিশাবে অন্দর মহলের লৌহকপাট। ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওধার

থেকে। এধারের লোক জানে না যে তারা অন্দর মহলে বন্দী। খাও, দাও, ফুর্তি কর, কিন্তু বাইরে যেতে চেয়ো না। গেলে তো আর বন্দী থাকবে না। একটি দরজা বন্ধ রাখাও সদর মহলকে বাইরে রাখা। রাজপুত্র অনুভব করে যে রাজপুরীর একটি দুয়ারও যদি বন্ধ থাকে তা হলে সমস্ত সদরটাই বাইরে থেকে যায়। সেই একটি দুয়ার যতক্ষণ না অবারিত হচ্ছে ততক্ষণ আর সব দুয়ার অবারিত হয়েও মোটের উপর বারিত।

রাজপুত্র হাজারদুয়ারীর আর ন'শ নিরানব্বইটা দুয়ারের কথা না ভেবে সেই একটি দুয়ারের কথায় বিভোর থাকে। কেমন করে সে ওই লৌহ যবনিকা ভেদ করবে? কেমন করে তার ও পারে যাবে? এ পারের আকর্ষণ সামান্য নয়। এ পারেই একদিন তার রাজত্ব, তার রানী, তার সোনার পালঙ্কে শোওয়া, তার সোনার থালায় খাওয়া। এপারের মায়া কাটানো কি সহজ? তবু তাকে গিয়ে দেখতে হবে ও পারে কী আছে। বিপদ শুনে সে পেছিয়ে যাবে না। বন্ধ দুয়ার খুলতে হবে, এই যদি হয় সঙ্কল্প তবে সঙ্কল্পের অনুরূপ মূল্য দিতে হবে।

হাজারদুয়ারীতে জন্মেছে। হাজারটা দুয়ারই খুলে দেখবে। ন'শ নিরানব্বইটা দেখেই বা সন্তুষ্ট হবে কেন? সমস্তটাই যদি তার পিতৃধন হয়ে থাকে, তবে তাব উত্তরাধিকারের সমস্তটাই সে বুঝে নেবে। তার যেটা ন্যায্য পাওনা তার থেকে সে বঞ্চিত হবে কেন? বাইরের থেকে কেউ এসে তাকে বঞ্চিত করছে না। বাধা যা কিছু তা ভিতরের। বাজপুত্র একটু একটু করে সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়। সাহস সঞ্চয় করে। তার পব একদিন বন্ধ দুয়াবে হানা দেয়।

বন্ধ দুয়ার যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। একটু চাপ দিতেই খুলে গেল। সেই খোলা দরজাব ও পারে গিয়ে রাজপুত্র দেখল এক পক্ষিরাজ ঘোড়া দাঁড়িয়ে। ঘোড়া বলল, এস এস তোমার জন্যেই প্রতীক্ষা করছি। বাজপুত্র তার পিঠে উঠে বসতেই সে ডানা মেলে চাব পা তুলে, নীল আসমানে উধাও হয়ে গেল। পক্ষিরাজ, এ তুমি আমায কোথায় নিযে চললে? বাজপুত্র, তোমারই রাজত্বের তিন সীমানা দেখাতে।

হাজারদুযারীর সেই একটা মহলই আর সব ক'টা মহলের সমবেত ঐশ্বর্যের চেযে ঐশ্বর্যময়। কিন্তু তারও সীমা আছে। রাজপুত্র ঘুরে ফিবে আবাব সেইখানে ফিবে এলো যেখান থেকে রওনা হয়েছিল। পক্ষিরাজেব পিঠ থেকে নেমে বলল, সাবাস। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই আবার সে দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। যেমনকে তেমন।'

॥ তিন ॥

মেঘবরণের গল্প বলা থামলে রাজীব তাঁর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললেন, 'আরব্য উপন্যাসে তো অত কথা নেই। এসব তুমি পেলে কোথায়?'

'জীবনের কাছে। জীবনটাও তো একটা 'একাধিক সহস্র রজনী'। সেন্স অফ মিস্টরি যার আছে সে আপনি অনুভব করে, তাকে বলে দিতে হয় না যে, জীবনটাই একটা আরব্য উপন্যাস।' মেঘবরণ অন্যমনস্ক হলেন।

'আমাদের পীর[illegible]ারের ভদ্রাসন,' বলতে থাকলেন মেঘবরণ, 'হাজারদুয়ারী নয়। আর আমরাও কিছু মুর্শিদাবাদের নবাব নই। তা হলেও তার অনেকগুলো দুয়ার। অবস্থা যখন তেজ ছিল,

তখন আমাদের নিজেদের থিয়েটার ছিল, সিনেমা ছিল, পাওয়ার হাউস ছিল। এমন কি একটা ছাপাখানাও ছিল। ঘোড়াশালে ঘোড়া আর হাতীশালে হাতী তো ছিলই, একটা চিড়িয়াখানাও ছিল আমাদের।'

রাজীব এসব জানতেন। সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'তোমার বাবা তো নাটকও লিখতেন। তাঁর নিজের একদল অভিনেতাও ছিল।' চেপে গেলেন যে অভিনেত্রীও ছিল।

'আমাদের অবস্থা পড়তে আরম্ভ করে,' মেঘবরণ একমনে বলে চললেন, 'আমার বিলেত যাওয়ার সময় থেকেই। বোধ হয় আরো আগে থেকে। বাবা সেটা কাউকে জানতে দেননি। তাঁর অনেক টাকা লোন কোম্পানীতে আটকা পড়ে যায়। পাটের বাজার মন্দা। চাষী খাতকরা শোধ দিতে পারে না। জোর করে আদায় করারও দিনকাল আর নেই। ভোট এসে গেছে। জোট আসছে। ভোট আর জোট ক্রমে সাম্প্রদায়িক আকার নেয়। যদিও আমরা চিরকাল অসাম্প্রদায়িক।'

'তোমরা তো মানসিংহের সঙ্গে রাজপুতানা থেকে এসেছিলে, শুনেছি। এদেশে ক্ষত্রিয় না থাকায় কায়স্থদের সঙ্গে মিশে গেলে।' রাজীব যতদূর জানতেন।

'হ্যাঁ, আমরা রাজপুতানার সিংহ। বাংলার মাটিতে হরিণ হয়ে গেছি। না, পুরোপুরি হরিণও নয়। সিংহরিণ।' মেঘবরণ হাসির ভান করলেন।

'যাঃ! ও কী যা তা বকছ!' রাজীব হাসি চাপলেন। 'পীরনগরের সিঙ্গিদের দাপটে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত।'

'আর সিঙ্গিরা সাহেব কালেক্টারদের চাবুকে সার্কাসের সিঙ্গির মতো ওঠ-বস করত।' মেঘবরণ রাগে জ্বলতে জ্বলতে বললেন, 'মখমলের দস্তানার ভিতরে লোহার হাত ছিল বেটাদের। সে হাত ওরা কদাচিৎ খুলে দেখাত। আমাদের ছোট তরফ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে চান, যে তাঁকে ভোট দেবে তাকে দেবেন টাকার তোড়া, যে না দেবে তাকে রিভলভারের হুমকি। খেয়াল ছিল না যে রিভলভারটা নিজের প্রয়োজনে হলেও লাইসেন্সটা পরের অনুগ্রহে। সাহেব ডেকে পাঠালেন। রিভলভারটা একটু দেখি না, কুমার বাহাদুর। পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন। এ রিভলভার ব্যবহার করা বিপজ্জনক। সারানো দরকার। আমিই সে ভার নিচ্ছি। ছোট তরফ বোকা বনে গেলেন। ভোটের দিন তিনি কলকাতায় অসুস্থ। কেই বা তাঁকে ভোট দেবে! মাস কয়েক বাদে রিভলভারটা সাহেব একটু ঝেড়ে মুছে ফেরৎ দিলেন।'

রাজীব কোনো মতে হাসি চেপে কপট কোপে বললেন, 'সত্যি, বড় দজ্জাল ছিল বেটারা। গেছে, হাড় জুড়িয়েছে।'

'কিন্তু আমরাও যে সহমরণে গেছি।' মেঘবরণ নির্জীবের মতো বিলাপ করলেন।

তার পরে তিনি আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। 'তোমাকে যা বলতে চেয়েছিলুম তার থেকে সরে এসেছি। আমাদের পীরনগরের বাড়িটাই ছিল আমার বালকবয়সে আমার চোখে হাজারদুয়ারী। বাবা বলতেন কী নেই এখানে যে তোরা কেউ জমিদারির বাইরে যাবি? জমিদারির বাইরে তোদের মানবে কে? কলকাতায় যে যত খরচ করতে পারে সে তত মান পায়। খরচের কড়ি জুগিয়ে মরে পূর্ববঙ্গের চাষী। কিন্তু কলকাতায় যারা তোদের মান দেবে তারা কি তোদের মানবে? বাবা নিজে কোথাও যেতেন না। সাহেব সুবো এলে যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করতেন। বলতেন, মনসা শীতলার মতো এসব দেবতাকেও তুষ্ট করতে হয়। তা বলে প্রণাম এদের আমি করব না। তিনি ছিলেন অ্যাগনস্টিক।'

রাজীব বললেন, 'শুনেছি তিনি সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করতেন।'

'ভুল শুনেছ বলব না। অতি গোপনে করতেন।' মেঘবরণ বললেন, 'সন্ত্রাসবাদ ব্যর্থ হলো

কেন, জানো? কে যে বিশ্বাসী আর কে যে বিশ্বাসঘাতক তা বোঝবার জো ছিল না। যাকে তিনি বীর ভেবে সাহায্য করলেন সে-ই হয়তো পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করল, তাঁর নাম করল। কিংবা সে হয়তো পুলিসেরই চর। বাবাকে সরকার থেকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয় যে, তাঁর বন্দুক রিভলভার বাজেয়াপ্ত করা হবে। তখন সিংহ থেকে সিংহহরিণ।'

এবার আর রাজীবের হাসি পেলো না। তিনি সমব্যথী।

'কিন্তু আবার আমি আমার বিষয়ের থেকে সরে যাচ্ছি।' মেঘবরণ শুধরে নিলেন।

'আমাদের হাজারদুয়ারীতে আমি যা চেয়েছি, সব পেয়েছি। হুরী পরীরও অভাব ছিল না।'

'ওঃ!' রাজীব চমকে উঠলেন। 'সেইজন্যেই অভিনয়ের আয়োজন।'

'আরে না। অভিনয় অভিনয়ের জন্যেই।' মেঘবরণ জোর দিয়ে বললেন, 'আমরা কখনো আর্টের মান খাটো হতে দিতুম না।'

এর পরে রাজীব আর পীড়াপীড়ি করলেন না। শুনতে লাগলেন, 'যা বলছিলুম। হাজারদুয়ারীতে যা চেয়েছি, সব পেয়েছি। তবু আমার মনে হয়েছে একটি দুয়ার বন্ধ। বাবার ইচ্ছা নয় যে আমি সেটা খুলি।'

'কী সেটা?' রাজীব কৌতূহলী হলেন।

'সত্য।' মেঘবরণ তাঁকে আর-এক চমক দিলেন।

এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। রাজীব চমৎকৃত হলেন। 'সত্য! তার মানে কী, সত্ত্ব?'

'তার মানে তার চেয়েও দুর্বোধ্য। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, বাবলু। বছর বারো তেরো বয়সে আমার চেতনায় যেদিন সত্যের জন্যে ক্ষুধা জাগে সেদিন আমিও জানতে চেয়েছি সত্য বলতে কী বোঝায়। ন'শ নিরানব্বইখানা পুঁথির উপরে আরো একখানা পুঁথি আছে। তাতে কী লিখেছে কেউ তা জানে না। কেউ বলতে পারে না। সেইজন্যেই তো আমি সেটা খুলে পড়তে চাই। বাবা শুনে বলেন, পণ্ডশ্রম। বৃথা চেষ্টা। তার চেয়ে বাকী ন'শ নিরানব্বইখানায় মন দে। খানকয়েক তো পড়ে বুঝবি। আপেক্ষিক সত্য নিয়েই আমাদের কারবার। তাই ঠিকমতো শেখ। আমি বলি, শিখছি তো। কিন্তু আপেক্ষিকের উপরে যে সত্য তারই জন্যে আমি ক্ষুধিত ও তৃষিত।'

পীরনগরের হাই স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে মেঘবরণ কলকাতা যান কলেজে ভর্তি হতে। তাঁর বাবা সেটা পছন্দ করেননি। বাড়িতে প্রোফেসার রেখেও তো পড়া যায়। মেঘবরণকে তাই বিজ্ঞান নিতে হয়। তার জন্যে চাই ল্যাবরেটরি। পীরনগরে ল্যাবরেটরি নেই। বাবা তাঁর জন্যে ল্যাবরেটরি গড়ে দিতে পারেন না। বিজ্ঞান পড়তে কলকাতায় যাওয়া, তাতে কিন্তু মন লাগে না। আর্টস নিতে হলো। এমনি একটার পর একটা দুয়ারে করাঘাত।

'আমার জীবনটাই এমনি ধারা। একটার পর একটা দুয়ারে ঘা দিই। খুলে যায়। কিছুদিন বাদে বুঝতে পারি ঢের হয়েছে। আর না। বেরিয়ে আসি। সব সময় মনে পড়ে ন'শ নিরানব্বইয়ের উপরে আরো একটি দুয়ার আছে। সেটি সহজে খোলবার নয়। সেটি খুলতেই হবে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। সত্যকে জানতে যাওয়া দারুণ দুঃসাহসের কাজ।' মেঘবরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

'তার পর?' রাজীব ক্লান্ত স্বরে সুধালেন, 'এখনো কি সে দুয়ার বন্ধ?'

'এর উত্তর, হাঁ ও না।' মেঘবরণ বললেন হেঁয়ালীর মতো করে। 'আরো কিছুদিন যদি বাঁচি তা হলে হয়তো এ প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন উত্তর নিয়ে যেতে পারব।'

রাত হয়েছিল। ঘুমও পাচ্ছিল দুজনের। ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখা দরকার। হাই তুলতে তুলতে রাজীব বললেন, 'আরো কিছুদিন কেন, আরো অনেকদিন তুমি বাঁচবে, ভাই।'

'কে জানে!' মেঘবরণ উদাস কণ্ঠে বললেন, 'বয়স যতই বাড়ছে সাহস ততই কমছে। আর

সাহসই তো সম্বল। তা না হলে বন্ধ দুয়ার খোলে না। খুললেও পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে তিন সীমানা প্রদক্ষিণ করা যায় না। সে যদি আমাকে ফিরিয়ে না আনে।'

'আনবে। আনবে।' আশ্বাস দিলেন রাজীব। 'আরব্য উপন্যাসে যেমনটি লিখেছে। উপন্যাস কখনো মিথ্যা হতে পারে?'

হেসে উঠলেন মেঘবরণ। 'ঔপন্যাসিকরা তো অমন কথা বলবেই।'

এর পরে তিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পক্ষিরাজ আমাকে ফিরিয়ে আনলেই বা কী? সময়মতো ফিরিয়ে না আনলে রাজত্বও বিস্বাদ লাগবে। সময়। সময়ই হচ্ছে আসল। সময় উত্তীর্ণ হলে স্বর্গেও অরুচি।'

রাজীব যে ঠিক বুঝতে পারছিলেন তা নয়। বললেন, 'তা হলে এই তোমার দুঃখ? পরিবারভঙ্গ বা দেশভঙ্গ নয়?'

'সেও আমার দুঃখ। পরিবার বা দেশ ভেঙে যাওয়ায় আমি যে সুখী হয়েছি তা নয়, ভাই। কিন্তু যে দুঃখ আমরা সবাই মিলে বহন করি সেটা তেমন ভারী নয়। যে দুঃখ সকলের সে দুঃখ সেই অনুপাতে হালকা।' মেঘবরণ দার্শনিকতা করলেন।

'আর, যে দুঃখ একার?' রাজীব জানতেন কী এর উত্তর। তবু জানতে চাইলেন।

'সে দুঃখ জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে থাকে।' মেঘবরণ ক্লিষ্ট স্বরে বললেন।

এর পরে তিনি কী যেন ভাবলেন। খাটো গলায় বললেন, 'পরমায়ুর আর কতটুকু বাকী আছে! কিন্তু এখনো আমার জীবনের কনসামেশন হলো না।'

প্রায় লাফ দিয়ে উঠতে গেলেন রাজীবলোচন। 'বল কী, সন্ত! তুমি যে একটি সন্তানের বাপ! এ কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

'আমি বললুম কী আর তুমি শুনলে কী?' মেঘবরণ হাসতে গিয়ে হাসি চাপলেন। 'বিয়ের কন্‌সামেশন তো বলিনি। বলেছি জীবনের কন্‌সামেশন।'

'ওঃ তাই বল!' রাজীব একটু হি হি করে হাসলেন।

'এবার বুঝলে না আরো খুলে বলতে হবে?' মেঘবরণ জিজ্ঞাসা করলেন।

'বুঝেছি।' রাজীব আবৃত্তি করতে শুরু করলেন, 'ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা—'

মেঘবরণ বাধা দিয়ে বললেন, 'কিছুই বোঝনি। জীবনের কন্‌সামেশন যদি মরণ হয় তবে মরণ হচ্ছে না বলে দুঃখ করা কি আমার সাজে! কীই বা এমন বয়স হয়েছে আমার! সাতান্ন বছর কি আজকাল একটা বয়স!'

'তা বটে।' রাজীব ভ্রম স্বীকার করে বললেন, 'মরণ নয়। তবে কী?'

'পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে আসমানে উধাও হয়ে যাওয়া। ওই যেমন ওরা রকেটে করে মহাশূন্য পরিক্রমায় যাচ্ছে।' মেঘবরণ কী যেন একটা তত্ত্বের আভাসটুকুই শুধু দিলেন। আর বিশদ করলেন না।

রাজীব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মেঘবরণ কথা কেড়ে নিয়ে বললেন 'না, একটি সন্তানের বাপ কেন? আরো একটি সন্তান হয়েছিল। পুত্রসন্তান। সে যদি বেঁচে থাকত আমার জীবন হয়তো অন্যরূপ হতো। বাঁচিয়ে রাখতে পারলুম না বলেই তো বিশাখা'র মন ভেঙে গেল। তিনি আর মা হতে রাজী হলেন না। পীরনগরের উপরেও তাঁর ভয় ধরে গেল। আর একটিকে বাঁচানোর জন্যে কলকাতায় চলে গেলেন।'

রাজীব স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকলেন। মেঘবরণ আপন মনে বলতে থাকলেন, 'চলে গেলেন

ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমিও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলুম না। কিংবা অপর কোনো নারীর। যদি বাঁচিয়ে রাখতে না পারব তবে কেনই বা এ সংসারে আনব! আমি কি শুধু জনক! আমি পিতা। আমি পালন করব। কিন্তু পারলুম কি ঝণ্টুকে পালন করতে! কী মূঢ়তা যে আমার হাত পা বেঁধে রাখল তার অসুখের সময়!'

রাজীব বললেন, 'কতকালের কথা, সন্তু?' তাঁর কণ্ঠস্বরে বেদনা ও বিস্ময়।

'এই তো সেদিনকার। বছর একুশ বাইশ হবে।' মেঘবরণ তখন অন্য জগতে। বললেন, 'আহা, সে যদি আজ বেঁচে থাকত পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের নওজোয়ান হতো। কে জানে, সে হয়তো এতদিনে মহাশূন্যে ঘুরে আসত। আর আমিও না হয় তারই উপর ছেড়ে দিতুম আমার পক্ষিরাজের স্বপ্ন। এখন আর কাকেই বা দিয়ে যাব এ ধ্যান? বন্ধ দুয়ার খুলবে কে?'

রাজীব তাঁর বন্ধুর হাতে হাত রাখলেন। সেকালের মতো। পরম সমবেদনাভরে। জানতেন না যে মেঘবরণ পুত্রশোকের দাবদাহে দগ্ধেছেন। সিংহের মতো। হরিণের মতো।

'সংসারে' মেঘবরণ সহসা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'বন্ধুত্বের মতো কী আছে? মনে হচ্ছে তুমি আমি ঠিক সেইরকমটি আছি, বাবলু। বসে আছি গোলদীঘির ধারে।'

'আছিই তো! দেখা হয় না বলে বন্ধুত্ব কি তামাদি হয়ে যায়?' রাজীব তাঁর বন্ধুর হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'তুমি এসেছ বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আবার এসো।'

'আমিও আজ অপূর্ব তৃপ্তি পেলুম।' মেঘবরণ একটু চাপ দিলেন। 'আসব একদিন।'

এর পরেও যথেষ্ট সময় ছিল। কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখা গেল। মেঘবরণ বললেন, 'আমার দুঃখের কথাই কেবল শুনলে। সুখের কথা তো শুনলে না?'

'শুনি? শুনি?' যুবকের মতো অধীর হলেন রাজীব।

'আমার মনে হচ্ছে,' মেঘবরণ আকাশের দিকে চেয়ে জ্যোতির্বিদের মতো বললেন, 'দুয়ার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও আমি বেশ খানিকদূর দেখতে পাচ্ছি। দুয়ার না খুলুক, দৃষ্টি খুলছে। আরো খুলবে, আরো খুলবে, আরো আরো খুলবে। যদি আরো কিছুদিন বাঁচি।'

'বাঁচবে। বাঁচবে।' রাজীব তাঁকে আশ্বাস দিলেন, 'আরো অনেকদিন।'

(১৯৬৩)

লখীন্দরের ভেলা

ফোর্টনাইটলি কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট পাঠাবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু রিপোর্ট করবার মতো আছেই বা কী? আইন অমান্য আন্দোলনের শেষ দীপশলাকাটি কবে নিবে গেছে। সার জন অ্যাণ্ডারসনের দাপটে সন্ত্রাসবাদী সলতেটিও নিবু নিবু।

সার্কল ইন্সপেক্টার অফ পুলিস আফসোস করে বললেন, 'কিছুই কোথাও ঘটছে না, সার। এখানকার হিন্দু মুসলমানে এমন সদ্‌ভাব যে দাঙ্গা পর্যন্ত বাধে না। এখানে বেশিদিন চাকরি করলে আমি আর কাজ দেখাতে পারব না, সার। কাজ দেখাতে না পারলে প্রমোশন হবে না। চোর ডাকাত ধরে কি আজকাল প্রমোশন হয়, সার?'

সত্যি। সাবডিভিজনাল অফিসার তা বলে তেমন কোনো ঘটনা কামনা করতে পারেন না।

বললেন, 'এমন শান্তি আমি অনেকদিন পাইনি। যে-কোনো অবস্থার জন্যে অনবরত প্রস্তুত থাকতে হয়েছে। সারাক্ষণ যেন ঘোড়ার পিঠে বসে আছি। মনে হচ্ছে এবারকার পূজার ছুটিটা বাইরে কাটাতে পারব।'

'বেআদবি মাফ করবেন সার।' সার্কল ইন্সপেক্টার মনে করিয়ে দিলেন, 'আপনারা হলেন হেভন-বর্ণ সার্ভিসের মেম্বর। প্রমোশনের ভাবনা নেই। কিন্তু আপনাদের যাতে শান্তি আমাদের তাতে অশান্তি।'

সাবডিভিজনাল অফিসার হেসে বললেন, 'একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব যে, তাও আপনার সইবে না। আমি কিন্তু ভাবছি এবারকার রিপোর্টটা কি ব্ল্যাঙ্ক যাবে?'

'কেন? ব্ল্যাঙ্ক যাবে কেন?' ইন্সপেক্টার বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমি হলে একটা কিছু ইনভেন্ট করতুম। পরের বার লিখতুম অনুসন্ধানের পর জানা গেল খবরটা ভুল।'

'ইউ আর এ রোগ!' পরিহাস করে বললেন এস ডি ও সাহেব। 'আপনার প্রমোশন দেখছি বন্ধ করাই মুশকিল।'

ইন্সপেক্টার শোনাচ্ছেন যে সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন যে কোনো একটা ঘটনার জন্যে, যার অঙ্গে রাজনীতির গন্ধ আছে। তিনি এতক্ষণ তাই নিয়ে মনে মনে গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ওহো! ছিল একটা খবর।'

মহকুমা শাসক নোটবই খুলে কলম বাগিয়ে বললেন, 'শুনি? শুনি?'

'ভেড়ামারা অঞ্চলে' ইন্সপেক্টার থেমে থেমে বলতে লাগলেন সাহেব যাতে লিখে নিতে পারেন, 'একটি নতুন মুখ দেখা গেছে সার।'

'নাম?' জানতে চাইলেন শাসক।

'নাম জানা যায়নি, সার।' তিনি বলে গেলেন, 'পদ্মার ধারে দক্ষিণডিহি গ্রামে যে স্বদেশী আশ্রম আছে তারই এক প্রান্তে একখানা কুঁড়েঘর তুলে এঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে আশ্রমের ডাক্তার পরাণবাবুর কাছে চিকিৎসার জন্যে ইনি এতদূর এসেছেন।'

সাহেব ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে রাজনীতি কোথায়?'

ইন্সপেক্টার সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন 'সার অভয় দেন তো আমিও একটা প্রশ্ন করি। পরাণবাবু তো এম বি পাশ করেননি। তার আগেই মেডিকাল কলেজ ছেড়ে ননকোঅপারেশনে যোগ দেন। একজন হাতুড়ের কাছে চিকিৎসার জন্যে কেউ শেয়ালদার থেকে ভেড়ামারা জংশনের টিকিট কাটে? তাও সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট?'

'হুঁ।' সাহেবের ধাঁধা লাগল।

'সঙ্গে মালপত্র বলতে একখানা সুটকেস ও একটা হোল্ড-অল।' ইন্সপেক্টার বলে চললেন, 'কিন্তু সুটকেস যদিও একখানাই তবু তার গায়ে একরাশ লেবেল। সুইটজারল্যাণ্ডের। জার্মানীর। ভিয়েনার। চিকিৎসার জন্যে ভদ্রলোক না গেছেন কোথায়! কিন্তু চিকিৎসার জন্যেই কি? সুভাষ বোসও তো চিকিৎসার জন্যে গেছলেন।'

'তা হলে,' মহকুমা হাকিম বললেন, 'অসুখটা পলিটিকাল?'

ইন্সপেক্টার ঠিক এই কথাটির অপেক্ষায় ছিলেন। রহস্যের ভঙ্গী করে বললেন, 'সার, কে জানে বিপ্লববাদের জাল কতদূর পাতা হয়েছে। এম এন রায়ের বৃত্তান্ত তো শুনেছেন। রায় কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে ঘুরেছেন। মেক্সিকো, রাশিয়া, চীন। যদি বলি ইনিও সেই গোষ্ঠীর একজন তা হলে কি খুব একটা ভুল বলা হবে?'

এটা তো তথ্য নয়। অনুমান। এস ডি ও সাহেব নোট বই সরিয়ে রাখলেন। বললেন,

'অলরাইট। আপনারা ওয়াচ করে যান। নতুন কোনো ডেভেলপমেন্ট দেখলে আমাকে জানাবেন। থ্যাঙ্ক ইউ, ইন্সপেক্টার।'

ফোর্টনাইটলিতে এই ব্যাপারটার উল্লেখ করতে ভুললেন না মিস্টার পাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও লিখলেন যে আশ্রমের সঙ্গে বিপ্লববাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আশ্রমের কর্মীদের অযথা সন্দেহ করা অনুচিত। তাঁরা দেশ গঠনের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। সেই ভালো নয় কি? যাই হোক, তিনি একবার সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করবেন।

এই উপলক্ষে তিনি একটা নতুন ফাইল খুলে তার নাম রাখলেন, 'একটি নতুন মুখ।' রইল সেটা তাঁর কনফিডেন্‌শিয়াল বাক্সয় তোলা। সেখান থেকে স্থানান্তরিত হবে টুর বাক্সয়, যখন তিনি ভেড়ামারা অঞ্চলে সফরে বেরোবেন।

কাজকর্মের ভিড়ে চাপা পড়ল সেই ব্যাপারটা। কিন্তু মন থেকে গেল না।

আশ্রমটা বহুদিনের পুরোনো। পরাণবাবুও দশ এগারো বছরের পুরোনো বাসিন্দা। যাই করুন খোলাখুলিভাবে করেন। গোপনে করবার পাত্র নন। সাফ বলেন, 'অহিংসা যদি ব্যর্থ হয় আমরা হিংসার পথে নামব। কিন্তু সেক্ষেত্রেও খোলাখুলিভাবে লড়ব।'

'অহিংসা কি ব্যর্থ হয়নি, ডাক্তার দাস?' প্রশ্ন করেন মিস্টার পাল।

'ব্যাহত হয়েছে, বলতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে, কেমন করে বলবেন? না, এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি। গান্ধীজী বেঁচে থাকতে ব্যর্থ হবেও না।' ডাক্তার দাস তাঁর বিশ্বাসে অটল। 'মহাত্মাজী চলে গেলে হয়তো অন্য কথা।'

দক্ষিণডিহিতে আগের বার যখন যান তখনকার কথাবার্তা। সেবারেও কী একটা সন্দেহের কারণ ঘটেছিল। পুলিস তো মাঝে মাঝে রিপোর্ট করবেই। মানবে না যে আশ্রমিকরা খদ্দর তৈরি করে আর দরিদ্র নারায়ণের সেবা করে বলে রাজনীতির উর্ধ্বে। কলকাতা থেকে দাদারা এসে দু'দশ দিন বিশ্রাম করে যান। পদ্মার হাওয়ায় ভালো ঘুম হয়। আশ্রমের কুয়োর জলে ভালো হজমও হয়। পুলিস কিন্তু ধরে নেয় যে ওটা একটা অছিলা। আসল মতলবটা হলো চুপি চুপি কৃষক সমিতি গঠন। সেইসূত্রে মুসলমানদের হাত করা।

'তার পর?' মহকুমা হাকিমকে স্বাগত সম্ভাষণ করে ডাক্তার দাস বললেন, 'এবার কী মনে করে রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ?'

'এমনি।' পাল তাঁকে সম্মান দেখিয়ে বললেন, 'ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করে ফিরছি। আশ্রম পথে পড়ে। আমারও তো একটু বিশ্রাম চাই। আপত্তি আছে।'

'আরে না, না। আপত্তি কিসের? আসুন, ভিতরে এসে বসুন ভালো করে। এত বেলায় এসেছেন। চারটি খেয়ে গেলে হতো না? আমরা অবশ্য মোটা খাই মোটা পরি।' ডাক্তার সাহেব সবিনয়ে বললেন।

বাইরে বিশ্রী রোদ। আশ্রমের ছায়াশীতল মাদুরমোড়া কুটিরে দু'দণ্ড বিশ্রাম করতে কার না ইচ্ছা করে। পাল বললেন, 'আমার সঙ্গে টিফিন ক্যারিয়ারে কিছু আছে।'

ডাক্তার একটু আহত হয়ে বললেন, 'বেশ, আপনার যা অভিরুচি।'

পাল যার জন্যে এসেছিলেন তা তো সরাসরি প্রশ্ন করে জানা যায় না। সেটা অভদ্রতাও হবে। তিনি ডাক্তারকে খুশি করার আশায় বললেন, 'আমি আপনাদের অতিথি।'

'যেমন জেলখানায় আমরা আপনাদের অতিথি।' বলে হেসে উঠলেন ডাক্তার। 'দাঁড়ান। আপনাকে আমরা শোধ দিয়ে ছাড়ব। জেল ডায়েট খাওয়াব।'

আশ্রমে ওঁরা যা খেতেন তা একরকম জেল ডায়েটই বটে। যাতে জেলে গেলে কষ্ট না হয়।

উভয়ত্র ওটা পুষ্টিকর। ভালো রাঁধুনির হাত লাগলে উপরন্তু রুচিকর। উপকরণের অভাব নেই, উত্তম হস্তেরই অভাব। যেমন জেলখানা তেমনি আশ্রম দুই-ই শ্রীহস্ত বর্জিত।

আহারের বিলম্ব ছিল। পাল বললেন, তিনি একবার আশ্রমটা ঘুরে ফিরে দেখতে চান। কোন্‌খানে কী হচ্ছে। সূতো কাটা, তাঁত বোনা, রং করা, এমনি যতরকম কর্ম। মায় রোগীচর্যা ও গোসেবা। ডাক্তার তাতে রাজী।

পাশ করা ডাক্তার নন বলে তিনি নিজের হাতে প্রেসক্রিপশন লেখেন না। সেটা করেন তাঁর সহকারী। সহকারীটিকে পাশ করিয়ে আনা হয়েছে। পরাণবাবু অবশ্য আর সমস্তই করেন, কিন্তু সহকারীর সহযোগে। 'আমি নয়, তুমিই চিকিৎসা করছ, আমি শুধু তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, সাহায্য করছি। আমিই সহকারী।' এই বলে তিনি তাঁর সহকারীকে দায়িত্ব নিতে শেখান।

॥ দুই ॥

ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা উপস্থিত হলেন নতুন তৈরি একটি কুঁড়েঘরে। ঘরটি দক্ষিণমুখী, জানালাটা উত্তরমুখী। সেই জানালার ধারে বসে পদ্মার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল একটি যুবককে। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়স। শরীব ভেঙে গেছে। কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছে। মুখখানি সুকুমাব ও সুন্দব।

'আমার বন্ধু অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ বোস।' বলে পরিচয় দিলেন ডাক্তার দাস।

'আরে!' চমকে উঠলেন পাল সাহেব, 'নিরুদা! এই চেহারা হয়েছে আপনার!'

সেই নতুন মুখটি যে অতি পুরাতন এই আবিষ্কারের পর পাল একেবারে বসে পড়লেন। ঘরে ঢুকে দোসরা একটা ডেকচেয়ারে। অনিরুদ্ধের পাশে।

'তুমি! তুমি কোত্থেকে। অংশুমানকে তুমি কোথায় পেলে, পরাণদা!' চঞ্চল হয়ে উঠলেন উভয়ের বন্ধু অনিরুদ্ধ।

'কই, এটা তো আমার জানা ছিল না।' অবাক হলেন পরাণদা, 'তোমার সঙ্গে এঁর সম্পর্ক তা হলে অনেক দিনের! জানলে এঁকে খবর দিতুম। নিরু, ইনি এখানকার এস ডি ও।'

'ওঃ! তুমি তা হলে অফিসিয়াল ভিজিটে এসেছ!' বলে কৌতুক করলেন অনিরুদ্ধ। 'বন্ধুকে দেখতে নয়!'

অংশুমান কি ফাঁস করতে পারেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ? বললেন, 'এদিকে আজ টুরে এসেছিলুম। আশ্রমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ভাবলুম এখানে বিশ্রাম করি ও সেই ফাঁকে আশ্রমটা একবার ঘুরে দেখি। কী করে জানব যে আপনি এখানে! আপনি, নিরুদা!'

'তুমি, অংশুমান!' নিরুদা সেকালের মতো স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, 'তুমি এখন এস ডি ও। সব খবর ভালো তো? কতকাল পরে দেখা!'

এর পর তিনি মোড়ার উপর উপবিষ্ট ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তিনজনেই আমরা মেসতুতো ভাই। তুমি, আমি আর অংশুমান। তুমি যে বছর নন্‌কোঅপারেশন আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে মেস ছেড়ে চলে গেলে তার বছর দেড়েক বাদে অংশুমান এলো মেসে। তোমার নাম তখন আমাদের সকলের মুখে মুখে। সেও শুনে থাকতে পারে। তোমার কি মনে পড়ে না

অংশুমান?'

'পড়ছে, পড়ছে। একটু একটু মনে পড়ছে।' অংশুমান চোখ বুজে বললেন, 'প্রাণমোহন দাস। এম-বি ফাইনাল দেবার আগেই দেশের ডাকে মেডিকাল কলেজ ত্যাগ। কিন্তু তারপরের কথা আমার মনে নেই। ইনিই যে তিনি সেটা এই প্রথম জানলুম।'

'জীবনে এ রকম হয়।' পরাণদা হাসিমুখে বললেন, 'কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! আবার একই তীর্থে মেশে। সেই মেস ছিল হিমাচল। আর এই আশ্রম হলো ত্রিবেণী। মাঝখানে তেরো চোদ্দ বছর ধরে যে যার পথে চলা।'

কথাবার্তার মাঝখানে পরাণদা উঠলেন। তাঁর কাজ ছিল।

তখন অনিরুদ্ধ বললেন, 'তুমিও তো কাজের লোক। তোমাকে আমি ধরে রাখব না, অংশু। কখনো যদি আবার এ পথ দিয়ে যাও পাঁচ মিনিটের জন্যে আমাকে দেখে যেয়ো। এখান থেকে আর কোথাও যাবার প্ল্যান আমার নেই। পরাণদা আমার ভার নিয়েছেন। বছরখানেক লাগবে বলছেন।'

'রোগটা কী তা যদিও জানিনে,' অংশুমান বললেন, 'তবু আমার মনে হয় আপনার আরো ভালো চিকিৎসার দরকার। পরাণদার মতো জেনারেল প্রাকটিশনারকে না দেখিয়ে স্পেশালিস্টকে দেখানো বিজ্ঞতা নয় কি?'

'তা যদি বল তবে কাকে না দেখিয়েছি? কলকাতায়, সুইটজারল্যাণ্ডে, জার্মানীতে, ভিয়েনায় কে না দেখেছেন?' অনিরুদ্ধ আবার পদ্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার আশ্রয় নিয়েছি বাংলাদেশের হৃদয়কন্দরে। পদ্মাবক্ষে। বছরখানেক ধরে আমার জন্যে একটা ভেলা বানানো হবে। লখীন্দরের ভেলার অনুকরণে। সেই ভেলায় চড়ে আমি ভাসব। অর্থাৎ হাউসবোটে চড়ে আমি নদীনালায় ঘুরে বেড়াব। নেচার কিওর।'

অংশুমান বিস্মিত হলেন। এরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি তাঁর অবিদিত। বললেন, 'লখীন্দরের ভেলায় তো আরো একজন ছিলেন। তিনিই বাঁচালেন।'

'না! বেহুলার কোনো পার্ট নেই এবার।' অনিরুদ্ধ নিঃস্পৃহভাবে বললেন, বাঁচতে যে হবেই এমন কোনো কথা নেই। যদি না পাই মনের মতো করে বাঁচতে। নিজের মতো করে বাঁচতে।'

অনিরুদ্ধ ছিলেন বছর চারেকের সিনিয়র। একা থাকতেন তেতালাতে আস্ত একখানা ঘরে। মেসের রান্না মুখে রুচত না বলে প্রায়ই নিজের খুশিমতো কিছু একটা রাঁধতেন আর বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন। অংশুমানকে ঠিক বন্ধু বলা চলে না। বড় বেশি জুনিয়র। তবু তাঁকেও ডেকে পাঠাতেন ও খাওয়াতেন। তাঁর উপর একটা অহেতুক স্নেহ ছিল অনিরুদ্ধের।

অংশুমানের একবার অসুখ করে। তাঁর রুমমেটরা যে যার কাজে বেরিয়ে যান, তাঁর জন্যে ক্লাস কামাই করেন না। বেচারা একলাটি পড়ে থাকেন জ্বর নিয়ে। তখন তাঁর কাছে এসে বসেন, তাঁর মাথায় জলপটি দেন, সময় মতো তাঁকে ওষুধ খাওয়ান ও শেষে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে যান ওই অনিরুদ্ধই। পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে তিনি কখনো এসব ক্ষেত্রে নীরব সাক্ষী হন না। বলেন, পড়াশুনার জন্যে যথেষ্ট সময় আছে, না হয় একটা বছর লোকসান হবে।

হয়েওছিল তাই। অংশুমানের জন্যে নয় যদিও। পড়াশুনায় অনিরুদ্ধ একটু পেছিয়ে রয়েছিলেন। তাঁর সহপাঠীর সঙ্গে এম-এ পরীক্ষায় বসতে পারেননি। তার জন্যে তাঁর ভাবনা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আইনটাও পড়ছিলেন। আরো এক বছর কলকাতায় থাকতে হতোই। কথা ছিল তিনি প্রথমে প্র্যাকটিস করবেন দেশে, অর্থাৎ আসানসোলে। পরে উঠে আসবেন কলকাতায়। হাইকোর্টে পসার জমাবেন। মফঃস্বল বারে তাঁর বাবা একজন মহারথী। অতি সহজেই স্টার্ট পাবেন। কলকাতায় সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু স্টার্ট যেখানেই করুন ফিনিশ করবেন কলকাতায়। সুতরাং

কলকাতায় দুটো একটা বছর বেশি থাকলেই সুবিধে। মানুষ চিনছেন।

এই স্নেহশীল মানুষটির কী একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা ছিল। হাসি দিয়ে সেটাকে তিনি সব সময় কোণঠাসা করে রাখতেন। দুটি কি তিনটি অন্তরঙ্গ বন্ধুই জানতেন কী তাঁর ব্যথা। তাঁরাও প্রকাশ করতেন না। তা সত্ত্বেও অংশুমানের কানে এসেছিল যে তিনি তাঁর এক বাল্যসখীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন। তাই সে মহিলার যথাসময়ে বিবাহ হয়নি। তাঁর বাবা যেই টের পেলেন যে স্বাবলম্বী হয়ে অনিরুদ্ধ তাঁর বাল্যসখীকে বিয়ে করবেন অমনি একটা উকিলী চাল চাললেন। ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন আর একটি মেয়ের সঙ্গে। এটি আরো সুন্দরী, আরো ধনবতী।

বিবাহিত তরুণ সহপাঠীরা তাঁদের বৌদের কথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতেন। প্রেমপত্র লিখতেন ও পেতেন। বৌদের হাতের ফুল তোলা কার্পেটের জুতো পায়ে দিতেন। রকমারি উপহার কিনে পাঠাতেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে সমানে ফূর্তি করতেন অনিরুদ্ধ। কিন্তু নিজের বেলা সাংখ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয় নির্বিচল। যেন তাঁর বিবাহই হয়নি। কেউ প্রশ্ন করলে কৌশলে এড়িয়ে যান। কেউ কৌতূহলী হলে শামুকের মতো খোলার ভিতর ঢুকে যান।

মানুষটি নরম। রাগ করতে কেউ তাঁকে দেখেনি। কড়া কথাও কেউ তাঁর মুখে শোনেনি। তবু তাঁর স্বভাবে এমন কিছু ছিল যার নাম ইস্পাত। তা দিয়ে তিনি অপরকে আঘাত করতেন না, কিন্তু আত্মরক্ষা করতেন। ভয় দেখিয়ে, খোশামোদ করে তাঁকে তাঁর পদতলভূমি থেকে টলানো যেত না। একবার যদি 'না' বলতেন তো শতচেষ্টাতে 'হাঁ' বলতেন না।

'না। বেহুলার জন্যে ঠাঁই নেই এ ভেলায়। এটা পুরোপুরি লখীন্দরের ভেলা।' নিরুদা আরো খোলসা করে বললেন, 'আমার অসুখটা আমার একার। এর কোনো সমভাগিনী নেই। সুখের সঙ্গে অসুখের এইখানেই তফাৎ। একদিক থেকে এটা একটা বাঁচোয়া। মানিক,—তোমাকে মানিক বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো? অসুখও মানুষকে বাঁচাতে পারে।'

এ কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন অংশুমান। অসুখও মানুষকে বাঁচাতে পারে। কার হাত থেকে বাঁচাতে পারে?

'আবার কবে এদিকে আসবে, মানিক? সাধ্য থাকলে আমিই তোমার ওখানে যেতুম। বৌমাকে আশীর্বাদ করে আসতুম। বিয়ে করেছ নিশ্চয় ছেলেমেয়ে ক'টি? ভালো আছে তো সকলে? ইচ্ছে করে সবাইকে দেখতে। সবাইকে ভালোবাসা জানিয়ো। পারো তো আরেক দিন এসো, যেদিন তোমার হাতে কাজ কম।' ধীরে ধীরে বললেন নিরুদা।

'আসব। আবার আমি আসব।' কথা দিলেন অংশুমান। 'আপনার মুখে মানিক নামটি শুনে কী যে ভালো লাগছে আমার! হ্যাঁ, বিয়ে করেছি। দুটি ছেলে। পথঘাট সুবিধের নয় বলে তাদের আনা সম্ভব হবে না, নিরুদা। আপনাকেও আমি নড়তে দেব না। আগে স্বাস্থ্য ফিরে পান। পাবেন, পাবেন। পদ্মার জল হাওয়ার গুণ আছে। আর পরাণদাও তাঁর সাধ্যমতো করবেন।'

নিরুদা ম্লানমুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলেন। সেই সেকালের মতো। বললেন, 'পরের বার যখন আসবে তখন দেখবে যে আমি উঠে পায়চারি করছি। তোমার সঙ্গে অনেক গল্প আছে।'

সেদিন পরাণদার সঙ্গে খেতে বসে নিরুদার অসুখের প্রসঙ্গ ওঠে। পরাণদা বলেন, 'অন্তত একটি বছর আমার চোখে চোখে রাখব। ওর হয়েছে ঘুরে বেড়নোর ভেসে বেড়ানোর বাতিক। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে ওর অরুচি। মানছি ভিয়েনার ডাক্তাররা ধন্বন্তরি। কিন্তু সেখানকার জল-হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাবে কি বাঙালীর শরীর? আর পথ্যও কি বাঙালীর ধাতে সইবে? দু'তিন বছর ধরে অভ্যাস বদলালে হয়তো একরকম সমঝোতা হতে পারত স্থানের সঙ্গে পাত্রের। তাহলে ডাক্তারের কাজ অনেক সহজ হতো। লোকে ভুলে যায় যে, রোগের চিকিৎসা হচ্ছে রোগীর

চিকিৎসা। আর রোগী যদি সহযোগিতা না করে তবে কারো সাধ্য নেই যে তাকে সারায়।'

অংশুমান আশ্চর্য হয়ে সুধান, 'কেন? নিরুদার থেকে কি সহযোগিতার অভাব?'

'প্রকারান্তরে।' পরাণদা উত্তর দেন, 'রোগী যদি সব সময় ভাবে এখানে থাকলে আমি সেরে উঠব না, অন্য কোনোখানে যাওয়া চাই তাহলে ডাক্তার বেচারা করবে কী? সেইজন্যে আমার প্রথম অনুশাসন হচ্ছে যেখানে এসেছ সেখানকার সঙ্গে মানিয়ে নাও। তার জন্যে যদি এক বছর লাগে তো এক বছর থাকতে হবে। কিন্তু ওই যে বললুম, নিরু কোথাও তিন চার মাসের বেশি টিকবে না ডাক্তারকে একটা ন্যায়সঙ্গত সুযোগ দেবে না। এমন নয় যে, ওর টাকার টানাটানি। পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল, তিন কুলেই টাকার ছড়াছড়ি।'

অবাক হলেন অংশুমান। এ রহস্য ভেদ করবে কে? কেন নিরুদার কোথাও মন বসে না? আগে তো এ রকম ছিলেন না। ওই মেসেই কাটিয়ে দিয়েছেন সাত বছর।

'ওর মতো সাকসেসফুল পুরুষ ক'জন?' বলতে থাকলেন পরাণদা। 'আসানসোলে ওদের তিন পুরুষের প্র্যাকটিস। ওর বাবা ওখানকার বারের একজন দিক্‌পাল। ছেলেও দেখতে দেখতে আরেকজন দিক্‌পাল হয়ে ওঠে। প্রায় মামলায় এক পক্ষে বাপ, আরেক পক্ষে বেটা। যেই জিতুক ওরাই জেতা। ওরাই নেতা। এত সুখও সইল না ছেলের। চলল হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে। সেখানে তো বাপ-ঠাকুরদার নামযশ নেই যে সাহায্য করবে। তবু সেখানেও নিজগুণে ও দাঁড়িয়ে গেল। ঠিক এমনি সময় বাধল ওর অসুখ। আজ একে দেখায়, কাল ওকে দেখায়। যে যা বলে তাই শোনে। শোনে আর কোথায়! ওষুধ মুখে দিয়েই বলে, বাজে ওষুধ। এতে আমার অসুখ সারবে না। ইনজেকশনের ছুঁচ দেখলেই মূর্ছার ভান করে। পুরী, দেওঘর, আলমোড়া ইত্যাদি হরেক জায়গা ঘুরে বিশেষ কোনো ফল পায় না। বলে ইউরোপে যাব।

'তারপর?' অংশুমান আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

'তার পর গেল ইউরোপে। কিন্তু সঙ্গে নিল না ওর গৃহিণীকে। বছর খানেক ছিল বিভিন্ন স্থানে। বিভিন্ন দেশে। শরীর আরো খারাপ হলো। ফিরে আসতে চাইল। ফিরল কিন্তু বাড়িতে নয়। আমার কাছে। এখন ওর খেয়াল কী শুনবে? হাউস বোট চড়ে নদীতে নদীতে ঘোরা। পাগল!' পরাণদা হাসলেন।

নিরুদার জন্যে বুক ভরা ব্যথা নিয়ে সেবারকার মতো বিদায় নিলেন অংশুমান। আবার যখন সার্কল ইন্সপেক্টারের সঙ্গে দেখা হলো তখন তাঁকে সমস্ত সমাচার শোনালেন।

সি আই বললেন, 'লোকটির জন্যে আমারও দুঃখ হয়, স্যার। অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি হাইকোর্টে বেশ পসার জমতে শুরু করেছিল। কী যে হলো কেউ বলতে পারে না। একদিন তাঁর মক্কেলদের পরামর্শ দেন অন্য উকীলের কাছে যেতে। কাগজপত্র ঘুরিয়ে দেন। ফী ফেরত দিয়ে বলেন, স্বাস্থ্যঘটিত কারণে আমি অক্ষম। অথচ তখনো তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। একটু ডায়েবেটিক ছিলেন। কখনো কোনো ব্যায়াম তো করতেন না।

অংশুমানের মনে পড়ল যে, মেসে থাকতে নিরুদার ব্যায়ামে অভিরুচি ছিল না। খেলা দেখতে গড়ের মাঠে কে না যেত। কিন্তু নিরুদা বাদ।

'পরের ফোর্টনাইটগুলিতে সেই ভুলটা শুধরে দেবেন সার। যদি উল্লেখ করে থাকেন।' ইন্সপেক্টার দরদীর মতো বললেন।

মাসখানেক বাদে সেই অঞ্চলে আর একটা টুর ফেললেন এস ডি ও সাহেব। স্কুলের উন্নতির জন্যে সভা ডাকলেন। সভার পর যথেষ্ট সময় থাকবে আশ্রমে নিরুদার খোঁজ নেবার। যথাকালে ভেড়ামারা স্টেশনে ট্রেন ধরবার।

নিরুদা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আঁকছিলেন। হাউসবোটের নক্সা। অংশুমানকে দূর থেকে স্বাগত করতে এগিয়ে এলেন। 'আসতে আজ্ঞা হোক, আসতে আজ্ঞা হোক, মাননীয় রাজপ্রতিনিধি মহোদয়।'

'কেমন আছেন, নিরুদা? একটু যেন ভালো মনে হচ্ছে।' বললেন অংশুমান। 'কোনো অভিযোগ নেই, মানিক। পরাণদা আমাকে রাজার হালে রেখেছেন। যাকে বলে ভি আই পি ট্রীটমেন্ট।' নিরুদা খুশি হয়ে বললেন। 'অতখানি মনোযোগ আমাকে এর আগে আর কেউ দেননি।'

'ওটা কী আঁকছেন, নিরুদা? দেখি।' চেয়ে নিলেন অংশুমান।

'তোমাকে বুঝিয়ে দিই। এই যে পাটাতন দেখছ এটার মাঝের অংশটাকে তুলে খাড়া করে টেবল বানানো যায়। এইখানে রেখে আমি খাব বা লিখব। এর দু'ধারে বেঞ্চি। তার একটাতে বসব আমি, অন্যটাতে আমার অতিথি। যদি কখনো কেউ এসে হাজির হন। পরে এটাকে ঠেলে ঢোকানো যাবে। তখন ঢালা বিছানা। বেশ হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে শোব। নয়তো সেতার নিয়ে বাজাব।' নিরুদা উৎসাহের সঙ্গে বললেন।

'সেতারটা কোথায় লটকাবেন?' অংশুমানের প্রশ্ন।

'কেন? জায়গার অভাব?' একটা দাগ দিয়ে দেখালেন নিরুদা।

'বেশ, বেশ।' সমর্থন করলেন অংশুমান। 'তারপর আহারের বাসনকোশন রাখছেন কোথায়? রান্না করছেন কোথায়?'

'পিছনের দিকে দুটো সেকশন থাকবে। একটা রান্নাঘর তথা ভাঁড়ার। একটা স্নানের ঘর তথা টয়লেট। তারপর পাটাতনের তলায় আমার বক্স রুম। ঐ যে দুটি বেঞ্চি ও-দুটিতে কপাট দেওয়া থাকবে। কপাটের ওধারে সুটকেস। হোল্ড অল। যতরকম টুকিটাকি।' নিরুদা দাগ দিয়ে দেখালেন।

'হাউ ক্লেভার!' তারিফ করলেন অংশুমান।

'ভার বাড়াতে চাইনে, ভাই।' নিরুদা মাথা নাড়লেন। 'যেটা না হলে নয় সেইটেই আমার সঙ্গে থাকবে। আর সব একে একে জলে ফেলে দেব। আমি জানতে চাই কত কমে একজন মানুষের চলে। তার উল্টোটা আমার জানা আছে।'

'বুঝেছি। আপনি ভার নামাতেই চান। কিন্তু কেন?' অংশুমান জিজ্ঞাসু।

'সোজা উত্তর।' নিরুদা মুচকি হাসলেন। 'ভেলাটা যত হালকা হবে তত সহজে ভাসবে। যত ভারি হবে তত সহজে ডুববে। আমি কি ভাসতে চাই না ডুবতে চাই? এই যে হাউসবোট দেখছ, এটা আরামের জন্যে নয়। এটা হলো একটা প্রতীক। এই কৌটায় নিহিত থাকবে আমার প্রাণ।'

তাঁর কথাবার্তায় রূপকথার আমেজ এলো। মনে পড়ে গেল অংশুমানের ছেলেবেলায় শোনা রূপকথা। বেহুলার কাহিনীও মনে পড়তে থাকল।

'কলকাতা আমি সহ্য করতে পারলুম না, মানিক। ইউরোপও না। মেটিরিয়ালিজমের জয়জয়কার। একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত ভালো লাগে নানা রঙের খেলনা। সে বয়সটা পেরিয়ে গেলে যদি কারো ভালো লাগে তা হলে বুঝতে হবে সে একটি বুড়ো খোকা। আমার সে বয়স যেদিন পেরিয়ে গেল সেদিন আমি খেলা ছেড়ে খেলাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। আর আমি খেলনা নিয়ে খেলব না।' তাঁর কণ্ঠস্বরে ইস্পাত।

'ঠিক বুঝতে পারছি নে, নিরুদা। কী এমন বয়স হয়েছিল আপনার? বানপ্রস্থের অনেক দেরি এখনো। মেটিরিয়ালিজম যদি বলেন, এই হাউসবোট কি তার ঊর্ধ্বে? হাজার হালকা হলেও একে ভাসিয়ে রাখা যাবে না, যদি এর নির্মাণের সময় ভালো এনজিনীয়ারের সাহায্য না নেন।' অংশুমান সাবধান করে দিলেন।

।। তিন ।।

পরের বার অংশুমান গিয়ে দেখেন হাউসবোটের একটি মডেল নির্মাণ করা চলেছে। মিস্ত্রীর সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন স্বয়ং নিরুদা। তাঁকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

'এস, ভাই, এস। সব ভালো তো?' নিরুদা তাঁর দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। বোঝা গেল গায়ে কিছু জোর হয়েছে।

'ও কী, নিরুদা? মডেল মনে হচ্ছে।' অংশুমান সুধান।

'ঠিক ধরেছ।' নিরুদা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ছোট মাপের হলেও যথাসম্ভব নিখুঁৎ যাতে হয় তারই চেষ্টায় আছি। কিন্তু মুশকিল কী, জানো?'

'না তো?' অংশুমান অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

'বোটের মডেল না হয় হলো। পদ্মার মডেল হবে কী করে?' বিষম কূট প্রশ্ন।

'পদ্মার মডেল তো হয় না।' অংশুমান ভেবে বললেন।

'তা যদি না হয় তবে এই মডেল আমি কিসের জলে ভাসাব? গামলার জলে না ডোবার জলে? সেখানে ভাসলেও তার থেকে প্রমাণ হবে না যে পদ্মার জলে ভেসে থাকতে পারবে।' তিনি বিষণ্ণ ভাবে বললেন।

'না। তেমন কোনো নিশ্চিতি নেই।' স্বীকার করলেন অংশুমান।

'তার পর পাগলা হাওয়ার মডেল আমি পাচ্ছি কোথায়?' আরো বিষম প্রশ্ন।

'পাগলা হাওয়ার মডেলও হয় না, নিরুদা।' অংশুমান উত্তর দিলেন।

'তা হলে কেমন করে প্রমাণ হবে যে আমার এ মডেল ঝড়বাতাসেও ডুববে না? হাতপাখার হাওয়া তো ঝোড়ো হাওয়ার মডেল নয়।' তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে এলো।

'এখন থেকে ওসব ভেবে কী হবে, নিরুদা? হাউসবোট যারা বানাবে তারাই এসব বিবেচনা করে বানাবে।' আশ্বাস দিলেন অংশুমান। 'তা হলেও আপনার এই মডেলের মূল্য আছে। এটার থেকে ওরা একটা আইডিয়া তো পাবে।'

'সে কথা ঠিক।' নিরুদা বললেন, 'কিন্তু আমার প্রশ্নগুলোর অন্য অর্থ আছে, মানিক। আমি যখন বলি আমার জীবন আমি নিজের মতো করে গড়ব তখন আমার মনে থাকে না যে চারদিকের জীবনপ্রবাহ আমার হাতে গড়া নয়। আর ঘটনাচক্রের উপরেও আমার হাত খাটে না। যে-কোনো সময় আমার জীবনকে এরা বিপর্যস্ত করতে পারে।'

'তা হলেও আপনার গড়া জীবন না-গড়া হয়ে যায় না।' অংশুমান বললেন, 'যেটা পাওয়া গেছে সেটা খোওয়া যেতে পারে, কিন্তু না-পাওয়া যেতে পারে না। নিখুঁত করে গড়ুন, নির্ভয়ে গড়ুন। যায় যাবে কালসাগরে তলিয়ে। কিন্তু গড়া যে হয়েছে এটা তো পাকা।'

'পাকা না ফাঁকা!' নিরুদা চিন্তান্বিত হলেন। তার পর কী মনে করে বললেন, 'এই এক প্রহেলিকা। যাকে নিয়ে জ্বালাতন হচ্ছি। শরীর সারবে কী করে?'

ঘরে গিয়ে বসলেন দু'জনে। সেই দুটো ডেক চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে। বেলা পড়ে আসছিল। পদ্মার বুকে বিচিত্র মেঘের ছায়া। নিরুদা ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন।

'দেখ, মানিক, আমি হার্ড বয়েল্ড লইয়ার। সেইজন্যেই সাকসেসফুল। আবার সেইজন্যেই আমার আজ এ দশা। আমি সবাইকে সন্দেহ করতে করতে জীবনদেবতাকেও সন্দেহ করতে

শিখেছি। মানুষের ভাগ্য ভগবানের হাতে এ বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে। আবার মানুষের হাতে এ কথা বলতেও বল পাইনে। তবে কার হাতে? অন্ধ নিয়তির? দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের?

গড়বে যে, কিসের উপরে গড়বে? কার উপরে নির্ভর করা যায়? তোমার পায়ের তলায় মাটি কোথায়? যেখানে দাঁড়িয়েছ সেখানে একদিন আবিষ্কার করবে যে মাটি সরে গেছে। সেখানে পদ্মার ঢেউ। দশ বছর প্র্যাকটিস করে আমি হাজারটা মামলা দেখেছি। হাজারটি মানুষের ভাগ্যের খবর জেনেছি! কত যত্নে ওরা গোড়া বেঁধেছিল। ভেবেছিল শক্ত ভিতের উপর সংসার পেতেছে। এক একটা মামলা শেষ হয় আর দেখি পাকা ঘুঁটিও কেঁচে গেছে। যারা হারে তারা তো হারেই, যারা জেতে তারাও যে চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত তা নয়।

যদি জানতুম যে মামলার জয় মানে ধর্মের জয়, সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়। তাও কি সব ক্ষেত্রে ঘটে? আইন অনুসারে বিচার হয়েছে যখন, তখন মেনে নিতে হবে যে ন্যায়ের জয় হয়েছে। কিন্তু আমার ন্যায়বোধ আমাকে অতটা নিশ্চিন্ত হতে দেয়নি। নিজের সফলতায় আমি নিজেই সংশয়ান্বিত। যে আমাকে যথেষ্ট ফী দিয়েছে তারই মামলা আমি হাতে নিয়েছি, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকেই আমি জিতিয়ে দিয়েছি। তা হলে ওটা ধর্মের জয়, না ধনের জয়? ন্যায় তা হলে কোন্ দিকে? আমি যেদিকে সেইদিকে না অপর দিকে? জিতেও আমি শান্তি পাইনি, মানিক। বরং কখনো কখনো হেরে গিয়েই শান্তি পেয়েছি। যদিও তার দরুন মক্কেল হারিয়েছি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবার বাসনা যতদিন ছিল ততদিন আমি আমার জয়ের জন্যেই মাথা ঘামিয়েছি, ন্যায়ের জয়ের জন্যে নয়। ক্যালকাটা হাইকোর্ট বারেও যখন প্রতিষ্ঠা হলো তখন আমার মনে খটকা বাধল, এতদিন আমি করেছি কী? অন্ধকারকে হটিয়ে দিয়ে আলোর সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছি, না আলো অন্ধকারের মধ্যে বাছবিচার না করে অন্ধকারকেই কার্যত প্রাধান্য দিয়েছি? শয়তান যত পাইয়ে দিতে পারে সাধু তত পারে না। যে আমাকে পাইয়ে দিয়েছে আমিও তাকেই পাইয়ে দিয়েছি। ভগবান আমাকে যে বুদ্ধি দিয়েছেন সে বুদ্ধি লেগেছে তাঁরই বিরুদ্ধে। আমি প্রোফেসনাল লাঠিয়াল। যে আমাকে নিযুক্ত করেছে তারই স্বার্থে আমি লাঠি চালিয়েছি। সেটা কি ন্যায়ের স্বার্থ? কখনো কখনো। আমি যদি প্রোফেসনাল লাঠিয়াল না হতুম তা হলে হয়তো সেকালের নাইটদের মতো বিপন্নকে উদ্ধার করতুম। তার দরুন নিষ্ক্রয় নিতুম না।

যা নিয়ে এতদিন আমার গর্ব ছিল—আমি প্রোফেসনাল ও আমার ফী থেকেই মালুম যে আমি উঁচুদরের—সেইটেই হলো আমার কাছে লজ্জার কথা। আমার এই অর্থকরী প্রোফেসনটা মরাল নয়, ইম্‌মরাল নয়, আমরাল। জগতে যদি মরাল অর্ডার বলে কিছু থাকে তা হলে আমিও তার আমলে আসি। আমি তার বাইরে বা ঊর্ধ্বে নই। অর্থের জন্যে অন্যায়ের পক্ষ নেব ন্যায়কে হারিয়ে দেব, এর কি কোনো ক্ষমা আছে তার কাছে; অবশ্য সব সময় তা করিনি। ন্যায়ের পক্ষেও লড়েছি অন্যায়কে নিরস্ত করেছি। কিন্তু বেছে বেছে তাই যদি করতুম তা হলে আমার সংসারযাত্রা চলত না। আমাকে ঘর থেকে নিতে হতো। সেও তো সেই আইন ব্যবসায়ের টাকা। ন্যায় অন্যায়ের চুলচেরা বিচার করলে বাবাও কি অত টাকা রোজগার করতে পারতেন? না ঠাকুরদাদা পারতেন?

ন্যায়মন্দিরে কি ব্যবসা করা চলে? ন্যায় কি সব নাগরিকের মাথাব্যথা নয়? আমিও কি একজন নাগরিক নই? আইনজ্ঞান ও সূক্ষ্মবুদ্ধি নিয়ে কি ব্যবসা করা উচিত? ইহুদীদের ধর্মমন্দিরে টাকাপয়সার আদান-প্রদান দেখে যীশু খ্রীস্ট কী করেছিলেন, জানো নিশ্চয়। তিনি ওই পোদ্দারদের ঘাড় ধরে বার করে দেন। আমি থাকলে আমাকেও তাড়িয়ে দিতেন। ধর্মাধিকরণ কি ধর্মমন্দির নয়? তা হলে আমরা সেখানে ব্যবসা করি কোন্ অধিকারে? এর স্বপক্ষে অনেক যুক্তি শুনেছি ও শুনিয়েছি। কিন্তু মন মানেনি। আইন থাকবে বইকি। আইনজ্ঞও থাকবে। আদালতও যে না থাকবে

তা নয়। গান্ধীজীর ওই পঞ্চায়তের বিচারে কেউ সন্তুষ্ট হবে না। তোমাদের ইউনিয়ন বেঞ্চকোর্টও আদালতের বিকল্প নয়। আদালত থাকলে উকীলও থাকে। কিন্তু উকীলদের দানাপানির অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন বিচারকদের। তা বলে তাঁদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না। সরকার যদি তাঁদের বিবেক কিনে নেয় তা হলে সেও তো সেই কেনাবেচাই হলো।

আমি যতই উন্নতি করি, উপার্জন করি ততই অস্বস্তি বোধ করি। জীবন যিনি আমাকে দিয়েছেন তিনি বিনামূল্যেই দিয়েছেন। আমি তাকে লাভের ব্যবসায় খাটাচ্ছি। কিন্তু সত্যি লাভবান হচ্ছি কি? মানুষের শক্তি অপরিমিত নয়। তার এতখানি শক্তি যদি অপাত্রে বা অকাজে অপচিত হয় তা হলে জীবনের হিশাব মিলবে কী করে? না জীবনের কোনো হিশাবনিকাশ নেই? সমস্তটাই আর্থিক লেনদেনের হিশাবনিকাশ? আমি ক্রমশ বুঝতে পারি যে আমি যা দিচ্ছি তার বিনিময়ে লক্ষ মুদ্রা লাভ করলেও সেটা লাভ নয়, যদি না তার দ্বারা ন্যায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এও আমি উপলব্ধি করলুম যে প্রচুর অর্থের প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন। প্র্যাকটিস যদি করি তো অল্পে সন্তুষ্ট হব না। বড় বড় মামলায় নামব, প্রাণপণে লড়ব, মোটা মোটা ফী পকেটস্থ করব। চুলোয় যাক ন্যায় অন্যায়। না, গরিব উকীল বা গরিবের উকীল হব না। ভেবে দেখলুম প্রলোভনের রাজ্য থেকে পলায়নই শ্রেয়। ওটা ফলস্ লাইফ।

কিন্তু বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। বাড়ির লোকটিকেই আমি বোঝাতে পারব না। পারিবারিক মনোমালিন্য ডেকে আনব কেন? তার চেয়ে একটা অসুখ বাধানোই মন্দের ভালো। তুমি বিশ্বাস করবে না, মানিক, আমি অনেকদিন মনে মনে বলেছি, আহা, আমার যদি একটা বড়রকম অসুখ হতো! তা হলে আমাকে বেশ কিছুকাল কোর্টে যেতে হয় না। সেই আমার পলায়ন। তার জন্যে জবাবদিহি করতে হয় না। মনোমালিন্যেরও সম্ভাবনা থাকে না। আর্থিক অনটন হয়তো হবে, কিন্তু সেটা তেমন গুরুতর নয়। পরিবারকে আসানসোলে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। বাবা দেখবেন। তোমার মতো আমারও দুটি সন্তান।

অসুখের কথা ভাবতে ভাবতে সত্যি সত্যি পড়ে যাই অসুখে। প্রতিরোধের ইচ্ছা থাকলে তো প্রতিরোধ করব। অসুখ আর সারবার নাম করে না। সকলে দুঃখিত হয়, আমি হইনে। আমার একটা লম্বা ছুটির দরকার ছিল। সেটা এইভাবেই এলো। তা ছাড়া দরকার ছিল একটা চেঞ্জের। সত্যিকার চেঞ্জের। ইউরোপে গিয়ে সেটাও হলো। কিন্তু একটা জিনিস এখনো বাকী। তার নাম পুনর্নবত্ব। সেইজন্যেই পরাণদার আশ্রমে আসা। পদ্মাতীরে বাসা। ভেলায় করে ভাসা। ভাসতে ভাসতে কোথায় যাচ্ছি কে জানে! স্বর্গে না পাতালে! মর্ত্যে যদি থাকি তো নতুন মানুষ হয়ে নতুন করে বাঁচব।'

অংশুমান এতক্ষণ অভিভূতের মতো শুনছিলেন। কণ্ঠক্ষেপ করেননি। এবার মৌনভঙ্গ করলেন। 'কিন্তু নতুন করে বাঁচতে গেলেও তো সেইসব পুরাতন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। পিতার সম্মতি, স্ত্রীর অনুমোদন, সন্তানদের ভবিষ্যৎ।'

অনিরুদ্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, 'তা হলে কিন্তু লখীন্দরের ভেলা নির্ঘাত ডুববে।'

'তাই নাকি!' অংশুমান ধাঁধার জবাব খুঁজে না পেয়ে বললেন, 'আপনার মনের ইচ্ছাটা কী, শুনতে পাই, নিরুদা?'

'আমি আর অন্যের মুখ চেয়ে বাঁচতে রাজী নই। হলোই বা তারা আমার প্রাণের চেয়েও আপন।' অনিরুদ্ধ যেন একটা ইশ্‌তেহার থেকে শোনালেন। 'লখীন্দর যদি বাঁচে তো তার কিছু নিজের কাজ আছে বলেই বাঁচবে। সে কাজ অর্থকরী না হতেও পারে। সে তার জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারলেই সুখী হবে, সুখী করবে। নয়তো অসুখী হবে, অসুখে ভুগবে ও—'

'ছি! অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই।' বাধা দিয়ে বললেন অংশুমান। 'আমি কি জানিনে, ইস্পাত আছে আপনার গঠনে? সেই ইস্পাতের ফলা দিয়ে আপনাকে আপনি উদ্ধার করবেন। সব রকম পরিস্থিতিতে।'

একেই বলে পাতলা বরফের উপর দিয়ে স্কেট করা। এ বিদ্যায় নিরুদার জুড়ি নেই। তিনি তাঁর সদর জীবনের গল্প বললেন, কিন্তু অন্দর জীবনের গল্প জানতে দিলেন না।

'সব রকম পরিস্থিতিতে!' সেকালের মতো মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলেন নিরুদা।

'না ভাই। সবরকম পরিস্থিতিতে ইস্পাতের ফলা কাজ দেয় না। অসুখের মূলে যদি থাকে অ-সুখ তবে ইস্পাতের ফলা তত গভীরে যায় না। তার জন্যে চাই গভীরতর বোঝাপড়া। যার জন্যে আমি ব্যাকুল। যার আশা নেই দেখে আমি পীড়িত। অগতির গতি আমার এই লখীন্দরের ভেলা। বাঁচতে হয় সত্য করেই বাঁচব। মরতে হয়—'

'না, না, না, না। ও কথা মুখে আনবেন না, দাদা।' ব্যাঘ্রঝম্পনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন অংশুমান। চেপে ধরলেন অনিরুদ্ধের দুটি হাত।

'আমি বলি কী।' অংশুমান তাঁর হাত ছেড়ে দিলেন। 'আমি বলি কী, নিরুদা, আপনি সমস্যার মুখোমুখি হোন। তাকে এড়াতে গিয়ে পালিয়ে বেড়ানো কোনো কাজের নয়। ভেলায় ভাসা মানে ড্রিফট করা তো? কতকাল ড্রিফট করবেন? ওদিকে আয়ু চলে যাচ্ছে। মানুষ কতদিন বাঁচে? লখীন্দরের তো দেহে প্রাণ ছিল না। তার বেলা যা অগতির গতি আপনার বেলা কি তাই? আপনি কি অগতি?'

'মানিক রে! আর আমায় জ্বালাসনে।' স্নেহের সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে বললেন নিরুদা। 'আমার যদি চাবা থাকত আমি কি একটা দিনও ভুগতে রাজী হতুম? আয়ু? আয়ু নিয়ে আমি করব কী? আরোগ্য? আরোগ্য নিয়েই বা করব কী? আরো আয়? আরো ব্যয়? আরো ভোগ? আরো সঞ্চয়? না, ভাই। এ উত্তরে আর আমার মন ভরে না। খুঁজেছি আমি অন্য কোনো উত্তর। অন্বেষণে বেরিয়েছি। এটা জীবনের থেকে পলায়ন নয়। বরং জীবনের উদ্দেশ্যেই পলায়ন। এর বেশি এখন আমার কাছে স্পষ্ট নয়। হবে ক্রমে ক্রমে। এতদিন জীবিকার দাবী মিটিয়েছি, তাই জীবিকা আমার দাবী মিটিয়েছে। এবার জীবনের দাবী মেটাব। তা হলে জীবনও আমার দাবী মেটাবে। তখন আমি পাব আমার জিজ্ঞাসার উত্তর। জানতে পাব আয়ু নিয়ে আমি করব কী। আরোগ্য নিয়ে আমি করব কী। না পেলেও আমার খেদ নেই। অসুখেও সুখ আছে।'

এর পরে বাকী থাকে করমর্দন ও বিদায় গ্রহণ। 'পুনর্দর্শনায় চ'। সেটা সারা হলে দু'জনে দু'জনের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। মুখে কথা নেই। মুখের বদলে মন বলছে কথা। বলতে বলতে চোখে জল এসে যায়। দু'জনেরই।

(১৯৬৩)

নাকের বদলে

'আমি যেমন তোমার মাস্টার মশায় ছিলুম,' অনাদিনাথ বললেন, 'তেমনি আমারও এক মাস্টার মশায় ছিলেন। একবার তিনি কী মনে করে আমাকে ও আমার বন্ধু ভদ্রকালীকে প্রশ্ন করেন, জীবনে

তোমরা কে কতদূর যেতে চাও।'

সুরকুমার কৌতূহলী হলেন। 'তারপর?'

'ভদ্রকালী ছিল চটপটে স্বভাবের। ধাঁ করে জবাব দেয়, ভ্লাডিভোস্টক, সার। ওর সঙ্গে টক্কর দিয়ে আমি উত্তর দিই, টিমবাকটু, সার। যেন ওটা ভূগোলের প্রশ্ন। আসলে, তা তো নয়। তিনি হাসলেন। বললেন, অতদূর না গিয়েও আরো দূরে যাওয়া যায়। তখন ওকথার অর্থ বুঝিনি। টিমবাকটু যাওয়া আমার জীবনে ঘটে উঠল না। ওর ধারে কাছেও যাইনি। আমার দৌড় হরিদ্বার অবধি। কিন্তু আমার বন্ধু ভদ্রকালী সত্যি অনেক দূর যায়। ভ্লাডিভোস্টক না হোক, য়োকোহামা। মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে ও জাহাজের ডাক্তার হয়।'

অনাদিনাথ একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু এসব কথা তোমাকে দেখে আজ মনে পড়ছে কেন? তুমি রাজশাহী বদলি হয়েছ। ভদ্রকালীর ভদ্রাসনও সেই জেলায়। কী যেন গ্রামটার নাম। ভুলে গেছি। খোঁজ নিয়ো তো একবার। শেষ চিঠি লিখেছিল গ্রামের ঠিকানা দিয়ে। সেটা কবে তাও ভুলে গেছি। বছর পাঁচেক হবে। বেঁচে আছে কিনা তাও জানিনে আমি। হয়তো আরো অনেক দূর চলে গেছে, ইহলোকের সীমানা ছাড়িয়ে। নইলে একটা খবর দিত। তুমি যদি ওকে খুঁজে বার করতে পারো, তা হলে ওকে বোলো আমাকে যেন মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখে। বড়ো ভালো লাগে পুরোনো দিনের বন্ধুর চিঠি পেতে, দেখা পেতে। দেখলে তো কত খুশি হলুম তোমাকে আজ দেখে। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য। শিষ্যাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্।'

'ও কী বলছেন, মাস্টার মশায়!' সুরকুমার তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। 'কিন্তু ভদ্রকালী কী, তা তো আমাকে বললেন না। ঘোস না বোস না চাটুজ্যে না মুখুজ্যে। ওটুকু জানতে পেলে খুঁজে বার করা কঠিন হবে না।'

'মুখুজ্যে নয়, মুস্তফী। ওরা বারেন্দ্র। নবাবী আমলের ক্ষুদে জমিদার। ঘোরতর শাক্ত। ডাক্তার মহলে তুমি ওর খোঁজ পাবে নিশ্চয়।' অনাদিনাথ বললেন, 'আবার এসো।'

।। দুই ।।

খোঁজ পাওয়া কঠিন হলো। অথচ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতোই সহজ। কার কার রিভলভার ও পিস্তল আছে তার একটা তালিকা থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে। একদিন সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল হাতীক্ষ্যাপার ডাক্তার ভদ্রকালী মুস্তফী তাঁর লাইসেন্স রিনিউ করাননি। কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, স্বয়ং হাজির হতে অক্ষম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি মেহেরবানী করে তাঁর গরিবখানায় পায়ের ধুলো দেন, তা হলে তিনি কৃতজ্ঞ হন। আর নয়তো সাহেবের যা আদেশ।

সুরকুমার হেড ক্লার্ককে তলব করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতদিন কোনো আদেশ দেওয়া হয়নি কেন? আবদার পূরণ করা যখন অসম্ভব।'

'ইওর অনার,' হেড ক্লার্ক নিবেদন করলেন, 'হুজুরের প্রিডিসেসর চিন্তা করে দেখতে চেয়েছিলেন লাইসেন্স ক্যানসেল না করে আর কিছু করতে পারা যায় কি না। বদলির হুকুম না পেলে এতদিনে এর একটা বিহিত করতেন বলে মনে হয়।'

'আপনি তো বহুকালের অভিজ্ঞ কর্মচারী।' সুরকুমার বললেন, 'আপনার অভিজ্ঞতায় এমন কেস কখনো ঘটেছে? ইনি রাজা মহারাজা নন, কেন আমরা এঁর বাড়ি গিয়ে রিভলভার পরিদর্শন করব। স্বাস্থ্য ভালো নয় তো রিভলভার ব্যবহার করবেন কী করে? বয়স কত!'

'তা ষাটের উপর হবে।' হেড ক্লার্ক অভয় পেয়ে বললেন, 'ইওর অনার ইচ্ছা করলে এক্ষুনি ওটা বাজেয়াপ্ত করতে পারেন, কিন্তু মহারানীর আমলের ওই রিভলভার এক টাকা দামেও কেউ কিনবে না। অস্ত্র হিসাবে ওর কোনো মূল্য নেই। বিনামূল্যে উপহার পেতেও লোকে নারাজ, কারণ বছর বছর লাইসেন্স রিনিউ করতে হবে, হুজুরে হাজির হতে হবে। তার খরচ কত! ডাক্তার মুস্তফীর ওটা একটা শাদা হাতী। যে কোনো লাইসেন্সকারীর পক্ষেও তাই। তা হলে বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করার হুকুম দিতে হয়। তাতে সরকারের কী লাভ? লাইসেন্স ফী বাবদ বছর বছর যে টাকাটা আসছে সেটা', হেড ক্লার্ক বলতে যাচ্ছিলেন 'তুচ্ছ নয', কিন্তু হাকিমের মনোভাব আঁচ করে বললেন, 'অবশ্য তুচ্ছ।'

সুরকুমার তৎক্ষণে মনঃস্থির করেছিলেন। বললেন, 'না, না, বাজেয়াপ্ত বা ধ্বংস করাটা একটা কাজের কথা নয়। আমি যখন ওই অঞ্চলে টুর করতে বেরোব একদিন আমার ক্যাম্প থেকে হাতীক্ষ্যাপা ঘুরে আসব।'

তাই হলো। মুস্তফীকে আগে থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা শুনে বলেছিলেন, 'আমাকে দেখতে তো নয়, আমার হাতিয়ারটিকে দেখতে আসা হচ্ছে।' পরে রানীনগর ডাকবাংলো থেকে একখানা নোট লিখে সুরকুমার তাঁকে জানালেন যে, তাঁর মাস্টার মশায়ের বাল্যবন্ধু এত কাছে থাকেন শুনে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উদগ্রীব। এবং লোকমুখে তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা শুনে উদ্বিগ্ন।

যমুনা নদীর কূলে একটা পুরোনো ভাঙা ইমারত। সেটাই মুস্তফীদের ভদ্রাসন। কিন্তু সেখানে তিনি বাস করেন না। করেন বেশ একটু দূরে একটি ছোট বাংলোয়। সম্পূর্ণ একা। তারই একটা অংশে তাঁর গেস্ট রুমস। একেবারে নদীর কিনারে।

শিষ্টাচার বিনিময়ের পর মুস্তফী বললেন, 'দেখছেন তো আমি এখন গঙ্গাযাত্রী। যে কটা দিন বাঁচি এইখানেই অনড় হয়ে উদ্ভিদের মতো বাঁচতে চাই। রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে আপনি আমাকে বাঁচান। আপনাকে এর পরের বার কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে নেই, স্যার।'

'ছি। আমাকে 'স্যার' বলে লজ্জা দেবেন না। আমি আপনার সহপাঠী অনাদিনাথ নন্দীর ছাত্র। আপনিও আমাকে 'তুমি' বলতে পারেন।' আশ্বাস দিলেন সুরকুমার।

ছোট্ট নদী। কিন্তু তার জলের তোড় খুব। পাহাড়ের থেকে নেমে এসেছে বলে কি?

মুস্তফী তাঁর বন্ধু অনাদিনাথের পরিবার প্রসঙ্গ তুললেন। তার থেকে এলো তাঁর নিজের পরিবার প্রসঙ্গ। তাঁর একমাত্র ছেলে এখন শোলাপুরে রেলওয়ে অফিসার। তাঁর গৃহিণী গেছেন নাতিনাতনীকে মানুষ করতে। বৌমা একা পেরে উঠছেন না।

'এককালে মনে হতো', মুস্তফী বললেন দুজনের পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে দিতে, 'আমার মরবার স্বাধীনতা নেই। সংসারের দায়িত্ব আর রুগীদের দায়িত্ব আমাকে মরবার স্বাধীনতা দেবে না। এখন সংসার থেকে সরে এসেছি। রুগী দুটি চারটি দেখি। একটা বিদ্যা শিখেছি। যাতে ভুলে না যাই। এখন আমি মরবার স্বাধীনতা অর্জন করেছি। যে কোনোদিন বৈতরণী পাড়ি দিতে পারি।'

সুরকুমার কিন্তু তাঁর শরীরে জরা কিংবা বিশেষ কোনো ব্যাধির লক্ষণ দেখতে পেলেন না। অসাধারণ গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সুপুরুষ, চুলে তেল পড়ে না বলে ফিরিঙ্গীদের মতো কটা, সাহেবী পোশাক পরে সাহেবী স্টাইলেই থাকেন।

'কই, আপনাকে তো তেমন অসুস্থ বলে মনে হয় না।' সুরকুমার বললেন।

'লিখতে গেলে হাত কাঁপে। সেইজন্যে চিঠিপত্র লেখা ছেড়ে দিয়েছি। বেশি দূর হাঁটতে গেলে পাও একটু একটু কাঁপে।' মুস্তফী বর্ণনা দিলেন। 'তা বলে আমি ইনভ্যালিড নই। বাগানে দস্তুর মতো হাঁটি। ভলতেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, কালটিভেট ইওর গার্ডেন। আমি সব দেখেশুনে ভলতেয়ারের পরামর্শে চলছি।'

সুরকুমার জানতে চাইলেন, 'ওখানে কী লাগিয়েছেন?'

'সোয়াবীন'। মুস্তফীর উচ্ছ্বাস দেখে কে। 'আমার প্রধান খাদ্য।'

সেদিন সুরকুমারের হাতে সময় ছিল না। নদীর ওপারে লোক জমে গেছে তাঁকে দেখতে ও ধরে নিয়ে গিয়ে ইস্কুল মাদ্রাসা দেখাতে। উপর থেকে সাহায্য যা পায় তাতে কুলোয় না, তাও ঠিক সময়ে পৌঁছয় না। ইতিমধ্যেই একটা মানপত্র ছাপিয়ে ফেলেছে তাতে তাঁকে হাতিম তাই বাদশার সঙ্গে তুলনা করেছে। তেমনি মুক্তহস্ত।

'আর একদিন আসব। আরো বেশি সময় থাকব।' বলে তিনি ওঠবার অনুমতি চাইলেন।

'রাজপুরুষকে বেঁধে রাখতে পারি সে ক্ষমতা কি আমার আছে?' মুস্তফীর কণ্ঠে হতাশা। 'কিন্তু অনাদির ছাত্র আজ আমার অতিথি, তার জন্যে আমি সান্ত্বাহারের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে টিফিন হ্যাম্পার অর্ডার দিয়ে রেখেছি, লোকও পাঠিয়েছি আনতে। আপনার—তোমার আরো কয়েকটা এনগেজমেণ্ট রয়েছে এ খবর আমি নিয়েছি কিন্তু আহারটা তো এক সময় এক জায়গায় করতে হবে। সেটা এইখানেই কোরো।'

সুরকুমার মনে মনে বিরক্ত হলেন। ভদ্রলোক দু'চারদিন আগে যথারীতি নিমন্ত্রণ করলেই পারতেন। কিন্তু অনাদিনাথের বাল্যবন্ধুর অনুরোধ প্রত্যাখান করা দুঃসাধ্য।

'টিফিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। বেশি কিছু খাইনে।' সুরকুমার বললেন। 'কিন্তু আপনি যখন তার আয়োজন করে ফেলেছেন তখন আর উপায় কী। পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।'

'হা হা।' মুস্তফী আহ্লাদে আটখানা হলেন। 'কী করে তুমি জানলে যে আমিও একজন মোগল। মোগল না হই মোগল আমলের রইস। তা ছাড়া এমন দিনও আমার গেছে যেদিন আমার টেবিলে খানা খেয়ে ইউরোপীয়ান প্ল্যাণ্টার সাহেব মেমরাও গৌরব বোধ করতেন। এদেশে আমাকে চেনে কে? আমার স্থান হচ্ছে মালয় দেশে। যেখানে আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটেছে।'

মালয় দেশ! এটা তো সুরকুমার জানতেন না। কৌতূহল জাগল। বললেন, 'আপনার ওই রিভলভারটি কি মালয় দেশে কেনা?'

'ঠিক ধরেছ। কী করে জানলে বল তো?' মুস্তফী আপ্যায়িত হয়ে বললেন, 'ওটা কিন্তু কেনা নয়। ওটা একজনের উপহার। জনসন বলে এক বিরাট বড়লোকের। হাঁ, আমার পেসেণ্ট। ও তল্লাটে গোরা ডাক্তার ছিল না সেকালে। থাকলেও কি পারত ওই দুর্দান্ত রোগ সারাতে? তা ছাড়া আমার কাছে গোপন করে কী হবে আমার চেহারাটা ছিল আমার পরিচয়পত্র। মেমসাহেবরা তাঁদের সাহেবদের অসুখেবিসুখে আমাকেই কল দিতেন। আমিও প্রাণপণে বিশ্বাসযোগ্য হতুম। চিকিৎসার গোড়ার কথা হলো বিশ্বাস। যে যাকে বিশ্বাস করে সে তাকেই ডাকে।'

'তা হলে এ রিভলভার আপনার স্মৃতিচিহ্ন? একে সারেণ্ডার করা উচিত নয়। আমরাও সীজ করব না, যদি নিয়মমতো রিনিউ করানো হয়। অলরাইট। রিনিউড ফর ওয়ান ইয়ার।' এই বলে সুরকুমার তাঁর সরকারী কাজটুকু শেষ করে দিলেন।

'থ্যাঙ্ক ইউ এভার সো মাচ।' মুস্তফী ভুললেন না যে বাঘের বাচ্চা।

'আচ্ছা, আবার আসব।' বলে সুরকুমার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

টিফিনের সময় মুস্তফী তাঁর মালয়-প্রবাসের কাহিনীর জের টানলেন। কেমন করে জাহাজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে মালয়ের প্ল্যানটেশনে গিয়ে পসার জমিয়ে বসেন। অমন যার প্র্যাকটিস তার কি ছুটি আছে? দেশে আসতে পারেন না, বিয়ে করতে পারেন না, অর্ধ ইউরোপীয় অর্ধ মালয়ী যান বনে। উভয় সমাজের উচ্চতম স্তরে তাঁর বিহার।

'তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর কোনোদিন দেখা হবে কি না জানিনে। মিথ্যা যদি বলে থাকি তো তার সংশোধন হাতে হাতে করাই ভালো! কে জানে কোন্‌দিন যাবার ঘণ্টা পড়ে। আর তুমিও তো বদলি হয়ে যেতে পারো।' বললেন ডাক্তার মুস্তফী।

'হাঁ, এ জেলায় আমি অস্থায়ীভাবে এসেছি। কিন্তু আপনি আরো অনেক দিন বাঁচবেন, ডাক্তার সাহেব।'

'ডাক্তার সাহেব' তা শুনে গলে গেলেন। 'কিন্তু যা বলছিলুম। মিথ্যার সংশোধন যদি না করি, তবে আমার মনে একটা কাঁটা থেকে যাবে। তুমি হয়তো ভাববে লোকটা খুব খারাপ। কিন্তু আমি তো শান্তিতে মরব।'

সুরকুমার বিস্মিত হলেন। ব্যাপার কী।

'শোন। তোমাকে তখন বলেছি আমার একমাত্র পুত্র শোলাপুরে কাজ করে। সংসারের চোখে একমাত্র পুত্র। ভগবানের চোখে নয়। আমার যে আরো একটি ছেলে ছিল। যতদূর জানি এখনো আছে। হাঁ, মালয় দেশে।'

'ওঃ।' সুরকুমার চমকে উঠলেন। কিন্তু খুব একটা আশ্চর্য হলেন না। শক পেলেন না। সহানুভূতি জানিয়ে আর একবার বললেন, 'ওও।'

'ছেলে হয়ে যদি মারা যায়, সে শোক ধীরে ধীরে সহ্য হয়। কিন্তু সে যদি বেঁচে থাকে অথচ তার সঙ্গে জীবনে আর কোনোদিন দেখা না হয়, তা হলে—তা হলে—' মুস্তফীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হলো, তাঁর চোখে জল এসে গেল।

'তা হলে সে দুঃখ সহ্য হয় না।' বলে পাদপূরণ করতে গেলেন সুরকুমার।

'তা হলে মরবার স্বাধীনতা থাকে না, মিস্টার আইচ।' আত্মসম্বরণ করে বাকীটুকু বললেন মুস্তফী।

'না। আমি মরবার স্বাধীনতা এখনো অর্জন করিনি। তার জন্যে যেতে হয় একটিবার ওদেশে। এমন কিছু অসাধ্য ব্যাপার নয়! পয়সা আছে, কিন্তু সাহস নেই। ওকে আসতে বললেও কি ও আসবে? কেন আসবে? ওর কি এদেশে কোনো মানসম্ভ্রম আছে? আমি ছাড়া আর কেউ কি ওকে অ্যাকসেপ্ট করবে?'

সুরকুমার মৌন থেকে সায় দিলেন।

'তবে আমার সান্ত্বনা এই যে, আমি ওদের পথে বসিয়ে আসিনি।' বলতে লাগলেন মুস্তফী। 'বিস্তর পণযৌতুক দিয়ে ওর মায়ের ভালো বিয়ে দিয়েছি। আর ওকে সঁপে দিয়েছি ইউরোপীয় মিশনারীদের হাতে। ওর নামে সম্পত্তি কিনে দিয়েছি। যাতে ও ভদ্রসমাজে মিশতে পারে সে ব্যবস্থাও যে না করেছি তা নয়। ওকে আইনত অ্যাডপ্ট করেছেন আমার এক পেসেণ্ট। ওদেশের খ্রীস্টান। তিনিই ওর সম্পত্তির ট্রাস্টী।'

সুরকুমার মনে মনে মাথা নাড়ছিলেন। এসব তিনি সমর্থন করেন না। মুস্তফীর কর্তব্য ছিল ছেলের মাকে বিয়ে করা। না করাটা কাপুরুষতা।

মুস্তফী সেটা আন্দাজ করেছিলেন। বললেন, 'মাঝখানের একটা অধ্যায় বাদ পড়ে গেছে।

সেটা শুনলে তুমি হয়তো ওরকম মুখ গোঁজ করে বসে থাকতে না।'

'দেশ থেকে চিঠি যায়, টেলিগ্রাম যায়। আমি ফিরিনে।' তিনি এগিয়ে গেলেন। 'শেষে একদিন দেখি মা আমার সশরীরে উপস্থিত। এই সেদিন যিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত বলে টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম। তাঁর সঙ্গে চোদ্দ পনেরো বছর বয়সের একটি বালিকা। তখনকার দিনে ঘোর অরক্ষণীয়া। এবং এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বালিকার পিতা। মা আমার নাছোড়বান্দা। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে না পারুন আমার বিয়ে না দিয়ে তিনি ফিরবেন না। কী করি! একই বাংলোয় সবাইকে নিয়ে বাস করতে পারিনে। ছেলেকে আর ছেলের মাকে না সরালে নয়। মালয়ের সমাজকে ও নিজের বিবেককে তুষ্ট না করে ও জিনিস করা যায় না। আগে ওদের সুব্যবস্থা করতে হয়, তারপর জননীর ইচ্ছা পূরণ।'

সুরকুমার লক্ষ করলেন যে, মুস্তফীর বিবেক তাঁকে একটুও শান্তি দিচ্ছিল না। তিনি ছটফট করছিলেন। কারী আর রাইস তাঁর মুখে উঠছিল না।

'বছরখানেক বাদে বুঝতে পারি যে, আমি যা করেছি, তার ফলে মা হয়ত সুখী, কিন্তু আর সবাই অসুখী। স্ত্রী চান না যে, আমি মালয় দেশে আর থাকি, থাকলে তিনি আমার চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন না। মাতৃত্বের সম্ভাবনায় তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি যেতে হচ্ছিল। সঙ্গে যাবে কে? আমি না গেলে তিনি মনে করবেন যে, আমি আমার পূর্ব জীবনের পুনরাবৃত্তি করব। চললুম আমি তাঁর সঙ্গে। কিন্তু বরাবরের মতো। বুঝতে পেরেছিলুম যে, মালয় দেশে আর আমার স্থান নেই।'

'কেন? আপনার অত ভালো প্র্যাকটিস।' সুরকুমার অবাক হলেন।

'প্র্যাকটিস তো ইউরোপীয় মহলেই বেশি লাভজনক। ও মহলে আমার নাম খারাপ হয়ে যায়, কারণ আমি অত্যাচারী স্বামী, বৌকে ক্লাবে নিয়ে যাইনে, বাড়িতে বন্ধুদের সামনে বেরোতে দিইনে; অথচ নিজে পরের বৌদের সঙ্গে মিশতে যাই।' মুস্তফী বললেন ম্লান মুখে। 'মোট কথা, আমাকে বিশ্বাস নেই। আমাকে বিশ্বাস করে কল দেওয়া যায় না।'

সুরকুমার বিচলিত হলেন। 'হাউ আনফরচুনেট!'

মুস্তফী তাঁকে আর একটু কারী নিতে সাধাসাধি করলেন। তার পর বললেন, 'পরে আমি ভেবে দেখেছি যে দেশে ফিরে নতুন করে প্র্যাকটিস জমাতে হলে যত আগে ফেরা যায় তত ভালো। এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। যেখানেই বসি লোকে ভাবে আমি জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছি। আমার ডাক্তার প্রতিযোগীরাই প্রচার করেন যে মালয়ের জঙ্গলে গিয়ে আমি ডাক্তারি ভুলে গেছি। স্বাধীন বৃত্তির স্বপ্ন মুলতুবী রেখে চাকরির জন্যে উমেদারি করতে হলো। চাকরি শেষকালে জুটল মধ্যভারতের এক দেশীয় রাজ্যে।'

সুরকুমার রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলেন। হাঁপ ছেড়ে বললেন, 'বাঁচা গেল।'

'যা বলেছ। মরুভূমির উটের পক্ষে রতনগড় যেন একটা ওয়েসিস। হলোই বা রেল স্টেশন থেকে সত্তর মাইল দূরে। চাকরি বলতে রাজবাড়িতে দু'বেলা হাজিরা দেওয়া। সন্ধ্যাবেলা মহারাজার ডামি হয়ে ব্রিজ খেলা। তাঁকে জিতিয়ে দেওয়া। তাঁর খরচে মদ খাওয়া। মদ আমার জীবনে নতুন কিছু নয়। কিন্তু নিখরচায় খাওয়া এই প্রথম। আগেকার দিনে খেতুম সামাজিকতার খাতিরে। এবার খেতে লাগলুম জীবনের ব্যর্থতা ভুলতে। রাত করে বাড়ি ফিরতুম, প্রায়ই মহারাজার টেবিলে খানা খেয়ে। স্ত্রী রাগ করতেন। তাঁর আশঙ্কা আমি হয়তো রাজকীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোনো এক রাজনর্তকীর মোহে মজব। ভদ্রমহিলাকে আমি কেমন করে বোঝাব যে আমি নাকের বদলে নরুন পেয়েছি।'

।। তিন ।।

'নাকের বদলে নরুন।' সুরকুমার বিমূঢ় হয়ে বললেন, 'তার মানে!'

'নাকের বদলে নরুন পেলুম, তাক ডুমা ডুম ডুম।' মুস্তফী ঢোলের বদলে টেবিল পিটিয়ে সুর করে বললেন, 'মক্ষনের বদলে হাঁড়ি পেলুম তাক ডুমা ডুম ডুম। কিন্তু সে কথা পরে। মানে জানতে চাও? মানে খুব সোজা।'

সুরকুমারকে আগ্রহান্বিত করে মুস্তফী ধীরে ধীরে সুতো ছাড়লেন।

'যৌবনে আমি ভগবানকে ডেকে বলতুম, প্রভু এখন নয়। এখন তোমাকে আমি স্মরণ করতে পারব না। তোমার জন্যে ত্যাগ করতে পারব না। ভোগশক্তি যতদিন আছে ততদিন আমি প্রাণভরে ভোগ করব। আমাকে ভোগ করতে দাও। যৌবন তো ভোগের জন্যেই। দাও, দাও আমাকে ভোগবতীর বন্যায় ভাসতে। ক'টাই বা দিন! দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। আর সকলের মতো আমিও বুড়ো হব। তখন ধার্মিক হব। ত্যাগী হব। তোমাকে দিনরাত স্মরণ করব। ততদিন অপেক্ষা কর।' মুস্তফী থামলেন।

'তার পর?' সুরকুমারের আগ্রহ বাড়ছিল।

'ভগবান ধৈর্য ধরলেন। তার পর আমাকে এমন এক পরিস্থিতিতে ফেললেন যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নারীত্যাগ করতে হলো। হাঁ, নারীত্যাগ। নারীকে আমি বরাবরের মতো বিসর্জন দিয়ে আসি গঙ্গোপসাগরের ওপারে। বিয়ে করে যাকে পাই তার নাম নারী নয়, সতীসাধ্বী সহধর্মিণী। স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী হব না বলেই শ্যাম্পেনের মধ্যে খুঁজি বিকল্প। সুরাই হয় আমার নারী। ভদ্রমহিলা রজ্জুতে সর্প ভ্রম করেছিলেন। তার দোষ কী! রাজরাজড়ার যারা ইয়ার তারা কি শুধু মদ খেয়েই নিবৃত্ত হয়?' মুস্তফী মাথা নাড়লেন।

'তার পর?' সুরকুমারের আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

'ওদিকে কতক লোক আমার শত্রু হয়েছিল। ওদের ধারণা মহারাজা আমার কথায় ওঠেন বসেন, রাজ্য চালান। আমি যদি ওদের হয়ে দুটি কথা বলি তা হলে কি ওদের উন্নতি বা প্রাপ্তি হয় না? আমি কিন্তু আমার সীমানার বাইরে যাইনে। দেওয়ান সাহেবের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিনে। মহারাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পরামর্শ চাইলে আমি কৌশলে এড়িয়ে যাই। যে মানুষ সাতেও নেই পাঁচেও নেই তারও শত্রু জোটে। কেমন করে জানব যে এরকম হবে! রাজ অন্তঃপুরে এক রানী আত্মহত্যা করেন। বিষপানে আত্মহত্যা। আমি সেই মর্মে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিই। কিন্তু কুচক্রীরা পলিটিকাল এজেন্টকে বেনামী চিঠি লিখে হুকুম আনায় যে ইন্দোর থেকে ডাক্তার এসে একমত না হওয়া পর্যন্ত শবদাহ হবে না। ফাউল প্লে বলে সন্দেহ হয়।' মুস্তফী লজ্জায় ক্রোধে কম্পমান।

'হোয়াট এ শেম!' সুরকুমার দুই হাত একত্র করে টেবিল ভর দিয়ে বসলেন।

'ইন্দোরের ডাক্তার এসে সব দেখে শুনে আমার সঙ্গে একমত হলেন ঠিকই। কিন্তু বাজারে রটে গেল তিনি এক লাখ টাকা ফী নিয়েছেন, যেমন আমি নিয়েছি দশ হাজার। ঘৃণায় আমি প্যালেসে যাওয়া ছেড়ে দিই। মহারাজাকে বলি আমি স্টেট মেডিকাল অফিসার হিসাবে থাকতে রাজী কিন্তু প্যালেস ফিজিসিয়ান হিসাবে থাকতে নারাজ। একই ব্যক্তিকে দিয়ে দুই কাজ চলবে না। মহারাজ চটে যান। নিমকহারাম বলে আমাকে অপমান করেন। বলতে পারতেন সরাবহারাম।

ভগবান আমাকে এমন এক পরিস্থিতিতে ফেললেন যে দামী দামী বিলিতী সরাবের মায়া আমাকে কাটাতেই হলো। ছাড়লুম যখন একেবারেই ছাড়লুম। নিজের খরচেও খাব না। নেহাৎ যদি অসুখে বিসুখে পড়ি তো এক আধ ফোঁটা ব্রাণ্ডি খেতে পারি। ভালো কথা, তোমাকে ড্রিঙ্ক অফার করা হয়নি। ভাইনাম গ্যালিসিয়াই বাড়িতে আছে। তোমার চলবে?' মুস্তফী তার খানসামাকে ইশারা করলেন।

'নো, থ্যাঙ্ক ইউ।' সুরকুমার মাফ চাইলেন।

'তা হলে থাক।' খানসামাকে ইশারায় বারণ করলেন গৃহস্বামী।

সুরকুমারের জরুরি কাজ ছিল। তিনি উঠি উঠি করছিলেন। অথচ গল্পটার শেষ না শুনে উঠতে পারছিলেন না। খানা টেবিল ছেড়ে ওরা সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন।

'মহারাজা আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু উপায় ছিল না। শত্রুবেষ্টিত হয়ে বাস করার চেয়ে পথের ভিখিরি হয়েও শান্তি। স্ত্রী বললেন, একদিন না একদিন একটা না একটা কারণে মহারাজের অনুগ্রহ হারাতেই। বড়োর পীরিতি বালির বাঁধ। তখন তো হাতে দড়ি পড়ত। তার চেয়ে মানে মানে চলে যাওয়া ভালো। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি। স্থির করি আর আমি চাকরি করব না। কিন্তু নতুন করে প্র্যাকটিসে নামা তো চারটিখানি কথা নয়। বড়ো বড়ো শহরের মোহ কাটাতে হলো। হাজার হাজার টাকা কামাবার প্রলোভন দমন করতে হলো। আত্মীয় বন্ধুদের পরামর্শে একটা ডাক্তারি দোকান খুলে বসি মহকুমা শহর নওগাঁয়। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাও করি। নওগাঁ তখন পাট আর গাঁজার দৌলতে ফেঁপে উঠছে। ডাক্তার যে ক'জন ছিলেন সকলেরই পৌষ মাস। আমি কারো প্রতিযোগী নই। আমার কল আমি অপরকে পাঠিয়ে দিই। দোকানের থেকে কমিশন তো দস্তুরমতো দিইই।'

সুরকুমার উঠতে চান এটা বিনা বাক্যে বুঝিয়ে দিলেন। তখন ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তোমাকে ডিটেন করা হচ্ছে। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করাই সঙ্গত।' এই বলে তিনি সিগার অফার করলেন। সুরকুমার নিলেন না, ধন্যবাদ জানালেন।

'শোন তা হলে বাকীটা। সেই যে বলে, নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম, তাক ডুমা ডুম ডুম। তার মানে কিন্তু মদের বদলে হাঁড়িয়া নয়। আমি জানতুম যে নিরালম্ব ত্যাগ আমার স্বভাবে নেই। কিছু একটা ছাড়ি তো কিছু একটা ধরি। অবলম্বন না পেলে আমার দশা হয় ত্রিশঙ্কুর মতো। নারীর বিকল্প সুরা। সুরার বিকল্প কী?' তিনি ধাঁধার মতো প্রশ্ন করলেন। উত্তর দিলেন নিজেই। 'তুমি বলতে পারলে না। কী করে বলবে! জীবনের কতটুকুন আর দেখেছ! কিন্তু কাজ নেই দেখে। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা আমার জীবনের উপর দিয়েই যাক।'

সুরকুমার তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হলেন। বললেন, 'আমি ওসব এড়াতে চাই।'

'তোমার অনুমানশক্তি কিন্তু প্রখর নয়। বললেই পারতে, গাঁজা। নওগাঁয় থাকি যখন তখন মদের বদলে আর কী ধরতে পারি!' সুরকুমারকে হতভম্ব দেখে তিনি হাসলেন। 'কী! পছন্দ হলো না? কোকেন বললে পছন্দ হতো? তা হলে শোন খুলে বলি। বরাবরই আমার ধর্মের প্রতি টান। সাধুসন্ন্যাসী দেখলে ইচ্ছে করে কিছু আদায় করে নিতে। ওষুধপত্র নয়, মন্ত্রতন্ত্র। সাহেবদের সঙ্গে না মিশলে যেমন কিছু আদায় করতে পারা যায় না তেমনি সাধুদের সঙ্গে। সাহেবদের সঙ্গে মিশতে হলে যেমন ডাইনিং আর ওয়াইনিং সাধুদের সঙ্গে তেমনি গাঁজা স্মোকিং। সাধুসমাজে কল্কে পাওয়া কি মুখের কথা! উঁচুদরের কল্কেদার হওয়া চাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাতের পর রাত ছিলিম সাজতে আর ফুঁকতে হয়। দম ধরে রাখতে হয়, সে সব যদি করতে যাই তো আমার প্র্যাকটিস মাথায় ওঠে, আমার দোকানদারিও ভোঁ হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বরহস্য ভেদ করতে শিখি।

ত্রিনাথমেলায় বসে ত্রিভুবনের নাড়ীনক্ষত্র চিনি। তৃতীয় নয়ন ফোটে। দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ না হলে যেমন বিজ্ঞান হয় না তেমনি তৃতীয় নয়ন না হলে ধর্মসাধন। ভোগ থেকে যদি যোগে উত্তীর্ণ হতে হয় তবে সাধুরা যে পথ দিয়ে যান স এব পন্থাঃ। সে পথে যারা চলে তাদের আর নারীতে প্রয়োজন থাকে না। তৃষ্ণা আপনি ফুরিয়ে আসে।'

লোকটা গোল্লায় গেছে। সুরকুমার মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেন। 'এই তা হলে শেষ?'

'না, এই শেষ নয়।' মুস্তফী বলতে লাগলেন, 'আমার দোকান বিক্রি হয়ে যায়। সাধুসেবায় অবশ্য। প্র্যাকটিস খতম হয়। সাধুতার জন্যেই। তখন আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি। নতুন করে জীবন আরম্ভ করি। পৈত্রিক জমিজমা দেখাশুনার অভাবে বরবাদ হচ্ছিল। দেখাশুনার ভার নিই। গাঁজা একদম ছেড়ে দিই। এর পর আবার খুঁজতে হয় অবলম্বন। গঞ্জিকার বিকল্প কী?'

সুরকুমার মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বলে ফেললেন, 'পঞ্জিকা।'

'হলো না। হলো না।' মুস্তফী ইস্কুল-মাস্টারি করলেন। 'অহিফেন।'

এর পর সুরকুমার গা তুললেন। আর শুনতে ভালো লাগে না একটি সজ্জনের ক্রমিক পতনের কাহিনী। এর পরে হয়তো শুনবেন চরস কি চণ্ডু।

'চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' বক্তা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রোতা বিরক্ত। 'ভোগশক্তি যতদিন ছিল ততদিন তাঁকে আমি স্মরণ করিনি। এখন এলো ভোগ বিরতি ভগবানে মতি। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করি, সাত্ত্বিক আহার করি, কিন্তু ওই যে আমার স্বভাব। নেশা ছাড়তে পারিনে। ধর্মের নেশা ও আফিঙের নেশা প্রায় একই রকম। একটা অপরটাকে জাগায়।' বলে মুস্তফী থামলেন।

আমাদের সেই অবসরে অতিথি উঠে দাঁড়ালেন।

'হাঁড়ির বদলে ঢাক পেলুম, তাক ডুমা ডুম ডুম। কিন্তু স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারলুম না। তিনি নওগাঁকেই মনে করতেন বনবাস। হাতীক্ষ্যাপায় দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। শোলাপুরে নাতি নাতনিকে দেখতে সেই যে চললেন আর ফেরবার নাম করলেন না। তখন আমার আফিমের নেশা কেটে গেল।'

সুরকুমার চলতে চলতে বললেন, 'এই তো চাই কিন্তু আবার এক নতুন নেশা না জোটে।'

'আমার জীবনদেবতা,' মুস্তফী বললেন প্রত্যয়ভরে, 'আমার সব চেয়ে বড়ো নেশাটা কেড়ে নিয়ে তার বদলে ধরালেন তার চেয়ে কম-বড়ো নেশা। তার পর সেটাকেও ছিনিয়ে নিলেন, তার বদলে ধরালেন তার চেয়ে আরো কম-বড়ো নেশা। তার পর সে নেশাও ছাড়িয়ে তার বদলে ধরালেন তার চেয়ে আরেকটু কম-বড়ো নেশা। সেটাও ছাড়ালেন। তার পরে কী ধরালেন শুনবে? চা। নিশ্চয় তার চেয়ে কিছু কম-বড়ো নেশা। চা আমি দিনে রাতে চব্বিশ পেয়ালা খাই। রাশিয়ান চা, চাইনীজ চা, জাপানি চা, বকমারি চা। ঢাকের বদলে টোপর পেলুম, তাক ডুমা ডুম ডুম।'

একটু আগে সুরকুমারের মনে হচ্ছিল যে, মুস্তফী ক্রমেই নেমে যাচ্ছেন। এবার কিন্তু মনে হলো যে একদিক থেকে যা নেমে যাওয়া আরেকদিক থেকে তা-ই উপরে ওঠা। যথারীতি ধন্যবাদ জানিয়ে, শুভ কামনা জানিয়ে বিদায়ের জন্যে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'এর পরে কী?' ঝাঁকানি দিতে দিতে বললেন ডাক্তার মুস্তফী। দেখা গেল তিনি হাত ছেড়ে দেবেন না, যতক্ষণ না তাঁর প্রশ্নের উত্তর পান। 'চায়ের পরিবর্তে কী ধরব? কী অবলম্বন করে এ জীবন সারা হবে? জীবনে আর কতদূর যাব? কী পেলে শেষের কলিটি গাইতে পারব, টোপরের বদলে বৌ পেলুম, তাক ডুমা ডুম ডুম।'

'যাকে ধরলে আর ছাড়বার কথা ওঠে না, যার পরতর নেই, তার নাম কী, এই যদি হয়

আপনার জিজ্ঞাসা', সুরকুমার গম্ভীরভাবে বললেন হাসি চেপে, 'তবে এর দুটি উত্তর। একটি হচ্ছে ভারতীয় বিজ্ঞতার শেষ কথা। ব্রহ্ম।'

'আর একটি?' তর সইছিল না মুস্তফীর।

'আর একটি?' সুরকুমার বললেন হাতীর পিঠে চেপে, 'আর একটি হলো বঙ্গীয় বিজ্ঞতার শেষ কথা। বৌ।'

(১৯৬৪)

ডুমুরের ফুল

পশ্চিম দিগন্ত থেকে উত্তর আকাশ দিয়ে স্যাটেলাইট যাচ্ছে। বাগানে বসে নিরীক্ষণ করছেন বড়াল দম্পতি। চারিদিক নিঃঝুম। পাড়াটি জনবিরল।

বাড়ির বাতিগুলো নেবানো। দরজাগুলো খোলা। হঠাৎ পিছন দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠলেন গৃহিণী। ও কে? আপাদমস্তক শাদা আবরণে ঢাকা দীঘল সবল মূর্তি। ও কি ঘরের ভিতর দিয়ে বারান্দায় হাজির হয়েছে? না স্যাটেলাইট থেকে নেমেছে? না ওটি একটি অশরীরী আবির্ভাব?

'আসুন', বলে আহ্বান জানিয়ে কর্তা গেলেন আগন্তুকের দিকে এগিয়ে। সাহসের চেয়ে নার্ভাস ভাবটাই প্রবল।

'আছো তা হলে?' সাড়া দিলেন আগন্তুক।

খানিক পরে শোনা গেল দুই বন্ধু হো হো করে হাসছেন। এক বন্ধু বলছেন আরেক বন্ধুকে, 'এই যে! ডুমুরের ফুল। কবে ও কোনখান থেকে?'

কোলাকুলি করতে করতে উত্তর দিলেন অপর বন্ধু, 'কাল ও বৃন্দাবন থেকে।' তারপর আরো বললেন, 'বাড়িতে কেউ নেই ভেবে ফিরে যাচ্ছিলুম। কিন্তু দোর জানালা খোলা দেখে মনে হলো লাইট ফেল করেছে।'

আলো জ্বালানোর পর শিপ্রা এসে যোগ দিলেন। দেখলেন আপাদমস্তক শাদা আবরণ নয়, বৈষ্ণব মহাজনদের মতো বগলবন্দ ও ধুতি। বললেন, 'ওঃ! আপনি! আসুন, বসুন। অনেকদিন বাদে এলেন। কেমন? ভালো আছেন তো?'

'যেমন দেখছেন।' আসন নিলেন কপোতাক্ষ। বললেন, 'তারপর আপনাদের খবর কী, বলুন। রাজেন আজকাল কী লিখছে?'

এর উত্তর দিলেন রাজেন নিজে। 'তুমি জাহাজের ব্যাপারী। তোমার আদার খবরে কাজ কী?'

'ছি! অমন কথা বলতে নেই। শুনলে অপরাধ হয়।' কপোতাক্ষ হাত জোড় করলেন।

'চা না কফি?' জানতে চাইলেন গৃহিণী।

'কেন কষ্ট করবেন?' অতিথির আগ্রহ ছিল না। 'ইতিমধ্যে দু'তিন ক্ষেপ খাওয়া হয়েছে।'

'তা হলে,' কর্তা চেপে ধরলেন, 'রাতের খাওয়াটা আমাদের সঙ্গেই হোক।'

অতিথির উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে গৃহিণী বললেন, 'আমি চললুম রান্নাঘরে। আপনি রুটি খান নিশ্চয়। আর সব কুলিয়ে যাবে।'

কপোতাক্ষ 'না' 'না' করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তা হলে

রিকশাওয়ালাকে দিয়ে খগেনকে খবর দিতে হয়। ওরা যেন আমার জন্যে খাবার না রাখে।'

সে ভার রাজেন নিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এসে বললেন, 'ও নিজে খাওয়াদাওয়া সেরে তোমাকে নিয়ে যেতে আসবে।'

'তোমার সঙ্গে' কপোতাক্ষ এবার জমিয়ে বসলেন, 'শেষবার দেখা হয়েছিল কলকাতায় তিন বছর আগে। কথা বলার সুযোগ মিলেছিল তিন মিনিট। ইচ্ছে ছিল তোমাকে একটু আড়ালে পাই। অত লোকের মাঝখানে কী বা বলতে পারি।'

'হাঁ, নিউ এম্পায়ারের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা শুধু হাতে হাত রাখতেই পারি। মন খুলে কথা বলার অবকাশ কোথায়?' রাজেন বললেন স্মরণ করে। কপোতাক্ষের সঙ্গে আরো কয়েকজন বন্ধু ছিলেন।

ভিতরে গরম বোধ হচ্ছিল বলে আবার সবাই মিলে বাগানে গিয়ে বসা গেল। কিন্তু শিপ্রা বার বার উঠে যেতে লাগলেন রান্নাঘরে ঠাকুরকে এটা ওটা বলতে।

আকাশের দিকে চেয়ে কপোতাক্ষ বললেন, 'মানুষ কী না পারে! মানুষের তৈরি স্যাটেলাইট এখন তারাদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। এ বলে, আমায় দ্যাখ। ও বলে, আমায় দ্যাখ। একদিন ওরা চন্দ্রলোকে পৌঁছে যাবে ঠিক।'

'যদি পৃথিবী ততদিন আস্ত থাকে।' হেসে বললেন রাজেন। কিন্তু সে অতি দুঃখের হাসি। এই তো সেদিন কিউবা নিয়ে যুদ্ধ বাধি বাধি হয়েছিল।

'মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রাখতে হবে, রাজেন। সেটা আজকের দিনে শক্ত যদিও।' কপোতাক্ষ বলতে লাগলেন, 'সব মানুষের ভিতরে একই মানুষ রয়েছেন। তিনিই সবাইকে শুভবুদ্ধি দেন। নইলে এ পৃথিবী কবে ধ্বংস হয়ে যেত। একে ধ্বংস করার জন্যে পরমাণু বোমা আবশ্যক হয় না, রাজেন। যদুবংশ ধ্বংস হলো কী দিয়ে?'

রাজেন সান্ত্বনা পেলেন না। 'যদুবংশ ধ্বংস হলো, স্বয়ং ভগবান কিছু করতে পারলেন না। এর পরে কে বলবে যে তিনি ভিতর থেকে শুভবুদ্ধি দেন। মানুষ, মানুষ, মানুষই সব। মানুষ যখন ঠেকে শিখবে যে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে তখন আগুনে হাত দেবে না। মানুষকে যদি কেউ বাঁচায় তবে সে তার প্র্যাকটিকাল অভিজ্ঞতা। পরের জন্যে যারা পরমাণুর বোমা বানিয়ে রেখেছে তাদের নিজেদের মাথার উপর দুটো একটা না পড়লে তাদের বুদ্ধি খুলবে না। যেমন খুলে গেছে জাপানীদের বুদ্ধি।'

এর পরে দীর্ঘ বিরতি। আকাশ দিয়ে আর স্যাটেলাইট যাচ্ছে না। তারার সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির।

কতকটা স্বগতভাবে বলতে শুরু করলেন কপোতাক্ষ। ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে তারাদের দিকে তাকিয়ে, 'তুমি তখন আমাকে ডুমুরের ফুল বললে, রাজেন। জানো তো, ইংরেজীতেও 'ফুল' কথাটা আছে। বলতে পারতে 'ফুল অফ গড'। অবশ্য অত বড়ো সম্মানের যোগ্য আমি নই।'

রাজেন এবার নীরব শ্রোতা। শুনে যেতে লাগলেন।

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে তুমি একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, মনে আছে? মানুষ বিপন্ন, দেশ বিপন্ন, এ পরিস্থিতিতে আমার কি কোনো কর্তব্য নেই? আমি থাকি আলমোড়ার চেয়েও দূরে, আরো দুর্গম পাহাড়ে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় এসেছি। তুমিও তখন কলকাতায়। তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলুম, আমি উদাসী বৈরাগী মানুষ। গোপালের শরণ নিয়ে তাঁরই চরণে পড়ে আছি। তাঁর সেবা করি, তাঁকে ভজন শোনাই, তাঁর প্রসাদ পাই ও বিলিয়ে দিই। এই আমার কর্তব্য। যুদ্ধ বেধেছে বলে কি আমি আমার স্বধর্ম ছাড়তে পারি।'

'মনে আছে।' রাজেন বললেন স্মরণ করে।

'আমি শুধু গোপালকে আকুলভাবে জানাতে পারি যে তুমি মানুষকে শুভবুদ্ধি দাও, মানুষ মানুষকে বাঁচাক। তুমি তো সকল মানুষেরই অন্তরে রয়েছ। অবশ্য গোপালকে জানাবার দরকার করে না। ও জানে সব। তবু না জানিয়ে পারিনে। ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে থাকে প্রার্থনা। হে ঠাকুর, মানুষকে মানুষ কর। সে যে আবার বনমানুষ হতে চলল। হাজার হাজার বছরের, লাখ লাখ বছরের বিবর্তন কি ব্যর্থ হলো?'

কপোতাক্ষ আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'গোপালের ইচ্ছার উপরে আমার ইচ্ছা খাটবে, এ কি কখনো হতে পারে? আমাদের প্রার্থনা অনেক সময় খোদার উপর খোদকারি। প্রার্থনা করেছি, যেভাবে করেছি ঠিকই করেছি। না করলে আমার আফসোস থেকে যেত যে মানুষের দুর্দিনে তার জন্যে আমি কিছুই করিনি। কিন্তু প্রার্থনা করেছি বলে আমি দাবী করতে পারিনে যে আমার প্রার্থনা পূরণ করাই তাঁর কাজ। জগতের জন্যে যিনি দায়ী তাঁর সৃষ্টি যদি তিনি নতুন করে গড়বেন বলে ধ্বংস করতে চান আমি বলবার কে? আমি কে যে তাঁর হাতেপায়ে ধরে তাঁকে থামাতে যাব? আমি সেবকমাত্র। আমি সেবা করেই খালাস।'

রাজেন এবার কণ্ঠক্ষেপ করলেন। 'এইখানেই আমার আপত্তি। এ জগৎটা আমারও জগৎ। ভগবানের ইচ্ছার উপরে একে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। আমাকেও ইচ্ছা দেওয়া হয়েছে, চিন্তা দেওয়া হয়েছে। সেবা করেই আমি খালাস হই কী করে?'

এর পর আহারের ডাক পড়ল।

'আপনি এখানে আছেন কদ্দিন?' প্রশ্ন করলেন শিপ্রা দেবী।

'আমার কি কোথাও তেরাত্রির বেশি থাকবার জো আছে?' উত্তর দিলেন কপোতাক্ষ। 'পরশু সকালে ফিরে যাচ্ছি।'

এখন আর তিনি আলমোড়ার ওদিকে থাকেন না। চৈনিক আক্রমণের আশঙ্কায় পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন সমতলে। বৃন্দাবনেই তার আস্তানা। সেখান থেকে তিনি বেরিয়েছেন পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে।

'পরিবার!' আশ্চর্য হলেন শিপ্রা। 'পরিবার আছে আপনার!'

'জানতেন না বুঝি? পরিবার তো আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করিনি কোনোদিন। আমার দীক্ষা সন্ন্যাস দীক্ষা নয়। সন্ন্যাসীর কাছে আমি দীক্ষা নিইনি। এমন কি পুরুষের কাছেও না। যাকে আমি মা বলতুম তিনি আমাকে ভিতরের সন্ধান দেন। তারপর থেকে আমি ভিতরে যাবার দুয়ার খুঁজছি। বৈরাগ্যসাধন করে দেখলুম তাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো না। উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়টাই বড়ো হয়ে উঠল। এখন আর আমি বৈরাগী নই। তা বলে গৃহীও নই। বৃন্দাবনে বাস করি। বৃন্দাবনের আরেক নাম ব্রজ। সে বলে, ব্রজ, ব্রজ, ব্রজ। চল, চল, চল। আমি যখন খুশি চলি। যখন খুশি থামি। পরিবারকে সঙ্গে পেলে ওদের নিয়েই চলতুম ও থামতুম। কিন্তু ওঁদের তাতে অসুবিধে। মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিন্তু বেশিদিনের জন্যে নয়।' কপোতাক্ষ বললেন খেতে খেতে।

'এটা কিন্তু আপনার অন্যায়।' শিপ্রা অনুযোগ করলেন। 'পরিবারেরও একটা অধিকার আছে। এর চেয়ে বিয়ে না করাই ছিল ভালো। কেন করতে গেলেন?'

'তখন আমার বয়স কম। বিয়ে দেন আমার গুরুজন।' কপোতাক্ষ কৈফিয়ৎ দিলেন। 'জেনেশুনে কোনো অন্যায় করিনি। করতুম, যদি সব সম্পর্ক কাটিয়ে দিয়ে ডোর কৌপীন ধারণ করতুম। গৈরিক পরিধানের কথা যে কখনো মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু অন্যের পক্ষে যাই হোক না কেন আমার পক্ষে ওটা হতো কপটাচার।'

তা শুনে শিপ্রা যে বিশেষ সন্তোষ বোধ করলেন তা নয়। রাজেন হেসে বললেন, 'ও মাংস ছেড়ে দেয়নি, তবে নিরামিশ খায়।'

গৃহিণীর মুখ বঙ্কিম। লক্ষ করে কর্তা বলে উঠলেন, 'ওর আশা আছে। ও ক্রমে ক্রমে সংসারে ফিরে আসছে। আলমোড়া থেকে বৃন্দাবন এটা যখন সম্ভব হয়েছে তখন বৃন্দাবন থেকে শ্রীরামপুর এটাও সম্ভব হবে।'

লোকটি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হলে শিপ্রা তাকে মেনে নিতেন, এতদিন তাই করেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীও নয়, গৃহীও নয়, সুবিধাবাদী। এমন মানুষকে তিনি গুরুত্ব দেন না। আহারের পর তিনি মাথা ধরেছে বলে মাফ চেয়ে সকাল সকাল শয্যায় গেলেন। ওদিকে রিকশারও পাত্তা নেই। রাজেন তার বন্ধুকে নিয়ে আবার আকাশের তলায় বসলেন।

॥ দুই ॥

জীবনটা নিজের সন্ধানে কাটিয়ে দিলে, কাবুল, তা তো খুলে বললে না।' রাজেনকে জিজ্ঞাসু বোধ হলো।

'কী করে তোমাকে দু'কথায় বোঝাই?' কপোতাক্ষ আত্মস্থ হলেন। 'তোমার কি বিশ্বাস হবে? আমার মতো সাকসেসফুল কে? কলেজে আমি তোমাদের ছাড়িয়ে গেছি। জীবিকাতেও ছাড়িয়ে যেতুম। কিন্তু একদিন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায়, আমি ভুলতে পারিনে। স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন এক রাজপুত্র, কিন্তু রাজপুরীতে প্রবেশ করতে গিয়ে কোথাও কোনো প্রবেশদ্বার খুঁজে পাচ্ছিনে। ভিতরে যারা আছে তারা উৎসব করছে, আমি যদিও এদের একজন তবু তাদের সঙ্গে মিলতে গিয়ে মিলতে পারছিনে। বাইরের লোকের মতো আমিও উকিঝুকি মারছি আর গানের রেশ শুনছি। এদের একজন নই, তবু আমি এদেরি মতো একজন বাইরের লোক। তখন থেকেই আমার ভাবনা, আমি কি আউটসাইডার না ইনসাইডার?

'আশ্চর্য! ওকথা আমার কখনো মনে হয়নি।' রাজেন বিস্মিত হয়ে বললেন।

পরে এমন হলো যে বাস্তবটাকেই মনে হতে লাগল সেই স্বপ্নের রাজপুরী, যার ভিতরে আমার প্রবেশ নেই। আর সকলের মতো আমিও খাই দাই, কাজ করি, খেলি। আর সকলের মতো পড়ি শুনি, তর্ক করি, ভাবি। কিন্তু আউটসাইডার। ইনসাইডার নই।' কপোতাক্ষ বলতে লাগলেন।

'বল, বল, আমি শুনছি।' রাজেন উসকে দিলেন।

'আমি উন্নতি করতে পারি, বড়লোক হতে পারি মান্যগণ্য হতে পারি,' কপোতাক্ষ বলে চললেন, 'কিন্তু ইনসাইডার হতে পারিনে। যদি না রাজপুরীতে প্রবেশ করতে পাই। আর সকলের মতো আমার সামনেও রাজপথ খোলা পড়ে আছে, সে পথ দিয়ে আমিও চলেছি। ওরা চলেছে পায়ে হেঁটে বা গোরুর গাড়ীতে চড়ে। আমি চলেছি ঘোড়ার গাড়ীতে বা মোটরগাড়ীতে চেপে। কিন্তু রাজপথের একদিকে যে রাজপুরীর দেয়াল খাড়া রয়েছে তার চারদিকে পরিক্রমা করেও আমি দুয়ার খুঁজে পাইনে। ওদের মতো আমিও বাইরের লোক। সারাজীবন যদি চক্কর দিই তা হলেও আমি ভিতরের লোক হব না। হলে হব উঁচুদরের বাইরের লোক। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটলেও আমি রাজপুরীর প্রাচীর ভেদ করতে পারব না। গতি বা প্রগতি এখানে বৃথা।'

সমঝদার শ্রোতা পেয়ে কপোতাক্ষ প্রাণ খুলে বলতে লাগলেন।

'এর পরে আমার ধারণা জন্মায় যে গতানুগতিক জীবনধারা যদি না বদলায় তবে আমি বাইরের লোকরূপে বাইরেই ঘুরতে থাকব। ভিতরে কোনোদিন প্রবেশ পাব না। জীবনে গতানুগতিক সুখদুঃখ জুটবে, কিন্তু রাজপুত্র হয়েও রাজপুরীর অভ্যন্তরে যাবার সৌভাগ্য ঘটবে না। জীবনধারা বদলানোর কথা যতই ভাবি ততই বুঝতে পারি আমাকে গান্ধীজীর পরিচালনায় গণসত্যাগ্রহে ঝাঁপ দিতে হবে। পুলিসের লাঠির গুঁতো খেতে হবে। জেলে যেতে হবে। কে জানে হয়তো অনশনে মৃত্যু বরণ করতে হবে। রাজপুরীর দুয়ার হয়তো বীরের মতো মরণ। হয়তো কারাগারের প্রাচীরই রাজপুরীর প্রাচীর। লৌহকপাট দিয়ে আমার প্রবেশপথ।'

'তোমার তো জেল হয়েছিল শুনেছি।' রাজেনের মনে ছিল।

'হয়েছিল বইকি।' কপোতাক্ষ বললেন, 'গতানুগতিক জীবনধারা ছেড়ে প্রথমটা আমি বেশ একটা নূতনত্ব বোধ করেছিলুম। মাস ছয়েক পরে দেখি সেটাও গতানুগতিক হয়ে উঠেছে। তখন সেই যে লৌহকপাট সেটাকে আর রাজপুরীর প্রবেশপথ মনে হলো না। আমার সত্যাগ্রহী বন্ধুদের মতো আমিও রাজপুরীর বাইরের লোক, যদিও কারাগারের ভিতরের লোক। যার জন্যে জেলে যাওয়া সে উদ্দেশ্য সাধিত হলো না। ফিরে এসে সম্বধনা পেলুম। কিন্তু আমার তাতে আনন্দ ছিল না। একটা বছর একটু চেঞ্জ হলো। এই যা।'

'কেউ কেউ তো জেলে গিয়ে নতুন মানুষ বনে গেছেন বলে জনরব। তুমি কি চেঞ্জ বলতে তেমনি কিছু বোঝাতে চাইছ?' রাজেন উৎসুক হলেন।

'না, ভাই। আমি নতুন মানুষ বনে যাইনি। আমি বনতে চেয়েছিলুম ভিতরের লোক। রয়ে গেলুম বাইরের লোক।' কপোতাক্ষ বললেন, 'তোমার নতুন মানুষরাও তাই।'

এর পর দু'জনের নীরবতা।

'সরকারী চাকরিটা হারিয়েছিলুম।' নীরবতা ভঙ্গ করলেন কপোতাক্ষ। 'কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না। বরং ইনসিওরান্সের এজেন্ট হয়ে আরো উপায় করলুম। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক মহলে দাদা বলে গেলুম। সব হলো। কিন্তু যেটি চেয়েছিলুম সেটি হলো না। কংগ্রেসের আমি ভিতরের লোক হলে কী হবে, রাজপুরীর আমি বাইরের লোক। কিছুদিন পরে জীবনযাত্রায় অরুচি ধরে যায়। সভাসমিতিতে যাইনে। নির্বাচনে নামিনে। চরকা কাটিনে। জীবনবীমার কাজে জীবনের আনন্দ পাইনে। সেটাতেও অবহেলা আসে।'

'তুমি তো কাগজেও লিখতে।' রাজেন বললেন মনে করে।

'হাঁ, সাংবাদিক রাজ্যেও আমি ভিতরের লোক হয়েছিলুম। কিছুদিন মাতব্বরি করে টের পাই যে রাজপুরীর বাইরের খবরটুকুই আমাদের সম্বল। সেদিক থেকে আমরা বাইরের লোক। আমরা আউটসাইডার।' কপোতাক্ষ আক্ষেপ করলেন।

'তার মানে', রাজেনের ভাষ্য, 'গভর্নমেণ্ট হাউসে তোমাদের প্রবেশ ছিল না!'

'দূর!' কপোতাক্ষ বিরক্তি দমন করে বললেন, 'আমি যে রাজপুরীর কথা বলছি সেখানে লাট বেলাটও আউটসাইডার।'

এর পর কপোতাক্ষ বলতে লাগলেন, 'আমার জীবনধারা গতানুগতিকের প্রতি বিমুখ হতে হতে জীবনবিমুখ হয়ে ওঠে। মনে হয় মরে গেলেই রাজপুরীর দুয়ার খুলে যাবে। জীবনের রাজপথের পাশ ধরে যে রাজপুরীর দেয়াল চলেছে তার নাম মৃত্যু। আমি যদি মরতে রাজী থাকি তো এক মুহূর্তেই রাজপথ থেকে রাজপুরীতে উপনীত হব।'

'কী সর্বনাশ!' রাজেন তাঁর ডেক চেয়ারে হেলান দেওয়া ছেড়ে টান হয়ে বসলেন। 'তা হলে

তো একদিন না একদিন সব মানুষই ভিতরের লোক হবে। কেউ বাইরে পড়ে থাকবে না। তোমার বাহাদুরিটা কোন্‌খানে?'

'না। ইনসাইডার হওয়া অত সহজ নয়।' স্বীকার করলেন কপোতাক্ষ। 'ওটা আমার ভুলই হয়েছিল। ও ভাবটা ক্রমে কেটে যায়। ওর থেকে আসে আর এক ভাব। মরব না, অথচ মৃত হব।'

'এ আবার কী হেঁয়ালী!' রাজেন হকচকিয়ে গেলেন।

'ভয় নেই। মৃত মানে ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি মৃত। বাসনাকামনার প্রতি মৃত। বিষয়ের প্রতি, সংসারের প্রতি মৃত। মানবে নিশ্চয় যে এটা তেমন সহজ নয়।' কপোতাক্ষ আড়চোখে তাকালেন।

রাজেন কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'না। সহজ নয়। কিন্তু সার্কাসের শক্ত দড়ির উপর দিয়ে হাঁটাও তো সহজ নয়। ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি মৃত হলে ইন্দ্রিয় থাকার দরকারটা কী! চোখে চশমা না পরে ঠুলি পরলেই হয়। দাঁতগুলো বাঁধিয়েছ কেন!'

কপোতাক্ষ নিরুত্তর। বিরতির পর বললেন, 'তোমার যুক্তি ভুল নয়। কিন্তু সে সময় মনে হতো আমি মৃত হতে পারছিনে বলেই রাজপুরীতে প্রবেশ পাচ্ছিনে।'

'ঐ যে 'মনে হতো' ওটাও তো মন নামক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার। মৃত যে তার কি মনের সাহায্য নেওয়া চলে?' তর্ক করলেন রাজেন।

'যা বলেছ।' কবুল করলেন কপোতাক্ষ। 'কিন্তু ওই ভাবটা আমার বেশিদিন ছিল না। ওসব থিওরিতে সম্ভব হতে পারে, প্র্যাকটিসে নয়।'

'তা হলে তুমি জীবন্মৃত হতে গিয়ে হতে পারলে না।' রাজেন খোঁচালেন।

'না, তার জন্যে আমার খেদ নেই। আমার উদ্দেশ্য তো জীবন্মৃত হওয়া নয়, ভিতরের লোক হওয়া। উপায়টাকেই আঁকড়ে ধরে থাকার চেয়ে উপায়ান্তর দেখাই শ্রেয়। অত বড় রাজপথ পড়ে রয়েছে, এগিয়ে গেলে কি আর কোনো দুয়ার খুঁজে পাব না রাজপুরীর?'

এই বলে কপোতাক্ষ নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন, 'আছে, আছে। খুঁজলেই পাব।'

এর পর তিনি উঠে পায়চারি করতে শুরু করে দিলেন। অগত্যা রাজেনও। বলে চললেন কপোতাক্ষ, 'একদিন কেমন করে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যাঁকে আমি মা বলে ডাকি। যেন অনেকদিন থেকে আমাকে চিনতেন। দেখেই কাছে টেনে নিলেন। জানতে চাইলেন কী আমার বেদনা।'

'তারপর?' রাজেনের মনে ঔৎসুক্য।

'আমার ঐ এক কথা। আমি যদি রাজার ছেলে হয়ে থাকি তো রাজপুরীতে যেতে পাইনে কেন? দুয়ার কই যে যাব! খাড়া রয়েছে রাজপথের একপাশে। পথও ফুরোয় না, দেয়ালও ফুরোয় না।' চলতে চলতে বলতে লাগলেন কপোতাক্ষ। 'মা আমার ভাবগ্রাহী। এক নিমেষেই বুঝে নিলেন।'

'তারপর?' রাজেনকে বেশ অধীর বোধ হলো।

'মা বললেন, বাবা, রাজপুরী যখন তখন রাজা একজন আছেন তা তো মানো। তাঁকেই ভালোবাসবে। তখন তুমি রাজপুরীর পাঁচিলের যেখানেই হাত রাখবে সেখানেই দেখবে দুয়ার। সে দুয়ার অমনি খুলে যাবে। দুয়ার কি একটি? দুয়ার হাজারটি, অযুতটি, নিযুতটি। একটি না একটি খুলে যাবেই। শুধু তাঁকে ভালোবাসতে হবে। তাঁকেই।' বলে কপোতাক্ষ থামলেন।

'আশ্চর্য!' রাজেন এটা প্রত্যাশা করেননি।

'আশ্চর্য বইকি!' কপোতাক্ষ চলতে চলতে বললেন, 'প্রথমটা মনে হয় খুবই সরল। ভালোবাসতে কে না পারে? আমি কেন পারব না? কিন্তু অন্তর থেকে বলতে ভয় পাই যে, রাজা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকেই। রাজা তা শুনলে আমাকে পরীক্ষা করতে শুরু করবেন।

এক এক করে আমার সব কিছু কেড়ে নেবেন। যা কিছু আমার প্রিয়। আমার সুবিধামতো ত্যাগ করতে আমি রাজী। কিন্তু তাঁর চাহিদামতো ত্যাগ করতে আমি নারাজ। তাঁকে ভালোবাসি বলে তাঁকেই ভালোবাসতে হবে, এ তো বড়ো কড়া নির্দেশ।'

'এ উত্তরে মা কী বললেন?' রাজেনের জানতে ইচ্ছা।

'একদিন মাকে বলি, মা তুমি যদি সত্য আমার মা হয়ে থাক আর আমি যদি সত্যি তোমার ছেলে হয়ে থাকি তা হলে রাজাকে ভালোবাসার দায় থেকে আমাকে মুক্তি দাও। আমি আমার সাধ্যমতো ত্যাগ করব। ডোরকৌপীন বা গৈরিকধারণ আমার দ্বারা হবে না। আমি বিবাহিত পুরুষ। জীবনের সব উচ্চাভিলাষ গেছে, আমি এখন কেউ নই, এই যথেষ্ট নয় কি?' কপোতাক্ষ চলতে চলতে থামলেন।

'মা কী বললেন?' রাজেন সুধালেন।

'মা বললেন, রাজাকে ভালোবাসতে ভয় পাস? তবে তুই গোপালকে ভালোবাসিস্। গোপীরা যেমন ভালোবাসতেন। কথাটা তো এই যে ভিতরের লোক হতে হবে। রাজপুরী না হয়ে ব্রজপুরী হলেই বা ক্ষতি কী? আমি তোকে একটা ইঙ্গিত দিলুম। বাকীটা তুই তোর নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে পূরণ করবি।' কপোতাক্ষ আবার চেয়ারে গা ঢেলে দিলেন।

'তারপরে?' রাজেনও আবার আসন নিলেন।

'সেই থেকে গোপালের সেবা করি। কিন্তু ভূগোলের ব্রজপুরীতে নয়। টিকিট কেটে একবার সেখানে গেলেই তো দুয়ার খুলে যাবে না। ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসার দায়ে আমি কত জায়গায়ই না গেছি। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এক জায়গায় দুয়ার খোলা পাই। সেই হয় আমার সত্যিকার ব্রজপুরী। একটু একটু করে প্রত্যয় হয় যে আমি ভিতরের লোক।' শান্ত হলেন কপোতাক্ষ।

'তবে তুমি সেইখানেই স্থিতি পেলে?' রাজেন জানতে চাইলেন।

'সেইখানে বলতে একটা বিশেষ স্থানে বোঝায় না। এর কোনো ভৌগোলিক ব্যাখ্যা নেই। এটা স্থানমাহাত্ম্যের কথা নয়।' কপোতাক্ষ পরিষ্কার করে বললেন। 'দেয়ালের যেখানেই তুমি হাত ঠেকাবে সেখানেই দুয়ার খুলে যাবে, যদি ভালোবাসা তাঁর দিকে যায়।'

রাজেন বুঝতে চেষ্টা করলেন। 'অর্থাৎ যে কোনো স্থানই ব্রজপুরীর সামিল।'

'ঠিক। যদি ভালোবাসা তাঁর দিকে যায়।' কপোতাক্ষ আকাশের দিকে তাকালেন। যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন।

'তোমার ভাগ্যে আলমোড়ার উত্তরেই সেই স্থান?' জিজ্ঞাসা করলেন রাজেন।

'আলমোড়া থেকে কৈলাস যাত্রার পথে আমার অসুখ করে। সাংঘাতিক অসুখ। সঙ্গীরা সকলে এগিয়ে যান। আমিই তাঁদের বলি আমার জন্যে যেন কারো মানসিকে বাধা না পড়ে। আমার মানসিক তো কৈলাস বলে একটি স্থানবিশেষের উপর নির্ভর করে না। অসুখ একদিন সারল। ততদিনে আমার উপলব্ধি হয়েছে যে এই আমার গোপাল সেবার স্থান। সেখানকার লোকের আগ্রহেই সেখানে থেকে যাই। উপলক্ষ একটা পাঠশালা। বিদ্বান বলে আমার যে অভিমান ছিল সেটা আমি গোপালকে সমর্পণ করি।' কপোতাক্ষ আর্দ্রস্বরে বললেন, 'তিনি আমার প্রাণরক্ষা করেন, সে প্রাণ আমি তাঁরই চরণে উৎসর্গ করি।'

'বুঝেছি।' রাজেন যেন একটা হদিস পেলেন। 'যেখানে তুমি জীবন ফিরে পেলে সেইখানেই জীবনপাতের সংকল্প করলে।'

কপোতাক্ষ প্রীত হয়ে বললেন, 'অবিকল।'

রিকশা ঘুরে এসে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ওইখানেই ছেদ টানতে রাজেনের ইচ্ছা ছিল না।

তিনি বললেন, 'সুদূর হিমালয়ের এক প্রান্তে একটি গ্রামে বিগ্রহসেবা নিয়ে তুমি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে কী করে, তাই ভাবি।'

'সত্যি। কিন্তু গোপালের সেবা শুধু বিগ্রহসেবা নয়। আমার চোখে সব মানুষই গোপাল। গোপাল আমার সেবা নেবার জন্যে হাজারটি হাত বাড়িয়েছে। মানুষকে না ভালোবেসে দেবতাকে ভালোবাসা যায় না। তাই যদি করতে যেতুম তবে ব্রজপুরী থেকে নির্বাসিত হয়ে আবার ঘুরে মরতে হতো রাজপথে। আমার বিগ্রহ আমাকে পথে বসাত। আমি বাইরের লোক হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতুম। সেটা হতো আরো দুঃখের। একবার যে ভিতরের লোক হয়েছে সে কি আবার বাইরের লোক হয়ে সুখী হতে পারে!' কপোতাক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন।

'না, বোধ হয়। কিন্তু কোন্‌টা যে ভিতর আর কোন্‌টা যে বাহির আমার কাছে এটা একটা প্রহেলিকা। জেলখানার দেয়াল আমি দেখতে পাই। সেটা আছে। রাজভবনের প্রাচীরও আমি দেখেছি। সেটা আছে। কিন্তু রাজপুরী বা ব্রজপুরী বলে তুমি যার সঙ্কেত দিয়েছ তার চৌহদ্দি আমার অদেখা। সেটা আছে কি না সন্দেহ। আমি যদি বলি যে ওটা তোমার স্বপ্ন—তোমার দিবাস্বপ্ন—তাহলে তুমি আহত হবে। তোমার মতো বন্ধুর মনে আমি আঘাত দিতে চাইনে, কাবুল।' রাজেন বললেন স্নিগ্ধ স্বরে।

'না, না, আহত হব কেন?' কপোতাক্ষ বন্ধুর হাতে হাত রেখে বললেন, 'আঘাত করার ছলে তুমি আমাকে স্পর্শ করতে। গোপাল যা প্রতিনিয়ত করছে। আঘাতকে পরশ মনে করলে তার ব্যথা দেবার ক্ষমতা চলে যায়।' কিন্তু কপোতাক্ষ ঘুরে বসলেন, 'তুমি যে কথাটা তুলেছ সেটা হক কথা। রাজভবন বলে আজকাল যার নামকরণ হয়েছে তার প্রাচীরের ওপারে একদা আমি গেছি। লাটসাহেবের সঙ্গে এক টেবিলে খেয়েছি। তবু ভিতরের লোক হয়ে যাইনি। ওঁরাও চাননি, আমি চাইনি। স্পষ্ট বোঝা যেত যে ব্যবধান একটা আছেই। বাইরের সঙ্গে ভিতরের। কথা হচ্ছে, সে রকম একটা ব্যবধান কি গোপালের রাজ্যেও আছে? ব্রজপুরীর চারদিকেও কি সেই রকম একটা প্রাচীর? না, সেই রকম নয়। তাহলে কি আমরা সবাই ভিতরের লোক? তাই বা কেমন করে হবে? আমি যে জানি আমি ছিলুম বাইরের লোক। আমি জানি আমি ভিতরে প্রবেশ পেয়েছি।'

'আচ্ছা ভাই, আমি মেনে নিলুম যে ভিতরের সঙ্গে বাইরের একটা তফাৎ আছে। তফাৎ মানলে সীমানারেখাও মানতে হয়। তুমি সেটা পার হয়েছ, আমি হইনি। তার জন্যে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমি রাজপথের পথিক হয়েই সুখী।' রাজেন তাঁর বন্ধুর হাতে চাপ দিয়ে স্নেহ জানালেন।

॥ তিন ॥

এটা হলো বিদায়ের সিগন্যাল। শিপ্রা ওদিকে বিছানায় একা একা ছটফট করছেন।

কপোতাক্ষ কী যেন বলতে চান, বলতে পারছেন না, কোথাও যেন তাঁর বাধছে। রাজেন সেটা আন্দাজ করে সুধালেন 'তোমারও আশা করি কোনো ক্ষোভ নেই?'

'ক্ষোভ? না, ক্ষোভ নেই।' ক্ষোভ কথাটার উপর জোর দিলেন কপোতাক্ষ। 'তবে ভয় আছে। ভয় কিছুতেই ভাঙছে না, রাজেন।'

'ভয়! ভয় কিসের!' রাজেনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'রাজাকে বলতে ভয় পেয়েছিলুম যে, রাজা তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকেই! গোপালের বেলা সেরকম কোনো ভয় বোধ করিনি। অকপটে বলেছি। কতবার ও আমাকে পরীক্ষা করেছে। আমি ভয় পাইনি। তাহলে আমার ভয় কেন? ভয় কিসের?' কপোতাক্ষ আপনাকে প্রশ্ন করে আপনি উত্তর দিলেন, 'ভয় দেবতাকে নয় ভয় মানুষকে নয়। ভয় আমাকেই। আমি যদি স্থির না থাকি। যদি অস্থির হই।'

'সে কি, কাবুল। কী তুমি বোঝাতে চাও! বল, বল, বলে ফেল।' অভয় দিলেন বন্ধু।

'বৃন্দাবনে আমার তেমন খুঁটি নেই যেমন ছিল রতুয়া গ্রামে। এ বয়সে নতুন করে খুঁটি গাড়তে পারিনি। এই ক'মাস একরকম ভেসে বেড়াচ্ছি। রতুয়াতে আমার একটা অবলম্বন ছিল। প্রথমে পাঠশালা। পরে স্কুল। হোমিওপ্যাথি দবাখানা। বীজ ভাণ্ডার। ডাকঘর। বৃন্দাবনে আমার তেমন কোনো অবলম্বন নেই। ভাবছি কী নিয়ে আরম্ভ করব। ভেবে পাচ্ছিনে। অস্থিরতা ক্রমে বাড়ছে। এক একবার মনে হচ্ছে যে শুধু ভিতরের লোক হয়ে তৃপ্তি নেই। বাইরের লোক হতে হবে। একই সময়ে। একসঙ্গে। তা বলে কি আমি বাইরে আসার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছি?' কপোতাক্ষ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করলেন।

'সত্যাগ্রহীরা যেমন জেলে ঢোকার জন্যে অস্থির হতেন, তারপর জেল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে অস্থির।' রাজেন বললেন মৃদু হেসে।

'কতকটা সেই রকম।' কবুল করলেন কপোতাক্ষ। 'আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে যে বৃন্দাবনে যদি খুঁটি না পাই তবে শ্রীরামপুরেই খুঁটি খুঁজব। পরিবারও তারই প্রতীক্ষায় আছেন। আমার কাছে যেটা আশঙ্কা তাঁর কাছে সেইটেই আশা।'

'হা হা হা হা!' রাজেন হেসে বললেন, 'আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে তাঁর আশাই পূর্ণ হবে। তুমি শ্রীরামপুরেই চলে এসো কপোতাক্ষ। ওখানে মস্তবড়ো খুঁটি। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীটাই ওখানে। তুমি যেমন একটা অবলম্বন পাবে তেমনি তোমাকে অবলম্বন করে আমরাও কদম কদম এগিয়ে যাব। কাম্ ব্যাক্, কাবুল।'

'দ্যাখ, রাজেন এটা তামাশার বিষয় নয়। আর আমরাও নই প্রেসিডেন্সীর ছাত্র।' কপোতাক্ষ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'শ্রীরামপুরে একবার যদি বসি তা হলে আমি পুরোপুরি বাইরের লোক বনে যাব। ভিতরের লোক থাকব না। তাহলে আমার জীবনের কী মূল্য। আমার এ সঙ্কটে কোথায় তুমি একটু সহানুভূতি দেখাবে না ঘোড়ার মতো অট্টহাসি হাসছ।'

রাজেনের হাসি তবু থামে না। তবে হাসির আওয়াজটা থামে। তিনি হাস্যসম্বরণ করে বললেন, 'কাবুলভাই, ভুলে যেয়ো না যে তোমার বয়স হলো ষাটের কাছাকাছি। বেঁচে থাকলে বয়স আরো বাড়বে। কে তোমাকে দেখবে শুনবে? তোমার সেবাযত্ন করবে? গোপালের সেবাযত্ন করার জন্যে শত-সহস্র গোপগোপী রয়েছে। তোমার মুখে এককোঁটা জল দেবার জন্যে কে আছে, বলতো? তুমি তো চেলা করবে না। মঠবাড়িতে থাকবে না। বৃন্দাবনে কুঞ্জ রচনা করাও তোমার দ্বারা হবে না। তোমার স্ত্রীকেও তো তুমি সেখানে নিয়ে যাবে না। ওখানে প্রকৃতির যদিও অভাব নেই তবু সেটাও তোমার প্রকৃতি নয়। তাহলে তোমার বৃদ্ধবয়সে তোমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবে কে?'

কপোতাক্ষর তা শুনে কাঁদো কাঁদো অবস্থা। 'থাক, ভাই, থাক। তুমি কি আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়বে! মানুষকে গোপাল বলে আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি, কিন্তু আমাকে গোপাল বলে ভালোবাসবার কেউ নেই। যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে আমি সরে গেছি। তাঁরাও

ইহলোক থেকে। বৌয়ের কাছে কি আমি গোপাল হতে পারি? রাজেন, তুমি আমার বুড়ো বয়সের দুর্দশার কথা ভেবে কাতর হচ্ছ। তুমি আমার সত্যিকার বন্ধু। তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব? কিন্তু তুমিও ধরতে পারলে না কী কারণে আমি অস্থির। তাই বলতে পারলে না কী করলে আমি স্থির হব।'

'কী করলে তুমি স্থির হবে, তুমিই বল।' রাজেন অনুরোধ করলেন।

'চীনেদের ভয়ে যাদের ফেলে পালিয়ে এসেছি তাদের কাছে ফিরে গেলে। আমার স্থান বিপন্নদের সঙ্গে, বিপদের মাঝখানে। কিন্তু,' কপোতাক্ষ বলি বলি করে বলতে পারলেন না যে, 'এক ডিভিজন সৈন্য যদি সঙ্গে না যায় তো আমি একা একা যাই কী করে।'

'কিন্তু—কিন্তু—' রাজেন পীড়াপীড়ি করলেন, 'কোথায় তোমার বাধছে?'

'আমার মুখে একফোঁটা জল না দিয়ে আমার বুকে একফোঁটা সাহস দেবার জন্যে যদি কেউ থাকত!' বলে কপোতাক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

(১৯৬৪)

অন্তরাল

নর্মদানদীর তীরে মারেল শৈলের উপর উন্মুক্ত আকাশের তলে কম্বল পাতি আমরা। মা আর তাঁর সন্তানসন্ততি। মাকে আমি আর কখনো এত কাছে পাইনি।

রাতে শুতে যাবার সময় প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর রাঙা চরণ দুই হাতে চেপে ধরি। বলি, মা, তুমি আমাকে সত্যি করে বল। তুমি আমার কে? আমি তোমার কে?

উনি চমকে ওঠেন। বলেন, ও কী কথা, বিক্রম! তোরা আমার পূর্ব জন্মের ছেলেমেয়ে! আর আমি তোদের পূর্বজন্মের মা!

ঠিক বলছ তুমি আমার সত্যিকারের মা?

হাঁ রে। সত্যিকারের মা নয় তো কী! আত্মার বন্ধন রক্তের বন্ধনের চেয়ে কম কিসে? জন্মান্তরের টান নাড়ীর টানের মতোই সত্য। তা নইলে তুই তোর কলকাতার ঘরসংসার আইনের পসার ফেলে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবি কেন?

শুনে আমি বলি, মা, তুমি যদি আমার সত্যিকারের মা হয়ে থাক তবে আমাকে বল, আমার বাবলা কোথায় আছে। ওকে আমি দেখতে পাব কি না।

উনি বোধহয় এর জন্যে তৈরি ছিলেন না। অন্তর্যামিনী হলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন ভক্তদের প্রত্যেকের বাড়ির খবর, হাঁড়ির খবর, মনের খবর, জীবনের খবর। আমরাও কেউ কিছু গোপন করতুম না।

মা শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করেন। বলেন, বাবা বিক্রম, তোর কি আর কোনো অভীষ্ট নেই? ধন সম্পদ বিষয় আশয় আয়ু আরোগ্য? ধনং দেহি রূপং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। এই রকম কোনো অভীষ্ট?

না, মা। আমার ওই একটিই ভিক্ষা। ক্যাডিলাক আমি চাইনে। মানসনে আমার কাজ নেই। লক্ষপতি হয়ে আমি করব কী! আর শত্রু বলতে আমার কেউ যদি থাকে তবে শত্রুরও যেন এ শোক

না হয়। তুমি তো সব জানো। বল আমার বাবলা কোথায় আছে।

মা আরো কিছুক্ষণ তদ্‌গত থাকেন। তারপর বলেন, আচ্ছা, তুই অত 'আমার' 'আমার' করিস যে, এই নদী কি তোর? ওই আকাশ কি তোর? আমার নদী, আমার আকাশ বলা যা আমার বাবলা বলাও তাই। তেমনি ভ্রান্ত বুদ্ধির কথা। বাবলা তাঁর। বাবলা তিনি। জীবাত্মার আর পরমাত্মায় কোনো ভেদ নেই। বিন্দুতে আর সিন্ধুতে।

তা হলে তো ও নির্বিশেষে মিশে গেছে। আর ওকে দেখতে পাব না, পৃথক করতে পারব না।—কাতরকণ্ঠে নিবেদন করি।

দৃষ্টি খুলে গেলে দেখবি ও যেখানে ছিল সেইখানেই রয়েছে। তোর আর ওর মধ্যিখানে একটা পাতলা পর্দার ব্যবধান। সব যখন আলো হয়ে যাবে তখন ওটুকু অন্তরাল ভোরের মেঘের মতো কোথায় সরে যাবে।—মা আশ্বাস দেন।

অনেকটা শান্তি পেলুম। এরপর আমার জিজ্ঞাসা হলো, দৃষ্টি খুলে যাবে কী করে? তার জন্যে কী সংসার ত্যাগ করতে হবে?

না, তেমন কোনো কথা নেই।—মা ভরসা দেন।—সংসারে থেকেও হঠাৎ একদিন একটা বিদ্যুৎচমকের মতো উপলব্ধি ঘটতে পারে। চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যেতে পারে। প্রিয়জনের জন্যে শোকাকুল হয়ে সংসার ত্যাগ করা উচিত নয়। সংসার যদি ছাড়তেই হয় তবে তাঁরই জন্যে ব্যাকুল হয়ে। যিনি প্রিয়তম।

এই বলে উনি ধ্যানমগ্ন হন। আমি উঠে এসে আমার কম্বলে গা মেলে দিই। এক আকাশ তারা ফুটে অন্ধকারকে আলো করে রেখেছে। কিন্তু ওই আলোয় বাবলুকে দেখতে পাইনে। তা হলে কি সূর্যের আলোয় দেখব? হাঁ, সূর্যের আলোয়। কিন্তু সে আবেক সূর্যেব আলো।

॥ দুই ॥

বিক্রমবাবু এসব কথা কাউকে বলেন না, বলতেনও না। একদিন কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা এসে পড়ল। তাঁর নতুন প্রতিবেশী সরোজবন্ধু কর এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। ইনি তখন সিটি সিভিল কোর্টের জজ। আর বিক্রমজিৎ বর্ধন তো হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকীল। দু'জনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

দোতালায় গাড়ী-বারান্দার খোলা ছাদে বসে আলাপ। আদালত থেকে ফিরে বিক্রমবাবু সন্ধ্যাবেলা এইখানেই চুপচাপ বসে থাকেন। কে জানে হয়তো চোখ বুজে ধ্যান করেন। পরে এক সময় নিচের তলা থেকে খবর আসে যে মক্কেলরা অপেক্ষা করছেন। তখন নেমে যান। তার আগে বারান্দার বাতি জ্বলে না।

সেদিন অন্ধকারেই কথাবার্তা হচ্ছিল। বিক্রমবাবু তাঁর নতুন প্রতিবেশীর পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন, 'আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?'

সরোজবাবু বললেন, 'চারটি।' তারপর ইনিও জানতে চাইলেন, 'আপনার?'

'আমারও চারটি।' কথাটা বলে ফেলেই বিক্রমবাবু জিভ কাটলেন। 'না, না। ও কী বলছি! আমার যে আরো একটি আছে।'

এর পর তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্যাখ্যা করলেন, 'আছে মানে ছিল। কিন্তু 'ছিল' এই কথাটা আমার মুখ দিয়ে বার হতে চায় না। আমি যতবারই বলতে যাই 'ছিল' ততবারই বাধা পাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই কবিতা মনে পড়ে কি? 'উই আর সেভেন।' মেয়েটির বিশ্বাস যে সাতজনই আছে। আমিও তেমনি বলতে পারি, উই আর সেভেন। আমি, আমার স্ত্রী, আমাদের পাঁচ ছেলেমেয়ে।'

ঠিক ধরতে পারলেন না সরোজবাবু। সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না বুঝি? নিরুদ্দেশ?'

'সে অর্থে নয়।' বিক্রমবাবু আরো খুলে বললেন, 'আয়ু ফুরিয়ে গেলে যা হয়। বিশ্বাস করতে পারিনে যে মানুষের দেশে ও বেড়াতে এসেছিল। এ জগতের নয়।'

সরোজবাবু এবার বুঝলেন। পুত্রশোক, কার সাধ্য সান্ত্বনা দেয়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'এ রহস্য ভেদ করা মানুষেব অসাধ্য। বিজ্ঞান স্যাটেলাইট তৈরি করে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাচ্ছে, কালে কালে আরো কত কী করবে। বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। কিন্তু বিজ্ঞানেরও সাধ্য নেই যে এ রহস্য ভেদ করে।'

'ধর্ম?' বিক্রমজিৎ মনে করিয়ে দিলেন, 'ধর্ম এ রহস্য তিন হাজার বছর আগে ভেদ করে ফেলেছে। কঠোপনিষৎ পড়েছেন নিশ্চয়। নচিকেতা উপাখ্যান। আমারও সেই রকম একটা উপাখ্যান জানা আছে।'

'কী রকম?' কৌতুহল প্রকাশ করলেন সরোজবন্ধু।

'তা হলে শুনুন, বলছি।' বিক্রমবাবু কাউকে যা বলেন না, বলতেন না, তাই বলে শোনালেন তাঁর নবাগত প্রতিবেশীকে। সেই নর্মদাতীরেব গল্প।

॥ তিন ॥

ভিতরে বসে দুই গৃহিণীতে আলাপ চলছিল। কিন্তু ওদের বিষয়বস্তু এমন গুরুগম্ভীর নয়। বর্ধনদের বড়ো মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ। মৃতের জন্যে ভাববার সময় কোথায়? জীবিতকে নিয়েই ভাবনা।

মেয়ের পছন্দ অপছন্দ পরের কথা। আগে তো মেয়ের মা-বাপের পছন্দ হোক। এখন এই নিয়ে দুজনের দুই মত। বিক্রমজিৎবাবু যার হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান সে হচ্ছে তাঁরই মতো একজন উকীল। তাঁরই জুনিয়ার। কালে তাঁর প্র্যাকটিসটারও উত্তরাধিকারী হবে। হাতের পাখী ছেড়ে কেউ ঝোপের পাখী খুঁজতে যায়?

কিন্তু তাঁর গৃহিণীর সন্ধানে আর একটি সুপাত্র আছে। আর্মি অফিসার। কী তার চেহারা আর তেজ! যেন মূর্তিমান রাজপুত। রাজপুত্রই বা নয় কেন? বাপ গরিব, এটা অবশ্য ওর দুর্ভাগ্য। শুধু ওর নয়, বর্ধনদেরও। পরিচয় তো দিতে হবে সমাজে। কী বলে পরিচয় দেবেন জামাতার পিতৃকুলের? পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলমাস্টার?

'ওর ফোটো দেখবেন? এই দেখুন। কেমন? বীরপুরুষের মতো নয়? আমি তো বলি ইলা যদি এর হাতে পড়ে তবে বীরজায়া হবে।' মিসেস বর্ধন গর্বের সঙ্গে বললেন, 'বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল হবে।'

মিসেস কর তারিফ করে বললেন 'বেশ। বেশ। কিন্তু অন্য ছেলেটির ফোটো কোথায়? মিলিয়ে দেখতুম।'

'ও তো ঘরের ছেলের মতো। আসল মানুষটাকেই দেখবেন একদিন। আপনাকেই ফয়সালা করতে হবে এই মামলার। ওঁর পছন্দ ভালো না আমার পছন্দ ভালো। কার পছন্দ অনুসারে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হবে।' মিসেস বর্ধন ধরে বসলেন।

'কী বিপদ!' মিসেস কর ভয় পেয়ে বা ভয়ের অভিনয় করে বললেন, 'আমি ফয়সালা করবার কে? যার বিয়ে সে নিজে কী বলে?'

'ইলার কথা বলছেন? ও বলে, তোমরা যার হাতে দেবে তাকেই আমার পছন্দ!' মিসেস বর্ধন হাসলেন।

'ও মেয়ে দেখছি কম ডিপ্লোমাট নয়। ওর বিয়ে হওয়া উচিত ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে।' মিসেস কর হেসে বললেন।

'কিন্তু সত্যি, আমরা স্বামী স্ত্রী কিছুতেই একমত হতে পারছিনে। অবশ্য উনি স্বামী, গুরুজন। ওঁর আদেশ মানা করতে আমি বাধ্য। কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে। ওই অফিসার উঠতে উঠতে একদিন প্রধান সেনাপতি হবে। সন্তানরা হবে বীরসন্তান। আর এই উকীলের ভবিষ্যৎ কী?' মিসেস বর্ধন ঠোঁট উলটিয়ে বললেন, 'যদি জানতুম যে বার থেকে বেঞ্চে গেলেই মোক্ষলাভ। জজ হলে তো ঠাট বজায় রাখাই দায়। সে সম্মান কি আছে?'

মিসেস কর একটু আহত হলেন বইকি। তাঁর স্বামীর সামনের ধাপটা যে হাইকোর্ট। তিনি শুষ্ক হাসি হেসে বললেন, 'তা কপালে থাকলে উকীল ফুলতে ফুলতে হয় মিনিস্টার। এ ছেলে যদি হয় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তবে প্রধান সেনাপতি হয়ে এরই হুকুম তামিল করবে ও ছেলে। আর বীরসন্তানের চেয়ে বেনিয়া সন্তানেরই তো প্রভাব বেশি।'

দু'জনেই হাসাহাসি করলেন।

॥ চার ॥

ওদিকে বিক্রমবাবুর মুখে নর্মদাতীরের বিবরণ শুনে সরোজবাবুর কৌতূহল বেড়ে গেছে। মা কে, কোথায় থাকেন, কলকাতায় আসেন কি না, কবে আসবেন এসব প্রশ্ন শুনে বিক্রমবাবুরও ঝামেলা বেড়ে গেছে।

এমন সময় চা এসে হাজির হয়। দু'জনেই অন্যমনস্ক থাকেন।

'প্ল্যান্‌চেট?' সরোজবাবুর প্রশ্ন, 'আপনি কি প্ল্যান্‌চেট পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

'না, জজসাহেব।' বিক্রমবাবুর উত্তর, 'ওটা বিজ্ঞানের আমলে আসে না। যেটা বিজ্ঞানের আমলে আসে না সেটা যে ধর্মের আমলে আসবেই এমন কোনো কথা ন্যায়শাস্ত্রে লেখে না। আমি ধর্মের শরণ নিয়েছি। আমি শরণাগত।'

'তা ছাড়া' তিনি বলতে লাগলেন, 'এ পথে কোনো শর্ট কাট নেই। আপনাকে সেই দৃষ্টি অর্জন করতে হবে যা দিয়ে একসঙ্গে সমস্তটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্রকে দেখতে পেলেই আপনি তার মধ্যে যথাস্থানে আপনার যদি কেউ হারিয়ে গিয়ে থাকেন সেই প্রিয়জনকে দেখতে

পারেন। সব কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দেখা যাবে না, তার কথা শোনা যাবে না। সম্ভব নয়।'

সরোজবাবু শুনে যেতে লাগলেন। বলে যেতে লাগলেন বিক্রমবাবু, 'সেই দৃষ্টি আস্ত একটা ল্যাণ্ডস্কেপকে চোখের সামনে ধরবে। বাবলা তার অঙ্গ। ও যখন চলে যায় তখন মনে হচ্ছিল ছোট একটি ছেলে একলা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে— কোন মহাশূন্যের গহ্বরে। মনে হচ্ছিল সে জীবিতদের প্রত্যেকের কাছ থেকে বিযুক্ত, সে সমূহের থেকে পৃথক। রাতের অন্ধকারে যেমন একটা আগুনের ফুলকি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ব্যক্ত করে নিবে যায়। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়। সে একলাও নয়, নিঃসঙ্গও নয়। সমুদয় আলোকিত বিশ্ব তার সঙ্গে রয়েছে। তাকে ঘিরে রয়েছে। অন্ধকার যদি কোথাও থাকে তবে তা আমাদের চোখে। আমরাই অন্ধ অথবা অজ্ঞ।'

সরোজবাবুর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। তিনি বললেন, 'যা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত তার বিষয়ে অতখানি নিশ্চিত হওয়া কি সঙ্গত, বর্ধন সাহেব? যে বুদ্ধি দিয়ে আপনি মামলা লড়ছেন বা আমি মামলা বিচার করছি সেই বুদ্ধি দিয়েই আমরা বিভিন্ন হাইপোথীসিস গঠন করি। উদ্দেশ্য ইহকালের সঙ্গে পরকালের একটা ধারাবাহিকতা প্রমাণ করা। অথবা ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের একটা সমন্বয় প্রমাণ করা। জীবন যে এইটুকুতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে এতে আমাদের অন্তরের আপত্তি। তা বলে প্রকৃত সত্য যে আমাদের কারো জানা আছে বা জানবার উপায় আছে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় কি?'

বিক্রমবাবু রীতিমতো সওয়াল করলেন 'কনটিনিউইটি যদি অনিশ্চিত হয় তবে ডিসকনটিনিউইটি কি নিশ্চিত? জল অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই কি শেষ? আকাশে মেঘ দেখা দিল যে। আবার সেই মেঘও অদৃশ্য হয়ে গেল। সেও কি শেষ? আকাশ থেকে জল ঝরছে যে। প্রত্যেকটি পরমাণুর পারম্পর্য আছে। যা কিছু অদৃশ্য হয়ে যায় তাই পরে দৃশ্যমান হয়। তা হলে ছেদ কোথায়, স্যার? দৃষ্টির দিক থেকে কোথাও নেই, স্যার। ছেদ বলে যেটা প্রতীয়মান হয় সেটা দ্রষ্টার দিক থেকেই, তার দৃষ্টি সসীম বলেই। দৃষ্টির সীমা যদি বিস্তারিত হয় তবে আর ছেদ নয়। জীবনের অনুবৃত্তি তখন। অন্তরালেও তার জের চলা হয়। বুদ্ধির সঙ্গে এর বিরোধ কই? বরং এই হচ্ছে বুদ্ধির সম্পূরক।'

সরোজবাবু হাল ছেড়ে দিলেন। লক্ষ লক্ষ বছর পরে মানুষ থাকবে কি না সন্দেহ, কিন্তু মানুষ যদি থাকে তবে তার এই জিজ্ঞাসাও থাকবে। অন্তরালে অনুবৃত্তি চলে কি না অন্তরালে না গিয়ে তার মীমাংসা হবে না।

॥ পাঁচ ॥

মিসেস কর বলছিলেন মিসেস বর্ধনকে, 'দু দিকের পাল্লা সমান ভারী। সেই জন্যে মনঃস্থির করা এত শক্ত। আর্মি অফিসার— আচ্ছা, ওকে অতবার আর্মি অফিসার বলতে কষ্ট হয় না? আমি হলে বলতুম কার্তিক। আর ওই উকিলকে গণেশ। কার্তিক আর গণেশ দু'জনের মধ্যে কোন্ জন অপেক্ষা করতে রাজী, আর কোন জন নারাজ?'

'তার মানে কী হলো, দিদি?' মিসেস বর্ধন একটু অন্তরঙ্গ স্বরে সুধালেন।

'ধরুন, মনঃস্থির করতে যদি দু'বছর লাগে তা হলে কোন্ পাত্রটি হাতছাড়া হবে, কোন্‌টি

হাতে থাকবে?'

'কী করে বলি!' মিসেস বর্ধন চিন্তা করে বললেন, 'কার্তিক কি সবুর করবার ছেলে! পুরাণে তো বলে ও দুনিয়া ঘুরে এসে দেখে গণেশ ধীরস্থির হয়ে বসে আছে। তা ছাড়া ওর গুরুজন কি ওকে তাড়া না দিয়ে ছাড়বেন! এর মধ্যেই নীলামে উঠিয়েছেন। একালের স্বয়ংবরাদেরও তো চেষ্টার অন্ত নেই।'

মিসেস কর হেসে বললেন, 'গণেশটিকে কেউ চায় না?'

'চাইবে। চাইবে। ওর পসার যতই বাড়বে দর ততই চড়বে। সবুরে মেওয়া ফলে। কিন্তু এদিকে আমার মেয়ের বয়স যে সবুর করতে দেবে না। তার বেলা সবুরে মেওয়া ফলে না। আমি ওকে অবিলম্বে পাত্রস্থ করতে চাই।' বললেন মিসেস বর্ধন।

'বেশ। তা হলে আপনার ছোট মেয়ের জন্যে গণেশকে হাতে রাখুন। আর বড়ো মেয়েকে দিন কার্তিকের হাতে। এমন যদি হয় তো আপনাদের দু'জনেরই জিৎ হয়। কর্তার জুনিয়র যখন তখন কর্তার অনুগত হবে গণেশ। অবশ্য আপনার ছোট মেয়ের যদি খুব একটা অনিচ্ছা না থাকে।' বললেন মিসেস কর।

'বাঁচালেন দিদি।' মিসেস বর্ধন যেন অকূলে কূল পেলেন। 'এর চেয়ে উত্তম রোয়েদাদ আর কী হতে পারে! কিন্তু আমার কর্তাকে ভজানো অত সহজ নয়। ওই যে পাগলিনী মা বলে একজন আছেন, আমরা ওঁর ভক্ত। ওঁকেই দিয়ে বলাতে হবে। তা হলে কর্তা আর 'না' বলতে পারবেন না। মা এখন কোথায় তীর্থবাস করছেন, জানিনে। বোধহয় পুরীতে। খোঁজখবর নিয়ে যাব একদিন দর্শন করতে।'

মিসেস কর মাকে দেখেননি। দেখতে বিশেষ আগ্রহান্বিত। কথাবার্তা চলল এরপর মাতৃপ্রসঙ্গে।

চা এসে হাজির হয়। গভীর বিষয়ের আলোচনা জমে ওঠে।

॥ ছয় ॥

'আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন,' কর জিজ্ঞাসা করেন বর্ধনকে, 'এই জীবনেই আপনার দিব্যদৃষ্টি লাভ হবে?'

'মা আমাকে সেই আশাই দিয়েছেন।' একটু অন্তরঙ্গ স্বরে যোগ করলেন বর্ধন, 'তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলুম গৈরিক পরিধান করব কি না। সংসারে থেকে গেরুয়া পরা বলতে কী বোঝায় আপনার মতো বিচক্ষণ বিচারপতি অবশ্যই তা অনুমান করেছেন।'

কর ঠিক ধরতে পারেননি, তবু এমন ভাব দেখালেন যেন ইঙ্গিতটা বুঝেছেন।

'মা বললেন, না। গেরুয়া পরলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। স্ত্রীর হয়তো মত নেই। আমি তোদের বৈরাগ্যের দীক্ষা দিইনি। একটি ছেলে গেছে। আরেকটি হতে পারে। সংসারীদের পক্ষে নিয়ম হচ্ছে লাইন অফ লীস্ট রেজিস্টান্স।' বর্ধন বললেন।

'মা ইংরেজী জানেন?' বিস্মিত হলেন কর।

'ভক্তদের সঙ্গে বলতে বলতে শিখেছেন। দক্ষিণী ভক্তরা আর কোন্ ভাষায় কথা বললে

বুঝবে? আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না সাহেবভক্তও আছে। এক আইরিশ ছোকরা তো পূর্বজন্মের ছেলে বলে মাকে আপনার করে নিয়েছে। মা ওর নাম রেখেছেন গোরা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়েছিলেন কবে। তাও মনে আছে। আমরা মাঝে মাঝে অভিমান করে বলি মা তোমার কালো ছেলেদের কিছু দিয়ে গেলে না, সব সম্পদ ওই গোরা ছেলেটিকে দিয়ে যাচ্ছ। সত্যি অধ্যাত্ম মার্গে ও যতদূর এগিয়েছে আমরা কেউ ততদূর এগোতে পারিনি। মা বলেন ওর হচ্ছে শ্রদ্ধা ভক্তি।'

'অতি আশ্চর্য ব্যাপার!' সরোজবাবু মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ কি ত্রিকালদর্শী ছিলেন! 'গোরা' তা হলে কবিকল্পনা নয়।'

'আসবে। আসবে। সারা পৃথিবী আসবে। ভারতের ভাণ্ডারে যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য রয়েছে তা কি শুধু আমাদের জন্যে! তা সকলের জন্যে। মার কাছে তাই আপন পর বাছবিচার নেই।' বিক্রমবাবু ভক্তিভরে বললেন।

সরোজবাবুর মনে পড়ল কথায় কথায় তিনি প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছেন। বললেন, 'লাইন অফ লীস্ট রেজিস্টান্স নিয়ে কথা হচ্ছিল। তারপর?'

'সংসারে যারা থাকবে তাদের জন্যে নিয়ম হচ্ছে লাইন অফ লীস্ট রেজিস্টান্স। কিসে অশান্তি সব চেয়ে কম হয়। গৃহী হয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়লেই কি সিদ্ধি মেলে? সিদ্ধি অমন নেগেটিভ নয়। যাঁকে পাবার জন্যে ওর থেকে নিবৃত্তি তাঁর উপর অনুক্ষণ ধ্যান থাকা চাই। সাধুদেরই বা তাঁর উপর ধ্যান আছে ক'জনের। মা বলেন আমার হয়েছিল মীরার দশা।' বিক্রমবাবু একান্ত অন্তরঙ্গের মতো বললেন।

'তাই নাকি!' সরোজবাবু আরো কাছাকাছি সরে বসলেন।

'মার কথা হলো, কী ছেড়েছি কাকে ছেড়েছি এসব না ভেবে বরং ভাবতে হবে কী চেয়েছি কাকে চেয়েছি। তাঁর জন্যে, তাঁর দর্শনের জন্যে ব্যাকুলতা যদি জাগে তবে সেই ব্যাকুলতা আপনি আপনার পথ করে নেবে। সে পথ যদি সংসারের পথ না হয় তবে একদিন দুটোর একটা বেছে নিতে হবে। কিন্তু তোর জীবনে, বিক্রম, সে রকম মোড় এখনো আসেনি। তুই শোককাতর পিতা, তুই প্রেমকাতর ব্রজগোপী নোস্ আর যদি ব্রজগোপী হয়েই থাকিস্ তবে মনে রাখবি ব্রজগোপীদেরও সংসার সুখ ছিল। তোর বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, মা এখনো বেঁচে। তুই তোর কর্তব্য করে যা। তাই করতে করতেই তোর দৃষ্টি খুলে যাবে।' বিক্রমবাবু ভাবাকুল স্বরে বললেন।

'গভীর আশার বাণী বইকি,' সরোজবাবু স্বীকার করলেন।

বিক্রমবাবু আবেগভরে বললেন, 'আমি যেন নতুন প্রাণ পেয়েছি।'

॥ সাত ॥

দুই গৃহিণী এত বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁদের কথাবার্তা তৃতীয় ব্যক্তির আড়ি পেতে শোনার জো ছিল না।

বর্ধনজায়া ফিসফিস করে বললেন, 'বর না হয় কোনো রকমে জোটানো গেল, কিন্তু সোনা আমি কোথায় পাব?'

'কেন চোদ্দ ক্যারাট?' ফিসফিস করে বললেন করজায়া।

'তা কি হয়! আমার কত আদরের মেয়ে। তাকে আমি চোদ্দ ক্যারাট পরাব। কার্তিকের মা জানতে পেলে এ সম্বন্ধ ভেঙে দেবেন। কার্তিকেরই বা অত সাহস কোথায় যে মার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। ওর যত সাহস পাকিস্তানী আর চীনদের বেলা।'

'তবে আর কী। সবাই যা করছে আপনিও তাই করবেন। বাইশ ক্যারাট যত চাই তত পাওয়া যায়। শুধু একটু কারসাজি করতে হয়। ভালো নয় কিন্তু যুবতী মেয়ের বিয়ে না হওয়াটাও তো ভালো নয়। দেখতে হবে কোন ভালো নয়টা কম ভাল-নয়। ন্যূনতর মন্দ কোনটা।'

'ওইখানেই তো বাধছে।' বর্ধনজায়া বিমর্ষভাবে বললেন, 'ওর কথা হলো, বাবলুকে যদি দেখতে চাও তো সত্য পথে চল। সমাজের সঙ্গে সত্য রক্ষা করতে হবে।'

'কাকে যদি দেখতে চাও?' চমক লাগে করজায়ার।

'আমার ছোট ছেলেকে। যে আর নেই।' কেঁদে ফেললেন বর্ধনজায়া।

সব কথা শুনে মিসেস কর অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। কিন্তু সেই ছেলেকে আবার দেখতে চাওয়ার তাৎপর্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। অবাক হলেন যখন শুনলেন যে মা আশ্বাস দিয়েছেন ওকে আবার দেখতে পাওয়া যাবে। তবে তার জন্যে সত্য পথে চলতে হবে, সমাজের সঙ্গে সত্য রক্ষা করতে হবে।

'না ভাই,' করজায়া হাল ছেড়ে দিলেন, 'আমি তো আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝতে পারিনে সেটা কেমন করে সম্ভব। হাজার সত্য পথে চললেও কি হারানিধিকে দেখতে পাওয়া যায়? সত্য পথে চলা নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু ফলপ্রদ কি না সংশয়ের বিষয়।'

'আমারও, ভাই প্রত্যয় হয় না।' বর্ধনজায়া কবুল করলেন, 'কিন্তু মা বলেছেন, উনিও বলছেন, একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। কিন্তু এদিকে মেয়ের বিয়ের কী উপায় হবে যদি ছেলেকে আবার দেখব বলে সত্য পথে চলি?'

'এর উত্তর,' বিচারকপত্নী বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, 'একমাত্র মা ই আপনাকে বলতে পারেন। আপনি তো তাঁকে দর্শন করতে যাবেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন।'

'হাঁ, তিনিই ভরসা।' বর্ধনজায়া নিঃসংশয়।

'কিন্তু', ফিক করে হেসে বললেন করজায়া, 'আমি ভাবছি এমন যদি হয় তো কেমন হয়। তর্কের খাতিরেই বলছি কিছু মনে করবেন না, ভাই। ধরুন, মা যদি অভিমত দেন যে, কার্তিক বা গণেশ যে চোদ্দ ক্যারাটে রাজী হবে তার সঙ্গেই বিয়ে হবে, আর কার্তিক যদি নারাজ হয় ও গণেশ রাজী হয়, তা হলে আপনি কী করবেন?'

'দিদি', বর্ধনজায়া মলিন মুখে বললেন 'তা হলে তো আমার এ জন্মের সাধ আহ্লাদ ফুরোল। আর কেন বেঁচে থাকা! মা যদি আমার সত্যিকারের মা হয়ে থাকেন তো আমাকে বাঁচবার পথ বাতলে দেবেন। ও যে মরবার পথ।'

'সত্যি!' করজায়া দরদের সঙ্গে বললেন, 'স্বর্ণশিল্পীদের আত্মহত্যার খবর সবাই ফলিয়ে লিখছে। সোজা রাস্তায় সোনা কিনতে না পেরে অরক্ষণীয়া কন্যাদের জননীরাও যে মরণপথযাত্রী একথা কি কেউ লেখে?'

॥ আট ॥

বিক্রমবাবুর তত্ত্বালাপে বাধা পড়ল যখন নিচের তলায় টেলিফোন বেজে উঠল। মেজ ছেলে পল্টু এসে জানিয়ে দিয়ে গেল যে কথা বলতে চান বাবাজী গৌরপ্রেম।

'ওঃ! গৌরপ্রেম! যার কথা আপনাকে বলছিলুম, জজসাহেব। ছোকরা অনেকদিন বাঁচবে। আমি আসছি। আপনি বসুন।' তিনি আসন ছেড়ে উঠলেন।

সরোজবাবুরও ওঠবার সময় হয়েছিল। তিনিও আসন ছেড়ে উঠে বললেন, 'আরেক দিন আসব। ওঁকে একটা খবর দিলে হয় না?'

গৌরপ্রেম বিশুদ্ধ বাংলায় কিন্তু বিদেশী উচ্চারণে যা বললেন তার মর্ম মা পরের দিন পুরী এক্‌সপ্রেসে হাওড়া পৌঁছবেন। বাবাজী একদিন আগে এসেছেন সন্তানদের শুভ সংবাদ দিতে। যদি কারো ইচ্ছা হয় তিনি স্টেশনে গিয়ে মাকে অভ্যর্থনা করতে পারেন।

সোজা বাংলায় বিক্রমবাবুকে হাওড়ায় হাজিরা দিতে হবে। পুলকিত হয়ে দিতেন যদি দিনটা হতো ছুটির দিন। কিন্তু কালকেই একটা গুরুতর মামলার শুনানী। অর্ধেকটা হয়ে রয়েছে, অর্ধেকটা বাকী। জজ সময় দেবেন না। তিনি যথাকালে প্রস্তুত হয়ে না গেলে অপ্রস্তুত হবেন। অথচ মা আসছেন শুনে তিনি আনন্দে অধীর।

'মা শুভাগমন করছেন।' তিনি বেশ একটু চেঁচিয়ে বললেন। যাতে দোতালায় শোনা যায়। 'কাল সকালের পুরী এক্‌সপ্রেসে।'

'ওমা, তাই নাকি!' বলে ছুটে এলেন তাঁর গৃহিণী। তাঁর পিছন পিছন কন্যাজায়া। কলরব করতে করতে ছেলেমেয়েরাও এসে জুটল। উপরে এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরও শোনা গেল। এর মধ্যে জনাকয়েক মক্কেল এসে অপেক্ষা করছিলেন। তারাও মুখর হলেন। সকলের মুখে এক কথা, 'আমরা যাব।' এমনকি কন্যাদম্পতির মুখেও।

বিক্রমবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এইটুকু তো প্ল্যাটফর্ম। কত ধরবে!' যদি প্রত্যেক ভক্তই সপরিবারে ও সপার্ষদে যান। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসও বোধ করছিলেন যে, এত লোক মার দর্শনপ্রার্থী। এই তো সবে আরম্ভ। আসবে, আসবে, সারা পৃথিবী আসবে।

শেষে স্থির হলো যে দুই বাড়ি থেকে দু'খানা মোটর যাবে। তাতে যত জনের আঁটে। ড্রাইভারদের বদলে স্টীয়ারিং ধরবেন একখানার স্বয়ং জজসাহেব, অন্যখানার শ্রীমান্ অভিজিৎ। বিক্রমবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র।

কখন একসময় বুড়ি মা নেমে এসেছেন কেউ লক্ষ করেনি। বেতো রোগী, কিন্তু তাঁরও অভিলাষ মাতৃদর্শন। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদর্শনও হবে।

তখন বিক্রমবাবু কী করেন! এক মাতৃভক্তির সঙ্গে আরেক মাতৃভক্তি ব্যালান্স করে ইহজন্মের মার পক্ষ নেন। 'মাকে জায়গা দেবার জন্যে আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। ওগো মাকে তুমি একটু বুঝিয়ে বলবে?' অর্থাৎ পূর্বজন্মের মাকে।

সবাই মিলে বিক্রমবাবুকে সাধাসাধি করেন, তিনি না গেলে চলবে কেন, তিনিই যে কর্তা। তিনি কিন্তু অনড়। মুখ ফুটে জানাতে বাধে যে, আদালত অপেক্ষা করবেন না, মামলা সবুর করবে না, মক্কেলের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সর্বাগ্রে প্রোফেশনাল এথিক্স। তিনি যে একজন দায়িত্ববান ব্যবহারজীবী।

তিনি যাচ্ছেন না শুনে সরোজবাবু ইতস্তত করেন। 'আপনি না গেলে আমার যাওয়া ভালো দেখায় না দাদা। কে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন?'

'সে ভাবনা আপনার নয়, ভাই। সে ভাবনা আমার। এক্ষুনি আমি গোরাকে টেলিফোন করছি।' বিক্রমবাবু অভয় দেন। 'আপনাকে দেখেই আমি অনুমান করেছি যে আপনিও একজন ভক্ত। না, না, প্রতিবাদ শুনব না। আপনি পরম ভক্ত।'

সঙ্গে সঙ্গে গৌরপ্রেমকেও জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বিক্রমবাবুর প্রতিবেশী জজসাহেব তাঁর হয়ে মাকে অভ্যর্থনা করতে যাবেন। ওঁকে যেন মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কোর্ট থেকে ফিরেই বিক্রমবাবু আশ্রমে গিয়ে দর্শন করবেন।

।। নয় ।।

বেচারা সরোজবাবু! দশচক্রে ভগবান ভূত। তেমনি ঘটনাচক্রে যুক্তিবাদীও ভক্ত।

সেদিন স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মন্তব্য করলেন, 'অদ্ভুত লোক বিক্রম বর্ধন! আমার মতো র‍্যাশনালিস্টকেও পরম ভক্ত বলবেন।'

'তোমার তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি।' মন্তব্যের উপর টিপ্পনী করলেন তাঁর গৃহিণী তথা সচিব তথা সখী। কালিদাসের বর্ণনা।

'কেন বল তো?' সরোজবাবুর মনে খটকা লাগে।

'এই জন্যে যে, তিনি না জেনে তোমার উপকার করেছেন। এই যে একটা সুযোগ তুমি পাচ্ছ এর সদ্ব্যবহার করলে পরে মার আশীর্বাদ পাবে।' তাঁর স্ত্রী ইঙ্গিত করেন।

'আশীর্বাদ বলতে তুমি কী বোঝ, মিনু?' সরোজবাবু জিজ্ঞাসু হন।

'এযুগে দেবদেবীদের দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁদের স্থান নিয়েছেন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী। বরভিক্ষা করতে হলে এঁদেরি কাছে করতে হয়। তোমার যদি কোনো প্রার্থনা থাকে পাগলিনী মাকে জানালে মা হয়তো সেটা পূরণ করবেন।' পরামর্শ দেন মৃণালিনী।

'আমার কি নিজের কোনো যোগ্যতা নেই যে নিজগুণে প্রাপ্য পদ পাব না? আরেকজনের পদধারণ করতে হবে?' সরোজবাবু অভিমান করেন।

'চুপ! চুপ! অমন কথা মুখে আনতে নেই।' স্বামীকে শাসন করেন শ্রীমতী।

'পুরুষকারের পুরস্কার ক'টা ক্ষেত্রে দেখছ? অত বেশি নিশ্চিত হবার কী আছে? তুমি তো পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিত নও। পরের মর্জি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে বসে আছো কোন্ যুক্তিতে? আজকাল সকলেরই গুরু আছে, মুরুব্বি আছে। তুমি ছাড়া।'

সরোজবাবুর ইচ্ছা করছিল জোর গলায় প্রতিবাদ করে বলতে যে, তিনি উচ্চ পদ চান না, না পেলেও তাঁর কোনো খেদ থাকবে না কিন্তু ওকথা শুনলে বিশ্বাস করতেন না তাঁর সহধর্মিণী। ওকথা না বলে তিনি আশ্চর্য একটি কথা বললেন। এটা কারো অবিশ্বাস্য। বললেন অন্তরের প্রেরণায়। আকস্মিক সে প্রেরণা।

'মার আশীর্বাদ যদি পাই,' বললেন ধরা গলায়, 'তবে সামান্য কিছু চাইব না। বলব, মা, যাবার আগে যেন আমি জেনে যেতে পারি কেন এ জগতে এসেছিলুম, কী দিয়ে গেলুম কী নিয়ে

গেলুম। মা যাবার আগে যেন আমি জেনে যেতে পারি যে, সব ভুলভ্রান্তি সব দোষত্রুটি সব অপরাধ সব পাপতাপসত্ত্বে মোটের উপর এ জীবন সার্থক, এর একটা মানে আছে। মা, ভগবানকে আমি ভালোবাসি, একথা তাঁকে বলতে আমার সাহস হয়নি, পাছে তিনি পরীক্ষাচ্ছলে আমাকে কাঙাল করেন। যাবার আগে সে সাহস যেন আমার হয়, আমার হয়।'

(১৯৬৫)

শরশয্যা

দ্বিতীয় দর্শনের দিন সন্ধ্যাকর বলে, 'এলেন যদি তবে এত দেরিতে কেন?'

'দেরিতে!' জাফরান থতমত খেয়ে বলে, 'কই, দেরি তো হয়নি!' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে বলে, 'আমার আসতে একটুও দেরি হয়নি। ঠিক পাঁচটায় এসেছি। আপনার ভিজিটিং আওয়ার্স তো পাঁচটা থেকে সাতটা।'

'মাফ করবেন, জাফরান দেবী।' সন্ধ্যাকর মৃদু হেসে বলে, 'আপনার ঘড়ির নিরিখে আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন। কিন্তু আরো একটা নিরিখ আছে যে। আমার জীবনের নিরিখ। এলেন যদি তো বছর দু'তিন দেরি করলেন কেন?'

জাফরাণ তো হতভম্ব। এর মানে কী!

'ঠিক সময়ে যদি আসতেন,' ব্যাখ্যা করে সন্ধ্যাকর, 'তাহলে হয়তো আমার এ দশা হতো না। ভীষ্মের মতো শরশয্যায় শুয়ে আছি। উঠব যে, তেমন কোনো আশা নেই। মরব যে, তেমন কোনো তাড়া নেই।' বেচারা অনেকদিন থেকে ভুগছে। প্রথমে স্যানিটারিয়ামে। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আরো উঁচুতে এই কটেজে। ঘরের বিরাট কাচের বাতায়ন দিয়ে হিমালয়ের চিরতুষার চোখে পড়ে। নার্স আছে, চাকর আছে, ডাক্তারও নিত্য দেখে যান। নিত্য না হলেও প্রায়ই দেখতে আসেন বৌদিদি, মাঝে মাঝে দাদা। রেলওয়ে অফিসার।

অনেকদিন থেকে ভুগছে বলেই হোক বা অন্য কোনো কারণ আছে বলেই হোক ওর আননে একপ্রকার আভা লক্ষ করা যায়। প্রথম দর্শনের দিন ওটা লক্ষ করে ভদ্রলোকের প্রতিকৃতি আঁকতে ইচ্ছা করে জাফরানের।

জাফরানের? হাঁ, জাফরান নামেই ওর পরিচয়। সুস্মিতা বললে পারিবারিক মহলের বাইরে কেউ ওকে চিনবে না। স্বাধীনতার আগে ও যখন দেশসেবিকা ছিল তখন জাতীয় পতাকার ওই রংটা ও আপনার করে নিয়েছিল। জাফরানী ছাড়া আর কোনো রংয়ের শাড়ি ব্লাউজ পরত না। সেই থেকে ওর সহকর্মীরা ওকে জাফরান নামে ডাকে। স্বাধীনতার পর দেশসেবা ছেড়েছে, কিন্তু জাফরানী সাজ ছাড়েনি। তাই নামটাও ওকে ছাড়তে চায় না। চিত্রকর ও চিত্ররসিকরাও ওকে জাফরান নামে চেনে। অগাস্ট আন্দোলনের সময় সেই যে নাম হয়ে যায় সে নাম অবিস্মরণীয়।

'ছি! ও কী।' জাফরান বাক্য ফিরে পায়। 'আপনি নিশ্চয় সেরে উঠবেন, সন্ধ্যাকরবাবু। আপনি এখনো বহুকাল বাঁচবেন। ভয় কিসের?'

'ভয়! না, ভয় একটুও নেই।' সন্ধ্যাকর নিঃশঙ্কভাবে বলে, 'প্রথমটা মনে হয়েছিল জীবনের সব সুখ ফুরিয়েছে, বাকী আছে প্রাণটুকু রাখা। তা তো নয়। এই অসুখটাও একটা সুখ। এটা একটা

অভিশাপ নয়। শুয়ে শুয়ে হিমালয়ের তুষারমালা দেখি। সৌন্দর্যের ধ্যান করি। ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই। আমি যা হারাবার তা হারিয়েই বসে আছি।'

জাফরান এমন কথা কখনো শোনেনি। ছবি আঁকতে ভুলে গিয়ে মানুষটির দিকে চেয়ে থাকে। একদা সুদর্শন ছিল, এখনো তার বেশ আছে। কিন্তু রোগ তার ছাপ রেখে গেছে।

জাফরানকে মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে শুনিয়ে যায় সন্ধ্যাকর। 'বড়ো অস্থিরপ্রকৃতির ছেলে ছিলুম আমি। সেই অস্থিরপ্রকৃতির তাল সামলাতে না পেরে একটা গড়ানে পাথরের মতো গড়াতে গড়াতে চলি সারা জীবন। চল্লিশের কাছাকাছি এসে দেখি কোথাও এক জায়গায় স্থিতি নেই, কোনো একটা জীবিকার স্থায়িত্ব নেই। অসংখ্য সম্ভাবনা নিয়ে জীবনের পত্তন, কিন্তু তাদের কোনোটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট, কোনোটা ফুল হয়ে ফোটার আগে কুঁড়িতেই শুষ্ক, কোনোটা ফল হয়ে পাকবার আগে কচিতেই বিচ্যুত। সেই চির অস্থির মানুষটাকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা নারীরও ছিল না, জাফরান দেবী।'

জাফরান শুনতে শুনতে রেঙে ওঠে। লুকিয়ে একটু একটু স্কেচ করে।

'শেষে সত্যি সত্যি একটা স্থায়িত্বের সূচনা হলো।' সন্ধ্যাকর বলে যায়। 'গতিশীল ছিলুম, হতে চললুম স্থিতিশীল। সবাই আমাকে অভিনন্দন জানায়। কোনো কাজের নয় বলে আমার উপর যারা আস্থাহীন তারাও চমৎকৃত হয়। ওদিকে অবচেতন মন বোধহয় চেয়েছিল যে আমি একটা কোনো অসুখে পড়ি। এক একবার সচেতন মনও চেয়েছে। তা বলে আমি প্রস্তুত ছিলুম না অকস্মাৎ শয্যাশায়ী হয়ে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কাটাতে। এটা অপ্রত্যাশিত। অথচ এটার পিছনেও একটা পটভূমিকা আছে।

জাফরান আঁকতে আঁকতে বলে, তাই নাকি

'হাজার অপ্রত্যাশিত হলেও কিছুই আকাশ থেকে পড়ে না মাটিতে তার শিকড় থাকে। তলে তলে তার প্রস্তুতি চলে ভূমিকম্পের মতো। একদিনে এটা হয়নি যদিও ভোজবাজির মতো দেখতে দেখতে আমগাছ ও পাকা আম।' সন্ধ্যাকর উপমা দেয়।

'হাঁ, যা বলেছিলুম,' সন্ধ্যাকর পুনরাবৃত্তি করে পটভূমিকা একটা থাকেই। ভেবে দেখুন সারা জার্মানি একটি ছেলে টো টো করে বেড়িয়েছে। দিনের বেলা শহর দেখেছে, রাতকম করেছে রাতের বেলা ট্রেনে চড়ে স্থানান্তরে গেছে। টাকার অভাব সেটাও তার একটা কারণ। কিন্তু আর একটা কারণ পুলিসকে ফাঁকি দেবার তাগিদ। তখনকার দিনে আমি কমিউনিস্ট ছিলুম কিনা। জার্মানরা আমাকে শেষপর্যন্ত ধরে হাজতে দেয়, ইংরেজ সরকারের সৌজন্যে খালাস হই। তারপর ইংরেজরাই আমাকে ধরে দেশে চালান দেয় আর বিনা বিচারে অন্তরীণ করে রাখে। সেই যে লাটিমের মতো ঘোরা সেটার মাশুল মাঝে মাঝে দিতে হয়েছে খুচরো অসুখে। এইবার সুদশুদ্ধ দিতে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধিহারে।'

জাফরান করুণ নেত্রে সমবেদনা প্রকাশ করে। শুধু বলে, 'ওঃ!'

'একটা শক্তি যেন আমাকে একদিন ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়। ওইয়ে রাখে।' সন্ধ্যাকর বলে যায়, 'কিন্তু সেই শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের ইচ্ছা আমার একটুকুও ছিল না। এখনো নেই। আমি যেন তার কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করি। যেন মন থেকে আশ্বাস পাই যে সেই শক্তি যা করেছে তা মঙ্গলের জন্যে। যা করবে তাও মঙ্গলের জন্যে। তার হাতে আত্মসমর্পণ করলে সে আমাকে মারতেও পারে, বাঁচাতেও পারে। কিন্তু যেটাই করুক সেটা মঙ্গলের জন্যে।'

তাই যদি হয় তবে—জানতে কৌতূহল বোধ করছিল জাফরান, কিন্তু দমন করছিল সে কৌতূহল—ঠিক সময়ে এলে এমন কী লাভ হতো?

জাফরান স্কেচ করতে করতে বলে, 'আপনার নিশ্চয় অত কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার অবশ্য আপনাকে বেশি কথা বলতে বারণ করে থাকবেন।'

'ডাক্তার!' সন্ধ্যাকর নিঃস্পৃহভাবে বলে, 'ডাক্তারকে একটা চান্স দিতে হয়। সেইজন্যে দিচ্ছি। নইলে আমার যা রোগ ডাক্তাররা তার সন্ধান পাবেন কী করে? ডাক্তারদের ধারণা সবকিছু নিছক জৈব ব্যাপার। একটা পশুও যা একটা মানুষও তাই। ইদানিং সাইকিয়াট্রিস্টদের উদয় হয়েছে। তাঁদের ধারণা মানুষের একটা মগ্নচৈতন্য আছে, সেইখানেই ব্যাধির উৎপত্তি। কারো ধারণা ভুল নয়; আবার কারো ধারণাই নির্ভুল নয়। ডাক্তারের সঙ্গে এবং মনসের আমি একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছতে পারছিলুম না। এর থেকে যদি ট্র্যাজেডী না আসে তো আসবে কোন সূত্র থেকে?'

'এখন পৌঁচেছেন?' জাফরান জিজ্ঞাসু হয়।

'অনেকটা।' সন্ধ্যাকর ভেবে উত্তর দেয়। 'এই বস্তুজগতের কোথাও না কোথাও একটা মূল আছে। একটা কেন্দ্র আছে। সেইখান থেকে বিকিরিত হচ্ছে প্রাণরস। তার সঙ্গে যদি সংযোগ কেটে যায় তা হলেই আমি অসুস্থ। যদি সংযোগ ফিরে আসে তা হলে সেই আমাকে সারিয়ে তুলবে। জুইয়ে রেখে আমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে প্রকৃতি। ...এখনো স্পষ্ট নয় কেন আমি বাঁচব। বৃহত্তর অর্থে বাঁচতে না পারলে ক্ষুদ্রতর অর্থে বেঁচে কী হবে। সেরকম বাঁচা তো এতদিন বাঁচলুম। অসংখ্য অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয় দিয়ে লুটেছি, বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ নিয়েছি। ...অভিজ্ঞতা দিয়ে সুটকেসের মতো ঠেসেছি। তবু কিছু?

॥ দুই ॥

জাফরান কোনোদিন কল্পনা করেনি, কেই বা করেছিল যে দেশ রাতারাতি ভাগ হয়ে যাবে। পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী হয়ে জীবিকার জন্যে দরবার করতে হবে। আশা আছে তার দরখাস্ত একদিন সফল হবে, দিল্লীতেই ছবি আঁকার কমিশন পাবে। আপাতত বছরে একবার কি দু'বার চিত্রপ্রদর্শনী, কোথাও পেলে ঠিকে চাকরি। কার্শিয়ং এসেছে একটা ইউরোপীয়ান স্কুলে ড্রইং শেখাতে। সেই সঙ্গে ফরাসী। হাঁ, ফ্রান্সে বছরদুই ছিল। সরকারী বৃত্তি পেয়েছিল।

কার্শিয়ং এসে এক বাঙালী পরিবারে উঠেছে। সম্পর্কীয় জামাইবাবু রেলওয়েতে কাজ করেন। সম্পর্কীয়া দিদির আপন দেওর হলো সন্ধ্যাকর। দিদি যখন তাকে দেখতে যান তখন জাফরানকেও সঙ্গে নিয়ে যান। জাফরানের মুখে ইউরোপের যুদ্ধোত্তর রূপের বর্ণনা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল সন্ধ্যাকর। প্রথম দিনটা তার সেই আগ্রহ পূরণ করতে হয় জাফরানকে।

আগাস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী নায়িকার নাম সন্ধ্যাকরের অবিদিত ছিল না। সে বন্দনা জানিয়ে বলে, 'মাতরম বলতে পারব না, তার বদলে কী যে বলব জানিনে। সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুস্মিতাং বলেই বন্দনা করি, দেবী।'

জাফরান তা শুনে রাঙা হয়ে ওঠে। বলে, 'থাক, থাক, অপরাধ হবে। ও আগুন আপনি জ্বলেছে, আমি জ্বালাইনি। আপনি নিবে গেছে, আমি জাগিয়ে রাখতে পারিনি। বন্দনাটা আমার প্রাপ্য নয়। আমি যেন দম দেওয়া খেলনা। আমার দম ওই একবারেই ফুরিয়ে গেছে। এখন আমি সাধারণ মেয়ে।'

সন্ধ্যাকর অবশ্য সেটা মেনে নেয় না। জাফরানও আর ওকথা শুনতে চায় না। ছবি আঁকার কাজই তার জীবনের কাজ। তার স্বধর্ম। সন্ধ্যাকরের ছবি আঁকবে বলে ওকে চমকে দেয়।

'আমার চেহারা যখন আঁকবার মতো ছিল', সন্ধ্যাকর বলে, 'তখন আপনি ছিলেন কোথায়? এই হাড়গিলেটাকে অমর করে দিয়ে আপনার যশ বাড়বে না, জাফরান দেবী।'

জাফরান তার সঙ্কল্পে অটল থাকে। তাই দ্বিতীয় দর্শন। এবার দিদির সঙ্গে নয়, এবার একা। বেশিক্ষণের জন্যে নয়। একদিনে আঁকা হবে না। বারবার আসতে হবে। সেই সূত্রে নিঃসঙ্গ মানুষটিকে একটু সঙ্গ দেওয়া যাবে। এটা দিদির বিশেষ অনুরোধ। সন্ধ্যাকর ইউরোপের গল্প শুনতে ভালোবাসে।

দেখা গেল গল্প শোনার চেয়ে গল্প করাই তার পক্ষে আরো প্রীতিকর। জাফরান তাকে থামাতে চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়। সন্ধ্যাকর বলে, 'দেরি করে আসার পর সকাল সকাল ওঠা? এই আপনার বিচার?'

'পাঁচটায় এলে যদি দেরি হয় তাহলে কাল আরো আধঘণ্টা আগে আসতে পারি?' জাফরান জানতে চায়।

'নিশ্চয় আসবেন।' আপ্যায়িত হয়ে আপ্যায়নের প্রস্তাব করে সন্ধ্যাকর। 'এইখানেই চা খাবেন।' কিন্তু জুড়ে দিতে ভুলে যায় না যে, 'কালকেও আপনাকে একই কথা বলব। এলেন যদি তো এত দেরিতে কেন? এত দেরিতে আমার জীবনে?'

জাফরান ভেবে বলে, 'সময় পেলুম কবে যে আসব! বছর চারেক আগেও আমি দেশকর্মী। দেশ স্বাধীন না হলে কেশ বাঁধব না। দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা। স্বাধীনতার দিন আমি ছিন্নমূল। আমার দেশের মাটি থেকে আমি বিচ্ছিন্ন। দেশ বলতে যদি বুঝি পূর্ববঙ্গ। কী একটা কাণ্ড ঘটে গেল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে। আমিও অসুখে পড়তুম। সে অসুখও মানসিক থেকে কায়িক হতে পারত। সেদিন আমার আর্ট আমাকে ত্রাণ করে। এককালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষা করেছিলুম। তারপরে চর্চা রাখিনি। ভুলে গেছি। পুরোনো দিনের ছবিগুলি পাবনা থেকে সরাতে গিয়ে হঠাৎ মনে এলো আমি আবার আঁকতে চাইলে আঁকতে পারি। এ যেন বহুকাল অনভ্যাসের পর নদী দেখে সাঁতার কাটতে চাওয়া ও পারা। আমার এমন নেশা ধরে যায় আমি সম্পূর্ণ ভুলে যাই আমার চারদিকের অভাবনীয় বিপর্যয়। আর্ট এমন ভোলাতেও পারে!'

তন্ময় হয়ে শোনে সন্ধ্যাকর। জাফরানের কথা শেষ হলে বলে, 'আমার বেলা আর্ট ছিল না ত্রাণ করতে। আর্টের মতো আর কিছু ছিল না। আমাকে ত্রাণ করতে পারত যে তার নাম শক্তি। আমার শক্তি। যে শক্তির কথা বলেছি তার সমকক্ষ অপর এক শক্তি। এই শক্তি যদি আমার থাকত এ কখনো আমাকে আত্মসমর্পণ করতে দিত না। এ আমাকে সংগ্রামের প্রেরণা দিত। হয়তো জিতিয়ে দিত। আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না, জাফরান দেবী, শক্তি মানে কী। শক্তি মানে নারী।'

জাফরান এবার গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'আপনার উচিত ছিল বিয়ে করা।'

'কিন্তু কাকে?' সন্ধ্যাকর করুণ স্বরে বলে। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। জাফরান এর কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার অন্য একটা এনগেজমেন্ট ছিল।

'আসবেন। আবার আসবেন। আর্টের নেশায় আসবেন। আমি আপনার বিষয়বস্তু।' এই বলে সন্ধ্যাকর নমস্কার করে।

উত্তরের কাচের জানালা দিয়ে হিমালয়ের তুষারশিখর দেখা যায়। সন্ধ্যাকরের দৃষ্টি তারই উপরে সর্বক্ষণ। এমন লোভনীয় দৃশ্য জাফরানের দিদির বাড়ি থেকে নজরে আসে না। স্কুল থেকেও

না। অন্তত এই কারণেও কয়েক শ' ফুট উঠে জাফরানের মতো শিল্পীর রোজ কষ্ট করে দেখতে আসা সার্থক। যদিও সে কথা দেয় না যে রোজ কিছুক্ষণের জন্যে আসবে তবু মনে মনে স্থির করে যে হাতে অন্য কাজ না থাকলে রোজ একবার এসে দিগন্তের তুষারশোভা দেখবে।

'আবার আসব। আজ তবে আসি।' বলে সে নমস্কার করে।

॥ তিন ॥

বুড়িদির সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়। বুড়িদি যা বলেন সে এক গল্প।

ওরকম একটি ব্যস্তবাগীশ ফুর্তিবাজ ছেলে বুড়িদি তাঁর জীবনে দেখেননি। ফুলের মতো নরম ছিল ওর মন, চেহারাও ফুলের মতো কমনীয়। সেই ফুলের ভিতরে একদিন উচ্চাভিলাষের কীট প্রবেশ করে। কীটের জ্বালায় ও জর্জর হয়। ওটাও একপ্রকার জ্বর।

ওর বন্ধুরা একে একে বিলেত চলল। সবাই জীবনে উন্নতি করবে। বড়ো বড়ো পদ পাবে। ব্যারিস্টার হয়ে দশহাজারী বিশহাজারী মনসবদার হবে। ডাক্তার হয়ে নাম করবে। এনজিনীয়ার হয়ে কীর্তি রাখবে। আর ওর কী ভবিষ্যৎ! বনগাঁয়ের শেয়ালরাজা। ক্ষুদে জমিদার। কোথায় যেন দুটো একটা খনি আছে। পড়াশুনা তো মন দিয়ে করেনি। সম্পত্তি দেখাশুনা করতে হবে। বাপের আদেশে বিয়ে। ওদিকে ওর বান্ধবীদের সংখ্যাও কম নয়। বন্ধুদের বোন। বিয়ে করতে হলে ওদেরি একজনকে করতে হয়। কিন্তু কী দেখে কেউ ওকে মালা দেবে? বিদেশের ডিগ্রী কোথায়?

বিলেত ও যাবেই। কারো কথা শুনবে না। এক দিন ওকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায় না, দেশেও না। ও নিরুদ্দেশ। অনেকদিন পরে খবর মেলে ও প্যারিসে ডাক্তারি পড়ছে, বন্ধুদের চাঁদায়। ওর বাবা কী আর করেন! মাসোহারা পাঠান। তারপর শোনা যায় ও লণ্ডনে গিয়ে এনজিনীয়ারিং পড়ছে। মাসোহারা পাঠানো হয়। তারপর ও লেখে ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিচ্ছে। দেখা যায় নিজের সম্বন্ধে ওর যেমন উচ্চ ধারণা পরীক্ষকদের তেমন নয়। ওর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস নিছক রাজনৈতিক কারণে ওকে উত্তীর্ণ হতে দেওয়া হয়নি।

একথা সত্য যে, দেশে থাকতে ও প্রজাদরদী ছিল। প্রজাদের সঙ্গে মিশত। বংশগত জমিদারি মেজাজ থেকে ও ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। লোকে বলত দত্তকুলের প্রহ্লাদ! সিভিল সার্ভিসে ঠাঁই না পেয়ে ও কমিউনিজমের দিকে ঝোঁকে। কমিউনিস্টরাও ওকে আর ওর মাসোহারাকে নিজেদের কাজে লাগায়। এরপর বাড়ি থেকে মাসোহারা বন্ধ করে দিতে হয়, যাতে ও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে। ও কিন্তু খালি হাতে ফিরবে না। খালি হাতে ফিরলে বান্ধবীদের কাছে মুখ দেখাবে কী করে? গতানুগতিক একটা ধরা বিয়েতে ও নারাজ।

ও বরং ইউরোপেই থেকে যাবে, বিপ্লবী নায়ক হবে। দেশে যদি ফেরে তো লেনিন হয়ে ফিরবে। কোনো এক কমরেডকে বিয়ে করবে। মাসোহারা বন্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে। যাদের এতদিন খাইয়েছে তারা কি ওকে খাওয়াবে না? ফাইফরমাস খাটবে, খুচরো মজুরি নেবে। পার্টির তরফ থেকে স্পেনে যাবে, জার্মানীতে যাবে, খরচ জুটবে গোপন সূত্র থেকে।

শেষে একদিন খবর আসে ছেলে পচছে হিটলারের হাজতে। সেখান থেকে ওকে ছাড়িয়ে আনতে পারে যে তার নাম ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। ওরা সেটা বিনা শর্তে করবে না। ছেলে ছাড়া পায়

বাঘের কবল থেকে। কিন্তু সিংহ ওকে ভারতে ফেরৎ পাঠায়। এদেশে ওকে কিছুদিন অন্তরীণ করা হয় দেশের বাড়িতে। সে সময় দেখা যায় ওর অসুখ করেছে। চিকিৎসার খাতিরে অন্তরীণের হুকুম রদ হয়। ও আবার ঘুরেফিরে বেড়ায়, কিন্তু আর রাজনীতি নয়। এবার বিজনেস।

হাজারিবাগে ওদের একটা অভ্রের খনি ছিল। যুদ্ধের সময় সেটাই হয়ে ওঠে সোনার খনি। সন্ধ্যাকরই দেখাশুনা করে। সরকারী কর্মচারীদের খানা দেয়। সাহেবদের সঙ্গে খানা খায়। একদিন শোনা যায় ও নাকি একটা এমার্জেন্সী কমিশন বাগিয়ে বসেছে। যুদ্ধে যাচ্ছে। মা থাকলে কান্নাকাটি করে থামাতেন। বাপকে বোঝায় যে এই ওর জীবনের মোক্ষম সুযোগ। এর থেকে ওকে বঞ্চিত করলে ও আর বাঁচতে চাইবে না।

উত্তর আফ্রিকায় লড়তে গিয়ে ওয়েভেলের নেকনজরে পড়ে যায়। ওয়েভেল যখন বড়লাট হয়ে আসেন তখন তাঁর পার্সনাল স্টাফে ওকেও একটা উল্লেখযোগ্য পদ দেন। বড়লাটের সঙ্গে দিল্লী, সিমলা, করাচী, কলকাতা করতে করতে ও সত্যি সত্যি একজন কেষ্ট বিষ্টু হয়ে ওঠে। ওর জীবনের ওই মহিমাময় দিনগুলি আর ফেরবার নয়। স্বাধীনতার বছর খানেক আগে ও টের পায় যে শাসন ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আসন্ন।

এবার ও একজন কংগ্রেস নেতার প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়। মাইনে নেয় না। বড়লাটের সঙ্গে কংগ্রেসের যেসব গোপন পরামর্শ হয় সেসব ব্যাপারে সন্ধ্যাকরেরও কিছু হাত থাকে। দু'শো বছরের সাম্রাজ্যের শেষ ক'টা দিন ও স্বচক্ষে দেখেছে শুধু নয়, ভিতর থেকে দেখেছে ও হাত লাগিয়েছে। ওর জীবনের ওই যেন পরম মুহূর্ত।

স্বাধীনতার পর এক ইউরোপীয় ফার্ম ওকে একজন ডাইরেক্টার করে নেয়। ওর কাজ হয় দিল্লীতে গিয়ে নতুন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। উন্নতির সীমা পরিসীমা নেই। অতঃ উড্ডয়নের। কতবার যে আকাশে উড়ে বিলেত এল গেল। কলকাতা দিল্লী তো সর্বদাই।

এইবার ও সেটল্ড হবে। সেটল্ড হলে পরে বিয়ে থা করবে। বিয়ে থা করলে পরে অত ছুটোছুটি করবে না। স্থায়ীভাবে দিল্লীতে বসবাস করবে। কোম্পানী দেবে বাড়ী। কিন্তু এমন সময় ঘটল এক বিভ্রাট। ডাক্তার দেখে বললেন, শুইয়ে রাখতে হবে। যেতে হলো নার্সিং হোমে। বছর খানেক বাদে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কার্শিয়ং। শুইয়ে রাখা হলো স্যানিটোরিয়ামে। বছর খানেক বাদে থাকতে বলা হলো কটেজ নিয়ে। এখন কে জানে কতকাল লাগবে কটেজে থেকে সুস্থ হতে।

এত অগণ্য যার বন্ধুবান্ধবী, দিদি বলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাদের একজনেরও দেখা নেই। মিতু, তুই ওর দুর্দিনের বন্ধু। ছবি আঁকছিস ওর। সঙ্গ দিচ্ছিস ওকে। যতদিন আছিস এখানে ওকে একটু ভুলিয়ে রাখিস। ও যেন হিমালয়ের উপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকা কলহংস। ডানা ভেঙে মাটিতে পড়ে আছে। আর কবে সেরে উঠবে। ডানায় জোর পাবে। উড়বে।

॥ চার ॥

ড্রয়িংবোর্ড প্রত্যহ যায়। স্কেচ করে। তারপর একদিন ইজেলের উপর ক্যানভাস রেখে তুলি ধরে রং দিয়ে প্রতিকৃতি শুরু করে দেয়।

সন্ধ্যাকরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'তা হলে এই থাকলে?'

জাফবান বুঝতে পাবে না। 'ওব মানে কী, সন্ধ্যাকবদা?'

'আমি যখন থাকব না তখন এই ছবি থাকবে? শুধু পটে লিখা?' সন্ধ্যাকরেব প্রশ্ন।

না, না, আপনিও থাকবেন। বিশ বছব পবে এই ছবিব দিকে তাকিয়ে ভাববেন, কবে একবাব আমাব অসুখ কবেছিল, সে অসুখ বেখে গেছে এই ছবি। কে যেন এঁকেছিল এটা? মনে পড়ছে না ওব নাম। নেহাৎ কাঁচা হাত। এমেচাব অর্টিস্ট হলে যা হয়। দাম দিয়ে কেনবাব মতো নয়। এটা ওব উপহাব।' জাফবান ছবিব উপব দৃষ্টি বেখে বলে।

'সৌভাগ্য! আমাব সৌভাগ্য।' সন্ধ্যাকব আবেগে রুদ্ধস্বব।

'দেশসেবিকা হিসাবে হয়তো আমাব কিছু নাম ছিল, সেটাকেই ভাঙিয়ে খাচ্ছি এখন। তা নইলে আমি কি একটা আর্টিস্ট না এটা একটা ছবি।' জাফবান ভবসা দিয়ে বলে, 'আপনি যখন সেবে উঠবেন, যখন আপনাব চেহাবা আগেব মতো হবে, তখন কোনো একজন ভালো চিত্রকবকে দিয়ে ভালো একখানা ছবি আঁকিয়ে নেবেন সন্ধ্যাকবদা। আব এখানা আমাকে উপহাব দেবেন। আমি বাঁধিয়ে বাখব।'

'ধন্যবাদ।' সন্ধ্যাকব হাসিব চেষ্টা কবে। 'আপনাব আশীর্বাদ আমাকে অভিভূত কবেছে, জাফবান দেবী।'

থাক, অতঃপব 'দেবী' 'দেবী' বলতে হবে না। সোজাসুজি জাফবান ব'লেই ডাকবেন আমাকে। বয়সে আমি অনেক ছোট না অনেক ছোট না। স্বাধীনতাব দিন আমাব বয়স ছিল ত্রিশেব একটু উপবে।' জাফবান বাকিটা অনুমানেব উপব ছেড়ে দেয়।

'তা হলে ম্যাসাকাব বিপ্লবেব সময় বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ আশ্চর্য। কী কবে আসামেব সংগ্রাম পবিচালনা কবলেন।' সন্ধ্যাকব বিস্ময়ভবা চোখে তাকায়।

আচ্ছা আপনি ওইবকম কবেই চেয়ে থাকুন আমাব দিকে।' জাফবান বলে সকৌতুকে। 'আপনাব ওই বিস্ময়টাকেই আমি রূপ দিব আমাব চিত্রে। তাহলে ছবিখানা ঢেব বেশি সজীব দেখাবে। বিষাদেব চেয়ে বিস্ময় ভালো নয় কি?'

'এতদিন আমি কেবল নিজেব ভাগ্য বিপর্যয়েব কথাই ভেবেছি। তাই বিষাদই আমাব পক্ষে স্বাভাবিক। এতদিন পবে নতুন একটা ভাব এলো। বিস্ময়। নিজেব খোলাব বাইবে বেবিয়ে কচ্ছপ যেমন বোধ কবে আমিও তেমনি বোধ কবছি। কত বৃহৎ এ জগৎ। কত বিচিত্র এ সংসাব। কেবল আপনাকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকাটা কিছু নয়। সকলেব মধ্যে বাঁচতে চাই। সকলেব সুখদুঃখেব অংশ নিতে চাই। অঙ্গ হতে চাই আমাব চেয়ে যা বড়ো তেমন কোনো সত্তাব। যে আমাব পবেও থাকবে। আমি যদি না থাকি তবে তাবই অঙ্গীভূত হয়ে থাকব। যেভাবে আছি সেভাবে আমি থাকতে পাবিনে, জাফবান। দু'দিন বেশি কমে কী আসে যায়।' এক নিঃশ্বাসে বলে চলে সন্ধ্যাকব।

'খুব আসে যায়। একটা দিনও যে নবাব নাবি।' জাফবান ছবিব উপব দৃষ্টি বেখে বলে। 'একটা দিনও একটা শতাব্দী। শুধু ঘটনাব জন্যে নয় অনুভূতিব জন্যেও। আপনি যদি দুটো দিন বেশি বাঁচেন তা হলে আপনাব অনুভূতিব ভাণ্ডাব আবো ভববে। ভিতবটা যদি আবো ভবে যায় বাইবেটা আব না খুলবে। বস থেকে আসবে রূপ।'

এমনি অনেক কথা। বলে প্রশান্ত সন্ধ্যাকব। ওকে তো আঁকতে হচ্ছে না।

'হিমালয়েব দিকে চেয়ে আমাব সময় কাটে, জাফবান। ওকে যতক্ষণ দেখি ততক্ষণ আশ্বাস পাই যে সব ঠিক আছে, ভগবান আছেন তাঁব স্বর্গে জগৎ আছে যেখানে তাব থাকা উচিত। যদি সত্যি কোনোদিন সেবে উঠি তা হলে এইখানেই ডেবা বাঁধব। আব সমতলে নামব না। যে জীবন পিছনে ফেলে এসেছি আব সে জীবনে ফিবব না। নতুন মানুষ হতে চাই। এই অসুখটা যেন আমাকে

নতুন করে দেয়। এই আমার প্রার্থনা।' সন্ধ্যাকর এক অলক্ষ্য শক্তির উদ্দেশে হাত জোড় করে।

'আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হোক। আপনি নতুন হয়ে উঠুন। নিরাময় নিয়ে আসুক নবীনতা।' জাফরান তার শুভকামনা জানায়।

'কিন্তু এই সঙ্গীহীন জীবন আমার সহ্য হবে কি?' হঠাৎ বলে ওঠে সন্ধ্যাকর। 'আমি তো যোগী নই যে হিমালয়ের কোলে বসে ধ্যান করেই সন্তুষ্ট থাকব।'

জাফরান চমকে ওঠে। বলে, 'না, সঙ্গীহীন থাকা উচিত হবে না। আত্মীয়দের বলবেন পালা করে আপনার কাছে এসে থাকতে। ইচ্ছা করলে আশ্রম স্থাপন করতে পারেন। সাধুরা আসবেন। আপনি সাধুসেবা করবেন। কিংবা একটা স্কুলই খুলবেন। আজকাল অনেকেই তাঁদের ছেলেদের পাহাড়ে পাঠাতে চান পড়তে। ছাত্রের অভাব হবে না। শিক্ষকও পাওয়া যাবে। চেষ্টা করলে অর্থও জোটে।'

· সন্ধ্যাকর বলি বলি করে বলতে পারে না যে সঙ্গী বলতে ও বোঝে সঙ্গিনী।

পরে একদিন ওই প্রসঙ্গ আবার ওঠে। সন্ধ্যাকর খোলাখুলি বলে যে সঙ্গী মানে সঙ্গিনী। যে ওকে ভালোবেসে বিয়ে করবে। যদি তেমন মেয়ে পৃথিবীর কোথাও থাকে।

'ওঃ! এই কথা!' জাফরান সপ্রতিভভাবে বলে, 'আমাদের রেলওয়ে কলোনিতেই আছে। বেশি দূর যেতে হবে না। ওরা পাহাড়ে বারোমাস বাস করতে অভ্যস্ত। সমতলের জন্যে চঞ্চল নয়। আপনার প্রস্তাব আমরা ওদের কাছে পৌঁছে দেব। বুড়িদি আর আমি। ওদের আমি গুরুজনদের মারফৎ। কিন্তু তার আগে আপনাকে সেরে উঠতে হবে। রোগটাকে আপনি ঝেড়ে ফেলুন, সন্ধ্যাকরদা।'

'শক্তি চাই যে। শক্তিরূপিণী না হলে শক্তি জোগাবে কে!' সন্ধ্যাকর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইশারায় বোঝায় যে আরোগ্য নির্ভর করে নারীর উপর। নারীই সারিয়ে তুলবে।

কথাটা বুড়িদির কানে তুলতেই তিনি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন। বলেন, ' কেউ রাজী হবে না। একজনও রাজী হবে না। সেরে ওঠার আশা একান্ত ক্ষীণ। সেরে উঠলে বরং চেষ্টা করা যাবে। যখন ওকে বিয়ের জন্যে সাধা হয় তখন ধরাছোঁয়া দেয় না। ওর মা তো সেই দুঃখেই মারা গেলেন। তারপরেও কতবার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে। সব ভেস্তে গেছে। এই নির্বোধ এখন রেল কলোনির কেরানীর মেয়ে বিয়ে করতে পেলে বর্তে যায়। হায়! এও দেখতে হবে!'

'মানুষটাকে বাঁচাতে হলে ওছাড়া আর উপায় নেই, বুড়িদি।' জাফরান বিবেচনা করতে বলে। 'ওঁর যদি জাতধর্মের বিচার না থাকে আমি আমার স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের বাজিয়ে দেখতে পারি। একটি ভালো নেপালী খ্রীস্টান মেয়ে আছে। বয়সেও ওঁর সঙ্গে মিশ খাবে।'

'ওর না থাক, আমাদের তো জাতধর্মের বিচার আছে। আমরা ওরকম একটা বিয়েতে যোগ দিতে যাব কেন?' বুড়িদি অসহযোগের ভয় দেখান।

।। পাঁচ ।।

ঘটকালি করা মেয়েদের মজ্জাগত নেশা। জাফরানও এর ব্যতিক্রম নয়। দার্জিলিঙে বেড়াতে যায় ফী রবিবার। সেখানেও সন্ধ্যাকরের জন্যে পাত্রী অন্বেষণ করে। বুনো হাঁস তাড়ায়।

সুখের দিনে বিয়ে না করলে দুঃখের দিনে বৌ জোটে না। এই মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করে জাফরান সেটা বিশ্বজনকে শোনাতে চায়, যাতে লোকের শিক্ষা হয়। চোখ ফোটে। বিশ্বজনকে তো হাতের কাছে পাচ্ছে না। বুড়িদিকে দিয়ে আরম্ভ করে।

'খুব খাঁটি কথা। সন্তু যদি সুখের দিনে ওই জীবনবীমাটি করে রাখত!' বুড়িদি কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করেন।

তত্ত্বটাকে সন্ধ্যাকরের কাছে প্রচার করতেই ও বেচারার মুখখানি শুকিয়ে যায়। জুলিয়াস সীজারের মতো ও বলে, 'তুমিও, ব্রুটাস!'

জাফরান তা শুনে বিমূঢ় হয়। সামলে নিয়ে বলে, 'অন্যায়টা কী বলেছি, সন্ধ্যাকরদা? আপনি যদি সময়ে বিয়ে করতেন তা হলে আজ আপনার সাথীর অভাব হতো কি?'

'বিয়ে কি শুধু একজনের ইচ্ছায় হয়, জাফরান?' সন্ধ্যাকর কাতরস্বরে শুধায়।

'না একজনের ইচ্ছায় নয়। আপনার মার শুনেছি বিশেষ ইচ্ছা ছিল। আপনার অনিচ্ছার জন্যেই শুনেছি ওঁর মনে আঘাত লাগে, সেই আঘাত প্রাণান্তিক হয়।' জাফরান উত্তর দেয়।

'তা হলে তোমাকে শুনতে হয় আরো আগেকার কথা।' সন্ধ্যাকর শোনায়। 'আমি যখন দেশ ছেড়ে পশ্চিমে পাড়ি দিই তখন একজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাই যে জয়ী হয়ে ফিরব, সে যেন আমার জন্যে তার জয়মাল্য তুলে রাখে। কিন্তু ফিরলুম যখন তখন আমি পরাজিত, জয়মাল্য আমার পাওনা নয়। তখন আমি গভীর বেদনার সঙ্গে ওকে নিষ্কৃতি দিয়ে বলি, শুধু তোমাকে নয় কাউকেই বিয়ে করব না, যতদিন না আমি জয়লাভ করছি। কাউকেই বিয়ে করব না বলার পর মার কথায় রাজী হই কী করে? হলে ও মেয়েটি কী মনে করত? ভাবত আমার কথার ঠিক নেই। মা যদি বুঝতেন তা হলে আমি কত সুখী হতুম!'

'তারপরও তো আপনি বিয়ে করতে পারতেন, যখন জয়লাভ করলেন?' জাফরান শুধায়।

'পারতুম। কিন্তু ততদিনে আমি আরো ক্রিটিকাল হয়েছি। যাকে তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নই। আমি চাই এমন একটি নারী যে আমার চেয়ে সুপিরিয়র। যাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পূজা করতে পারি। আর যে আমার প্রতি বরদা। তাকে আমি নানারূপে দেখেছি, কিন্তু সে আমার দিকে ফিরে তাকায়নি। বোধহয় মনে করেছে আমি একটা দৌড়ঝাঁপ করনেওয়ালা বেশি মাইনের দৌবারিক। যখন শেষে ডাইরেকটার হই তখনি আসে সত্যিকার সম্মানের সময়। আর তখনি আসে ওই ব্যাধিবাণ। সেই থেকে শরশয্যায় শুয়ে আছি। আবার পরাজিত।' সন্ধ্যাকরের চোখের জল বাধা মানে না।

জাফরান দুঃখিত হয়ে বলে, 'তা হলে আর আপনার দোষ কী! আপনার বরাত!'

'কিংবা বলতে পারো বিধির বিধান।' সন্ধ্যাকর জাফরানের চোখে চোখ রেখে বলে, 'কেউ একজন আমার জীবনে আসবে বলেই আর সকলে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ভুল মেয়েকে বিয়ে করলেও তো পস্তাতে হতো। তুমি কি ভাবছ বৌ মাত্রেই কার্শিয়ং ছুটে আসত, বরাবরের মতো থেকে যেত? কর্তব্যহিশাবে যেটুকু করণীয় তার উপরে উঠতে চায় ক'জন? আর আমিও কেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি? আমি চাই প্রেম। আমি চাই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। আমার সঙ্গে বাস করার আনন্দ। আমি কি কেবল রোগী? আমি বীরপুরুষ নই? তুমি যখন আসামে বিদ্রোহ পরিচালনা করছ আমি তখন ইজিপ্টে সৈন্য পরিচালনা করছি, বেনগাজীতে প্রবেশ করছি। সেই আমি এই আমি।'

ছবিখানা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। জাফরান ওর গায়ে আবার তুলি চালায়। বীরপুরুষের ভাব ফোটাতে হবে। বিষাদ থেকে বিস্ময়, তার থেকে অকুতোভয়।

এর দিনকয়েক পরে ছবিখানা সন্ধ্যাকরকে উপহার দিয়ে জাফরান বলে, 'সন্ধ্যাকরদা, এটি

আপনার কাছে রেখে দিন। এর দিকে তাকালে বেনগাজী মনে পড়বে।'

সন্ধ্যাকর সাধুবাদ দেয়। কিন্তু উপহার নিতে অসম্মত হয়। বলে, 'আমি তো আঁকতে বলিনি। তুমি এঁকেছ, তোমার হাতের কাজ। প্রদর্শনীতে দাও বা কাছে রাখ যেমন তোমার অভিরুচি। ছবিটা থাকুক, এই আমি চাই। ছবি আমি রাখব যে, আমাকে রাখবে কে?'

ওদিকে দিল্লী থেকে চিঠি এসেছিল। নিযুক্তি পত্র। জাফরান টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছে যে যথাসম্ভব কাজে যোগ দেবে। আত্মীয়রা বন্ধুরা সবাই ওকে অভিনন্দন করেছে। এমন সুযোগ হারাতে নেই। কার্শিয়ং কিছুদিনের জন্যে ভালো। ওর মতো শিল্পী কি সেখানে আটকা পড়ে নিজের তথা দেশের ক্ষতি করতে পারে? মন বলছে, চল, চল, দিল্লী চল।

'বিদায় নিতে এলুম সন্ধ্যাকরদা।' একদিন জাফরান এসে শয্যার পাশে বসে ও ধীরে ধীরে ওর একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের হাতে রাখে।

সন্ধ্যাকর ছোট ছেলের মতো কাঁদে। ওর মুখ দিয়ে বাক্য সরে না।

'সেরে উঠুন। সেরে উঠবেন আমি জানি।' জাফরান জোর দিয়ে বলে। 'আমার প্রার্থনা প্রতিদিন আপনাকে ঘিরে পরিক্রমা করবে। ভগবান আমার ডাক শুনবেন।'

সন্ধ্যাকর কোনোমতে প্রকাশ করতে পারে 'তোমার যাত্রা শুভ হোক, তোমার জয় হোক।'

জাফরান ওর হাতে চাপ দিয়ে বলে, 'যাচ্ছি, কিন্তু খুশিমনে যাচ্ছিনে। পদটা লোভনীয়, লোভে পড়ে যাচ্ছি। এখানকার স্কুলের কচি কচি ছেলেমেয়েরাও কাঁদছে। এতগুলো মানুষকে কাঁদিয়ে কোন সুখ! কোন সুখের অন্বেষণে আমি যাচ্ছি! সত্যি কি আমি একজন আর্টিস্ট? না এটাও আমার জীবনের একটা অধ্যায়? যেমন ছিল দেশোদ্ধার।'

সন্ধ্যাকর বা কানের উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। কেউ যেন ভরসা পায়।

'হয়তো একদিন দেখবে তোমার কাছেই আবার আমি এসেছি, এসেছি আমার সুখের জন্যে। তোমাকে ততদিন ধৈর্য ধরতে হবে। এতকাল তুমি অপেক্ষা করেছ, আরো কিছুদিন কর। আমার মনটা এখনো দোদুল্যমান। স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনে। দেখি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি কিনা। কদ্দিন পারি। একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।' জাফরান ওর হাত তুলে মুখে দেয়।

'আমি যে একটা দিনও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।' সন্ধ্যাকর কাঁদতে থাকে।

'তুমি যে কেমন ধৈর্যশীল মানুষ তারই পরীক্ষা আমি তার প্রমাণ চাই, সন্ধ্যাকর।' এই বলে জাফরান ওর দুই গালে দুটি চুমু খায়। ও এখনি কাঁদতে থাকে। কিন্তু ওর দুই গাল হাসে।

বিষ হয়ে গেছে অমৃত

কথাটা হঠাৎ সেদিন মনে পড়ে যায়। কে বলেছিলেন? কবে? কোন্ উপলক্ষে? স্মরণ করতে গিয়ে উমাপতি বাবু দেখেন তাঁর মনের পরতে কোথাও কোনো চরণরেখা নেই। চারদিকে শূন্যতা। মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে এই ক'টি অক্ষর। 'বিষ আমার ভাগ্যে অমৃত হয়ে গেছে।'

এখন তাঁর কাজের চাপ কমেছে। পূজার উপন্যাস শেষ হয়েছে। তাই একটু অবসর পাচ্ছেন ভাববার। সকাল থেকে লেগে আছেন ওর পেছনে। জিগ স পাজল যেমন করে আস্তে আস্তে জোড়া

লাগে তেমনি কবে জুড়ে যাচ্ছে একটাব পব একটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকবো। গড়ে উঠছে একটা স্মৃতিগত ঐক্য। এখানে ওখানে দুচারটে টুকবো নিকদ্দেশ। পবে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। তখন যাব যাব জায়গায় বসিয়ে দিতে পাবা যাবে।

না পারলে কল্পনা আছে কী কবতে? ফাঁক যদি কোনো মতে না ভবে তবে কল্পনা দিয়ে ভবাতে হবে। মিশ যদি না খায় নিকপায়।

॥ দুই ॥

ময়মনসিং থেকে কলকাতা আসাব পথে যমুনা নদী পাব হবাব সময় স্টীমাবে আলাপ। ভদ্রলোক পবিচয় শুনে বলেন,'কাব্য পড়ে যেমন ভাবি কবি তেমন নন তো। নিবাশ হলুম, মিস্টাব ধব।'

ধব কাষ্ঠহাসি হেসে বলেন, 'আমাব দুর্ভাগ্য, ডক্টব ব্রহ্ম।'

ওঁদেব ডেকে ওবা যাত্রী বলতে তিনজন কি চাবজন। ঘুবে ফিবে বাব বাব দেখা। ধব ভালোবাসেন হেঁটে বেড়াতে। ব্রহ্মাও তাই। ছোট একটা খাঁচায় একজোড়া শার্দূল। মুখোমুখি ও ঠোকাঠুকি অনিবার্য। হলেই ইনি বলে ওঠেন, 'সবি।' উনি বলে ওঠেন, 'পার্ডন।'

ভদ্রলোকেব চেহাবা থেকে মনে হয় না যে বাতে ঘুম হয়। চোখেব কোল ফোলা। সিগবেট টানছেন তো টানছেন। একটা ফুবোলে আব একটা। তাও পুবোপুবি ফুকোতে দেন কই। পা দিয়ে মাড়িয়ে দেন। হুঁশিয়াব কবে দিলে নদীব জলে ছুড়ে ফেলে দেন।

'বুঝতে পাবছি আপনি একটা কিছু নিয়ে গভীব চিন্তায় মগ্ন, ডক্টব ব্রহ্ম।'

'কিছু না হাতো।' আমি মবছি, মশায়, প্রাণেব জ্বালায়। দাকণ অশান্তি ভোগ কবছি। দাবদাহ জানেন তো? আব হবিণ?'

'ওঃ তাই নাকি। আমাব সমবেদনা।' বলে ধব তাব ডান হাত বাড়িয়ে দেন।

'ধন্যবাদ। কী খাবেন, বলুন। হুইস্কি আব সোডা? বীয়াব আব—'

'নো থ্যাঙ্কস। কোল্ড ড্রিঙ্ক।' ধব ও বসে বঞ্চিত।

'তা হলে আপনি একজন ওল্ড ম্যান।' বৃদ্ধ পবিহাস কবেন।

'ওল্ড ম্যান বললে আমি তেমন খুশি হইনে যেমন হই ওল্ড ফ্রেণ্ড বললে।' ধব তাঁব পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন।

'ওল্ড অ্যাডমায়াবাব যদি বলি তা হলে কি আপনি বিশ্বাস কববেন? উমাপতি ধবেব কবিতা আমবা ছাত্র বয়সে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তুম। কোথায় গেল সেসব দিন। আপনি আব কবিতা লেখেন না। আফসোস।'

পাশাপাশি জমিয়ে বসা গেল। দৃষ্টি যমুনাব উপব। সে বেচাবা শুকিয়ে এসেছে। মাসটা বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ। বর্ষণেব দেবী আছে। গলাটাও তেমনি শুকিয়ে যাচ্ছে।

কখন এক সময় ব্রহ্ম শোনাতে শুব কবেন তাব চাকুবি জীবনেব দুঃখেব কাহিনী। অন্যায়ভাবে বদলি আব সুপাবসেসন। অন্যায় বিপোর্ট আব বিমার্ক। বছবেব পব বছব কেস সাজিয়ে যাওয়া যাতে এফিসিয়েন্সি বারে আটকায়।

কে কাকে শোনাবে। কে না ভুগেছে। ধব মনে মনে বিবক্ত হন। চাকুবিব বিষ তাঁব আস্বাদন

করতে বাকী নেই। তবে আকণ্ঠ পান করতে তখনও কিছু বাকী।

'মাই ডিয়ার ব্রহ্ম,' তিনি তাকে পরামর্শ দেন, 'আপনি একবার আপনার উজির সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করুন। শুনেছি সদাশয় লোক।'

'করিনি ভাবছেন? উজির সাহেব আমাকে সিগরেট অফার করলেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং আমার সিগরেট ধরিয়ে দিলেন, তারপর নিজেরটা ধরালেন। কিন্তু তারপর যা বললেন তা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম। বললেন, আমি মুসলমানের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি, মুসলমানের ভোটের জোরে আমি মন্ত্রী হয়েছি, মুসলমানের কাছে আমার দায়দায়িত্ব। মুসলমানের জন্যে কী করতে পারি সেই আমার একমাত্র ভাবনা। নইলে পরের বার কেউ আমাকে ভোট দেবে না। আমি আবার সেই ফকির। আপনার কী! আপনার চাকরি তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। সামান্য একটা প্রমোশন, তার জন্য কেন এত মাথাব্যথা!' ব্রহ্ম উত্তেজিত হয়ে বলেন।

ধর দুঃখিত হয়ে উপদেশ দেন ভগবানে বিশ্বাস রাখতে। ব্রহ্ম তা শুনে আরো উত্তেজিত হন। বলেন, 'আমার পদবীটাই ভগবানের নামে। অথচ আমি সম্পূর্ণ নাস্তিক। বায়োলজিতে ওরকম কোনো জীব নেই, বিজ্ঞান ওঁর কোনো সন্ধান রাখে না। ভগবান! ভগবান থাকলে ত্রিশ লক্ষ মহাপ্রাণী দুর্ভিক্ষে মারা যায়! তাও মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে! আর ওই হিরোশিমার পরমাণু বোমা! আহা, পরম আত্মার অস্তিত্বের কী মহৎ প্রমাণ!'

ধর তাঁর ব্যথা বোঝেন। সমবেদনার সঙ্গে বলেন, 'আপনি এখনো যুবক। ইচ্ছা করলে আবার নতুন করে আরম্ভ করতে পারেন। নিজেই তো বললেন বিয়ে করেননি।'

।। তিন ।।

প্রসঙ্গটা এবার অন্য মোড় নেয়। জীবিকার কথা ছেড়ে ব্রহ্ম এবার জীবনের কথায় ধ্যান দেন। জীবনই তো বড়ো। জীবিকা তার তুলনায় কতটুকু!

'সেদিক থেকেও আমি হ্যামলেটের মতো দোদুল্যমান। কিন্তু তার আগে সবটা শুনবেন কি? কাহিনীটা মনোহর নয়। কাহিনী না বলে কিস্‌সা বলতে পারি।'

কিস্‌সা! ধর চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। কিস্‌সা শুনতে কার না ভালো লাগে! তিনি মনে মনে বলেন, এখনো আমি বুড়ো হইনি, ভায়া। গম্ভীরভাবে বলেন, 'আচ্ছা'।

'কলকাতায় বদলি হয়ে সেবার এক মাঝারি হোটেলে সাময়িকভাবে বাস করছি। কবে কোথায় ঠেলে দেয় তার স্থিরতা কী! সেখানে থাকতে একটি ফুটফুটে খোকার সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। বরাবরই আমি ছোট ছেলেমেয়েদের ভালোবাসি। ওদের জন্যে বিস্কুট লজেন্স চকোলেট রাখি। খোকার সঙ্গে দেখা হলেই পকেট খালি হয়ে যায়। দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে লুট করে।

ওর মা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন আর হাসতে হাসতে শাসান। আমাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করেন, কিন্তু ধন্যবাদ দেন না। কথা বলেন না। ওর বাপকে বড়ো একটা দেখিনে। কখন আসেন কখন যান, কতক্ষণ থাকেন তাতে আমার কাজ কী! আমি আমার আপনার ধান্দায় ব্যস্ত। নামধাম পরিচয়ও জানিনে। জানতেও চাইনে। তবে একটা আভিজাত্যের আভাস পাই। অভিজাত অথচ অভাবগ্রস্ত।

যা আমি কল্পনাও করিনি তাই একদিন ঘটে। ভদ্রমহিলা একদিন খোকার হাত ধরে আমার ঘরের সামনে এসে টোকা দেন। আমি শশব্যস্ত হয়ে সুপ্রভাত জানাই। তিনি বলেন, 'আপনি তো ডাক্তার। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?'

'আমি ডাক্তার নই, ম্যাডাম। আমি ডক্টর। বলেন তো আপনাকে ডেকে দিতে পারি।'

ভদ্রমহিলা তখন পূর্ণগর্ভা। লেডী ডাক্তারের প্রয়োজন। কিন্তু হোটেলে নয় নিশ্চয়। তিনি আমার ভাব দেখে বলেন, 'দেরি আছে। কিন্তু এখন থেকে হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। আমার কর্তাটি প্রায়ই টুরে যান। নির্ভর করতে পারি এমন একজনও নেই। খোকনকে যখন এত ভালোবাসেন তখন আপনিই ভরসা।'

ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়। টাকা যা লাগে তিনিই দেন। সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তিনি আমাকে একটি আশ্চর্য কথা বলেন। তাঁর স্বামী একমাস তাঁর কাছে আসেননি, অথচ আছেন কলকাতাতেই। টেলিফোনের ঠিকানা দিয়েছেন, কিন্তু বাসার ঠিকানা দেননি। তাঁর বাসার ঠিকানা খুঁজে বার করা কি সম্ভব? আমি কি পারব একটু উপকার করতে?

এমন কিছু নয়। সীলভান রিট্রিট, রিজেন্টস পার্ক, টালিগঞ্জ খুঁজে বার করতে কতটুকু উদ্যোগ লাগে! তা শুনে ভদ্রমহিলা বলেন, 'আমার স্বামীকে টেলিফোন করে সাড়া পাইনে। চিঠি লিখে সাড়া পাব কি না কে জানে! আমাকেই যেতে হবে দেখছি, কিন্তু ওরা যদি আমাকে ঢুকতে না দেয়! যদি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে না দেয়। তা হলে কী হবে, ডক্টর ব্রহ্ম। আপনিও চলুন না, লক্ষ্মীটি।'

অদ্ভুত আবদার। আমি ইতস্তত করছি দেখে তিনি বলেন, 'বুঝেছি, আপনি ভাবছেন এটা আমাদের স্বামী স্ত্রীর প্রাইভেট ব্যাপার। এর মধ্যে আপনি নাক গলাবেন কেন। কিন্তু আমার যে কেউ নেই, ডক্টর ব্রহ্ম। সবাই আমাকে ছেড়েছে। তিনিও আমায় ছাড়লেন কি না জানতে চাই।'

সেদিন তিনি আমাকে বিশ্বাস করে তাঁর বৃত্তান্ত বলেন। দেওগড় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন তার বাবা। সে সময় রাজবংশের একটি ছেলে তাঁদের বাড়িতে আসত, বাংলা শিখত, পারিবারিক উৎসবে যোগ দিত। তারপর সে ছেলে বড়ো হয়ে কলকাতার কলেজে পড়ে, কিন্তু বাল্যসখীকে ভোলে না। দেওয়ানও ততদিনে অবসর নিয়েছেন, নিয়ে কলকাতায় বাস করছেন। ছেলেটি একদিন বিয়ের প্রস্তাব করে, কিন্তু ক্ষত্রিয়কে কন্যা সম্প্রদান করতে ব্রাহ্মণের আপত্তি। তা ছাড়া রাজ্যের বাইরে বাড়ি নেই, জমি নেই, অন্য কোনো উপার্জনের উৎস নেই। রাজবংশের ছেলে বলে চাকরি যদি বা জোটে তা দিয়ে ঠাট বজায় রাখা দায়। ওদিকের গুরুজনও অসম্মত। ওঁরা নাকি এক ক্ষত্রিয় পরিবারে বিয়ের সম্বন্ধ করে ফেলেছেন।

আর কিছুদিন দেরি করলে প্রদ্যুম্নকে পাওয়া যেত না। তাই ললিতাগৌরী বাপ মার অমতে ওকে বিয়ে করেন। সিভিল ম্যারেজ। সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় মাসোহারা বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় অর্থ কষ্ট। টার্ফ ক্লাবে একটা চাকরি জুটে না গেলে পথে বসতে হতো। ছেলেটি যেমন সুপুরুষ তেমনি নিপুণ ঘোড়সওয়ার। আদবকায়দায় অদ্বিতীয়। লেখাপড়ায় গ্র্যাজুয়েট। বিভিন্ন রাজপরিবারের সঙ্গে তার কানেকশন আছে।

কিন্তু টার্ফ ক্লাবের সভ্যদের সঙ্গে সমান হতে হলে সমান খরচ করতে হয়। অভিজাত স্টাইলে থাকতে হয়। একজন কর্মচারীর পক্ষে তা সম্ভব হবে কেন? দু'দিক মেলাতে গিয়ে দেখা যায় মিলছে না। ধারকর্জ করতে হয়। অশান্তি ও অনিশ্চয়তা। প্রদ্যুম্নকে উদ্ধার করেন রাজমাতা অফ বিজয়কোণ্ডা। দূর সম্পর্কের মামী। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি পদ দিয়ে। ললিতাগৌরী ও খোকা থাকে হোটেলে,প্রদ্যুম্ন কলকাতায় এলে হোটেলে রাত কাটান, কিন্তু সারাদিন রাজমাতার ওখানে ডিউটি দেন। কলকাতায় তাঁর রেসের ঘোড়া আছে। সেই সূত্রে তাঁকে প্রায়ই কলকাতা আসতে হয়।

ঘোড়দৌড়ের মরশুমে তিনি কলকাতা থেকে নড়েন না। ছেলেকে গদীতে বসিয়ে তিনি এখন স্বেচ্ছাগতি।

ব্যাঙ্কে ঢালা হুকুম দেওয়া আছে। মাসে মাসে প্রদ্যুম্নর মাইনে ললিতাগৌরীর হিসাবে জমা দেওয়া হয়। নিজের জন্যে প্রদ্যুম্ন একটি পয়সা রাখেন না। তাঁর যাবতীয় খরচ রাজমাতার পার্সনাল এস্টাব্লিশমেন্টের খরচের সামিল। এর চেয়ে লোভনীয় বন্দোবস্ত আর কী হতে পারে! ললিতাগৌরী তো হাতে স্বর্গ পান। তখন যদি জানতেন এর পেছনে কী আছে। এখন একটু একটু করে জ্ঞান হচ্ছে আর জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে অনুতাপ হচ্ছে।

॥ চার ॥

একদিন বেরিয়ে পড়া গেল লালসাহেবের খোঁজে মিসেস লালকে নিয়ে। সঙ্গে আমার বন্ধু সৈকত। গাড়িটা তারই। ললিতাদিকে বলি, 'আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি যেন আমাদের সামনে লালসাহেবকে গালমন্দ না করেন। আপনার কাছে আসতে না পারার গুরুতর কারণ থাকতে পারে। কৈফিয়ৎ না চেয়ে শুধু বলবেন, চল, দরকারী কথা আছে।'

বনস্থলীর মধ্যে সীলভান রিট্রীট। আমরা বাইরে দূরে মোটর রাখি, ভিতরে নিতে সাহস হয় না। ললিতাদিকে বলি মোটরে বসে অপেক্ষা করতে। সৈকত তার প্রহরী হয়। ভিতরে ঢুকতে যাব এমন সময় একটা মোটর আমাকে পাশ করে চলে যায়। ভিতরের দিকেই। আন্দাজে বুঝতে পারি ড্রাইভ করছেন লালসাহেব স্বয়ং। তাঁর পাশে বসেছেন রাজমাতা সাহেবা।

ব্লু ভীনাস! ব্লু ভীনাস! প্রমথ চৌধুরীর বর্ণনা পড়েছেন নিশ্চয়। বয়স তাঁর রূপকে একটুও ম্লান করেনি। নিখুঁত ভাস্কর্য। আর ডিগনিটি। রাজরানী বটে। মোটর গাড়িবারান্দায় থামে। তিনি লালসাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্দরে যান। গাড়ি সেখানেই রেখে লালসাহেব আমার দিকে এগিয়ে আসেন। বোধ হয় স্ত্রীকে লক্ষ করেছেন। আরো এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি তাঁকে গ্রীট করে আমার পরিচয় দিই। তিনি এমন সুরে 'হ্যালো' বলেন যেন কতকালের চেনা। অবশ্য আমাকে তিনি হোটেলেই দেখেছিলেন, যদিও জানতেন না আমি কে। আমি তাকে বলি আমরা কেন এসেছি। তাঁর স্ত্রীর যে রকম অবস্থা যে-কোনোদিন নার্সিং হোমে যেতে হতে পারে। রিজেন্টস পার্ক পর্যন্ত আসা তো রীতিমতো ঝুকি নেওয়া। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে দেখা না করে তিনি নার্সিং হোমে যাবেন না। কে জানে যদি পরে কখনো দেখা না হয়। যদি না বাঁচেন।

তাঁকে অভয় দেবেন কে? কার কাজ সেটা? ডাক্তারের? নার্সের? না স্বামীর? 'সব বুঝি। কিন্তু দেখছেন না শোফার নেই, ছুটিতে গেছে, আমাকেই ড্রাইভ করতে হচ্ছে। কী করে বলি, আমাকেও ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। শেষে কি চাকরিটা খোয়াব? আপনিও তো চাকরি করেন। বলুন দেখি, ছুটি কি চাইলেই পাওয়া যায়? একটু পরেই ওঁকে নিয়ে আবার বেরোতে হবে। লাঞ্চনের নিমন্ত্রণ আছে। ডিনার তো রোজ বাইরেই খাওয়া হয়। কখনো হোটেলে, কখনো ক্লাবে, কখনো রাজরাজড়াদের সঙ্গে। ফিরতে রাত এগারোটা থেকে বারোটা। একটু ফুরসৎ পেলেই আমি আসব। আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব, ডক্টর ব্রহ্ম।'

স্বামীকে দেখে স্ত্রীর ও স্ত্রীকে দেখে স্বামীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। ওরা সত্যি দু'জনে দু'জনাকে

ভালোবাসে। অদর্শনটা সাময়িক। কারণটা বিশ্বাসযোগ্য।

উভয়ের উপরোধে আমাকেই নিতে হয় নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার ভার, সেখানে খাবার পৌঁছে দেবার ভার, এদিকে খোকনকে সামলাবার ভার। অবশ্য আয়া ছিল। এসবও করি, সঙ্গে সঙ্গে ডিউটিও দিই। একটু আধটু গাফিলতি না ঘটে পারে না। তার জন্যে কী কৈফিয়ৎ দেব? পরার্থে আত্মদান? শত্রুরা রটায় ওটা আমারই স্বার্থ। শুনে তো আমি থ! কেমন করে বোঝাব যে বাপ কলকাতায় থেকেও ভার নিতে অক্ষম। তাকে সংসার চালানোর জন্যে অর্থোপার্জন করতে হয়। মনিবের কাজ আগে।

মেয়ে হয়। নাম রাখা হয় প্রতিমাগৌরী। আমি যদি ওই সৌন্দর্য প্রতিমাকে নিয়ে মেতে উঠে থাকি তবে সেটা আমি ওর জনক বলে নয়। বাপ থাকতেও বেচারি বাপের আদর পাচ্ছে না, তাই আমি সে ফাঁক ভরিয়ে দিই। লোকে ভুল বুঝবে। আমার গুরুজনের কাছে খবর যায়। মা নেই, বাবা দ্বিতীয় পক্ষ করবার পর থেকে আমাদের প্রতি উদাসীন। আমিই ভাইবোনের প্রতিপালক। সেইজন্যে বিয়ে করিনি।

সত্যি একদিন বদলির হুকুম আসে। আমি অবাক হইনে, কিন্তু ললিতাদি অবাক হন। তিনি বলেন, 'আপনি থাকতেই আমি এর একটা হেস্তনেস্ত চাই। আমার স্বামীর সঙ্গে। ওসব ওজর আপত্তি আমি শুনব না। হয় ওকে আমার সঙ্গে বসবাস করতে হবে, নয় আমাকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বাবার কি টাকা ছিল না যে আমি টাকার জন্যে আমার অধিকার বিকিয়ে দেব? কে চায় ওঁর মাইনের টাকা? আমি চাই ওঁর সঙ্গ। মামী ভাগনের এই রাধাকৃষ্ণের লীলা আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। আমাকে দয়া করে উকীলের কাছে নিয়ে চলুন।'

'এসব আপনি কি বলছেন, ললিতাদি!' আমি হকচকিয়ে যাই। 'কী করে আপনি জানলেন যে ওটা রাধাকৃষ্ণ লীলা? যেখানে বয়সের এত তফাৎ?'

তিনি গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, 'আমারও সেই ধারণা ছিল। সেই ধারণা থেকেই অনুমতি দেওয়া। এখন উনি ধরা পড়ে গেছেন। থাক, ওসব আপনি বুঝবেন না। ব্যাচেলার মানুষ। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ এত নিগূঢ় যে কেউ যদি একদিনের জন্য অবিশ্বাসী হয় তার পরের বার মিলনের সময় তার ব্যবহার বদলে যায়। তার কাছে আমি যেন আরেকজন। ভেবে দেখবেন কী ভয়ানক শকিং আর রিভোল্টিং।'

আমি ব্যাচেলার মানুষ। আমি এর কী বুঝি? কিন্তু উকীলবাড়ি যাবার প্রস্তাবে ঘাড় নাড়ি। ঢি ঢি পড়ে যাবে। লালসাহেবরা উল্টে আমাকেই জড়াবেন। ব্যারিস্টার দেবেন। ওঁদের, মানে রাজমাতার, টাকার জোর বেশি। টাকা সত্যকে মিথ্যা করতে পারে, মিথ্যাকে সত্য করতে পারে, দিনকে রাত, রাতকে দিন।

ঝগড়া করতে নয়, মিটমাট করতে এমনি আমরা একদিন রিজেন্টস পার্কের বাড়িতে যাই। রাজমাতা দর্শন দেন না। লালসাহেব এসে অভ্যর্থনা করেন। কথাবার্তা চলছে, এমন সময় দেখি রাজমাতার সহচরী এসে লালসাহেবের সামনে সিগরেটের ট্রে ধরেন। লালসাহেব একটি সিগরেট বেছে নিলে সহচরী দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দেন। তারপর যা ঘটে তা আরো বিচিত্র। লালসাহেব শুধু একবার ঠোঁটে ছুঁইয়ে প্রসাদ করে দেন। সিগরেট অন্দরে ফিরে যায়। রাজমাতা প্রসাদ পেয়ে ধন্য হন।

ললিতাদির মুখখানা যদি দেখতেন। কী লজ্জা, কী ঘৃণা, কী রাগ কী— হাঁ, অনুরাগ! প্রেম যেন আরো বেড়ে যায়। মেয়েরা যে কী চীজ আমি সেদিন প্রত্যক্ষ করি। আমি সরে যাই। ওদের দু'জনকে মোকাবিলা করতে দিই। মিটমাট করতে চায় ওরাই করবে। আমি কে যে ফপরদালালি

করি।

মোটরে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ পরে ললিতাদি এসে যোগ দেন, তাকে পৌঁছে দেন লালসাহেব। দু'জনের চোখে জল। দু'জনের মুখে হাসি। দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে কলকাতা থেকে বদলির জায়গায় যেতে পারি।

ওমা, কোথায় যাব! ললিতাদি ছুটে এসে একদিন আমার ঘরে আমার খাটের উপর ভেঙে পড়েন। আমি যদি বিভাকর ব্রহ্ম না হয়ে নিরাকার ব্রহ্ম হতুম তা হলেও হতভম্ভ হতুম। শয্যাটা তো আমার। লোকে বলবে কী? তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আয়াকে ধরে নিয়ে আসি। দেখি সেও কাঁদছে। তারই মুখ থেকে শুনি যে লালসাহেব বিলেত চলে গেছেন।

পরে ললিতাদির কাছে জানতে পাই যে রাজমাতা ইউরোপ পরিদর্শনের সময় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির সাহায্য চান। প্রদ্যুম্ন কখনো ইউরোপ দেখেননি। এই তার সুযোগ। ওভারসীজ অ্যালাওয়ান্স হিসাবে তিনি আরো টাকা পাবেন। সে টাকাও ললিতাদির হাতে আসবে। লালসাহেবের ইচ্ছা সেই বাড়তি টাকায় একটি মনের মতো ফ্ল্যাট নিয়ে ঘরকন্না পাতা। ললিতাদিও তাই চান। হোটেলের লোকের সামনে মুখ দেখানো দায়।

পরে যখন কলকাতা আসি ওঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা করি। বালিগঞ্জের মেফেয়ারে আরামে আছেন। ঠিকানা এমন লোভনীয় যে হোটেলে যাঁরা কোনোদিন খোঁজ নিতে যেতেন না তাঁরাও প্রায়ই আসাযাওয়া করেন ও মাঝে মাঝে থাকেন। তাঁর বৌদি, তাঁর বোন, তাঁর ভাইপো ভাগনের দল বুঝতে পারি যে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি ফালতু লোক।

এই কথাটা যাঁহাতক ওঁকে বলা উনি গভীরভাবে বিচলিত হন। ঘরে আর কেউ তখন ছিল না। আমার কাছে সরে এসে বসেন ও এত আস্তে আস্তে বলেন যে তৃতীয় প্রাণীর কানে পড়ে না।

'বিভাকর, তুমিও কি আমাকে ছাড়বে? যাকে সবাই ছেড়েছে? এ যা দেখছ এটা তোমার দৃষ্টিবিভ্রম। আমি আরো নিঃসঙ্গ। কারণ তোমার সঙ্গে মেশার সুযোগ পাইনে।'

আমি কল্পনাও করিনি যে তিনি আমাকে ভালোবাসেন ও আমার ভালোবাসা চাইবেন। এ কি স্বপ্ন! এ কি কায়া! সেদিন থেকে আমার সম্বন্ধটা বদলে যায়। হাঁ, আমিও ওঁকে ভালোবাসি। না ভালোবেসে পারিনে।

এর পর আমি আবার কলকাতায় বদলি হয়ে আসি ও এক বন্ধুর ওখানে পেয়িং গেস্ট হই। ললিতাকে একথা বললে সে অভিমান করে বলে, 'পেয়িং গেস্ট যদি হলে তো আমার এখানে কেন নয়? আমার ছেলেমেয়েরা তো কাকু বলতে অজ্ঞান। আমি একাই ওদের মা বাবা হতে পারব কেন? পারব কতদিন?'

ললিতার ওখানে পেয়িং গেস্ট হওয়ার মানে যে কী তা আমি আন্দাজে বুঝেছিলুম। তবুও একবার বাজিয়ে নিই। বলি. 'যদি আত্মসংবরণ করতে না পেরে হঠাৎ একটা কিছু করে বসি তখন কি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে? না প্রদ্যুম্ন আমাদের ক্ষমা করবে?'

'আমার কথা যদি বল,' সে অস্ফুট স্বরে বলে, 'আমি প্রাণ ফিরে পাব।'

আমি মহামুনির মতো মৌন দেখে সে আরেকটু মুখর হয়। 'আমার পোজিশনটা কী কুৎসিত! আমার স্বামী আর একটি নারীর রক্ষিত। তার জন্যে তিনি যে শুল্ক পান তাই দিয়ে আমার জীবনযাত্রা চলে। আমাকে এই পাঁক থেকে টেনে তুলবে কে? তোমার মতো নিঃস্বার্থ ও শুদ্ধ কে আছে? তুমি যদি আমাকে নিরাশ কর আমিও বকে যেতে পারি, বিভাকর। ও আগুন আমাকেও পুঁড়িয়ে খাক করতে পারে।'

এ এক বিদ্রোহ ঘোষণা। কিন্তু আমি কেমন করে ও আগুনে হাত দিই? যদি জানতুম যে

ডিভোর্সের মামলা ফেস করতে পারব। তারপর বীরপুরুষের মতো বিয়ে করতে পারব।

তাছাড়া আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস ললিতা বা প্রদ্যুম্ন কেউ কাউকে ছাড়বে না। ওদের প্রেম আপাতত রাহুগ্রস্ত হলেও চিরকাল তা থাকবে না। যৌবনজ্বালা সইতে না পেরে ললিতা হয়তো আমাকে ধরা দেবে, কিন্তু প্রদ্যুম্ন ফিরে এলে মিঞা বিবি এক হয়ে যাবে। তখন আমাকে ওরা লাথি মেরে তাড়িয়ে না দেয় তো আমিই মানে মানে সরে পড়ব।

না, ভালোবাসাকে আমি ততদূর যেতে দেব না। ললিতাকে বলি, আমি অসম্মত।

।। পাঁচ ।।

লালসাহেবকে একটি ছোট পাখী খবর দেয় যে তাঁর স্ত্রী চন্দননগরের এক বিশিষ্ট পরিবারের কুলচন্দনের সঙ্গে দিবারাত্র মেলামেশা করছেন। তিনি ললিতাকেও দোষ দেন না, গোকুলকেও না। কিন্তু দু'জনের মাঝখানে একটি পাঁচিল খাড়া করেন। দেওগড় থেকে সামন্তরানী আসেন কালীঘাটে তীর্থ করতে। ওঠেন পুত্রের ফ্ল্যাটে। বলতে ভুলে গেছি যে ওটা প্রদ্যুম্নর নামেই নেওয়া। ও তাসখানা লালসাহেব নিজের হাতেই রেখেছিলেন।

ললিতা বুঝতে পারে যে শাশুড়ী থাকতে সে যখন খুশি বাইরে যেতে পাবে না, যাকে খুশি বাড়িতে আনতে পাবে না। এরা হলো জাতক্ষত্রিয়। যাদের দাপটে বাঘে গোরুতে জল খায়। সেই মহাভারতের যুগের পর থেকে আজ অবধি এরাই ভারতের শাসকশ্রেণী, যদিও মোগল বা ব্রিটিশের দ্বারা পরাজিত। সামন্তরানী কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেন। দেওগড়ে ফিরে যাবার নাম করেন না। নাতি নাতনিকে নিয়ে তাঁর সময় কেটে যায় মন্দ না। মালা জপ করার বয়স এখনো হয়নি। বিগতযৌবনা, কিন্তু রূপবতী আর কী সুন্দর নাম! নক্ষত্রমালী!

আমি তাঁকে দেখেই চিনতে পারি যে যৌবনে অনেক বাঘ শিকার করেছেন। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় থেকেই বুঝতে পারি যে এ নারীকে 'না' বলার সাধ্য আমার নেই। আর তামাশা দেখুন। আমাকেই ললিতা তাঁর গাইড হবার ভার দেয়। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠের সেইসব জাঁদরেল মূর্তি, এসব কে দেখাবে, কে বুঝিয়ে দেবে আমি যদি প্রদর্শক না হই? আসলে ললিতা চেয়েছিল শাশুড়ীকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে গোকুলকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে। আমারও আপত্তি ছিল না জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নিতে। তবে হুঁশিয়ার ছিলুম যাতে ফল্স পোজিশনে না পড়তে হয়। চাকরি খুইয়ে এক সামন্তরানীর প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে আমার রুচি ছিল না।

মাস তিনেক পরে আমি তাঁকে কলকাতার সিনেমা ও থিয়েটারগুলো দেখাচ্ছি, এমন সময় তুচ্ছ একটি ঘটনা ঘটে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে আমার হাতখানা কেমন করে তাঁর হাতে চলে যায় ও মুখমদের আস্বাদন পায়। চেপে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি কিনা শুকদেব, তাই ললিতার কানে তুলি। তখন কি জানতুম যে ওটা ব্ল্যাকমেলের উপকরণ হবে? বেচারি শাশুড়ীকে দেওগড়ে ফিরে যাবার জন্যে চাপ দেওয়া হবে? যেদিন তিনি মানে মানে বিদায় হন সেদিন আমার দিকে তাকিয়ে অগ্নিবাণ হানেন। যেন বলতে চান, এটা মর্দানা নয়। প্রণাম করবার ছলে আমি তাঁর পায়ে ধরে মার্জনা চাই। তিনি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন ও সেই

ছলে সমঝিয়ে দেন যে কোণারকের সে সব মূর্তি এখনো জীবন্ত। নারীর স্তন কাকে বলে তার জন্যে আমাকে মন্দির দেখতে যেতে হবে না।

লালসাহেবের এ চাল ব্যর্থ হবার পর বাকী থাকে সশরীরে আগমন। আমি সেদিন দৈবক্রমে উপস্থিত ছিলুম। গোকুলকে নিয়ে তিনি এমন মজা করেন যে সে বেচারার গৌরবরণ লাল হয়ে যায়। ললিতার নিষ্ঠুর রূপ সেইদিন প্রত্যক্ষ করি। সে ষোল আনা স্বামীর দিকে। এবার সে স্বামী পুত্রকন্যা নিয়ে ঘর করবে। ঘুরমুখো গোরু যেমন পেছন ফিরে তাকায় না সেও তেমনি। গোকুলকে আর তার দরকার নেই। ও এখন পুনর্মূষিক। ওই খেলাটা খেলেই সে স্বামীকে সাগর পার থেকে ঘরে টেনে আনতে পেরেছে। উপায়টা হয়তো নীতির দিক থেকে শুচি নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

সে আর ক'টা দিনের জন্যে! প্রদ্যুম্ন একদিন আমাকে বলে, 'তুমি যদি তোমার চাকরি ছেড়ে দাও তো আমিও আমার চাকরি ছেড়ে দিই। তারপর নতুন করে আরম্ভ করা যাবে। কী বল, বিভাকর?

ললিতাও আমাকে মিনতি করে। 'বিভাকর, তুমি আমাদের একমাত্র বন্ধু। ওঁকে আমি রাজী করিয়েছি, কিন্তু ওঁর শর্ত তো শুনলে। তুমি যদি ছাড়ো তো উনিও ছাড়বেন।'

চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি কিছু না হোক এক শো বার বলে থাকব। তার যে এই পরিণতি হবে তা কি তখন জানতুম! সরকারী চাকরি ছেড়ে দেওয়া কি মুখের কথা! তার তুলনা হলো কিনা রাজমাতার চাকরি ছেড়ে দেওয়া!

কিন্তু কেন নয়? রাজামাতা সরকারের চেয়ে কম কিসে? ভদ্রমহিলা এখনো বিশ ত্রিশ বছর বাঁচবেন। প্রদ্যুম্নকে তিনি প্রাণভরে ভালোবাসেন। কোনোদিন তার অর্থাভাব হবে না। সেটার মতো নিশ্চিতি কি সরকারী চাকরিতে আছে? এইসব মন্ত্রীদের চেয়ে ওই রাজমাতা ঢের ভালো। যদি না থাকত স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে।

সেই থেকেই হ্যামলেটের মতো ভাবছি, 'মিস্টার ধর, চাকরিটা রাখব না ছাড়ব? যদি ছাড়ি লালসাহেবকেও ছাড়ানো যায়। নয়তো তিনি ফিরে যাবেন রাজমাতার আঁচলে। বাঙ্গালোরে। সেইখানেই ঘোড়া চালান গেছে। বাড়ি কেনা হয়েছে। এবার গেলে লালসাহেবকে ফিরে পাওয়া শক্ত হবে। বছরে একবার পাওয়া তো ফিরে পাওয়া নয়।'

ধর এতক্ষণ নির্বাক হয়ে শুনছিলেন। বলেন, 'এমন অদ্ভুত কথা আমি শুনিনি। প্রদ্যুম্ন পাপ করছে। সে তার পাপ ছাড়বে কি ছাড়বে-না নির্ভর করছে তার স্ত্রীর বন্ধুর চাকরি ছাড়া না ছাড়ার উপরে? কখনো অমন কাজ করবেন না। তবে যদি উপরওয়ালাদের সঙ্গে বনিবনার অভাব হয় সেটা অন্য কথা। সে ক্ষেত্রেও দুম করে অমন কিছু করবেন না।'

ব্রহ্ম চিন্তান্বিত হয়ে বলেন, 'তাহলে ললিতার কী হবে? সে কি ওইরকম ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলতে থাকবে? না আবার গোকুলের দিকে ঝুঁকবে?'

'মাই ডিয়ার ব্রহ্ম', ধর হিতোপদেশ দেন, 'সেটা আপনার বিজনেস নয়। যদি সত্যি ভালোবেসে থাকেন তো বিয়ে করে ফেলুন। ডিভোর্স কেমন করে কোথায় পেতে হবে সে আমি আপনাদের বলতে পারি। বম্বে ইজ দি প্লেস।'

॥ ছয় ॥

এরপরে কুরুক্ষেত্র বাধে। দেশ ভাগ হয়ে যায়। কে যে কোথায় ছিটকে পড়ে কে কার খবর রাখে। ব্রহ্মকে ধর ভুলে যান। কিস্‌সাটাও তাঁর মনে থাকে না।

বছর সাতেক পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দিল্লীতে এক বন্ধুর পার্টিতে দেখা। ব্রহ্মই ছুটে এসে আপনার পরিচয় দেন।

'ওঃ আপনি সেই ব্রহ্ম। এখন কি ব্রহ্মবাদী হয়েছেন না তেমনি নাস্তিক!' ধর তাঁর হাতে ঝাঁকানি দিয়ে শুধান। তাঁকে নিয়ে একটু আড়ালে যান।

'এখন আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। আর আমার কোনো সংশয় নেই!'

'যে ভগবান আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছেন, যাঁর রাজ্যে এত অবিচার, সেই ভগবানে আপনি বিশ্বাস করেন! যাঁর জন্যে এক কোটি না দেড় কোটি লোক প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, পাঁচ লাখ লোক পালাতে না পেরে মরেছে, কে জানে ক' হাজার নারী ধর্ষিতা হয়েছে, এখনো তাদের অনেকে বন্দিনী, সেই ভগবানে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'করি। আমার জীবনের সব দুর্ভোগ আমাকে তাঁর দিকে নিয়ে গেছে। আমার ভাগ্যে বিষ হয়ে গেছে অমৃত।' ব্রহ্ম শান্ত ও সস্মিতভাবে বলেন।

'মিরাকল। কী করে এটা সম্ভব হলো?' ধর জানতে চান।

'যেদিন দেখলুম আমার সেই উজির ও তাঁব দলবল হাওয়ার সঙ্গে উড়ে গেলেন, যেদিন দেখলুম আমাব উপরওয়ালাই আমার কাছে জোড়হস্তে সাহায্য প্রার্থনা করলেন সেদিন আমি ভগবানকে ডেকে বললুম, তুমি আছো, তুমি আছো। পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবে কেউ কোনোদিন জানত? তাঁর পক্ষে সকলি সম্ভব। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।' ব্রহ্ম একেবারে ব্রহ্মবাদী বনে গেছেন।

'তা হলে চাকরিতে আপনি টিকে গেছেন, বলুন।'

'তখনকার মতো। তারপরে দেখি একই সমস্যা ও তার একই সমাধান। চাকরি আমাকে ছাড়তেই হলো। কেন, দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন না। এর সঙ্গে ললিতার কোনো সম্বন্ধ নেই। এটা আমার একার সমস্যা।' ব্রহ্ম অন্যমনস্ক হয়ে যান।

'তারপর বিয়ের খবর কী? করেছেন না করেননি?' ধর তাঁর ওৎসুক্য দমন করতে পারেন না।

'বিয়ে আমার জন্যে নয়। যে মানুষ কথায় কথায় চাকরি ছাড়ে তার বিয়ে না করাই ভালো। যদি কোনোদিন সেটল্ড হই ভেবে দেখব। দেখছেন তো আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। এখন দিল্লীতে একটা কোম্পানীর অ্যাডভাইজার। চেষ্টা করছি ইউনাইটেড নেশনসে যেতে। যাই হোক, আমার যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। বিষ আমার ভাগ্যে অমৃত হয়ে গেছে।'

'তারপর ওদের কী খবর? ললিতা, প্রদ্যুম্ন ওরা এখন কোথায়?'

'ললিতা কলকাতায় চাকরি পেয়েছে। আর প্রদ্যুম্ন বাঙ্গালোরে চাকরি করছে। বছরে একবার কি দু'বার দেখা হয়। কেউ কারো আশা ছাড়েনি। পরস্পরের প্রতীক্ষা করছে।'

ধরের হঠাৎ মনে পড়ে যায়। 'আর ওই গোকুল না গোপাল?'

'গোকুল ললিতাকে ছাড়তে পারেনি। ললিতাও ওকে ছাড়বে না', ব্রহ্ম মুচকি হাসেন। 'ওদিকে রাজামাতাও তেমনি নাছোড়। প্রদ্যুম্নও তাঁর বান্দা।'

'এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি কোনোকালে শুনিনি। বেযোড় দেখছি শুধু আপনি, ডক্টর ব্রহ্ম।

অ শ র গ- ১০/৬

নক্ষত্রমালীকে অমন করে বিদায় না দিলেই হতো।' ধর রসিকতা করেন। জানতেন না যে কেউ সীরিয়াস ভাবে নেবে।

'আমার জীবনে ওইটে ছিল মাহেন্দ্রক্ষণ।' ব্রহ্ম গম্ভীরভাবে বলেন।

(১৯৬৬)

সখা সুদামা

পথের মাঝখানে একটা দৃশ্যের মতো দাঁড়িয়ে আমরা তিনজন।

'হাঁ রে, কানু, তুই আমাকে ভুলে গেলি?' আমাব বাল্যবন্ধু শত্রুঘ্নদাস আমাকে ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে নিষ্পেষণ করতে করতে বলে।

'না, বাবাজী। ভুলে আমি যাইনি। তবে তোমার ঠিকানা আমি জানতুম না। কেউ আমাকে বলেনি যে এত জায়গা থাকতে হৃষীকেশে তোমার দেখা পাব।' আমি কৈফিয়ৎ দিই।

পরনে গেরুয়া আলখাল্লা। রং চটা। ময়লা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। একমুখ গোঁফ দাড়ি। ছোট ছোট চোখ দু'টির একটি দৃষ্টিহীন। গালে বসন্তের দাগ। কোথায় ছিল জানিনে, পথ দিয়ে যাচ্ছি দেখে হনহনিয়ে ছুটে এসে রোধ করে। চিনি চিনি করছি, কিন্তু তাব আগেই সে আমাকে দুই সবল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে। একবার আমার মাথাটা টেনে নিয়ে তাব কাঁধে বাখে, একবাব তার মাথাটা আমার কাঁধে তুলে নিয়ে চোখ বুজে চোখের জল ঝরায়। এর যেন শেষ নেই। আমাব দামী বিলিতী সুট ভিজে কুঁকড়ে যায়। আমি অসহায়। আমার গৃহিণীও সাক্ষীগোপালিনী।

এতক্ষণ পরে তাব হোঁশ হয় যে আরো একজন আছেন ও তিনি আমার স্ত্রী। একমাত্র দৃষ্টিমান চোখ দিয়ে তাঁর দিকে তাকায়। তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দেয়। একটু অপ্রতিভভাবে বলে, 'সিসটারজী, হী মাই ওল্ড ফেরেণ্ড আই হিজ ওল্ড ফেরেণ্ড।'

'উনি বাংলা জানেন। তুমি যদি বাংলায় বলো উনি আরো ভালো বুঝবেন।' আমি ওকে আংরেজী হটাতে শেখাই। দেশ স্বাধীন হবার বারো তেবো বছর আগে।

বাবাজী সরল মানুষ। আমার উপর তার অন্ধ বিশ্বাস। আমার স্ত্রীকে বলে, 'দিদি, ও আমার কিষণজী। আমি ওর সুদামা। চোদ্দ বছর বাদে এই আমাদের প্রথম ভেট। ওকে আমি আজ সাজা না দিয়ে ছাড়ব না, দিদি। ও আমার সঙ্গে চাতুরালি কবেছে। হাঁ রে. কানু, কেন তুই আমাব সঙ্গে চাতুরালি করলি?'

আমি তো বিমূঢ়। কবে কী করেছি তা কি আমার মনে আছে?

'শুনবেন, দিদি, এ ছেলেটার কাণ্ড!' বাবাজী যেন চোদ্দ বছর উজিয়ে যায়। 'এ তখন সকূলে পড়ে। বাড়িতে বহুৎ আংরেজী আখবার আসে। আমি ভবঘুবে মানুষ। ঘুরতে ঘুরতে জুটে গেছি কিশোরগড়ের রামায়েৎ মঠে। সেখানে থাকি আর টোলে গিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্থ করি। দুনিয়ার কী জানি! এই লড়কাই আমাকে বোঝায় যে, পরকালে মুক্তি নিয়ে আমি করব কী! পরের জন্যে জীবনদানই মুক্তি। ইহকালে দেশমাতাকে মুক্ত করাই ধম। মহাত্মা গান্ধারীর আবির্ভাব ঘটেছে, এ বাত এর কাছেই আমি শুনি।'

আমার অত কথা মনে ছিল না। মহাত্মা গান্ধারী শুনে আমরা হেসে ফেলি।

'হাসছিস যে!' বাবাজী চটে গিয়ে বলে, 'হাসির কথা নয়। বিলায়তী কাপড় পোড়াতে গিয়ে আমার এক বরষ জেল হয়ে যায়। আর তোর গায়ে এখন দেখছি বিলায়তী পোশাক। চাতুরালি নয়? আর শুনেছি তুই নাকি মেজেস্টার হয়েছিস। আপনিই বিচার করুন, দিদি। বোকা পেয়ে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে ও নিজে হলো গিয়ে মেজেস্টার। চাতুরালি নয়?'

তা বলে রাস্তার মাঝখানে ধরে অপমান! আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে মোটরের দিকে পা বাড়াই। হরিদ্বারের ট্যাক্সি অদূরে অপেক্ষা করছিল। বেলা থাকতে ফিরে যেতে হবে। বাচ্চা দুটোকে ডাক বাংলোয় রেখে এসেছি।

'যাচ্ছিস কোথায়? থাম। তোর সঙ্গে কতকাল বাদে দেখা। পরে আবার কবে দেখা হবে কি হবে না কে জানে! চল আমার সঙ্গে আমার আস্থানায় মহাবীরজীকে দর্শন করবি। জাগ্রত দেবতা। তোদের যদি কোনো মনস্কামনা থাকে নিশ্চয় সিদ্ধ হবে। তারপর তোকে সাজা দেব আমি। তোর অপরাধে দিদিকেও।'

আমাদের পাকড়াও করে নিয়ে যায় তার আস্থানায়। সেখানে দেয়াল জোড়া হনুমান মূর্তি। সারা অঙ্গে সিঁদুর মাখানো। হিন্দুস্থানী মেয়েরা পূজা দিয়ে মানৎ জানিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা ফুল তাদের হাতে দিয়ে বাবাজী বলে, 'মহাবীরজী কী কৃপাসে সব মিল জায়েগা।' প্রসাদী লাড্ডু প্যাড়া সমবেত বালখিল্য জনতার মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে বলে, 'প্রেমসে কহো মহাবীরজীকী জয়। মহাত্মা গান্ধীজীকী জয়।'

আমি লক্ষ করি মহাত্মাজীর একখানি পট হনুমানের আখড়ায় লম্বিত ছিল। ডাণ্ডী অভিযান।

'কই, তুমি নিজের জন্যে কিছু রাখলে না যে?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'গরিবদের জিনিস আমি গরিবদের মধ্যেই বেঁটে দিই। আর বড়লোকদের জিনিস আমি গরিবদের জন্যে তুলে রাখি। তোর যদি কিছু দিতে ইচ্ছা হয় আমি সেটা দিয়ে গরিবদের জন্যে জ্বালানি কাঠ কিনব। শীতে ওদের বড়ো কষ্ট। আমি সব দিন এখানে থাকিনে, মাঝে মাঝে পদযাত্রা করি। এক হাতে নিই, এক হাতে দিই, নদী যেমন নিচ্ছে আর দিচ্ছে। হিসেব রাখছে না। আমার হাত দিয়ে মহাবীরজী এই দশ বছরে কমসে কম লাখ খানেক টাকা লেনদেন করিয়েছেন। আর আমি যে ফকিরকে সেই ফকির।'

বেণু একখানা দশ টাকার নোট মহাবীরজীর সামনে রেখে প্রণাম করলে বাবাজী বলে, 'মহাবীরজী আপনাদের আপনাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করবেন। জাগ্রত দেবতা যে যা মনে মনে জানায় তা আর কেউ জানতে না পেলেও তিনি জানেন। আর একদিন না একদিন মঞ্জুর করেন।'

এই বলে বাবাজী একটা টিনের কৌটা বার করে তাতে নোটখানা ভাঁজ করে রাখে। বলে, 'কার টাকা কে কাকে দিচ্ছে! রামজীর ধন রামজী নিচ্ছেন। আমি একটা ডাকহরকরা বই তো নয়।'

'তা হলে তোমার চলে কী করে?' জানতে চাই আমি। 'আমার কিসের ভাবনা রে! খিদে পেলে রামজী ডেকে নিয়ে খাওয়ান। তাঁর ভক্তের কি অভাব আছে? তারাই আমার জন্যে রাঁধে, আমার জন্যে বাড়ে, আমার অন্ন আমার মুখে তুলে দেয়। সব রামজীর লীলা। এমন দিনও গেছে যখন অনাহারে থাকতে হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাসের জোর থাকলে ফলটা মূলটা জুটে যায়। গরিব গৃহস্থ দেখলে আমি তার ক্ষেতবাড়ির কাজও করে দিই। গাই থাকলে গাই দুয়ে দিই। ঘুঁটে না থাকলে ঘুঁটে কুড়িয়ে এনে দিই। গান্ধী মহারাজের আশ্রমেও বছর খানেক ছিলুম রে। আর জেলখানা, সেটাও কি গান্ধী মহারাজের আশ্রম নয়? একই শিক্ষা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেদিনকার খোরাক সেদিন রোজগার করবে। আমি ঘানিও ঘুরিয়েছি, মাটিও কুপিয়েছি। এখনো খেটে খাই।' বাবাজী উত্তর দেয়।

এরপরে সে আমাদের নিয়ে যায় তার নিজের কুঠরিতে। সেই যেমন ছেলেবেলায় প্রথম আলাপের দিন আমাকে পুরীর একটি মঠে ওর কুঠরিতে নিয়ে গিয়ে দুধ কলা খেতে দিয়েছিল। এবারেও সেই দুধ, সেই কলা, তার সঙ্গে কিছু মুড়কি ও খাজা। সেবারকার মতো এবারেও বলে, 'প্রেমসে খাও।'

আমরা যখন খেয়ে উঠি, তখন খুশির ঝড় তুলে বলে, 'কেমন সাজা দিয়েছি।'

মোটরে ফিরে যেতে চাই বললে নিজে এগিয়ে দেয়। সেসময় আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বলে, 'আচ্ছা এত লোক মহাবীরজীর কাছে আসে, কিশোরগড়ের রাজারানী কেন আসেন না, বলতে পারিস?'

তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। বলি, 'কেন বল তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'সাত বছর বিয়ে হয়েছে, এখনো বৈঠনেওয়ালা পয়দা হলো না। পরে গদীতে বসবে কে? খালি খালি ডাক্তারকে হেকিমকে পয়সা খাওয়াচ্ছেন, যেন ছেলে হওয়া না হওয়া ওঁদের হাতে। আসতেন যদি একবার মহাবীরজীর কাছে আর বিশ্বাস করে মহাবীরজীর শরণ নিতেন তা হলে দেখতিস কী হয়। এ আমি কত দেখলুম। মহাবীরজী কত অপুত্রকের মনস্কামনা সিদ্ধ করেছেন।'

একেই বলে, বিশ্বাসে মিলয়ে পুত্র তর্কে বহুদূর। আমি তর্ক না করে গৃহিণীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করি। তিনি চোখ টিপে শাসান।

মোটর তক এগিয়ে দিয়ে বাবাজী বলে, 'আবার কবে দেখা হবে কে জানে? চল তোদের আমি লছমনঝোলা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। কতই বা সময় লাগবে!'

ওদিকে বাচ্চারা বেয়ারার কাছে রয়েছে। ফিরে যেতে চাই, অথচ পারিনে। বাবাজীর টানে না লছমনঝোলার টানে ওর সঙ্গে চলি। মোটর অতদূর যায় না। আমরা পায়ে হাঁটি।

সে যে কী মনোরম দৃশ্য! বাবাজী আমাদের নিয়ে যায় একটি মঠে। সেখানে থাকেন এক মাতাজী। ষাটের উপর বয়স। কী সুন্দর মানুষ। পরম আত্মীয়ের মতো চা করে খেতে দেন পিতলের বাটিতে। সেই একই অনুরাধে। 'প্রেমসে পিও।'

গঙ্গার উপরই মঠ। নদী থেকে খাড়া উঠে গেছে। ছাদে বসে চা পান করি। সন্ধ্যারতি দেখি। নদীর জলে তার প্রতিফলন পড়ে। ধূপধুনার গন্ধ আসে। ভাবি এইখানেই থেকে গেলে হয়। কেন যে বাংলাদেশের মহকুমায় ফিরে যাওয়া।

।। দুই ।।

বাবাজীর সঙ্গে ওর জীবনে আর দেখা হয়নি। সেই শেষবার।

স্বাধীনতার বছর দুই বাদে পুরীর পুলিস হঠাৎ কী কারণে ক্ষেপে যায়। সাধুসন্ন্যাসীদের দেখ-মার করে। যেখানে যাকে পায় তাকেই দু ঘা কষিয়ে দেয়।

তা দিক, আমার আপত্তি নেই। সাধুরা সকলেই অহিংস নয়। কেউ কেউ রীতিমতো হিংস্র। কিন্তু আমাদের শত্রুঘ্নদাস বাবাজী। সে বেচারা কার কী করেছিল। সারাদিন মঠের কুঠরিতে ছিল, শরীর ভালো নয়। শুয়ে আছে লোকটা, হঠাৎ যমদূত এসে তাকেও পিটোতে পিটোতে চ্যাংদোলা

করে নিয়ে যায়।

বাবাজীকে কে না চেনে! জেল খাটার দলই তো ক্ষমতার আসনে বসেছে। তাকে দেখে তার বন্ধুরা বলে, 'এ কী! তোমাকে মারধোর করে কেন?'

'সেই কথাই তো আমিও জিজ্ঞাসা করছি। প্রথম জেলে গিয়ে স্বাধীনতা এনে দিল যেজন তাকেই তোমরা ঠ্যাঙালে! কৃতজ্ঞতার চমৎকার নমুনা! ওদিকে মহাত্মাকেও খুন হতে দিলে। এরই নাম রামরাজ্য!' বাবাজী দুঃখ করে।

তারপরে সকলে এসে একবাক্যে বলে যে, ভুল মানুষকে পিটুনি দেওয়া হয়েছে। একই রকম চেহারার আরেকজন সাধু আছেন। এটা কিন্তু অবিশ্বাস্য। আমার বন্ধু অদ্বিতীয়।

(১৯৬৬)

জন্মদিনে

টেবিলের চারদিকে সবাই জড় হলে গৃহকর্ত্রী অমিয়া দেবী বলেন,

'যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
এক ফুঁয়ে নেবাতে পারো,
যাব তোমার সঙ্গ।'

একটি নয়, দুটি নয়, সাতান্নটি মোমবাতি এক ফুঁয়ে নেবানো কি মুখের কথা? তাঁর যাদু কি যাদুকর? ছোটদের চোখে কৌতূহল, বড়োদের চোখে কৌতুক, প্রত্যয়ের আভাস নেই কারো চোখে। তিনি কি পারবেন? কেউ কি পারে!

সুরথ একবার এর দিকে তাকান, একবার ওর দিকে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। যেন বলতে চান, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না নির্ভর করছে একটি ফুঁয়ের উপরে।

'আচ্ছা। ওয়ান। টু। থ্রী।' এই বলে সুরথ আস্তে আস্তে দুই গাল ফুলিয়ে প্রাণপণে এমন এক ফুঁ দেন যে ফুঁ আর ফুরাতেই চায় না। সত্যি সত্যি সব ক'টি ক্ষুদে মোমবাতি এক ফুঁয়ে নিবে যায়। ছোটরা হাত তালি দিয়ে বলে ওঠে, 'সাবাশ!' আর বড়োরা একে একে হাতে হাত মিলিয়ে আরো এক দফা অভিনন্দন জানান, 'এই দিনটি অনেকবার সুখের সঙ্গে ঘুরে আসুক।'

আর অমিয়া দেবীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুরথ যেন তাঁকে নতুন করে জয় করে নিলেন। মৌন মুখে ব্যক্ত হয়, যাব তোমার সঙ্গ।

কেক কাটতে কাটতে নবজাতক বলেন, 'তোমরা কি মনে করেছ এক ফুঁয়ে সাতান্নটা পেরেছি বলে সত্তরটা পারব? পঁয়ষট্টিটা? নাঃ। যাটটা? না বোধ হয়। ওই সাতান্ন আটান্ন পর্যন্তই আমার দৌড়।'

কথাটা তিনি এমন সুরে বলেন যে ওটা যেন ফুঁয়ের দৌড় নয়, পরমায়ুর দৌড়। তাই তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেন তাঁর সঙ্গিনী। 'পরমায়ুর দৌড় তোমার আরো অনেকদূর। আর ফুঁয়ের দৌড়ও কম নাকি? তোমার মতো দম ক'জনের?'

'তা বটে। তুমি একজন দমবাজ লোক।' পরিহাস করেন প্রিয় বন্ধু রমেন।

'কিন্তু ওটা কি একটা ফুঁ হলো নাকি? ফুঁ হচ্ছে ফুঁ। তার জন্যে সাপুড়ের মতো গাল ফোলাতে হয় না। তুমি শতায়ু হও, তার বেলা আমি সকলের সঙ্গে একমত, কিন্তু শাঁখ বাজানোর মতো করে ফুঁ দিলে সেটা ফুঁ হবে না' তর্ক করেন অগ্রজপ্রতিম চিত্ততোষ।

ছোটরা কেকের বখরা পেয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। বড়োদের হাত থেকেও কেড়ে খেতে চায়। অমিয়া দেবী তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে আরো কয়েকরকম খাবার ভাগ করে দেন। জন্মদিনের পার্টি আসলে ছোটদের জন্যেই। ওদের খাতিরেই কলকাতা থেকে অত খরচ করে কেক আনিয়ে রাখা। ওরা চলে গেলে পার্টি তেমন জমে না।

কিন্তু তর্ক জমে। মোমবাতি আবার জ্বালিয়ে চিত্ততোষকে বলা হয় ফুঁ দিয়ে নেবাতে। তিনি একবার ফুঃ করতেই তিনটে দপ করে নিবে যায়। তা হলে সাতান্নটা নেবাতে উনিশবার ফুঃ করতে হয়। সেটা কিন্তু জন্মদিনের রীতি নয়। তোমার বয়স যত বেশিই হোক না কেন একটি ফুঁতেই তোমার অধিকার। নয়তো তুমি পরাজিত। তোমার মতো পরাজিত পুরুষকে অমিয়ার মতো নারী বরণমাল্য দেবেন না।

'কিন্তু তোমার কথা মেনে নিলে আমি একশোটা মোমবাতি এক ফুঁয়ে নেবাতে পারি।' বলে চিত্ততোষ সবাইকে হকচকিয়ে দেন।

অতগুলো মোমবাতি ও বাড়িতে ছিল না। ওরকম ক্ষুদে মোমবাতি কলকাতার বাইরে পাওয়া মুশকিল। কাজেই তাঁর চ্যালেঞ্জের উত্তরে মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। রমেন কিন্তু অত সহজে ছাড়বেন না। ঐ সাতান্নটাকেই আবার জ্বালানো হয়। চিত্ততোষকে বলা হয় সাধ্য থাকে তো সাতান্নটাকেই এক ফুঁয়ে নেবাতে।

নাঃ। পারলেন না চিত্ততোষ। একত্রিশটা পর্যন্ত তাঁর দৌড়। একশোটা একটু অতিরঞ্জন নয় কি? তিনি স্বীকার করেন যে সুরথের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাঁর কর্ম নয়। তবে ফী বছর প্র্যাকটিস করলে তিনিও একদিন পাল্লা দিয়ে জিতবেন।

'এ ধরনের পার্টি এই বছরই প্রথম।' সুরথ গম্ভীরভাবে বলেন। 'জন্মদিনে আমি আমোদ আহ্লাদ করিনে। ঘরের কোণে আপন মনে জীবনদেবতার সঙ্গে বোঝাপড়া করি। আনন্দ করার কী আছে এতে? বয়স বেড়ে যাওয়া কি আনন্দের না নিরানন্দের? মরণ ঘনিয়ে আসা কি আনন্দের না নিরানন্দের? ছেলেবয়সেই এটা মানায়। এ বয়সে নয়। তা হলে কেন এই ছেলেখেলা?'

'না, না, ছেলেখেলা নয়।' রমেন প্রতিবাদ করেন। 'তুমি আজ নতুন করে জন্ম নিলে। আমরা তোমার বন্ধুরা তার জন্যে নতুন করে আনন্দিত। সূর্যোদয়ের লগ্নে কেউ সূর্যাস্তের কথা ভাবে না। নিরানন্দের ঠাঁই নেই তাতে। বয়স বেড়ে যাওয়া, মরণ ঘনিয়ে আসা এসব আজকের দিনে বেমানান। তার জন্যে বছরের অন্যান্য দিন আছে। আজ তুমি নবজাতক তোমাকে নিয়ে আমাদের আনন্দ নিত্যকালের অরুণোদয়ের আনন্দ।'

'তা নয়, হে। কনিষ্ঠতমার কেক খাবার ফন্দী।' সুরথ স্নেহভরে হাসেন।

বন্ধুরা একে একে বিদায় নেন। বন্ধুপত্নী ও তাঁদের ছেলেমেয়েরাও। তাঁদের এগিয়ে দেবার জন্যে অমিয়া দেবী ও তাঁর খুকু। বাকী থাকেন সুরথ ও তাঁর বেড়াল পুষি। কেক খেয়ে তাকেও বেশ খুশি মনে হয়। বাড়ির ঝি চাকরদেরও।

তা হলে খুশি নয় কে? সুরথ? যিনি আজকের অনুষ্ঠানের নায়ক।

তিনি ঘর থেকে বাগানে গিয়ে ডেকচেয়ার পেতে সন্ধ্যার অন্ধকারে অর্ধশয়ান হন। এখন তিনি চুপচাপ একা থাকতে পারবেন। অন্তত কিছুক্ষণ।

॥ দুই ॥

বিষয় আশয় পুত্রকলত্র দিয়ে দেবতা আপনাকে আড়াল করেছেন। তাঁর মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন আড়াল তো ছেলেবেলায় ছিল না। মাঝে মাঝে দেবতার মুখ দেখা যেত। জীবনে সফল

হতে গিয়ে এ কী হলো সুরথের।

কোথায় গেলে এ আড়াল দূর হবে? তীর্থক্ষেত্রে? হিমালয়ে? মরুপ্রান্তরে? তা হলে কি শেষজীবনটা যতিব্রত? অমিয়া যে বলে রেখেছেন, যাব তোমার সঙ্গ। ত্রিশ বছরের সঙ্গিনীকে সঙ্গে না নিয়ে যাবেন কোথায়? সঙ্গে নিয়েই বা যাবেন কোন্ ধামে? যেখানে দেবতার মুখ দেখা যায়।

বিয়ের আগে সুরথের ধারণা ছিল শেলী কীটস বায়রনের মতো তিনিও যৌবনের মধ্যাহ্নে অস্ত যাবেন। নয়তো যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে। যতদিন যৌবন ততদিন জীবন। তার পরে কে বাঁচতে চায়! বাঁচলে তো নিজেই নিজের ভূত হয়। রোমাণ্টিক কবিদের পক্ষে সময়মতো মরাটাই অমরত্ব। মরতে দেরি হলে অমরত্বহানি। প্রাণহানি তার তুলনায় দুঃখের নয়। সুরথের প্রস্তুতি ছিল সার্থক যৌবনের প্রস্তুতি। অতিক্রান্ত যৌবনের নয়।

অমিয়ার হাতে পড়ে তাঁর যৌবনের দিনগুলি দীর্ঘতর হয়। অতিক্রান্ত যৌবনেও তিনি অনতিক্রান্তযৌবন। কিন্তু দীর্ঘতরকেও অক্ষয় করা যায় না। পঁয়তাল্লিশের পর তিনি অনুভব করেন যে যৌবন চলে গেছে। বা যাবার মুখে। মরতে হয় তো এখনি। এর পরে মরলে কেউ মনে রাখবে না। অমরত্বহানি হবে।

হয়েওছিল নার্ভাস ব্রেকডাউনের মতো একটা ব্যাপার। মাথায় যেন আগুনের ফুলকি বা বিদ্যুতের চমক। কথা বলতে গেলে জিব জড়িয়ে যায়। একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে আর একটা উচ্চারণ করে বসেন। সেটা হয়তো অর্থহীন বা অনিচ্ছাকৃত। বলবার সময় মুখ বেঁকে যায়। হাস্যকর চেহারা।

অমরত্বের রথে উঠতে যাচ্ছিলেন সুরথ। কিন্তু তা হলে তাঁর হাতের কাজ অসমাপ্ত পড়ে থাকত। সেকাজ এমন কাজ যে এ জগতে মাত্র একজনই সে কাজ করতে জানে ও পারে। সে যদি না করে তো আর কেউ করবে না। সুতরাং তাঁর বেঁচে থাকা তাঁর নিজের দিক থেকে না হোক তাঁর কাজের দিক থেকে চাই। কী ছার অমরত্ব! কাজই কাজের পুরস্কার।

যৌবনের সঙ্গে জীবন সহমরণে গেল না, থেকে গেল হাতের কাজ সারা করতে। আর সব দায় থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হলো। রইল শুধু সৃষ্টির দায়। কিন্তু বয়স তো ওইখানেই থামল না। বয়স বছরে বছরে বেড়েই চলল। চলল বার্ধক্যের অভিমুখে।

তাও সহ্য হয়। কিন্তু এই-যে আড়াল এ কি সওয়া যায়?

'ওগো কাকে ধরে নিয়ে এসেছি দেখবে এস।' অমিয়া বাড়ির ভিতর থেকে ডেকে বলেন। 'এই তোমার জন্মদিনের সেরা উপহার।'

দাদাজী!

সুরথ ছুটে যান তাঁর কাছে। দু'জনে দু'জনাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বৃদ্ধ কেবল বলতে থাকেন, 'গোপাল! আমার গোপাল!' আর তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। না, তিনি পায়ের ধুলো নিতে দেবেন না। সেটা তাঁর নীতি বা রীতি নয়।

শণের মতো শাদা দাড়ি এখন আরো লম্বা হয়েছে। কোমর ছুঁয়েছে। বাবরি চুল কিন্তু যেমনকে তেমন। ধবধবে শাদা। পরনে শাদা পাজামা ও আলখাল্লা। মুসলমান ফকিরের মতো দেখতে, অথচ মুসলমান নন। কিন্তু কী তা কেউ বলতে পারবে না। খ্রীস্টানের সঙ্গে খ্রীস্টান, বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈষ্ণব। বন্ধুবান্ধব চতুর্দিকে ছড়ানো। কিন্তু শিষ্য একটিও নেই। কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা না করে বরং জিজ্ঞাসা করতে হয় কোথায় না থাকেন। কিন্তু কারো কাছে হাত পাতেন না। নিজের জন্যে কিছুই নেন না। তবে ওঁর বন্ধুরা ওঁকে একটা না একটা কাজ জুটিয়ে দেন। সেই কাজ করে যা মজুরি পান তাই দিয়ে খরচ চালান।

'গোপাল! আমার গোপাল। কেমন আছিস, গোপাল? আজ নাকি তোর জন্মদিন! কত বয়স হলো। সতেরো আঠারো?' তিনি যেন ছেলেবেলায় ফিরে যান যখন তিনি ছিলেন কলেজের অধ্যাপক ও সুরথ তাঁর ছাত্র। সেই সতেরো আঠারো বছর যেন আজো চলেছে। যেন দু'জনে দু'টি রিপ ভ্যান উইংকল। মাঝখানকার চল্লিশ বছরটা মায়া।

'সাতান্ন।' সুরথ না বলে তার সহধর্মিণী বলেন।

'দিদি, আমি মুখ্যু মানুষ। অত গুনতে জানিনে। সাতান্ন মানে ক'কুড়ি কত?' তিনি তামাশা করেন।

অমিয়া উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। সুরথ তাঁকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করেন। দাদাজী একদা চৈতন্যদেবের মতো বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় জ্ঞানমার্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। জ্ঞান মানুষকে অহঙ্কারী করে। আর অহঙ্কারই তাকে ভগবানের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করে।

কলেজের প্রথম বছরেই দাদাজী গৃহত্যাগ করেন। যে ক'জন ছাত্রকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন সুরথ তাদের একজন। সে বলে, 'দাদাজী, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

অসহযোগের আমলে কলেজ তার এমনিতেই ভালো লাগত না, মনটা উড়ু উড়ু করত। আর দাদাজী ছিলেন তার ও তার বন্ধুদের বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী। সেই দাদাজী চলে যাচ্ছেন শুনে তারা সকলেই মনে মনে কাঁদে।

'গোপাল', তখন থেকেই সে তাঁর চোখে গোপাল, 'তুমি কি বুকে হাত রেখে বলতে পারবে যে, ভগবান তুমিই আমার স্ত্রী, তুমিই আমার পুত্র, তুমিই আমার চাকরি, তুমিই আমার সম্পত্তি? তা যদি বলতে না পারো তো তুমি সংসারে থেকেই তাঁর উপরে ধ্যান রেখো। তাঁকে চোখের আড়াল হতে দিয়ো না। এ তুমি পারবে?'

তখন সুরথেরও সেই রকম মনে হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী বয়সে কেমন করে যে তাঁর ধ্যান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তিনি আবিষ্কার করেন তিনি আড়াল হতে দিয়েছেন ভগবানকে। সে আড়াল পরে আরো বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে দুর্ভেদ্য হয়েছে।

পাঁচ বছরে দশ বছরে দাদাজীর সঙ্গে দেখা হয়। ইতিমধ্যে তিনি চমৎকার বাংলা শিখে নিয়েছেন। আগেকার দিনে বলতেন ইংরেজীতে। অনুরোধ করলে এক আধ দিন একসঙ্গে কাটিয়ে যান। কিন্তু পারমার্থিক ব্যাপারে ধরাছোঁয়া দেন না, শুধু বলেন, 'আমার বিদ্যার জাঁক এখনো যায়নি। জ্ঞানী বলে আমি এখনো আপনাকে বড়ো ভাবি। সাধু বলেও আমার দেমাক কম নয়। শুদ্ধ বলেও আমি গর্ববোধ করি। পরের ভুল ধরতে পেলে আমি আর কিছু চাইনে। ভগবানকে ধরব যে, কী দিয়ে ধরব?'

দাদাজী থাকতে রাজী হন না। তাঁকে আরো কয়েক জায়গায় ডেকেছে। ভজন শোনাতে হবে। ও ছাড়া তিনি আর কিছু শোনাবেন না। না তত্ত্ব কথা, না উপদেশ।

'তা হলে আমাদের এখানেও একটা ভজন হোক, দাদাজী।' অমিয়া অনুনয় করেন।

'আরে দিদি তোর হুকুম কি আমি ঠেলতে পারি?' এই বলে তিনি একটি সিন্ধী ভজন গেয়ে শোনান। কোনো এক মুসলমান সুফী সাধকের রচনা। ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা।

ভজনের পর ভোজনের কথা ওঠে। কেক তখনো দু'এক টুকরো তোলা ছিল। যদি কোনো বিশিষ্ট অতিথি আসেন। অমিয়া তা নিয়ে দাদাজীর সামনে ধরেন।

'আমি ওর সুগন্ধটুকুই নিচ্ছি। আর সব রেখে দিচ্ছি বাচ্চাদের জন্যে। ওদের সেবাই পরমাত্মার সেবা।' দাদাজী হাত জোড় করেন।

'কেক চলবে না? তা হলে ফলমূল পায়েস? দুধ?' অমিয়া অপ্রতিভ হয়ে বলেন।

'আরে দিদি, আমার কি জাত আছে যে জাত যাবার ভয়ে কেক খাব না? ফলমূল দিলে আমি ফলমূলেরও সুগন্ধটুকুই নেব। তার বেশি নেব না। নিলে রুগীরা কী খাবে? থাকে তো দে আমাকে। আমি আমার এই ঝোলায় করে নিয়ে যাই হাসপাতালের রুগীদের সেবা করতে।' তিনি তাঁর ঝোলা খুলে ধরেন।

অমিয়ার মুখে নৈরাশ্যের ছায়া দেখে দাদাজী বিচলিত হন। বলেন, 'জন্মদিনে কিছু খেতে হয়, নইলে অকল্যাণ হয়। কেমন, এই তো ভাবনা? আচ্ছা, একটি কণিকা দে।' তিনি কেকের টুকরোর থেকে একটুখানি ভেঙে নিয়ে আস্বাদন করেন।

'খাসা কেক। খুব মজাদার কেক। জন্মদিন বার বার ঘুরে আসুক। মজাসে ঘুরে আসুক। প্রেমসে ঘুরে আসুক।' তিনি আশীর্বাদ করেন।

এর পর দাদাজীকে উঠতে দেখে সুরথ বলেন, 'ওগো, আমি ওঁকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসছি। ফেরবার সময় খুকুকেও ধরে নিয়ে আসব। ও বোধ হয় শ্যামলীদের ওখানে।'

পথে যেতে যেতে দাদাজী বলেন, 'তোকে এত অন্যমনস্ক দেখছি কেন? জন্মদিনে ফুর্তি করতে হয়। ফুর্তি কোথায়?'

সুরথ তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেন। 'জন্মদিনে আমি জীবনদেবতার সঙ্গে বোঝাপড়া করি। তাই অন্যমনস্ক থাকি। এবার আমাকে সোয়াস্তি দিচ্ছে না এই ব্যথা যে দেবতার মুখ আর দেখতে পাচ্ছিনে। মাঝখানে দুর্ভেদ্য আড়াল।'

দাদাজী আস্তে আস্তে তাঁর হাতে হাত রাখেন। নীরবে শুনে যান।

'ছেলেবেলায় এ আড়াল ছিল না। ইচ্ছে করে আবার ছেলেবেলায় ফিরে যেতে। কিংবা কোথাও চলে যেতে। হিমালয়ে কি তীর্থক্ষেত্রে। যেখানে এ আড়াল নেই। যেখানে তাঁর মুখ দেখা যায়।' সুরথ বলে যান।

দাদাজী তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বলেন, 'আড়ালটা তো তাঁর দিক থেকে নয়, তিনি যে তোর মুখ নিত্য দেখতে পাচ্ছেন। সমস্তক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন। এইখানেও দেখতে পাচ্ছেন। আড়াল যদি তোর দিক থেকে হয়ে থাকে তবে কাশী বৃন্দাবন মায়াবতী যেখানেই যাস তোর আপনার তৈরি আড়াল তোর সঙ্গেই যাবে। আর ছেলেবেলায় ফিরে যাবার দুয়ার কি খোলা? যেই ওঘর থেকে বেরিয়ে আসা অমনি ও দুয়ার বরাবরের মতো বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই যে আমি এত চেষ্টা করলুম ছেলেবেলার মতো অবিদ্বান হতে তা কি বৃথা চেষ্টা নয়? জ্ঞানবৃক্ষের ফল একবার খেলে আর তাকে উগরানো যায় না। তুই কি পারবি শত চেষ্টা করলেও কুমার হতে? বিয়ের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে?'

সুরথ অবশ্য ভালো করেই জানেন যে, অতীতে ফিরে যাওয়া বা অতীতকে অনতীত করতে যাওয়া বৃথা। 'সব বুঝি, দাদাজী। তাসত্ত্বেও আমি অবুঝ। আমি চাই ঘটনাকে অঘটিত করতে, 'হাঁ'-কে 'না' করতে। সব ক'টা ঘটনাকে নয়। বাছা বাছা ঘটনাকে। যেসব ঘটনা বিয়ের আগে ঘটেছে। আর তার থেকে যে অভিজ্ঞতাটা হলো, যে রসটুকু পেলুম। অথচ তাকে বাদ দিলে আমার বিকাশ হতো কী করে? পরিণতি হতো কী করে? সেইজন্যে একবার যদি অনুতাপ করি তো পরের বার অনুতাপ প্রত্যাহার করি, দাদাজী। ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইব যে, চাইবার মুখ কোথায়। ক্ষমা চাইতে হলে অনুশোচনা করাই তো নিয়ম। আমিও অনুশোচনা করি, কিন্তু আমার অনুশোচনা অকপট নয়। সুখ পেয়েছি সুখ দিয়েছি, এর জন্যে লজ্জিত কিন্তু দুঃখিত নই। তবে, হাঁ, আমার সুখের জন্যে যদি কারো অনিষ্ট বা অমঙ্গল হয়ে থাকে তবে আমি ঘোরতর দুঃখিত। আমার যেন

সাজা হয়।'

দাদাজী তা শুনে অট্টহাস্য করেন। ভাগ্যিস পথে সে সময় লোকজন ছিল না।

'গোপাল! আমার গোপাল। কথাটা গোপালের মতোই হলো। ভগবান যেন যশোদা মাঈ। ননী চুরি করে খেয়েছি। খেয়ে হজম করে দিয়েছি। খেয়েছি বলে আপসোস করি, অথচ করিনে। ননী বড়ো মজাদার চীজ। কারো যদি লোকসান হয়ে থাকে তবে আমার যেন সাজা হয়। যশোদা মাঈ ওর পেট বেঁধে ওকে দামোদর করে দেন। আর কেউ হলে ওর পিঠে পাঁচন ভাঙত।' বলতে বলতে তিনি গম্ভীর হয়ে যান।

সুরথ শুনতে থাকেন, তিনি বলতে থাকেন, 'ইহুদীদের শাস্তিদাতা ভগবান বিশ্বাস করিনে। কিন্তু বৌদ্ধদের মতো আমিও মানি যে, কর্মমাত্রেরই ফল আছে। কর্মফল ছায়ার মতো পিছু নেয়। মানুষ যেখানেই যায় ছায়া পিছু পিছু যায়। হিংসার ফল অসত্যের ফল একদিন না একদিন ফলবেই। জাতিকে একথা মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিকে একথা মনে রাখতে হবে। তুই বা আমি কেউ এর ঊর্ধ্বে নই। তবে খ্রীস্টানরা বিশ্বাস করে, আমিও তাদের সঙ্গে করি, যে ভগবানের প্রেম সব পাপ সাফ করে দিতে পারে। কর্ম মুছে গেলে কর্মফলও মুছে যেতে পারে। কত বড়ো আশ্বাসের কথা!'

কথাটা সুরথের মনে ধরে। তবু তাঁর মন থেকে 'কিন্তু' দূর হয় না। 'ভগবান হয়তো পাল্টা প্রত্যাশা করবেন যে আমিও তাঁকে ভালোবাসব। ভালোবেসে সর্বস্ব সমর্পণ করব। অকপটে সেটাও আমি পারছি কোথায়, দাদাজী! কাম্যবস্তু ছাড়তে পারি, কিন্তু কামনা ছাড়তে পারিনে। পারিনে নয়, নারাজ।'

দু'জনেই হাসেন। দাদাজী বলেন, 'ভগবানের সঙ্গে আমার জানপহিচান নেই, আমিও একজন দর্শনপ্রার্থী। তবে এইটুকু আমি জানি যে, তিনি তোর কাছে তেমন কোনো ত্যাগ দাবী করবেন না। তাসত্ত্বেও তোকে ভালোবাসবেন। তোর ভালোবাসার জন্যে অপেক্ষা করবেন। মানুষকে ভালোবেসেই তুই তাঁকে ভালোবাসতে পারিস। এটা আরো শক্ত। আজকের দুনিয়ার শয়তান মানুষ বেশে রোজ ঘুরে বেড়াচ্ছে বা মানুষ শয়তান বনে গিয়ে শয়তানী করে চলেছে। দুর্জনকে ভালোবাসতে পারাও একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা।'

সুরথ আক্ষেপ করে বলেন, 'আমার প্রেমশক্তি অত বলবান নয়, দাদাজী।'

'তা হলে তুই তোর সাধ্যমতো ভগবানের কাজ করে যা। সেইভাবেও তাঁকে তুই ভালোবাসতে পারিস। যতটুকু তোর সাধ্য। বিন্দুর সাধ্য কী সিন্ধুর সঙ্গে সমান হয়। কিন্তু প্রেমের বেলা বিন্দু আর সিন্ধু সমান। ভক্ত ও ভগবান সমান।' দাদাজী গুন গুন করে আর একটা ভজন ধরেন। আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়। অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যায় না যে তাঁর চোখের দু'কূল ছাপিয়ে অশ্রু ঝরছে।

।। তিন ।।

খুকু কি গানের আসর ছেড়ে উঠতে চায়? শ্যামলী ও তাঁর বোন তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ভার নেয়। সুরথ ফিরে গিয়ে অমিয়াকে খবর দেন। তিনি নিশ্চিন্ত হন।

'কী সুন্দর মানুষ দাদাজী। দেখলে তো, বুড়ো হলেও মানুষ কত সুন্দর হতে পারে। তাহলে কেন তুমি অত ভাবছ? বার্ধক্যের ভয়ে কেন অত বিমর্ষ?' অমিয়া বলেন।

'সেজন্যে নয়। তবে সেটাও একটা কথা বইকি। নারীর চোখে বৃদ্ধ হতে কে চায়!'

'উঃ কী সাংঘাতিক শব্দ! বৃদ্ধ। কী করে যে আমার সাতান্ন বছর বয়স হলো! কেন আমি সতেরো বছর বয়সে ফিরে যেতে পারিনে?' সুরথ যেন বিলাপ করেন।

'আমার চোখে তুমি যুবা। দাদাজীর চোখে তুমি গোপাল। আর কত চাও? এই যথেষ্ট নয় কি?' অমিয়া তাঁর একটি হাত টেনে নিয়ে মুখে ছোঁয়ান।

'নিশ্চয়। কিন্তু সমস্যাটা তা নয়। জীবনটাকে জীবনীর মতো এডিট করতে গিয়ে দেখছি বিস্তর অশুদ্ধি। তাহলে কি ওইরকমই থাকবে?' তিনিও আদর করেন।

অমিয়া প্রথমে বুঝতে পারেন না, তারপরে বলেন, 'অশুদ্ধকে শুদ্ধ করতে গেলে তাকে অসত্য করা হয়। তার চেয়ে তাকে অবিকৃত রেখে দেওয়াই ভালো। জীবন যদি অন্যরকম হতো তাহলেই কি তুমি সুখী হতে?'

'তা কী করে বলি? পরম্পরাসূত্রে তোমাকে আমি ভালোবেসেছি। পরম্পরা ছিন্ন হলে তোমাকে হয়ত পেতুম না। সেটা কি সুখের ব্যাপার হতো?' সুরথ সোজা উত্তর না দিয়ে ঘোরালো জবাব দেন।

'অমন করে ফাঁকি দিতে পারবে না।' অমিয়া সহাস্যে বলেন, 'আমার আসার আগে যা ঘটেছে তা যদি না ঘটত তা হলেই কি তুমি সুখী হতে?'

চোখা প্রশ্ন। সুরথ আমতা আমতা করে বলেন, 'না ঘটলে ভালো হতো কিন্তু ফুটে উঠতুম কি না সন্দেহ।'

অমিয়া একটি ঠোনা মেরে বলেন, 'থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। ওসব কবেকার কথা। ভুলে যাওয়াই ভালো। ভুলে যাওয়া হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়া। ঘুম না হলে কেউ তাজা থাকতে পারে? তেমনি ভুলে না গেলে কেউ স্বাস্থ্য রাখতে পারে না। অতীতের চিন্তা ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের ধ্যান করো। ভালো হতে চাইলে ভালো হবার পথ সব সময় খোলা রয়েছে। কবে কী ঘটেছিল তার ফলে রুদ্ধ হয়ে যায়নি।'

দীর্ঘজীবনের এক অভিশাপ হচ্ছে দীর্ঘ স্মৃতি। কিছুতেই তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। সুরথ অসহায়ের মতো দাগা বুলিয়ে যান। কিন্তু সবটা তো মন্দ নয়। বলতে গেলে অল্পই মন্দ। অশুদ্ধ বলে সকালে যা কেটেছিলেন সেটা বাড়াবাড়ি। অত বেশি কাটলে কেউ পাশ করতে পারতেন না। দান্তে গ্যেটে শেকসপীয়ারও না। অত বেশি শুদ্ধ হলে শিল্পীপ্রকৃতি বন্ধ্যা হয়ে যায়। সৃষ্টি বজায় থাকে কী করে?

শ্যামলীরা এসে খুকুকে দিয়ে যায়। তার মা তার সঙ্গে গল্প করেন। সুরথ মুক্ত অঙ্গনে শুয়ে আকাশভরা তারার দিকে চেয়ে থাকেন। জীবনের প্রত্যেকটি কথা অদৃশ্য অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে আকাশে আকাশে তারায় তারায়। অতদূর থেকে সেসব কথায় মাঝখান থেকে কয়েকটিকে ছিঁড়ে আনবে পেড়ে আনবে কে? হে অতীত, তুমি আমার নাগালের বাইরে। বর্তমান মুহূর্তটিই আমার পায়ের তলার মাটি। সুরথ মনে মনে বলেন।

পেছন থেকে বাপের গলা জড়িয়ে খুকু আবদার ধরে, 'বাবা, তুমি আবার একদিন জন্মদিন করো। এবার আমি যাদের ডাকতে ভুলে গেছি তাদেরও ডাকব।'

'কেক খাবার ফন্দী। না?' বাপ ওকে থাপ্‌পড় দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, কলকাতা থেকে কেক আনিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু পড়াশুনায় মন দেওয়া চাই।'

মেয়ে খুশি হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যায়। বিজলীর মতো অকস্মাৎ ঝিলিক দিয়ে যায়—ভগবানের মুখ!

তুমি আমাকে প্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছ। পুত্ররূপে দেখা দিয়েছ। কন্যা রূপে দেখা দিয়েছ। তুমি আপনা হতে দেখা না দিলে আমার সাধ্য কী যে দেখা পাই। কেন তাহলে ভাবি যে, তুমি আড়াল হয়েছ? আর কোন্ রূপে তোমার দেখা পেতে চাই? সুরথ প্রশ্ন করে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান না। আর কোন্ রূপে? তাঁর মনে আসে না।

না, যতিব্রত নিয়ে খুঁজে বেড়ানোর সাধ বা সময় নেই তাঁর। তিনি যদি না করেন তাঁর হাতের কাজ আর কেউ করে দেবে না। সেকাজ সন্ন্যাসীর কাজ নয়। জীবনের সব দিক যে না দেখেছে, নিষিদ্ধ ফল আস্বাদন না করেছে, আঘাত না দিয়েছে ও না পেয়েছে সেকাজ তার কাজ নয়। সেই কাজের জন্যেই তাঁর জন্ম। জন্মদিন সেই কথাই বলতে এসেছে।

আক্ষেপের সত্যিকার হেতু যদি থাকে তবে সেটা এই যে সুরথ যাদের চেয়েছেন তাদের সবাইকে পাননি ও যাদের পেয়েছেন তাদের সবাই চাননি। ভালোবেসে না পাওয়াটা অন্যায় নয়, কিন্তু পেয়ে না ভালোবাসাটা অন্যায়। না ভালোবেসে পাওয়াটাও অন্যায়।

অন্যায় না বলে বলতে পারা যায় প্রেমের ঋণ। সেসব প্রেমের ঋণ শোধ হবে কী করে? তারা সবাই বেঁচে আছে কি না তাই বা কে জানে। মথুরা থেকে বৃন্দাবন বহুদূর। ফিরে যাবার পথ হারিয়ে গেছে, রথই বা কোথায়। স্মৃতিটুকুই সম্বল।

ভাবতে ভাবতে মনে উদয় হয় এই ভাব যে, অমিয়াকে আরো বেশি করে ভালোবাসলেই সে ভালোবাসা ভগবানের কাছে পৌঁছবে ও সে প্রেমের উদ্বৃত্ত তাঁর মারফৎ যাদের পাওনা তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। এপারে না হোক ওপারে।

এরপর সুরথ কতকটা শান্তি পান ও জীবনদেবতাকে ধন্যতা জানান।

'কী হলো? এত হর্ষ কেন?' কৌতূহলে ভেঙে পড়েন অমিয়া।

এক নিঃশ্বাসে সাতান্নবার চুমো খেয়ে নবজাতক বলেন, 'এবার তোমাকে তোমার কথা রাখতে হবে। কোন কথা? সেই যে! এক ফুঁয়ে নেবাতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ।'

একা দোকা

সেদিন সন্ধ্যাবেলা একজনকে টেলিফোন করতে গিয়ে টেলিফোনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে আরেকজনের নাম নজরে পড়ে। থানদার, নীলকুমুদ। বিশ্ববিখ্যাত নাম।

বহুকাল পূর্বে গোলদীঘির ধারে তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল এক বন্ধুর সৌজন্যে। কবেকার কথা। তাঁর মনে থাকার মতো নয়। সেকথা তাঁকে মনে করিয়ে দিতেও হবে না। রিং করে নমস্কার জানিয়ে শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে, 'মীনকেতন মল্লিক আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। আপনি কি আজ এখন ফ্রী আছেন?'

'কী আশ্চর্য!' টেলিফোন ধরেন মিসেস থানদার। 'মীনকেতন মল্লিক কি আপনি? আপনার নাম যে আমার স্বামী বার বার বলেন। খুব খুশি হবেন আপনাকে দেখে। চলে আসুন। চলে আসুন আজ এক্ষুনি। মিসেস মল্লিককেও নিয়ে আসবেন। আমি দেখতে চাই।'

ব্রেনওয়েভ নয় তো কী! একটু আগেও মনে হয়নি যে নীলকুমুদ থানদারের ওখানে একবার

কল করা উচিত। ছেলেবেলা থেকেই ওঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ। আর উনিও যে মীনকেতনের লেখার সমঝদার এটাও লোকমুখে শোনা।

'যাবে অধ্যাপক থানদারের ওখানে?' মীনকেতন জিজ্ঞাসা করেন তাঁর স্ত্রীকে। 'হঠাৎ খেয়াল হলো, একটা এনগেজমেন্ট করে বসলুম। মিসেস থানদার তোমাকেও নিয়ে যেতে বলেছেন। জানো বোধ হয় যে ভদ্রমহিলা অস্ট্রিয়ান।'

সেদিন সন্ধ্যায় বেরোবার কল্পনা ছিল না। তবে বাড়িতে কাজ ছিল। শিউলি একটু ভেবে নিয়ে বলেন, 'আচ্ছা। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। মুর্শিদাবাদের জন্যে গোছগাছ করা শেষ হয়নি। তোমরা তো বদলি হয়ে খালাস। আমরাই ভুগি। কোথায় কলকাতায় এসে দুদিন গুছিয়ে বসব, তা নয় আবার বদলি।'

'যাব আর আসব।' মীনকেতন কথা দেন। 'এটা একটা কার্টসি কল। উনি এককালে আমার হীরো ছিলেন। আমিও ভেবেছিলুম ওঁরই মতো নিজের লেখনীর দৌলতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াব। শুনতে পাই উনিও আমার লেখার পক্ষপাতী; কাজটা তাহলে আজকেই চুকিয়ে দেওয়া যাক। পরে আবার কবে কলকাতা আসা হবে কে জানে!'

থানদার দম্পতি মল্লিক দম্পতিকে বাহু মেলে স্বাগত করেন ও ভিতরে নিয়ে যান। বাড়ি না বলে গ্রন্থাগার বললে বাড়াবাড়ি হয় না। ওটি যেন একটি ধনভাণ্ডার আর ওরা যেন দুটি যখ। অমূল্য সম্পদ আগলে বসে আছেন।

'খুব ভালো করেছেন আজ এখন এসে।' অধ্যাপক বলেন, অবিলম্বে আমেরিকা রওয়ানা হওয়ার জন্যে পরোয়ানা পেয়েছি। কাল থেকেই গোছগাছ শুরু করে দিতে হবে। এরপরে আর কারো সঙ্গে আলাপ করবার সময় পেতুম না।'

'আমিও মুর্শিদাবাদ রওয়ানা হওয়ার জন্যে পরোয়ানা পেয়েছি।' মল্লিক বলেন।

'ওঃ তাই নাকি! তা হলে তো আজ না হলে আর দেখা হতো না কে জানে কতকাল! হাঁ, আমার খুব ইচ্ছে ছিল আপনাকে দেখতে। খুব খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন।' থানদার বলেন পাশাপাশি আসনে বসে। লেমন বার্লি সামনে রেখে।

'আমিও কম খুশি হইনি। তবে আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে বিশ বছর আগে একদিন গোলদীঘির ধারে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমার বন্ধু ব্রতীন।'

'ওঃ ব্রতীন! হাঁ, ব্রতীনকে আমার খুব মনে আছে। কিন্তু আপনার কথা কই মনে পড়ছে না। খুব খুশি হয়েছি আপনাকে—আপনাদের দু'জনকে দেখে। এখন কী লিখছেন? এই পার্টিশন নিয়ে কিছু লিখবেন না?' থানদার বলেন।

'আমার বুক ভেঙে গেছে, অধ্যাপক থানদার।' মল্লিক কাতরোক্তি করেন।

'আমরা জাতকে জাত ছিঁচকাঁদুনে। যেখানে সিভিল ওয়ার দরকার সেখানে পার্টিশন করে বসে আছি। তা নিয়ে আবার কান্না! আরে কাঁদবিই যদি তো ইংরেজকে যেতে দিলি কেন? আরো কিছুকাল ওর বুটের তলায় থাকলে পারতিস। রক্তহীন অশ্রুহীন স্বেদহীন স্বাধীনতা কে কবে পেয়েছে।' অধ্যাপক দৃপ্তকণ্ঠে বলেন। কিন্তু তলে তলে সকরুণ।

ওদিকে মিসেস থানদার মিসেস মল্লিককে বলছিলেন যে আপাতত এক শস্তের জন্যে যাওয়া হচ্ছে, সম্ভব হলে দু'তিন বছরও থেকে যেতে পারেন। দুর্ভাবনা এই পুঁথিপত্রের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে। সারা জীবনের সঞ্চয়। আর তো কিছু জমেনি। যখন যা হাতে এসেছে বই কিনে হাত খালি করে দেওয়া হয়েছে।

'আর একখানা ওয়ার অ্যাণ্ড পীস লেখা যেতে পারত।' অধ্যাপক বলে যান। 'কিন্তু কোথায়

সেই ওয়ার? আর সেই পীসই বা কোথায়? এ যে না যুদ্ধ, না শান্তি। না ট্র্যাজেডী, না কমেডী। এ নিয়ে ব্যঙ্গকবিতা ছাড়া আর কী লেখা যেতে পারে। কিন্তু আমাকে মাফ করবেন। আমি সাহিত্যের লোক নই।'

শিউলি চোখে চোখে টেলিগ্রাফ করেন যে আর দেরি নয়, এবার উঠতে হবে। মীনকেতন উঠি উঠি করছেন এমন সময় দরজায় বেল বেজে ওঠে।

মিসেস থানদার তাঁর স্বামীকে বলেন, 'কাউন্টেস এরিকা ও তাঁর স্বামী।'

'এক্স্‌কিউজ মী' বলে অধ্যাপক অভ্যর্থনা করতে ছুটে যান।

'এক্স্‌কিউজ মী' বলে অধ্যাপকজায়াও তাঁর পিছু পিছু যান।

কাউণ্টেসের সঙ্গে যিনি প্রবেশ করেন তিনিও কোন্ না অস্ট্রিয়ান কাউন্ট হবেন। কিন্তু কাছে আসতেই বোঝা যায় তিনি অস্ট্রিয়ানও নন, কাউন্টও নন। থানদার তাঁর পরিচয় দেন, 'ডক্টর ঘোষাল।'

॥ দুই ॥

কেউ ভোলে কেউ ভোলে না।

'আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না, আমি কিন্তু আপনাকে চিনেছি, মিস্টার মল্লিক। আমি কি আপনাকে ভুলতে পারি, না ভুলব কোনোদিন?' করমর্দনের পর মল্লিকের হাত ছেড়ে দেন না ঘোষাল।

'চিনি চিনি মনে হচ্ছে, কিন্তু নেহাত ঝাপসাভাবে।' হাত ছাড়িয়ে নেন না মল্লিক।

'আচ্ছা, এইবার মনে করিয়ে দিই। প্যারিসের সেই বাশিযান রেস্টোরাণ্ট। কার্তিক সামন্ত। নলিনী ভট্টাচার্য। পরাশর চক্রবর্তী। সহদেব ঘোষাল।' ঘোষাল খেই ধরিয়ে দেন।

কার্তিককে মনে পড়ে বইকি। পরাশরকেও। কিন্তু বাকী দু'জনের চেহারা ঠিক মনে পড়ে না। মল্লিক চেষ্টা করেন।

'আচ্ছা, আরো মনে করিয়ে দিই। পরের বছর আবার আপনার সঙ্গে দেখা। আপনি আমার হোটেলেই ওঠেন। বিদায়ের সময় আমাকে একখানি বই উপহার দেন। আপনারই লেখা। তারপর আর আপনাকে দেখিনি। কবে দেশে ফিরলেন তাও জানতে পাইনি। উনিশ বছর পরে আপনাকে এখানে দেখতে পাব আশা করিনি। কী আনন্দ!' তিনি বার বার ঝাঁকানি দিয়ে বলেন।

'বসুন, বসুন। আপনারা বসুন।' অধ্যাপক তাঁদের ধরে নিয়ে বসিয়ে দেন। যথাকালে পানীয়াদি আসে। দু'জনে দু'জনের গেলাসে গেলাস ঠেকিয়ে বলেন,'টু ইউ।'

'এবার চিনেছি।' মল্লিক স্মিত হেসে বলেন। 'আমার বই আমি আর কাউকে দিইনি। ওই একজনকেই দিয়েছি। কিন্তু দেশে ফিরে এসে আজ অবধি তাঁর সন্ধান পাইনি। কয়েক বছর পরে তাঁর প্রথম নাম যে সহদেব সেটিও ভুলে যাই। শুধু ঘোষাল বললে কেই বা বুঝবে কোন্ ঘোষাল! প্যারিসফের্তাদের দেখলেই জিজ্ঞাসা করি বলতে পারেন ঘোষাল এখন কোথায়? সেই যে ঘোষাল বলে একজন ছিলেন। ডাক্তারি পড়তেন। রোগামতন। কালো না হলেও ফরসা নন। বেঁটে না হলেও লম্বা নন। কষ্টেসৃষ্টে চালান। দারুণ খাটেন। কিন্তু কেউ বলতে পারেন না কোথায় সেই মানুষটি।

বেঁচে আছেন কি না কে জানে! সামন্ত তো শুনেছি মারা গেছেন। শুনে এত কষ্ট হলো।'

ঘোষালও আপসোস করেন। 'হ্যাঁ, যা শুনেছেন তা ঠিক। সামন্ত আর নেই। আমিই যে বেঁচে আছি এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। আর আমার স্ত্রীকে।'

তা হলে এই সেই ঘোষাল। কিন্তু একে দেখে কী করে কেউ চিনবে যে ইনিই তিনি। দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল। ফরসা না হলেও ফরসার দিকে। তবে লম্বা বলা যায় না। মাথায় বাড়েননি। প্যারিসের একটা রোখো হোটেলে নিজের হাতে রেঁধে খাবার দিন গেছে। সমৃদ্ধ বুর্জোয়া। অভিজাত বংশে বিবাহ। এ কি সোজা কথা! গরিবের ছেলের বরাত বলতে হবে।

'চলুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' ঘোষাল তাঁর বন্ধুকে তাঁর স্ত্রীর কাছে নিয়ে যান। কাউন্টেস তখন শিউলির সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ঘোষাল মল্লিকের ও মল্লিক ঘোষালের পরিচয় দেন। উচ্ছ্বসিত ভাষায়। যথারীতি 'পরম প্রীত হলুম আপনাকে দেখে' বলে দু'চারটি বাক্য বিনিময় করেন।

ঘোষাল মল্লিককে নিয়ে স্বস্থানে ফিরে আসেন। 'ওদিকে অধ্যাপক কার সঙ্গে টেলিফোনে লেকচার শুরু করে দিয়েছেন ও তাঁর পত্নী রাত্রের খানা তদারক করছেন। মনে হয় আজ এ বাড়িতে ডিনার ও ঘোষালরা নিমন্ত্রিত অতিথি।

কথা বলতে বলতে বোঝা গেল যে, এরা ভারতের স্বাধীনতার অপেক্ষায় ছিলেন। স্বাধীন ভারতের রূপ দর্শন করতে এসেছেন। রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচাও আছে। ঘোষাল সুইটজারল্যাণ্ডের এক প্রখ্যাত ভৈষজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে সস্ত্রীক গ্রেট ইস্টার্ণে উঠেছেন। ইতিমধ্যে জন্মস্থান ঘুরে আসা হয়েছে। সেটা এখন পাকিস্তানের সামিল। আরো দু'তিন দিন কলকাতায় অবস্থান তারপর মাদ্রাজ, বম্বে, দিল্লী হয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন, হাঁ, বিমানযোগে।

চমৎকার একটি সাকসেস স্টোরি। না? আসলে কিন্তু তা নয়। ঘোষালই আপনা হতে তাঁর পুরাতন বন্ধুকে তাঁর জীবনের কথা বলেন।

'দেখলেন তো আমার স্ত্রীকে। কেমন লাগল, বলুন।' এইভাবে আরম্ভ হয়।

দীর্ঘাঙ্গী তন্বী সুগঠিতা, কিন্তু সুললিতা বলা চলে না। সুশ্রী, কিন্তু সুন্দরী বললে বেশি বলা হয়। কাউন্টেস এক্ষেত্রে কাউন্টকন্যা। কাউন্টের যদি সাতটি কন্যা থাকে সকলেই কাউন্টেস। তা হলেও কাউন্টকন্যা তো বটে। কোন্ বাঙালীর ভাগ্যে কবে একজন কাউন্টকন্যা লাভ হয়েছে!

'আপনি একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ। আপনার সৌভাগ্যের জন্যে আপনাকে আমি অভিনন্দন করি। ঘোষাল, ইউ ডিড ইট। ইউ ডিড ইট। ইউ ডিড ইট।' মল্লিক ফূর্তি করে বলেন ও আর এক দফা করমর্দন করেন।

'সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, ভাই মল্লিক। আপনি শুধু একটা পিঠই দেখছেন। চাঁদেরও উল্টো পিঠ আছে।' তিনি কিসের ইঙ্গিত দেন কে জানে।

'তাই নাকি!' মল্লিক কৌতূহলী হন। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখিত।

'আমার দুই বিয়ে।' বলেই ঘোষাল চুপ করে যান।

অ্যাঁ! দুই বিয়ে! মল্লিক প্রায় লাফ দিয়ে ওঠেন আর কী! ধরে নেন যে এই লোকটা দেশেও একটি বিয়ে করে রেখে যায়। সেদিন বোধহয় তাঁকেই দেখতে মেহেরপুর যাওয়া হয়েছিল। ছি ছি! কাউন্টকন্যাকে অমন করে ঠকানো!

'আমার দুই বিয়ে, কিন্তু একই বৌ।' ঘোষাল ভেঙে বলেন। আর মুচকি হাসেন। কেমন জব্দ হয়েছেন মল্লিক!

'একই বৌ! সে কেমন করে হয়! ওঃ হিন্দু মতেও আরেকবার বিয়ে করেছেন আপনারা।

বুঝেছি।' মল্লিক আশ্বস্ত হয়ে স্থির ভাবে বসেন।

'না। ওই একই মতে। আমার স্ত্রী রোমান ক্যাথলিক। আমি অবশ্য হিন্দুই রয়ে গেছি, কিন্তু ওঁকে হিন্দু করিনি। করা অন্যায়। যার যেটা ধর্ম।' ঘোষাল আরো ঘোরালো করেন।

'আমি এ রহস্য ভেদ করতে পারলুম না, ভাই ঘোষাল। একই নারীকে একই মতে দু'দুবার বিয়ে করা আমার কাছে একটি প্রহেলিকা।' মল্লিক স্বীকার করেন।

'তা হলে শুনুন সবটা।' ঘোষালের গৌরচন্দ্রিকা শেষ হয়।

।। তিন ।।

প্যারিসের এম ডি হয়ে ঘোষাল দেশে ফিরে আসতেই চেয়েছিলেন, দেশের জন্য মন কেমন করছিল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পান যে, প্যারিসের ডিগ্রীকে ভারত সরকার ও তাঁদের অধীন অন্যান্য সরকার অমনি স্বীকৃতি দেবেন না। ইংলণ্ডে গিয়ে আবার পরীক্ষা দিতে হবে। সে রসদ তাঁর নেই।

যেখানে দানাপানি সেখানেই যেতে হয় মানুষকে। তাঁর অদৃষ্ট তাঁকে হল্যাণ্ডে নিয়ে যায়। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর তিনি সেখানেই স্থিতি পান। দেশে ফিরে আসার সংকল্প ত্যাগ করতে হয়। তিনি চাইলেও তাঁর পেসেন্টরা তাঁকে ছাড়তেন না।

তাঁর পেসেন্টদের মধ্যে ছিলেন এক অস্ট্রিয়ান কাউন্ট। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি যখন ছত্রভঙ্গ হয় ও রাজতন্ত্রের দিন যায় তখন অভিজাতদেরও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। এই পরিবারটির বেলজিয়ামে কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, সেই বাদশাহী আমল থেকে। এঁরা প্রথমে বেলজিয়ামে চলে আসেন। পরে গ্রামের সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকা শিল্পে বাণিজ্যে নিয়োগ করেন কেবল বেলজিয়ামে নয় তার আশেপাশে যেখানে যাঁর সুবিধে। এরিকার পিতামাতা আমস্টারডামে বসবাস করেন। ভাইবোন মিলে চারজন।

এমনি কয়েক ঘর বনেদী পেসেন্ট থাকায় ঘোষালের সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবনযাত্রার মানও বাড়ে। লক্ষ্মীও মুখ তুলে তাকান। তা সত্ত্বেও তাঁর পরিণয় পরিকল্পনা ছিল না। দেশে ফিরে এসে একা কোনো রকমে পসার জমিয়ে তুলতে পারতেন, জোড়ে কোনো মতেই পারতেন না। বিশেষ করে বৌ যদি হন ওদেশের মেয়ে। স্ত্রীর খাতিরে বিদেশেই জীবনপাত করতে হবে, এতে তাঁর অন্তর সায় দিত না।

অবিবাহিতই রয়ে যেতেন ঘোষাল অনির্দিষ্টকাল। কিন্তু প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কাউন্ট পরিবারের সঙ্গে তিনিও একবার অস্ট্রিয়ার টিরল অঞ্চলে উইণ্টার স্পোর্টসে যান। এমনি দুর্ভাগ্য যে কাউণ্ট খেলতে গিয়ে জখম হন। আমস্টারডামে স্থানান্তরিত হলেও তখন থেকেই তিনি ইনভ্যালিড। মেয়েদের একজনের বিয়ে হয়েছিল ইংলণ্ডে, আরেকজনের বাকী ছিল। এরিকার বিয়ে যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভাল। আর যত কাছাকাছি হয় তত ভালো। ঘোষাল ইতিমধ্যে পারিবারিক বন্ধুর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ চাইলে তিনিও সেই পরামর্শ দেন।

কিন্তু পাত্র কে কোথায়? অস্ট্রিয়ান অভিজাতও হবে আমস্টারডামেও থাকবে। অথচ নেহাৎ ঘরজামাই হবে না। এমন যোগাযোগই বা কোথায়? কাউন্টের মনের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়,

তার থেকে দেহের অবস্থা আরো খারাপ হয়। ঘোষালকে না হলে ওঁর চলে না। অথচ ডাক্তারের ফী দিতে গেলে ফতুর হতে হয়।

ইতিমধ্যে সহদেবের উপর এরিকার ও এরিকার উপর সহদেবের আকর্ষণ জন্মেছিল। এরিকার মা এটা লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু অনুমোদন করতে অসম্মত ছিলেন। আপত্তিটা বর্ণগত নয়, শ্রেণীগত। সহদেব তাঁর নিজের দেশে ব্রাহ্মণ হতে পারেন, ব্রাহ্মণরা বর্ণশ্রেষ্ঠ হতে পারে কিন্তু অস্ট্রিয়ার নীল রক্ত তাঁর শরীরে নেই। সেই যারা নীল ডানিউব নৃত্য করতেন তাঁদের একজনের দৌহিত্রীর এহেন বর কল্পনাতীত। এ তো বর নয়, এ শাপ।

ওদিকে অস্ট্রিয়া যখন জার্মানীর সামিল হয়ে যায়, তখন কাউন্ট পরিবারের হাড়ে চোট লাগে। ফিরে যাবার পথ রুদ্ধ। ফিরে গেলে ফিরে আসার দ্বার রুদ্ধ। যুদ্ধ যে কোনোদিন বেধে যেতে পারে। যুদ্ধে তাঁরা জার্মান সিটিজেন হতে চান না। তা যদি হন তবে হল্যাণ্ডে বা বেলজিয়ামে হবেন এনিমি এলিয়েন। পক্ষান্তরে যদি ডাচ কিংবা বেলজিয়ান সিটিজেন হন তা হলে অস্ট্রিয়ার বাসভূমিতে হবেন এনিমি এলিয়েন। আর যুদ্ধ একবার বাধলে তার ফলাফল কী হবে কে জানে! কাউণ্টের ভালোমন্দ হলে এরিকা কি নিরাপদ থাকবেন?

এই যখন পরিস্থিতি তখন এরিকা তাঁর মাকে গিয়ে বলেন যে সহদেব ছাড়া আর কাউকে তাঁর মনে ধরে না, বিয়ের অনুমতি না পেলে তিনি নার্স হয়ে যুদ্ধে আহতদের শুশ্রূষা করবেন। সেটা আরো ভয়ঙ্কর প্রস্তাব, তার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর সহদেবের প্রস্তাব, যদি তেমন কোনো প্রস্তাব সহদেব করেন। সহদেবও ইতিমধ্যে মনঃস্থির করেছিলেন। তিনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না। এরিকাকেই গৃহলক্ষ্মী করবেন, যদি কাউণ্ট পরিবারের সম্মতি পান। বলা বাহুল্য এরিকার নিজের সম্মতি যে পাবেন এটা তিনি জানতেন।

শুভকর্ম সকলের শুভেচ্ছার সঙ্গে সমাধা হয়। সহদেব ও এরিকা আশাতীত সুখী হন। বছর খানেক বাদে কন্যা সন্তান এসে তাঁদের সুখের বাসনা পরিপূর্ণ করে।

ওদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পেকে ওঠে। হিটলারের সৈন্য পোলাণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে যুদ্ধে নামে ইংলণ্ড ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ। হলাণ্ড, বেলজিয়াম আক্রান্ত হয়। পদানত হয়। অতটা কিন্তু কাউণ্ট পরিবার আশঙ্কা করেননি। তাই পলায়নের ব্যবস্থা করে রাখেননি। নাৎসীদের কাছে মাথা হেঁট না করে উপায় থাকে না। কাউণ্টকেও চিৎকার করে বলতে হয়, 'হাইল হিটলার।'

ঘোষাল তখনো ব্রিটিশ সাবজেকট। ডাচ সিটিজেন হলেও যে ইতরবিশেষ হতো তা নয়। কারণ ডাচদের মধ্যে যারা স্বাধীনচেতা তাদের উপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু ঘোষালকে তাঁদের মতো নজরবন্দী না করে সোজাসুজি কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যায় জার্মানরা। সেখানে তাঁর উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালায়। তিনি যখন স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি একজন ব্রিটিশ সাবজেকট হলেও ভারতীয় আর ভারতীয় নেতারা এই যুদ্ধে অসহযোগী তখন অত্যাচারের মাত্রা কমে না। বরং আরো বাড়ে। বামন হয়ে চাঁদে হাত। কালা আদমী হয়ে কাউণ্টেসকে বিয়ে। এর চেয়ে ইংরেজ হয়ে থাকলে ক্ষমা ছিল। জার্মানরা ইংরেজদের সঙ্গে অতটা দুর্ব্যবহার করত না। জানত যে যুদ্ধে হারজিৎ আছে। ইংরেজরাও একদিন প্রতিশোধ নেবে যদি জেতে। কিন্তু ভারতীয়রা তো গোলাম, তারা কি কোনোদিন শোধ নিতে পারবে?

ইংলণ্ডের আইন অনুসারে ব্রিটিশ সাবজেকটের স্ত্রীও ব্রিটিশ সাবজেকট, সুতরাং এরিকাও তাই। নাৎসীরা ইচ্ছা করলে তাঁকেও জ্বালাতন করতে পারত, কিন্তু সে সাহস তাদের হয়নি। খোদ হিটলারের দেশের মেয়ে। আর কতকালের অভিজাত। তাঁর স্বামীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ

করতে গেলে তাঁকে বলা হয়, কে কার স্বামী কে কার স্ত্রী। শাদায় কালোয় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্বীকার করা হবে না। ও বিয়ে বিয়েই নয়। তা হলে কী? এরিকা রাগে লাল হয়ে যান। তিনি কি তবে রক্ষিতা? তাঁর মেয়ে কি তবে জারজ?

তাঁর উপর অনবরত চাপ দেওয়া হয় ডিভোর্স করতে। তিনি বলেন, 'না। ডিভোর্সের কোনো গ্রাউণ্ড নেই।' তাছাড়া তাঁর রোমান ক্যাথলিক সংস্কারে বাধে। এদিকে ঘোষালের কানে মন্ত্র দেওয়া হয়, ভারতীয়রা তো জার্মানদের শত্রু নয়, অত্যাচার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে, তিনি যদি একটি কাজ করেন। যদি তালাক দেন। ঘোষাল সে মন্ত্রণা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, 'সত্যিকার আর্য তো আমরাই। ওই যে স্বস্তিকা ওটাও তো আমাদেরি প্রতীক। আর্য কথাটা এসেছে আমাদেরি ভাষা থেকে। আমারি শিল আমারি নোড়া আমারি ভাঙে দাঁতের গোড়া।'

এরিকাকে ওরা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। পারে না। ভয় দেখিয়েও ফল হয় না তিনি অকুতোভয়। নিজের জন্যে ভয় না থাকলেও স্বামীর জন্যে ভয় তাঁর ছিল। স্বামীকে যদি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলী করে মারে তা হলে কোন্ স্ত্রীর সেটা সহ্য হবে। ঘোষালের বিরুদ্ধে সাক্ষীপ্রমাণ জোগাড় করা চলেছিল, ডাক্তার হিশাবে তিনি তাঁর যেসব রুগীর প্রাণ রক্ষা করতে পারেননি তাদের নাকি তিনি ইচ্ছে করে মেরেছেন। কালীর কাছে নরবলি দেওয়া, বিধবাকে জীবন্ত দাহ করা এই যাঁর ঐতিহ্য তিনি যে ইচ্ছে করেই মেরেছেন এটা তো স্বতঃসিদ্ধ।

এরিকাকে সহদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হতো। সব দিক বিবেচনা করে স্বামী-স্ত্রী শেষকালে এই সিদ্ধান্ত নেন যে আইনের চোখে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী থাকবেন না, কিন্তু ভগবানের চোখে থাকবেন। যতদিন জীবন। সেই জীবনটাই যাতে নাৎসীদের ফুৎকারে নিবে না যায় তার জন্যে ডিভোর্সের আবেদন করতে হবে। একদিক থেকে ওটা একটা পরাজয়। কিন্তু কুকুরের মতো বদনাম নিয়ে ফাঁসী যাওয়া কি আরেকদিক থেকে নির্বুদ্ধিতা নয়? বেঁচে থাকলে পরে আবার বিয়ে করা যাবে। নাৎসীরা তো চিরন্তন নয়। জাতি হিশাবে জার্মানরাও অবুঝ নয়। পাঁচ বছর বাদে, দশ বছর বাদে বিয়ে আবার হবেই, পালিয়ে গিয়েও হতে পারে। অবশ্য পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা চাই। সেইটেই আসল।

প্রেমের দায়ের চেয়ে প্রাণের দায়ই বড়ো, নাৎসীরা যেন এইটুকুই চেয়েছিল। প্রাণের দায়ে প্রেমিক প্রেমিকাও অকারণে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। অ্যাবসার্ড আর কাকে বলে। জীবনটাই যেন অ্যাবসার্ড। নাৎসীবাদের মর্মকথা প্রেম-ফ্রেম বাজে, মহত্ত্ব বলে কিছু নেই, কেউ কারো জন্যে ত্যাগ করে না। ঘোষালের উপর অত্যাচার বন্ধ হয়, কিন্তু এরিকাকে প্রলোভন দেখানো হয় ঘোষালের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে। নাৎসীদের মধ্যে কি সুপুরুষ বা সুপাত্র নেই? বিয়ে না হতে পারে হয়ে হবে না কেন?

প্রাণের দায়ে প্রেমের অমর্যাদার গ্লানি ঘোষালকে তিলে তিলে দগ্ধ করে। নাৎসীরা তাঁর মনে দুর্ভাবনার পোকা ঢুকিয়ে দেয় যে এরিকা এখন আবার বিয়ে করবেন। এবার স্বশ্রেণীতে না হোক স্ববর্ণে। তালাক যখন হয়ে গেছে তখন আর দেখাসাক্ষাতের অনুমতি চাওয়া কেন? আর দেখা হয় না। তবে দুটি-একটি বন্ধুভাবাপন্ন নাৎসীও তো ছিল। ওরাই খবরাখবর বয়ে আনত ও বয়ে নিয়ে যেত। ওরাই আশ্বাস দিত যে এরিকা তাঁর জন্যে অনন্তকাল প্রতীক্ষা করবেন। তিনি যেন ধৈর্য ধরেন ও শান্ত হন।

।। চার ।।

'কী নিদারুণ অভিজ্ঞতা!' মন্তব্য করেন মল্লিক। 'আপনার স্ত্রীর চেহারায় সাক্ষী রেখে গেছে। আপনার বেলা কিন্তু হাঁসের পিঠে জল।'

'তার জন্যে', ঘোষাল হাত যোড় করে বলেন, 'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'আমার কাছে!' মল্লিক যেন আকাশ থেকে পড়েন।

'আপনার দেওয়া বইখানি আমাকে নাৎসীদের কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পে নিত্য প্রেরণা জোগাত। বাঁচবার প্রেরণা, ভালোবাসার প্রেরণা। ভালোবাসার উপর বিশ্বাস রাখবার প্রেরণা। আর তো কোনো বই আমার কাছে ছিল না।' ঘোষাল দু-চারটি লাইন আবৃত্তি করে স্মরণশক্তির পরিচয় দেন।

মল্লিক যেমন বিস্মিত তেমনি প্রীত, তেমনি লজ্জিত। 'কী যা তা লিখেছিলুম কাঁচা বয়সে! এখন ওসব আমি নিজেই বিশ্বাস করিনে। এখন আমি পরিপক্ক হয়েছি যে!'

ঘোষালের কাহিনী শেষ হয়ে এসেছিল। তিনি বাকীটুকু শোনান।

নাৎসীরা হেরে যায়। কন্সেনট্রেশন ক্যাম্প ভেঙে দেওয়া হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি আমস্টারডাম ফিরে যান। গিয়ে দেখেন কাউণ্ট দুঃখে কষ্টে মারা গেছেন। তাঁর পত্নী অস্ট্রিয়ার সম্পত্তি দেখাশুনা করবেন বলে পারিবারিক ভদ্রাসনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ছেলেরা যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিল। একটি স্টালিনগ্রাডে নিহত আরেকটি বন্দী। বড় মেয়েটি ইংলণ্ডে নিরাপদে আছেন। আর এরিকা কন্যাকে নিয়ে আমস্টারডামের শহরতলীতে বাস করছিল। মহিলাদের জন্যে পোষাক তৈরি করে যা পান তাই দিয়ে সংসার চালান। সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। পিনলোপির মতো তিনি তাঁব পাণিপ্রার্থীদের কৌশলে ঠেকিয়ে রেখেছেন। কাউকেই ধরাছোঁয়া দেননি।

দ্বিতীয়বার বিবাহের পর এরিকা ও সহদেব সুইটজারল্যাণ্ডে হানিমুন করতে গিয়ে স্থির করেন যে, হল্যাণ্ডে আর ফিরবেন না। সেসব স্মৃতির হাত থেকে পরিত্রাণ চাই। নইলে অসুস্থ মন নিয়ে আয়ুক্ষয় হবে। সুইটজারল্যাণ্ডেও এরিকাদের কিছু সম্পত্তি ছিল। আত্মীয়তা ছিল। আয়ের একটা পন্থা খুলে যায়। মেয়েকে বোর্ডিং স্কুলে দেওয়া হয়।

ওদিকে মল্লিকজায়া বার বার টেলিগ্রাফ করছিলেন যে ওঠবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। খাবার টেবিলে চারজনের জন্যেই ঠাই করা হচ্ছিল। বাকী ফালতো। সময়ে সরে না পড়লে কর্তা গিন্নী বিরক্ত হবেন।

'তা হলে ঘোষাল,' মল্লিক তাঁর হাতে হাত রেখে বলেন, 'জীবনটাকে নিয়ে একা-দোকা খেলে গেলেন? একই বৌ, দুইবার হানিমুন? শুনে ঈর্ষা হয়।'

'এমন দুর্ভাগ্য যেন আর কারো না হয়, এই আমার প্রার্থনা।' ঘোষাল বার বার ঝাঁকানি দেন। 'মল্লিক, আপনাকে আমি চিরদিন মনে রাখব। কী ভাগ্যি আজ দেখা হয়ে গেল, নইলে মনের কথা মনেই রয়ে যেত। বলা হতো না।'

এরপর থানদার দম্পতির কাছ থেকে বিদায় ও তাঁদের বিদেশযাত্রা যেন শুভ হয় এই কামনা নিবেদন।

'পুনর্দর্শনায় চ। পুনর্দর্শনায় চ।'

অধ্যাপক দু'জনকে বলেন। 'আমেরিকা থেকে ফিরে আসি, তারপর একদিন আপনাদের নিমন্ত্রণ করে গল্প করব ও গল্প শুনব। মুর্শিদাবাদে বেশিদিন থাকতে হবে না আশা করি।'

'কী করে বলব! ওটা এখন আমাদের সীমান্ত অঞ্চল। উপদ্রব লেগেই আছে। সেইজন্যেই তো আমাকে পাঠানো। যুদ্ধের ঘোড়া আমি, যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে উন্মনা। কিন্তু তার আগে আমি শান্তির জন্যে প্রাণপণ করব।' মল্লিক অন্যমনস্ক হন।

মোটরে উঠে শিউলি বলেন, 'ঈর্ষার কথা কী বলছিলে? বন্ধুর ভাগ্যে কাউন্টেস বলে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে না তো?'

'কী শুনতে কী শুনেছ।' মীনকেতন তাঁর কানে কানে বলেন, 'একই বধূর সঙ্গে দুইবার হানিমুন শুনে কার না ঈর্ষা হয়? তা মাঝখানকার বিবাহভঙ্গ কি ঈর্ষার যোগ্য? কী করুণ কাহিনী!'

রাবণের সিঁড়ি

বন্ধুজায়ার চিঠি জীবনে কোনোদিন পাইনি। এই প্রথম। হকচকিয়ে গিয়ে আত্মজায়ার হাতে দিয়ে বলি, 'তুমি পড়। তোমাকেই লিখেছেন মনে হয়।'

খামখানা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে যান উনি। বলেন, 'না, আমাকে নয়, তোমাকেই। তবে ভদ্রতার খাতিরে আমাকেও যেতে বলেছেন। নাও, পড।'

আমার বন্ধু সোমদেবের এখন এমন অবস্থা যে সে নিজের হাতে লিখতে পারে না। তাই লিখেছেন বন্ধুজায়া মঞ্জুরাণী। শুনেছিলুম বেচারা পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে। খুঁটিনাটি জানতুম না। শুধু একটা পোস্টকার্ড লিখে সমব্যথা ও শুভকামনা জানিয়েছিলুম। তারই বিলম্বিত উত্তর এ চিঠি।

লিখেছেন ও নাকি প্রায়ই আমার নাম করে। বোধহয় কিছু বলতে চায়। আমি যদি দয়া করে একবার দেখতে আসি তো ওঁরা বিলক্ষণ সুখী হন। আরো সুখী হন যদি ইরা দেবীও আসেন। চিকিৎসার ত্রুটি নেই যদিও, তবু কিছু বলা যায় না। মেরুদণ্ডে চোট। অপারেশনের প্রস্তাব উঠেছিল। ও কিন্তু রাজী হয়নি।

'কী দুঃখের কথা!' ইরা হতবাক হন।

'হাঁ, তবে অপারেশন হলে ও হয়তো সেরে উঠবে। দেখি যদি ওকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারি।' আমি আশা দিই।

'অপারেশন হলে নয়, অপারেশন সফল হলে। ও ঝুঁকি নেবে কে? তুমি? ওসব সিদ্ধান্ত ওঁদের উপর ছেড়ে দিয়ে এমনি একবার দেখা করে এস। কতকালের বন্ধু!' ইরা কলকাতা যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু সস্ত্রীক নয়।

'বন্ধু বলে বন্ধু।' আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। 'পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করে কেউ? করলুম কার যুক্তি শুনে? কেমন অকাট্য যুক্তি! বলেছিল, ছেলে হলে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পঁচিশ বছর লাগে। মেয়ে হলে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তার বিয়ে দিতে একুশ বছর লাগে। তা হলে তোমাকে এমন বয়সে বিয়ে করতে হয় যখন বিয়ে করলে তুমি ঝাড়া হাত পা নিয়ে রিটায়ার করতে পারবে। নইলে পেনসনের টাকায় কুলোবে না। তোমার মরবার স্বাধীনতা থাকবে না। ওঃ কত বড়ো একটা আর্যবাক্য!'

'কই, একথা তো কোনোদিনই বলনি!' ইরা শুনে অবাক।

'ওঃ কত বড়ো একজন প্রোফেট। দেশ ওকে চিনল না। কিন্তু ও যা চেয়েছিল ও তা পেয়েছে। সময়ে বিয়ে, সময়ে ছেলেমেয়ে, সময়ে তাদের প্রতিষ্ঠা ও বিবাহ। ওর এখন ঝাড়া হাত পা। বাড়িও করেছে কলকাতায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে। সব ভালো। মন্দ কেবল এই যে বেচারা এখন শয্যাশায়ী। কে জানে, এটাই হয়তো শেষশয্যা। মেরুদণ্ডে চোট। হায় ভগবান!' আমি বিমর্ষ হই।

আমরা দুই বন্ধু সমবয়সী। ও যদি অকালে চলে যায় আমিও কি বেশিদিন বাঁচব! এটা তো আমাকেও নোটিশ দিয়ে বলা যে, অদ্রীশচন্দ্র, তোমারও দিন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু মরবার স্বাধীনতা কি তোমার আছে? ছেলের চাকরি জোটেনি, মেয়ের পাত্র মেলেনি, বাড়িও করনি যে তোমার অবর্তমানে তোমার স্ত্রী সেখানে আশ্রয় নেবে।

'অপারেশনের ভাবনায় তুমিও নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি?' ইরা আমাকে তাড়া দেন। 'যেন সমস্যাটা সোমদেবের নয় তোমার নিজের।'

সমস্যাটা কেবল সোমদেবের নয়, আমার তোমার, সব মানুষের। কিন্তু কী করে বোঝাই সেকথা। মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন ছিল, যাতে আমাকে অমৃত করবে না কী করব আমি তা নিয়ে? আর আমার প্রশ্ন হলো, বেঁচে থেকে কী হবে যদি মরবার স্বাধীনতা না থাকে?

।। দুই ।।

মডার্ন আসবাবে ভরা মডার্ন ডিজাইনের বাড়ি, তারই একপ্রান্তে একটা খালি ঘরের মেজেয় ঢালা বিছানায় শুয়ে আমার বন্ধু সোমদেব। এককোণে একটা ক্যাম্পখাটও ছিল, সেটা ওর চিরসাথী। সেটলমেন্টের শিবিরে আমরা দুই বন্ধু যখন একই তাঁবুতে থাকতুম তখন দু'জনের ছিল দুই ক্যাম্পখাট। আমি সে অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি, ও কিন্তু কোনোদিন ছাড়েনি। কালেক্টারের কুঠিতে, কমিশনারের ভবনে যখনি যতবার ওর অতিথি হয়েছি ততবার লক্ষ করেছি সোমদেব শোয় ওর সেই পুরোনো ক্যাম্পখাটে।'

ঢালা বিছানার একপাশে বসে ওর একখানা হাত আমার হাতে টেনে নিয়ে রাখি। বলি, 'সেরে উঠে আবার তুমি ওই ক্যাম্পখাটে শোবে, দেখে আমার দু'চোখ জুড়োবে।'

'সেরে ওঠা আমার হাতে নয়, অদ্রীশ।' তবে কেওড়াতলায় যাবার সময় ওই ক্যাম্পখাটই আমার বাহন হবে।' সোমদেব বলে মমতার সঙ্গে। পুরোনো সৈনিকের যেমন পুরোনো ঘোড়া পুরোনো অফিসারের তেমনি পুরোনো ক্যাম্পখাট।

এমনি দু' চার কথার পর আসল ব্যাপারে আসি। ঘটনাটা ঘটল কবে আর কী করে? এখন তো ওকে আর ঘোড়ায় চড়তে হয় না। পড়ল কিসের থেকে?

'ঘোড়ায় চড়ার পাট কি আর আছে হে, অদ্রীশ? সেক্রেটারিয়াটে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। সারাদিন চেয়ারে চড়ে কাটে। তারপর মোটরে চড়ে বাড়ি ফিরি। এমনি করে আমার তো বাত হবার দাখিল। একজন পরামর্শ দিলেন যৌগিক আসন করতে। চমৎকার পদ্ধতি। রোজ কিছুক্ষণ শীর্ষাসন করি। সব গ্লানি দূর হয়ে যায়। শরীর তাজা থাকে। শেষে আমিই কতজনকে যৌগিক আসনের পাঠ দিই।' সোমদেব গর্ব করে বলে। তার মুখে চোখে আত্মপ্রত্যয়ের আভা।

'শুনেছি তুমি মাথার উপরে দাঁড়াতে সিদ্ধহস্ত। না, না, সিদ্ধমস্তক।' আমি তামাশা করে বলি।

'যেমন জবারহরলাল।'

'তাঁর দেখাদেখি মন্ত্রীরাও এখন মাথায় দাঁড়াতে শিখছে। সেক্রেটারিরাও। এরপরে দেখবে কেরানী ও চাপরাশিরাও।' সোমদেব কিন্তু সীরিয়াস।

'গান্ধী শিক্ষা দিয়েছিলেন দেশের লোককে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। নেহরু দিচ্ছেন নিজের মাথায় দাঁড়াতে।' আমি চাই কাহিনীটা শুনতে।

'মাথায় দাঁড়ানো যখন ভালো করে বপ্ত হয়ে গেল তখন আমি ভাবলুম কী, জানো? ভাবলুম দাঁড়াতে যদি পারি তো হাঁটতে পারব না কেন?' সোমদেব বলে গম্ভীর ভাবে।

'সে কী! তুমি মাথায় হাঁটতে চেষ্টা করেছিলে নাকি!' আমি আঁতকে উঠি।

'তাই করতে গিয়েই তো এ শিক্ষা। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পতনের হেতু।' বলতে বলতে সোমদেবের গলা ধরে আসে।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলি, 'যা করতে গিয়ে তোমার শিরদাঁড়া ভেঙেছে তাই করতে গিয়ে একদিন দেশেরও শিড়দাঁড়া ভাঙবে।'

সোমদেবের চোখে জলের আমেজ। বলে, 'পতন হলে উত্থান হয়, এই তো নিয়ম। দেশ আবার উঠবে। কিন্তু আমি কি আর উঠতে পারব, অদ্রীশ!'

'তুমিও পারবে। কতলোক পারছে। বিজ্ঞানের বলে কী না হয়! তোমাকে আমরা আমেরিকায় বা রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেব। এরা না পারে ওরা পারবে। ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে তো ভাবনা? সে হবে।' আমি আশ্বাস দিই।

'আমার ভাগ্য ভালো তোমার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা সব আছেন। শুনে সুখী হবে যে ভিয়েনায় পাঠানোর প্রস্তাব সরকার থেকেই উঠেছিল। আমি কিন্তু সাফ বলে দিয়েছি যে মরতে হয় নিজের বাসভবনে নিজের শয্যায় শুয়ে মরব। হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে নয়। বাঁচবই তার কোনো নিশ্চয়তা যখন নেই।' সোমদেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

ওর যখন এতই অনিচ্ছা তখন ওকে জোর করে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া চলে না। প্রকৃতি হয়তো ভাঙা হাড় আপনি জোড়া দেবে। প্রকৃতিকে সময় দিয়ে দেখা যাক। এই হলো আমার অভিমত।

'ও প্রসঙ্গ থাক, ভাই অদ্রীশ।' সোমদেব আমাকে অনুরোধ করে। 'জানো তো, আমার এখন ঝাড়া হাত পা। মরবার স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর কিসের ভাবনা! কে আমার উপর নির্ভর।'

'কেন? বন্ধুজায়া?' আমি সবিস্ময়ে বলি।

'দেখছ তো কত বড়ো সৌধ বানিয়ে দিয়েছি। আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। মানে বাড়িভাড়া।' সোমদেব রসিকতার ভান করে।

'ছি! অমন কথা বলতে নেই। তুমিই যদি না থাক তবে সুখ রইল কোথায়! তোমাকেই তিনি চান। তোমাকেই থাকতে হবে, ভাই সোমদেব।' আমি অনুনয় করি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সোমদেব বলে, 'অদ্রীশ, তোমার সঙ্গে আমার অন্য কথা ছিল। আমি তো জীবনের দিকে তাকাবার সময় পাইনি, তুমিই বরং পেয়েছ। সিদ্ধির জন্যে জীবনভর সাধনা করে দেখছি সিদ্ধি নয়, সিদ্ধাই।'

'সিদ্ধাই!' আমি চমকে উঠে বলি, 'কেন ওকথা মনে এলো!'

'এখন তো আমার হাতে কোনো কাজ নেই। সেক্রেটারিয়াট থেকে একটাও ফাইল আসে না। শুয়ে শুয়ে অর্ডার দিতে কি পারতুম না? মস্তিষ্ক তো জখম হয়নি। তবু পাঠাবে না। তাহলে কী নিয়ে বাঁচি? গীতা উপনিষদ নিয়ে? সব মুখস্থ হয়ে গেছে। তোতাপাখীর মতো আওড়াই। কিন্তু একবিন্দু

বুঝিনে। সংস্কৃত দুর্বোধ্য নয়। ভাবটাই দুর্বোধ্য। সন্ধ্যাবেলা একটু কীর্তন হয়। ওর মধ্যে কিছু পাই।' সোমদেব অকপটে বলে।

'বেশ তো। যাতে আনন্দ পাও তাই শোন বা পড়। আনন্দও একপ্রকার চিকিৎসা। আনন্দেও মানুষ সেরে ওঠে। তোমার সেরে ওঠা চাই, তা সে যে পদ্ধতিতেই হোক।' আমি বিধান দিই।

'সেরে ওঠা এ জীবনে হবে না, ভাই অদ্রীশ। আমি তো বুঝি আমি কী ছিলুম কী হয়েছি। সংসার থেকে মনও উঠে গেছে আমার। আমাকে ঠকিয়েছে।' সোমদেব ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলে।

'কে তোমাকে ঠকিয়েছে?' আমি হতভম্ব হই।

'সিদ্ধাই।' এককথায় উত্তর দেয় সোমদেব।

আমি আর প্রশ্ন করিনে। চুপ করে শুনি। ও যা বলতে চায় বলে যাক।

'যতই ভাবছি, ভাই অদ্রীশ, ততই আমার কান্না পাচ্ছে ভেবে যে, জীবনে কত কী করবার স্বপ্ন দেখেছিলুম, কিছুই করা গেল না। আমারি দোষ। রাবণের মতো আমিও সংকল্প করেছিলুম যে স্বর্গে যাবার জন্যে একটি সিঁড়ি গড়ে দিয়ে যাব, তা হলে মানুষকে আর মরতে হবে না, সশরীরেই সে স্বর্গারোহণ করবে।' সোমদেব চোখ বুজে আত্মস্থ হয়।

আমি তা শুনে চমৎকৃত হয়ে ভাবি এই ঘোরতর কাজের লোকেরও অমন এক অবাস্তব স্বপ্ন ছিল। আক্ষরিক অর্থে স্বর্গের সিঁড়ি নয় যদিও।

।। তিন ।।

কৃত্তিবাসের রাবণ বলেছিল রামকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে।

> 'করিব এমন পথ সবে যেন উঠে
> পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব পৈঠে।
> থাকিবে অপূর্ব কীর্তি সংসার মাঝার
> ত্রিভুবনে যশ সবে ঘুষিবে আমার।
> সেইক্ষণে করিতাম যবে হৈল মনে
> কোনকালে কার্যসিদ্ধি হৈত এতদিনে।'

যখনকার যেটা তখন যদি সেটা না কর তো আর কোনোকালেই করা হয় না। মরণকালে আপসোস সার হয়।

'আমার জীবনেও' সোমদেব বলে যায়, 'মাঝে মাঝে এক একটা স্বপ্ন এসেছে যা রাবণের সিঁড়ির মতোই অপূর্ব। তৎক্ষণাৎ যদি কাজে হাত দিতুম তবে কবে সারা হতো। কিন্তু রাবণের মতো আমিও করছি করব বলে শিকেয় তুলে রেখেছি। মন দিতে পারিনি। জানো তো শাসনের কাজ কেমন জরুরি আর জটিল। চব্বিশ ঘণ্টা টেলিগ্রাম আর টেলিফোন আসছেই। বারান্দায় সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়। রাস্তায় গণ-মিছিল। শান্তির আশায় গ্রামে গিয়ে তাঁবু ফেলি। সেখানেও শত রকমের আর্জি আর নালিশ।'

'জানিনে? আমিও তো সমান ভুক্তভোগী।'

'না, সমান নয়।' সোমদেব বলে, 'তোমাকে ওরা সরিয়ে দিয়ে সময় দিয়েছিল, অদ্রীশ। নইলে

তুমি তোমার রাবণের সিঁড়ির সিকিভাগও গড়তে পারতে না। কিছুটা যে পেরেছ এর জন্যে দুর্ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও। দুর্ভাগ্যই সৌভাগ্য।'

তার জন্যে কী ভীষণ মাশুল দিতে হয়েছে বন্ধুরা তা জানে না। আমি জানাইনি। বলি, 'সোমদেব, আমার প্রসঙ্গ আজ থাক। তোমার স্বপ্নের কথাই শুনি।'

প্রথম যেদিন ওকে দেখি তখন থেকেই ও ঘোরতর বাস্তববাদী। কত ধানে কত চাল ও ঠিক হিশেব করে বলতে পারে। ভাবালুতা বা ভাবপ্রবণতা কখনো ওকে স্পর্শ করেছে দেখিনি। ওর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মুখে শুনেছি ও তো মানুষ নয়, ও একটা মেশিন। ও যখন ইনস্পেকশনে যায় তখন অধীনস্থরা থরথর করে কাঁপে। সাজাও দেয় কঠোর হাতে। পুকুর চুরির দেশে ও একটা বিস্ময়।

এমন যে সোমদেব তারও একটা রাবণের স্বপ্ন ছিল। কোনোদিন আমাদের কাউকে জানতে দেয়নি। পরিবারকেও না।

'বলে কী হতো ভাই? কেউ বুঝত না। সবাই ঠাওরাত পাগলামি। বদনাম রটে যেত। সরকার আমাকে দায়িত্বের কাজ দিত না। কেরিয়ারটা মাটি হতো। তাই মনের বাসনা মনে গোপন রেখেই জীবনটা কেটে গেল।' সোমদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আমাকে যদি বলতে আমি বুঝতুম। পাগল ঠাওরাতুম না। কিন্তু এখনো হয়তো খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি। এখনো তোমার সিঁড়ি শুরু করে দেওয়া যায়। আজকেই শুরু হোক না? যদি বলসাপেক্ষ না হস।' আমি উৎসাহ দিই।

'আরে, না। তুমিও যেমন।' সোমদেব ম্লান মুখে বলে। 'কখনো তা আরম্ভ কোরো না, যা তুমি শেষ করতে পারবে না।'

সেদিন ও কি সহজে মুখ ফুটে বলবে কী ওর জীবনের স্বপ্ন। অথচ ওইজন্যেই আমাকে ডাকা। ধৈর্য ধরি। এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে যাই। যেন বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই আমার। ওর খুশি হলে ও বলবে। নয়তো বলবে না।

কিন্তু বলবার জন্যে ও আকুলিবিকুলি করছিল। না বলে সোয়াস্তি পাচ্ছিল না। কখন একসময় বলতে শুরু করে দেয়। আমার খেয়াল নেই।

'তোমার সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগে আমি যখন স্কুলের ছাত্র', সোমদেব বলতে থাকে, 'তখনি ও স্বপ্ন দেখি। তখনকার দিনে আমি স্বপ্নালু বালক। পড়াশুনায় ভালো নয়। খেলাধূলায়ও নয়। ছবি আঁকতুম। গান করতুম। কবিতাও লিখেছি যদি বলি তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ওর চেয়ে বড়ো কথা আমি যাত্রার পালা লিখতুম।'

অবাক করল সোমদেব! যাত্রার পালা!

'হ্যাঁ। রামায়ণ মহাভারত ভেঙে ভেঙে যাত্রার পালা। সেসব অবশ্য প্রকাশ্যে অভিনয়ের জন্যে নয়। তার জন্যে চাই যাত্রার দল। দল আমার কোথায়! দল থাকলেও কি সকলের সামনে দাঁড়াবার সাহস ছিল? বাবা যখন হাঁক দিয়ে বলতেন, বেত কেটে নিয়ে আয় রে, তখন জানতুম ও বেত আমার পিঠেই পড়বে। আমার ওসব যাত্রা আমি বেনামী করে দিতুম। হয়তো দুটো একটা দূরে কোথাও অভিনয় হতো। বড়ো হয়ে চাকরিতে ঢুকে একবার এক যাত্রা দেখে আমার অস্পষ্ট মনে হয়েছিল যে আমারি সোমদেবোত্তর সম্পত্তি। খোল আর নলচে বদলে দিয়েছে।' বন্ধুর হাসিতে আমিও যোগ দিই। অবিশ্বাসী যদিও।

'তারপর হঠাৎ কেমন করে আমি অন্য মানুষ হয়ে উঠি। খেলাধূলায় চৌকষ। লেখাপড়ায় ততটা নয়, তবে পরিশ্রমী। যাত্রা দেখা ছেড়ে দিই। তাতে সময়ের অপচয় হয়। সেই সময়টা কাজে

লাগালে ক্লাসে ফার্স্ট সেকেণ্ড হওয়া যায়। সময়ের এই মূল্যবোধ আমাকে মানুষ করে দিয়েছে। এ যেমন সত্য তেমনি সত্য আমার স্বপ্ন ভুলিয়ে দিয়েছে। গড়তে চেয়েছিলুম আমার যাত্রার দল যে দল আর সব দলকে হারিয়ে দিয়ে সারা দেশের সেরা দল হবে। আর রামায়ণ মহাভারতের স্রোতে সারা দেশকে প্লাবিত করে দেবে।' সোমদেব অতীতের স্বপ্নে মগ্ন হয়।

'ওটা তো চিরকাল হয়ে এসেছে। সোমদেব। ওই রামায়ণ মহাভারত ভাঙিয়ে তো তিন হাজার বছর খাওয়া হয়েছে। নতুন কী তুমি দিতে যা আর কেউ কখনো দেয়নি। দেশে কি যাত্রার দলের অভাব! না সেরা দলের অভাব?' আমি তর্ক করি।

'তুমি ঠিক ধরতে পারলে না, ভাই অদ্রীশ। আমার আইডিয়া ছিল মামুলী যাত্রা নয়। এমন এক যাত্রা যাতে দর্শক বা শ্রোতারাও অংশ নেবে। আমার দল যেখানেই যাবে সেখানেই সারা গ্রাম জমায়েৎ হবে। আর সারা গ্রাম যোগ দেবে। ছেলেবেলায় অবশ্য অতদূর ভাবিনি। পরে আমার চিন্তার বিকাশ হয়েছে। দর্শকরা বা শ্রোতারা প্যাসিভ হবে এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য সবাইকে অ্যাকটিভ করে তোলা। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নগরকীর্তনের মতো। আমি অবশ্য তুচ্ছ মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা! কিন্তু আমার যাত্রার আইডিয়া তাঁর ওই নগরকীর্তনের দোসর।' সোমদেব উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

'সেই রাধাকৃষ্ণ! সেই রামায়ণ মহাভারত! দূর।' আমি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিই। 'বাড়ি করেছ মডার্ন। আসবাব কিনেছ মডার্ন। আর স্বর্গের সিঁড়ির বেলা সেই আদ্যিকালের যাত্রা! সেই মান্ধাতার আমলের ভীম অর্জুন রাম সীতা! ও জিনিস চলত না, সোমদেব। তোমার প্রয়াস ব্যর্থ হতো।'

কথাটা বলে ফেলে পরে খেয়াল হয় যে কাজটা ভালো হয়নি। যে মানুষ যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে তার যাওয়া তাতে পেছবে না। তাছাড়া প্রসঙ্গটা হচ্ছে ওর বাল্যকালের। তখন আমারও তো রামায়ণ মহাভারতে অবিচল বিশ্বাস ছিল। দেশের লোকেরও। কেউ কি সে সময় ভেবেছিল যে ওজিনিস চলবে না? ওর দিন গেছে?

সোমদেব মর্মাহত হবে মনে করেছিলুম। কিন্তু তা নয়। সে খুশি হয়ে বলে, 'বাঁচালে। স্বর্গের সিঁড়ি গড়তে গিয়ে আমি মর্ত্যের কাজে অবহেলা করতুম। পরে হৃদয়ঙ্গম করতুম ও সিঁড়ি অচল। ও পথ দিয়ে কেউ স্বর্গে যাবে না। দেখছি তো লোকের মতিগতি। ওরা পারলে স্বর্গটাকেই মর্ত্যে নামিয়ে আনে। এই ধরণী হবে ওদের অমরাবতী। আমার পক্ষে যাত্রা একটা অযাত্রা হতো, অদ্রীশ।'

'যাত্রায় আমার আপত্তি নয়। সোমদেব।' আমি বুঝিয়ে বলি। 'আমার আপত্তি ওইসব পৌরাণিক বিষয়ে। কর না তুমি একটা নতুন ধরনের যাত্রা। বিষয় বেছে নাও আধুনিক জীবন থেকে। নায়ক নায়িকারাও হবে আধুনিক। তেমনি সব বীরপুরুষ, তেমনি সব বীরাঙ্গনা। কুন্তী দ্রৌপদীও কি এযুগে নেই? থাকলে কেন বাদ যাবে?'

'আমাকে মাফ কোরো, ভাই অদ্রীশ।' হাত জোড় করে সোমদেব। 'এযুগের কুন্তী দ্রৌপদীদের আমি জলচল করতে অক্ষম। জানো তো আমার নীতিবোধ কীরকম কঠোর। রামায়ণ মহাভারতের আধুনিক সংস্করণ থেকে যাবতীয় দুর্নীতি বর্জন করতে হবে।'

শুনে তো আমি থ! প্রতিবাদ করতেও ভরসা পাইনে। মৃত্যুপথযাত্রী।

'রাজাগুলো শত অনাচার করে অসমর্থ। রানীগুলো কুলগুরু, কুলপুরোহিত বা ঋষিদের কাছে নিযুক্ত। ব্রাহ্মণদের দয়ার শরীর। পরেরটিও চাই, ঘরেরটিও চাই। দেবতারাই বা কম কিসে! কেউ যখন বলে দেবতুল্য চরিত্র তখন মারতে ইচ্ছে করে। কোন্ দেবটি দেবতুল্য, শুনি? এক গণেশ ঠাকুর বোধহয়। ওটা তাঁর চেহারার গুণে। ভাই অদ্রীশ, স্বর্গের সিঁড়ি যে আমি গড়িনি এটা আমার জীবনের ব্যর্থতা নয়। এমন কি রাবণেরও নয়। ও সিঁড়ি দিয়ে দেবতারাই মর্তে নেমে আসত। ওদের

পেলে মেয়েরাও কি আর আমাদের দিকে ফিরে তাকাত? পুজো তো করছে দু'বেলা ওদেরই।' বলতে বলতে সোমদেব অগ্নিদেব হয়ে ওঠে।

আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলি, 'চুপ! চুপ!'

সোমদেব সামলে নিয়ে বলে, 'না, আমার মনে লেশমাত্র খেদ নেই। আমি এখন খেদহীন মন নিয়ে মরতে পারব। কোথায় যাব, জানিনে। স্বর্গে যেতেও রুচি হয় না। ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য পবন কাউকেই আমি বিশ্বাস করতে পারব না।'

'তাহলে তুমি যাবে কোথায়? নরকে? এমন কোনো পাপ তো তুমি করনি, সোমদেব, যে নরকেই তোমার গতি হবে?' আমি সহাস্যে বলি।

ও ধাঁধায় পড়ে। স্বর্গে যাবার স্পৃহা নেই, ভাবে নরকে যাবার হেতু নেই, তাহলে ও যাবে কোথায়? ভাবে। ভেবে কূল পায় না।

'সমস্যা হচ্ছে এই যে মানুষের নীতিবোধ এখন দেবতাদের নীতিবোধকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাই স্বর্গসুখও তার কাছে স্বর্গীয় নয়। তার জন্যে স্বর্গের সিঁড়ি গড়ে কী হবে? গড়তে হবে নতুন একটা স্বর্গ।' এই বলে আমি সেদিনকার মতো উঠি।

'আবার আসবে তো?' ও ডান হাত বাড়িয়ে দেয়।

আমি ঝাঁকানি দিয়ে বলি, 'আবার আসব।'

॥ চার ॥

বন্ধুজায়া আমাকে এগিয়ে দেবার সময় জানতে চান, 'কেমন দেখলেন?'

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। অপারেশন ছাড়া কি কেউ বাঁচে না? অস্টিওপাথী বলে একরকম চিকিৎসা আছে খোঁজ নিতে পারেন।' আমি ভরসা দিই।

কিন্তু মনটা হাহা করে। ও কি বেশিদিন বাঁচবে! ওই যন্ত্রণা কি বেশিদিন সহ্য হবে! আমার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলছিল যন্ত্রণার বিরাম ছিল না।

ভাবছিলুম ওর মতো ঝুনো নারকেলের ভিতর এত রস ছিল। যাত্রার দল গড়ে নগরসংকীর্তনের মতো সবাইকে কাছে টেনে নেওয়া। তার বদলে যা হলো তা শাসনের কাজে দাপট দেখিয়ে সবাইকে দূরে ঠেলে দেওয়া। এখন আর ফিরে যাবার পথ নেই। রাবণের সিঁড়ি গড়তে হলে স্বপ্ন দেখার বয়সেই আরম্ভ করতে হয়। পদে পদে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। অনন্যমনা হতে হয়।

কিন্তু গড়েই বা হতো কী! লোকে যদি স্বর্গে যেতে না চায়, যদি চায় স্বর্গই চলে আসুক স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে! কার জন্যে স্বর্গের সিঁড়ি! লোকের জন্যেই তো।

চিন্তাকুল মন নিয়ে বাড়ি ফিরি। ইরাও জানতে চান কেমন দেখলুম। 'মুক্ত পুরুষ।' আমি উত্তর দিই। 'স্বর্গের জন্যে স্পৃহা নেই, নরকের জন্যে শঙ্কা নেই। জীবনের উপর আসক্তি নেই। মরণের উপর বিরক্তি নেই। তবে যাত্রা বোধহয় সারা হয়ে এল।'

'কী বলতে ডেকেছিলেন?' ইরা কৌতূহলী হন।

'যে সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল তার কথা। স্বর্গের সিঁড়ি। রাবণের স্বপ্ন। ওরই রকমফের আর কী!' আমি করুণস্বরে বলি।

(১৯৬৮)

সাঁঝের অতিথি

ওরা দুই বন্ধু সান্যাল আর নন্দী ক্যাম্পটেবিলের দু'ধারে ক্যাম্পচেয়ার পেতে টুং টাং আওয়াজ করে ডিনার খাচ্ছে। শীতের সন্ধ্যা। তাঁবুর খুঁটিতে বাঁধা পেট্রোমাক্সের আলো রাতকে দিন করে দিয়েছে।

হঠাৎ আঁধারের এলাকা থেকে আলোর এলাকায় সবেগে পদপাত করলেন যিনি তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই খানসামা বেয়ারার দল তটস্থ ও স্তব্ধ। সান্যাল সবে পুডিংটা মুখে তুলেছে, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

'ও কে! তুমি! মুক্তা!' নন্দী শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়ায় ও চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আমরা তো কবে তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছি। এরই নাম কি পাঁচটা?'

'না, ভাই, বসব না। আমাকে এখনি ট্রেন ধরতে হবে। কলকাতার লাস্ট ট্রেন। অনেক, অনেক ক্ষমা প্রার্থনা। শুধু তোমার কাছে নয়, তোমার বন্ধুর কাছেও। মিস্টার সান্যাল, আই প্রিজিউম।'

সান্যাল ইতিমধ্যেই আসন ছেড়ে উঠেছে। বাউ করে বলে, 'ঠিক যেন ডক্টর লিভিংস্টোন, আই প্রিজিউম। এই তেপান্তরের মাঠে আপনার আবির্ভাব যেন আফ্রিকার অরণ্যে স্ট্যানলীর উদয়। দেখছেন তো কোথাও জনমানব নেই। আটটা বাজতে না বাজতেই সব নিঝুম। কিন্তু নন্দী, তুমি তো কই ইনট্রোডিউস করে দিলে না?'

'আমার বন্ধু ত্রিদিব সান্যাল। অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আমার—বোন মুক্তাপ্রভা দেবী। কংগ্রেস নেত্রী। আর বছর মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। এই সেদিন মুক্তি পেয়ে দিকে দিকে সভা করে বেড়াচ্ছেন। যেন দিগ্বিজয় করছেন।' নন্দী পরিচয় দেয়।

'যতসব বাজে কথা!' মুক্তা সহাস্যে প্রতিবাদ করেন, 'কিন্তু আর এক মিনিটও দাঁড়াতে পারব না। যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও তো চল ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। মিস্টার সান্যাল আশা করি কিছু মনে করবেন না।'

'মনে করব, যদি আপনি কিছু মুখে না দিয়ে যান।' সান্যাল ট্রে বাড়িয়ে দেয়। একমুঠো আখরোট বাদাম খদ্দরের ঝোলায় পুরে মুক্তা দেবী অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে নিষ্ক্রান্ত হন। সঙ্গে টর্চ হাতে করে নন্দী। ডাকবাংলোর সীমানা ছাড়িয়েই স্টেশনের রাস্তা। সেখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। আরোহী দু'জন গান্ধী টুপিধারী।

'তোমরা ফিরে যাও। আমি এইটুকু পথ হেঁটে যেতে পারব।' মুক্তা আদেশ দেন।

ট্রেনের সত্যি সময় ছিল না। দূর থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। জোরে জোরে পা চালিয়ে দেয় ওরা। চলতে চলতে কথা বলে যায়।

'চার বছর দেখা হয়নি। এই প্রথম ও এই বোধ হয় শেষ। ফের হয়তো জেলে ফিরে যেতে হবে। দিগ্বিজয় না ছাই। ইংরেজ কি অত সহজে মরবে! তোমরা আবার সেই ইংরেজেরই গোলামি করছ। ধিক তোমাদের!' মুক্তা এক নিঃশ্বাসে বলে।

'আমি কি তোমার সভাজন যে লেকচার শুনব। সারাটা দিন সভাজনকে দিয়ে দুটি মিনিট অভাজনকে দিতে পারো না?' নন্দী নালিশ করে।

'কেন দেব, শুনি। তুমি আমার কে? জেল থেকে বেরিয়েই বন্ধুদের মুখে বার্তা পেলুম তুমি নাকি বিয়ে করেছ। চমৎকার খবর। আমার তো আনন্দে জয়ধ্বনি করতে সাধ গেল। কিন্তু বৌদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। হলে কত খুশি হতুম।' মুক্তা ছুটতে ছুটতে বলে।

দেখতে দেখতে ট্রেন এসে পড়ে। ওরা দৌড়তে দৌড়তে টিকিট উইণ্ডোতে যায়। তারপর অন্ধকারে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে ইণ্টার ক্লাস উইমেন খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে ছেড়ে দেয় তারকেশ্বর লোকাল।

মুক্তা তো প্রায় ভেঙে পড়ে আর কী! একটার পর একটা মিটিং করে অবসন্ন। ইটিং যদি হয়ে থাকে তবে অকিঞ্চিৎকর। চোখের উপর দিয়ে চলে গেল লাস্ট ট্রেন।

অ্যাসিস্টাণ্ট স্টেশন মাস্টার ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'কাল ভোরেই আপনাকে রওনা করে দেব, দিদি। রাতটা কোনো মতে ধৈর্য ধরুন।'

ওদিকে যে নিরুপমা দেবীর বাড়ি থেকে হাওড়ায় মোটর আসবে ওকে নিতে! জেল থেকে ফিরে ও তাঁরই অতিথি হয়ে সর্বত্র সভাসমিতি করে যুদ্ধবিরতির সময়টুকু কাটাচ্ছে। ওর বিশ্বাস গান্ধীর সঙ্গে আরউইনের কথাবার্তা ব্যর্থ হবে। সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পরতে হবে। ওর স্বামী এসে কলকাতায় ওর সঙ্গে দেখা করে গেছেন, সঙ্গে শিশুপুত্র। আবার যখন যেতেই হবে জেলে তখন মায়া বাড়িয়ে কী হবে?

'অসম্ভব! এ হতেই পারে না!' মুক্তা মেনে নিতে পারে না যে ওকে আজ কলকাতার বাইরে এক পাড়াগাঁয়ের স্টেশনে রাত কাটাতে হবে। কিন্তু আরো বড়ো বিস্ময় ছিল ওর কপালে। ওয়েটিং রুম বলতে এতটুকু একটা শেড। সেখানে রাত কাটায় না কোনো যাত্রিণী।

'কী সর্বনাশ! তা হলে আজ আমি থাকব কোন্ চুলোয়!' স্টেশন মাস্টারকে ডেকে পাঠায়। সে ভদ্রলোক হাত যোড় করে মাফ চান রেলওয়ের তরফ থেকে।

সে গোসা করে স্টেশন মাস্টারের কামরাতেই প্রায়োপবেশন করতে যাচ্ছিল। অনশন ধর্মঘট। কিন্তু কেউ ওকে সঙ্গ দিতে রাজী নয় শুনে ওর কাণ্ডজ্ঞান ফেরে। ও নরম হয়ে বলে, 'তা বলে রেল কোম্পানীর এ অন্যায় সহ্য করব! ওয়েটিং রুম কেন বানায় না ওরা? কোটি কোটি টাকা শোষণ করছে- –'

'চুপ, চুপ। সভা নয় এটা।' নন্দী ওর কানে কানে বলে। 'একজন অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট যদি এসব কথা শোনে তো তার অ্যারেস্ট করার পাওয়ার আছে।'

তখন প্রকৃতিস্থ হয় মুক্তা। বলে, 'কী ভুল! কী ভুল! কেন ওই ঘোড়ার গাড়িতে করে স্টেশনে এলুম না? তা হলে তো পায়ে হেঁটে সময় নষ্ট হতো না!'

ওরা দু'জনে স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটেই ফেরে। পথে পড়ে ডাকবাংলো। নন্দী বলে, 'ওয়েটিং রুমের চেয়ে ডাকবাংলো এমন কী মন্দ? আমাদের দু'জনের অতিথিদের জন্যে দু'খানা ঘরই রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে। দু'খানাই তোমার জন্যে খুলে দেওয়া হবে। কেমন, রাজী? না কংগ্রেস আপিসে খবর পাঠাব যে মুক্তা দেবী ট্রেন ফেল করেছেন, আপনারাই তাঁর জন্যে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করুন।'

'ওরা তো সাধাসাধি করছিলই আরো একদিন থাকতে। কিন্তু আমার নিয়ম হলো আমি কোথাও রাত কাটাইনে। কলকাতার কথা আলাদা।' মুক্তা আর ওমুখো হতে চায় না।

'তা হলে চল সান্যালকে বলি। একখানা ঘর ওর নামে যখন।' নন্দী ওকে বোঝায়। ওদিকে সান্যাল আপন মনে গান ধরেছিল—

'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
এলো ফাগুনদিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে যাই যাই যাই।'

অন্ধকারে দু'জনের গলা শুনে ওর গান থেমে গেল। 'ও কে! তোমরা পরমেশ আর মুক্তা।

আরে, এস, এস। তারপর কী ব্যাপার! ট্রেন ফেল!'

তারপর চৌকিদারকে ডেকে ডাকবাংলোর ঘর খোলানো হলো, জল তোলানো হলো, বাতি জ্বালানো হলো। জমাদারকে ডেকে বাথরুম সাফ করানো হলো। বেয়ারাকে ডেকে বিছানা পাতা হলো। বাবুর্চিকে ডেকে খানা পাকানোর হুকুম দিতেই মুক্তো মিনতি করে বলল, 'আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না আজ। ভীষণ মন খারাপ।'

সত্যি ওর অবস্থা দেখে মায়া হয়। শ্রান্ত ক্লান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত। তবে গরম জলে স্নান করে ও কিছু আরাম পেলো। এক পেয়ালা গরম চা চেয়ে নিয়ে খেলো। আর ডাকবাংলোর বারান্দায় পাতা ইজি চেয়ারে গা মেলে দিয়ে শান্ত হলো।

'তা হলে সেই কথাই রইল। কাল ভোরে উঠে তোমাকে আমরা ট্রেন ধরিয়ে দেব। তুমি একটু পরে তোমার ঘরে গিয়ে ভিতর থেকে ভালো করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুতে যাবে। হাতের কাছে এই টর্চ। দরকার হলেই বেয়ারাকে ডাকবে। ও আজ বারান্দায় শোবে।' এই বলে পরমেশ বিদায় নিতে যায়।

'ও কী, তুমি চললে কোথায়! তোমার জন্যে আমি কতদূর থেকে এলুম, নিরিবিলিতে কথা বলব ভেবে ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে দিলুম, ট্রেনটা যে ফেল করলুম সেটাও তো বলতে গেলে তোমারি জন্যে। তোমার সঙ্গে না গিয়ে ওদের সঙ্গে গেলে ওরা আমাকে ট্রেন ধরিয়ে দিত নির্ঘাত। এখন তুমিই আমাকে পথি নারী বিবর্জিতা করে চললে!' মুক্তো এমন সুরে বলে যে, শুনলে মায়া হয়।

অগত্যা আর একটা ইজি চেয়ার টেনে বসতেই হলো পরমেশকে।

মুক্তো বলে, 'বিশ্বাস করো, আমার আজ এখানে রাত কাটাবার লেশমাত্র পরিকল্পনা ছিল না। আমি আসতে চেয়েছিলুম পাঁচটায়। হাতে আধঘণ্টা সময় নিয়ে। তারপর যে ট্রেনটা ধরতুম সেটা লাস্ট ট্রেনের আগের ট্রেন। সে ট্রেনেও মোটর আসত। কিন্তু মিটিং করতে করতে সাতটা বেজে গেল। তোমার এখানে আসতে আসতে পৌনে আটটা। আমার তো মনে হয় এটা আমার নিয়তি। তোমাকে এত কথা বলার ছিল যে আধঘণ্টায় কিছুতেই বলা যেত না। আর না বললে তুমি আমাকে ঠিক বুঝতে কী করে? একজনকে বিয়ে করেছ বলে কি আরেকজনকে একটুও ভালোবাসবে না?'

পরমেশ অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বলে, 'আর ওসব নতুন করে শুনিয়ে ও শুনে কার কী সুখ, মুক্তো! তুমি মুক্ত হতে চেয়েছিলে। মুক্ত হয়েছ। আমি বাঁধা পড়তে চেয়েছিলুম। বাঁধা পড়েছি। এটাও ভালোবাসার বাঁধন। ও আমাকে ভালোবাসে বলেই বিয়ে করেছে। আর আমি ওকে। আমরা কেউ মুক্তি চাইনি। তুমিই চেয়েছিলে। তুমি পেয়েছ। দ্বিতীয় এক বন্ধন তোমার কাম্য ছিল না। আমার সঙ্গে বন্ধন তো তুমি সত্যি সত্যি চাওনি। তিন বছর অপেক্ষা করার পর একদিন এলো সত্যের মুহূর্ত। আমি সেই মুহূর্তের উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলুম যে তুমি আমাকে ভালোবাসলেও কোনোদিনই আমার হবে না, আমার সঙ্গে মিলে নাড় রচনা করবে না। তুমি হবে বনের পাখী। আর আমাকেও তোমার জন্যে বনের পাখী হতে হবে সারা জীবন। যা আমার অন্তর চায় না। সেইজন্যেই তো আমার আপনাকে জোর করে ছাড়িয়ে নিলুম। ওটা তোমার উপর অপ্রেম বা অশ্রদ্ধা থেকে নয়। আমার অপূর্ণতার উপলব্ধি থেকে।'

মুক্তো নীরবে চোখের জল ঝরায়। মাঝে মাঝে চোখ মোছে। অনেকক্ষণ পরে উত্তর দেয়। 'তুমি যেমন সুন্দর করে বলতে পারো আমি কি তেমন পারি? তা বলে কি তোমার সত্যই একমাত্র সত্য, আমার সত্য কিছু নয়? মুক্তি চেয়েছি এটা ঠিক। এখনো চাই। কিন্তু বন্ধনও কি চাইনে?

প্রেমের বন্ধন?'

'আমি বলতে চেয়েছিলুম বিবাহের বন্ধন —' পরমেশ কণ্ঠক্ষেপ করে।

'ওসব পরের কথা। কেন যে তুমি ওই নিয়ে অত ভাবতে তা আজো আমার বোধগম্য হয়নি। কেন যে অত কম বয়সে—পুরুষের পক্ষে কম বয়স বই কি—বিয়ে করে পর হয়ে গেলে তাও কি আমি বুঝি?'

'অতি সহজ প্রশ্ন। দাবা খেলতে বসে যে-কোনো ভালো খেলোয়াড় দু'তিনটে চালের পরেই বুঝতে পারে যে খেলায় হার হবে। কী দরকার সময় নষ্ট করে? তার চেয়ে নতুন করে আসর সাজানো যাক। ট্রাই ট্রাই এগেন।' পরমেশ সংক্ষেপে বোঝায়।

'ওঃ এই তোমার প্রেমের ফিলসফি!' মুক্তা আহত হয়ে বলে, 'না, না, তুমি তো এমন ছিলে না। কেন যে তোমার মন বদলে গেল তা কোনোদিন স্পষ্ট করে বলনি। শুধু তোমার সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়েছ যে এর পর থেকে আমরা ভাই বোন।'

মুক্তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে পরমেশের অভিরুচি ছিল না। সে পরিচ্ছেদ সে ইচ্ছে করেই শেষ করে দিয়েছে।

'খেলার উপমা যখন দিয়েছ তখন বলি, খেলার মাঝখানে তুমি হঠাৎ উঠে পালিয়ে গেলে। সবুর করলে দেখতে তুমিই খেলায় জিতেছ। তোমার হেরে যাবার সম্ভাবনা তখনো ছিল না এখনো নেই, কিন্তু এখন তো আর ওকথা ওঠেই না। তুমি এখন বিবাহিত পুরুষ।' মুক্তা উদাসভাবে বলে।

'যদি শুনতে চাও তো বলি আমি অবিবাহিত থাকব বলেই পণ করেছিলুম, যতদিন না তার দেখা পাই যে আমার ও আমি যার। আকস্মিকভাবে দেখা পাওয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। তুমি যদি তখন বাইরে থাকতে তোমাকে জানাতুম। কিন্তু তুমি তখন জেলে আর আমি একজন সরকারী কর্মচারী। তোমার সঙ্গে মেশা জেলের বাইরেও দুঃসাহসের কাজ। এই যে আজ তোমাকে এখানে তুলেছি এর জন্যেও জবাবদিহি করতে হতে পারে। হবে না, কারণ সরকার এখন তোমাদের সঙ্গে মিটমাট করতে চান। তোমরা গেলে আমরাও হাফ ছেড়ে বাঁচি।'

'তোমার সঙ্গে মেশা আমার পক্ষেও কম দুঃসাহসের কাজ নয়, কংগ্রেসও জবাবদিহি তলব করতে পারে।' মুক্তার আত্মসম্মান উদ্দীপ্ত হয়।

লাস্ট ট্রেনের পর এ পথে লোক চলাচল থেমে আসে। গ্রাম এখান থেকে বেশ দূরে। চারদিক নিস্তব্ধ নিশ্চল। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। অন্ধকারে গা ছম ছম করে। ইতিমধ্যে পেট্রোমাক্স নিবে গেছে। আলো বলতে একটা লণ্ঠন।

'রাত কত হয়েছে, খবর রাখো?' মুক্তার হাত থেকে টর্চ চেয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখে পরমেশ। 'বাই জোভ, এগারোটা পঁচিশ। কোনখান দিয়ে সময় কেটে গেল। বেশি কথা তো হয়নি। এখন, লক্ষ্মীটি, তোমার ঘরে গিয়ে ভিতর থেকে বন্ধ করো।'

'কেন, তোমার ঘুম পেয়েছে বুঝি? জীবনে একটা রাত। তুমি ঘুমিয়ে কাবার করবে? আর আমার চোখে ঘুম আসবে মনে করো? এই তেপান্তরের মাঠে চোর যদি আমার ঘরে ঢোকে আমার প্রোটেকশন কী?' মুক্তা ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

পরমেশ বলতে যাচ্ছিল, কেন, বেয়ারা শুয়েছে বারান্দায়? কিন্তু কোথায় বেয়ারা? শীতের ভয়ে সে তার কারলীপার তাবুতে ঢুকেছে। বারান্দা তো ফাঁকা। মানুষটিও বুড়ো। আর ডাকবাংলোর চৌকিদার—যার এ ডিউটি— সে তার গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে।

'চোর কখনো এ তল্লাটে আসবে না। দু'দুজন হাকিম ও তাদের লোকলস্কর রয়েছে না? তাদের কাছে হাতিয়ার নেই ভেবেছ?' পরমেশ বলে।

'তা হলে তোমার রিভলভারটা আমাকে ধার দাও।' আবদার ধরে মুক্তা।

রিভলভার তো সত্যি পরমেশের ছিল না। তবু এমন ভাব দেখাতে হয় যেন আছে। সে মাথা নেড়ে বলে, 'ও জিনিস দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিতে নেই। কড়া নিষেধ। চোর এসে হয়তো ওটিকেই আগে সরাবে। এই সন্ত্রাসবাদের দিনে আমিও যে নিরাপদ নই, মুক্তা। আমাকেই বা রক্ষা করবে কে?'

'হুঁ। বুঝেছি। আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না। তোমার ধারণা আমি তলে তলে সন্ত্রাসবাদী। অবশ্য ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই তা নয়, কিন্তু নিরুদিকে আমি কথা দিয়েছি যে যতদিন আমি ওঁর সঙ্গে আছি ততদিন ওঁকে বিট্রে করব না। কত ভালোবাসেন আমাকে। আর কত বিশ্বাস করেন। উনিই তো আমাকে বলেন যে, মুক্তা, তোমার মুক্তি আর ভারতের মুক্তি একই সমস্যা। না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না। সেই জন্যেই তো আমি আজ রাত জাগছি।' সে হেসে ওঠে।

'তা হলে আমি নিদ্রার জন্য ছুটি পাব না?' পরমেশ নিবেদন করে।

'কেন পাবে না? কে বলছে তোমাকে জেগে থাকতে? যাও, তোমার তাঁবুতে যাও। রইলুম, আমি এই বারান্দায় বসে। একটু পরে চাঁদ উঠবে, তখন আমার আর ভয় থাকবে না। তা হলেও আমি ঘরে ঢুকছিনে। কে জানে, বাবা, কবেকার ডাকবাংলো! এসব পুরোনো বাড়িতে জন মানব না থাকলে যারা এসে আশ্রয় নেয় তাদের বাইরে থেকে দেখতে টিকটিকি গিরগিটির মতো। আসলে কিন্তু ওরা অশরীরী।' এই বলে সে বার কয়েক রাম রাম করে।

পরমেশ তো অবাক। একজন শিক্ষিতা মহিলার এ কুসংস্কার!

'পম, তুমি হ্যামলেট নাটকের হোরেশিও। তাই তোমার দর্শনবিজ্ঞানকেই মনে করেছ সবজান্তা।' এতক্ষণ বাদে মুক্তা ওর প্রিয় নামে সম্বোধন করে।

'দু'মাসের উপর ডাকবাংলোর মাঠে শিবির করে আছি, কেউ একদিনও বলেননি যে এটা ভূতুড়ে।' পরমেশ বিস্ময় প্রকাশ করে।

'চুপ, চুপ। নাম করতে নেই। দেখছ না, শুনতে পেয়েছে। ওই দেখ, টিকটিকিটা কেমন ল্যাজ নেড়ে এগিয়ে আসছে। মা গো! রাম রাম রাম।' মুক্তা শিউরে ওঠে। টর্চটা পরমেশের হাত থেকে খপ করে কেড়ে নিয়ে দেয়ালের উপর আলো ফেলে।

'কোথায় টিকটিকি? ওটা তোমার বিভ্রম।' পরমেশ মন্তব্য করে।

টিকটিকি নয়, কিন্তু বিভ্রমও নয়। ওটা একটা মথ। তার মানে ওই যারা শ্যাওড়াগাছে থাকে।' মুক্তা সন্ত্রস্তভাবে বলে।

হারিকেনের আলো-আঁধারিতে মথকেও টিকটিকি বলে ভ্রম করা সম্ভব। কিন্তু ও যে শ্যাওড়াগাছ থেকে নেমে এসেছে এটা একটা সংবাদ।

'ভাগ্যিস, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। হলে তো অশরীরীর আতঙ্কে তুমি নিজেও ঘুমতে না, আমাকে ঘুমতে দিতে না।' পরমেশ টিপ্পনী কাটে।

'তুমি পাশে থাকলে আমি অঘোরে ঘুমোতুম। তবে তুমি বোধ হয় সশরীরীর ভয়ে বিছানায় আসতে না। শরীর বলে তোমার কোনো পদার্থ ছিল না। সবটাই মন। তবে ইদানীং দেখছি হাড়ে মাস লেগেছে। বিলেতের গুণে না বিয়ের গুণে কে বলতে পারে! আচ্ছা, আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়! আরো মোটা হয়ে গেছি, না জেলখানার খোরাক খেয়ে ছিপছিপে ফুরফুরে।' মুক্তা প্রশ্ন করে।

'মোটা আর পাতলা মিলে যা হয়। মোতলা।' পরমেশ ওকে ক্ষ্যাপায়।

'কী যে বল! মোতলা বলে কিছু আছে নাকি! ওটা কি প্রশংসার কথা? না নিন্দার? তুমি কি সীরিয়াসলি বলছ, না ঠাট্টা করছ?' মুক্তা গালে হাত দিয়ে বসে।

'প্রশংসার কথা। তোমার গড়নটা এতদিন পরে চলনসই হয়েছে। রূপ তোমার চিরদিন সুন্দর। কিন্তু গড়ন সম্বন্ধে সে কথা বলা চলত না। এখন চলে। কিন্তু তার জন্যে চাই বিশ্রাম আর নিদ্রা। রাত জাগলে বিচ্ছিরি দেখাবে। তুমি ভিতরে যাও। আমিও যাই আমার শিবিরে।' পরমেশ গা তোলে।

রাত সাড়ে বারোটায় তাঁবুতে ফিরে পরমেশ দেখে তার বন্ধু ত্রিদিব অকাতরে ঘুমচ্ছে। অন্ধকারে পা টিপে টিপে সে বাথরুমে যায়। টর্চটাও তো বেহাত। এখন ত্রিদিব যদি হঠাৎ জেগে উঠে 'চোর, চোর' বলে শোর তুলত তা হলে কী লজ্জায়ই না পড়ত পরমেশ! এখনো ওর কাপড় ছাড়া হয়নি। আঁটসাট ট্রাউজার্স পরে আড়ষ্ট বোধ করছে।

এবার ঢিলে পায়জামা পরতে যাবে এমন সময় শোনে মুক্তা যেন চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠছে, 'বাঁচাও!'

যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ছুটতে হলো ওকে। গিয়ে দেখে মুক্তা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে আর বলছে, 'ওটা কী। কালপ্যাঁচা না বাদুড়।'

কিছু নয়। একটা চামচিকে। কিন্তু অন্ধকারে মনে হচ্ছে আরো বড়ো।

'হাস্যকর ব্যাপার। তুমি দেখছি চামচিকে দেখলেও ভয় পাও। এই মানুষ ইংরেজের সঙ্গে বিভলভাব হাতে নিয়ে লড়বে। বিকল্পে চরকা হাতে নিয়ে।' পরমেশ রঙ্গ করে।

'বসো। কখনো কি আমি পোড়ো বাড়িতে নির্জনে বাত কাটিয়েছি? এই প্রথম ও এই শেষ। তোমারি জন্যে আমাব আজ দুর্ভোগ। আব তুমি কিনা ওদিকে লেপকম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যাসুখ উপভোগ করছ! নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছ একজনকে। যে আমি নয়।' মুক্তা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে কালপ্যাঁচার ভয়।

'বিছানায় গেলুম কখন যে স্বপ্ন দেখব? লক্ষ করনি এখনো আমার পরনে সান্ধ্য পোশাক? আমাব পোশাক থেকে মনে হবে এটা সন্ধ্যাবেলা।' পবমেশ আবার আসন নেয়। তখন চাঁদ উঠি উঠি কবছে।

'ক্ষমা কোবো, তোমাকে তোমাব সুখশয্যা থেকে টেনে আনলুম। কিন্তু কী করি, আমি যে একেবারে নিঃসঙ্গ। আর নিঃসহায়। জেলখানাও এর চেয়ে নিরাপদ। সেখানেও রাতে পাহারা থাকে। এখানেও তোমরা আমার জন্যে স্পেশ্যাল প্রহরী মোতায়েন করলে পারতে। আমি যখন তোমাদের রাজ অতিথি।' মুক্তা হাসির ভান করে।

'হাঁ, সেটা পারতুম। থানায় একটা চিঠি লিখে পাঠালেই জনা দুই কনস্টেবল পাওয়া যেত। কিন্তু পরে তা নিয়ে চারদিকে সাড়া পড়ে যেত আর কতরকম কথা উঠত। ক্ষমতা আছে বলেই কি তা ব্যবহার করতে হবে?' পরমেশ চাঁদের দিকে তাকায়।

'তা হলেও আমি তোমাদের প্রশংসা করতে পারিনে। তোমরা এতগুলো লোক আশেপাশে থাকতে আমি এতবড়ো একটা বাংলোয় একাকী ও অসহায়। ওটা চামচিকে না হয়ে শিকারী পাখীও তো হতে পারত।' চাঁদের আলো মুক্তার মুখে এসে পড়ে।

পরমেশ বলে, 'কাজ কী তোমার বারান্দায় বসে থেকে? ভিতরে যাও. শিকারী পাখীর সাধ্য থাকবে না যে তোমাকে শিকার করে।'

'তুমি বোধহয় ভিতরটা দেখনি। যাও, দেখে এস।' মুক্তা নির্দেশ দেয়।

পরমেশ গিয়ে দেখে নেয়ারের খাট বিছানার ভারে নুয়ে পড়েছে। মাঝখানটা একটা গর্তের

মতো। সেখানে একবার শুলে আর উঠতে হবে না। টেনে তোলার জন্যে আরেকজনের দরকার হবে। সেই আরেকজনটি কে হবে?

'হুঁ। এখন বুঝতে পারছি কী ভুল করেছি। আরেকজন স্ত্রীলোকের খোঁজ করা উচিত ছিল। সেই এসে ঘরের মেজেতে শুতো।' পরমেশ ভাবনায় পড়ে। এত রাতে সে ভুল শোধরানো যায় না।

'ওঃ তোমার অভিপ্রায় একজন স্পাই লাগানো? ম্যাজিস্ট্রেট কিনা, তাই মাথায় জিলিপির প্যাঁচ।' মুক্তার মেজাজ চড়া।

'দূর, পাগলী! তোমারি স্বার্থের জন্যে বলছি। আমার কী! তবে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছ তাতে আমার ঘুমের আশা ফেরার। আচ্ছা, তুমি মেজের উপর ঢালা বিছানায় শুতে পারবে?' পরমেশ জানতে চায়।

'কী যে বল! আমার বুঝি প্রাণের মায়া নেই। তেঁতুলে বিছে, কাঁকড়া বিছে, লতাপাতা এরা কি আমাকে ছেড়ে কথা কইবে?' মুক্তা চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করে।

'কই, ওসব তো আমরা এতদিন এখানে থেকেও দেখিনি। থাকলে বারান্দাতেও উঠত। লক্ষ্মীটি, যাও। শুয়ে পড়ো। রাত এখন দুটো।' পরমেশ সাধে।

'অমন করে সাধতে হয় যাকে সে এখন তার বাপের বাড়িতে আরাম করে ঘুমিয়ে। সে এমন বোকা মেয়ে নয় যে মান্ধাতার আমলের একটা ডাকবাংলোয় তোমার অতিথি হবে। তুমি তো শুধু শোবার ঘরখানাই দেখলে। আরো ভিতরে গিয়ে যদি বাথরুমের দৃশ্য দেখতে। হাতীর মতো প্রাণীরই উপযুক্ত কমোড ওটা। তেমনি হাতী ধরবার ফাঁদ। আর ওই ড্রেসিং টেবিলটা দেখেছ? বিরাট আয়না, কিন্তু মুখ দেখা যায় না!' ঠেস দিয়ে ছড়ার মতো আওড়ায় মুক্তা।

পরমেশ তো ডাকবাংলোয় ওঠেনি। জানবে কী করে কোথায় কী আছে? শুনে দুঃখিত হয়। কিন্তু ওই ডাকবাংলোই সফরের সময় কত বড়ো একটা সম্বল।

'আচ্ছা, আমি তোমাকে ঘরে শুতে বলব না। তুমি এইখানেই চাঁদের আলোয় একটু ঘুমিয়ে নাও। আমিও এইখানেই একটু চোখ বুঁজি। ওঘর থেকে বালিশ আর কম্বল আনিয়ে নাও। আমিও তাঁবু থেকে নিয়ে আসি।' পরমেশ প্রস্তাব করে।

মুক্তা সায় দেয়।

যে যার আরামকেদারায় আরামে শয়ান। জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটেছে। দু'জনের মুখে আলোর লহর। ঝিল্লী প্রহর গুনছে।

আধঘন্টা পরে মুক্তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর। 'পম কি ঘুমিয়ে পড়লে?'

পরমেশের তন্দ্রা এসেছিল। সে চমকে উঠে বলে, 'কে? রিনি?'

মুক্তা খিল খিল করে হেসে ওঠে। 'পম, কার নাম করলে? তোমার বৌয়ের? রিনি বুঝি ওর নাম? বেশ নামটি তো। কিন্তু মানুষটিকে এখন পাচ্ছ কোথায়? এ যে নেহাৎ নীরস নিরেট মুক্তা।'

'ওঃ! মুক্তা। হাঁ, মনে পড়ছে। তোমাকে আমি পাহারা দিচ্ছি। কিন্তু তুমি কেন এখনো জেগে?' পরমেশ ধীরে ধীরে সজাগ হয়।

'পাহারা যারা দেয় তারা বুঝি পড়ে পড়ে নাক ডাকায়? কার ভরসায় আমি ঘুমোব? চোর যদি এসে হার খুলে নিয়ে যায় কে টের পাবে?' মুক্তা সুধায়।

'আর লজ্জা দিয়ো না। তোমার যদি কিছু চুরি যায় আমি আমার পকেট থেকে দেব। শুধু, লক্ষ্মীটি, বাকী রাতটুকু ঘুমোতে দাও। তুমিও আর জেগে থেকো না। আমি তো রয়েছি। ভয় কিসের?' পরমেশ আশ্বাস দেয়।

'ভরসাই বা কিসের? এমন ধন আছে যা একবার গেলে ফিরে আসে না। যে নেয় সেও ফিরিয়ে দিতে পারে না। আমি যদি বিনি হতুম তুমি যক্ষের মতো জেগে থাকতে। বিনি হবার ভাগ্য তো করিনি। তাই তুমি অমন উদাসীন।' খোঁচা দেয় মুক্তা।

পরমেশ নিদ্রার জন্যে সব কিছু দিতে পারত। কিন্তু সব পেলেও কি মুক্তা ওকে ঘুমোতে দেবে? তার দৃঢ় সংকল্প সে নিজে ঘুমোবে না, আর কাউকেও ঘুমোতে দেবে না।

'বল, দেবী, কী আদেশ দাসে?' পরমেশ একটু নাটকীয়ভাবে বলে।

'কিছু নহে, রহ তুমি জাগি। অতন্দ্র প্রহরী।' মুক্তাও তেমনি।

'তুমি যদি নিদ্রা যাও আমি রব জাগি। নতুবা নিদ্রিব।' পরমেশ বিদ্রোহ করে।

'ও কী। রাগ করলে নাকি।' মুক্তা ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আচ্ছা, তুমি একজন বিদ্বান মনীষী, তুমি কেন বুঝতে পারো না যে পুরুষবেষ্টিত পুরীতে একাকিনী নারীর একমাত্র রক্ষাকবচ জাগরণ। নারীর পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেইটেই আমি করছি।' মুক্তা খোলাখুলি বলে।

'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে আমি সারারাত পায়চারি করব। যেমন করে টহল দেয় সান্ত্রী। তুমি নির্ভয়ে ঘুমোও।' এই বলে পরমেশ উঠে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা।' বলে মুক্তা চোখ বোঁজে।

বেচারা পরমেশ। বারান্দাটার একধার থেকে আরেকধার পাড়ি দেয়। আধঘণ্টা কি তিন কোয়ার্টার পরে মুক্তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। 'পরম।'

'জেগে আছো তো। শুধু শুধু কসরৎ করালে।' পরমেশ গজগজ করে।

'এস। কাছে এসে বসো। বুঝেছি পারছ না। আজ আমার চোখে ঘুম আসবে না। আর তোমাকেও আমি চোখের আড়াল করব না। জীবনে একটা রাত।' মুক্তা মৃদু স্বরে বলে।

পরমেশ আবার স্বস্থানে ফিরে এসে বসল। চাঁদের আলোয় বান ডেকেছে। রাত বটে একখানা। এমন রাতে সত্যি চোখ বোঁজা যায় না।

'তোমাকে যেকথা বলতে এতদূর আসা সেটা কিন্তু আমার মনে চেপে আছে। নামছে না। কে জানে তুমি কী অর্থে নেবে। চার বছর বাদে তুমি তো আর সেই ছেলেটি নও। তোমাকে দেখলে ভয় করে এখন।' মুক্তা গৌরচন্দ্রিকা করে।

'ভয় কেন? আমি কি খুব বেশি বদলে গেছি?' পরমেশ বিস্মিত হয়।

'তুমি বিবাহিত পুরুষ। বিবাহজীবনে সুখী। আমার মতো বিবাহে অসুখী নও। তোমার সঙ্গে আমার মিলবে কী করে? আর আমিই বা মেলাব কী করে? যদি ইতিমধ্যে বিয়ে না করতে তাহলে হয়তো মেলাতে পারতুম। এখন তো ওটা প্রশ্নের অতীত। জেল থেকে বেরোবার পর খবরটা পেয়ে অবধি আমি ভাবছি এখন থেকে আমাদের কী ভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে।' মুক্তাকে ভাবুকের মতো দেখায়। তেমনি চিবুকে হাত।

'আমি কি কোনোদিন তোমার কাছে গোপন করেছি যে, বিয়ে না করে আমি থাকতে পারব না? একজনকে না একজনকে, তোমাকে না হোক আর কাউকে। তুমি যদি কেবলি ঝুলিয়ে রাখ তাহলে আমি করি কী? মুক্তা, সময় আর জোয়ার কারো তরে অপেক্ষা করে না। প্রেমও তেমনি। প্রেমেরও একটা প্রচ্ছন্ন টাইম লিমিট আছে। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। তুমি বোঝ না। আমি বুঝি।' পরমেশ মুক্তার দিকে অনিমেষ তাকায়।

'কিন্তু তোমার সৌম্যদা তো এখনো কুমার। বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড়ো। যাঁর জন্যে অপেক্ষা তিনিও তো বিবাহিতা', মুক্তা তর্ক করে।

'সৌম্যদাকে কেউ অপেক্ষা করতে বলেননি। বৃথা অপেক্ষা। ও বিবাহ ভাঙবার নয়। প্রেমের

বিবাহ।' পরমেশ দুঃখ প্রকাশ করে। 'সৌম্যদা হলেন রোমান্টিক বিরহী। বিরহেই তাঁর গৌরব, মিলনের চিন্তা তাঁর মনে ঠাঁই পায় না, সেইজন্যে তাঁর কাছে টাইম লিমিট নেই। ইংরেজদের মধ্যে যেমন চার্লস ল্যাম্বের ড্রীম চিলড্রেন পড়েছ?'

'হ্যাঁ। কী করুণ। উনিও কি সন্তানের স্বপ্ন দেখেন?' মুক্তা কৌতূহলী হয়।

'দেখেন বইকি। ওঁর অ্যালিসের সন্তান।' পরমেশ বলে।

মুক্তা অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবে, তারপর বলে, 'তোমার ড্রীম চিলড্রেনের কথা তুমিও আমাকে জানিয়েছিলে। আমাকে দিয়ে পড়িয়েছিলে। কিন্তু তখনো আশা দিইনি, এখনো আশা দিতে পারতুম না, যদি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে বসে থাকতে। না, তোমাকে মিথ্যে ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হতো না। তোমার ড্রীম চিলড্রেন রিনির কোলেই আসবে।'

পরমেশ পূব আকাশের দিকে তাকায়। সেদিকে রঙের আমেজ।

'তোমাকে আমি দোষ দিতে চাইনে, পম।' মুক্তা নরম হয়ে বলে, 'কিন্তু তুমি যে মনে করতে তুমি একজন মহান প্রেমিক সেটা কিন্তু পরীক্ষায় টিকল না। তুমিও ঠিক আর পাঁচজনের মতো বাস্তববাদী। অসম্ভবের পেছনে না ছুটে সম্ভবপরের দিকেই হাত বাড়াও। তোমার সিদ্ধিও তেমনি সহজ সিদ্ধি। কোনো বাহাদুরি নেই তাতে।'

পরমেশ মাথা পেতে নেয় সে রায়। তার অন্তরাত্মাই জানেন সিদ্ধি সহজ না কঠিন। সাধনাটাই আসল, সাধনাতেই তার অধিকার। সিদ্ধিতে নয়।

'আমি যে ফেল সে আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু তুমিও পাশ নও। পাশ ওই সৌম্যদা। সত্যিকার আদর্শ প্রেমিক।' মুক্তা ওঁর প্রশংসায় গদগদ হয়।

দুটো একটা পাখী ডাকতে শুরু করেছে। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। এইবার লোকজন একে একে জাগবে ও এদের দু'জনাকে একসঙ্গে দেখে কী যে মনে করবে!

মুক্তা ত্বরিৎগতিতে বলে যায়, 'কতজন আমাকে ভালোবাসে। আমি কি প্রেমের কাঙাল! কিন্তু আমি চাই রস। যাতে আমার প্রাণ জুড়োবে। বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।'

'একটিও না!' পরমেশ কথাটা গায়ে পেতে নেয়। তার মনে লাগে।

'কী করে বলি একটি, যখন দেখি সে আর আমার চোখে চোখ রাখে না, আমার হাতে হাত মেলায় না, আমার ছোঁয়ার ভয়ে দশ ফুট দূরে চেয়ার পাতে। সমস্তক্ষণ আনমনা হয়ে বৌয়ের কথাই ভাবে যেজন সেজন আদর্শ পতি হতে পারে, হয়তো আদর্শ যতি। কিন্তু রস কাকে বলে জানে না।' বলতে বলতে মুক্তার চোখে জল ভরে আসে। সে আবেগে আকুল হয়ে কাঁদে।

সন্ধ্যাবেলা যে সন্ধ্যাতারার মতো উদয় হয়েছিল ভোরবেলা সে শুকতারার মতো অস্তপ্রায়। তার মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থাকে পরমেশ। সে যেন পূর্বজন্মের একটি স্মৃতি। এখনি সে মিলিয়ে যাবে।

(১৯৬৯)

সব চেয়ে দুঃখের

কোথায় যেন পড়েছি, চারজন ইংরেজ যদি একত্র হয় তবে একটা ক্লাব গড়ে। তেমনি দেখেছি চারজন বাঙালী যদি একত্র হয় তবে একটা মাসিকপত্র ফাঁদে।

'আপনার কাছেই এলুম।' সেদিন চারজন যুবক অভ্যাগত হয়ে আমার বাড়িতেই আমাকে ঘেরাও করে। 'আমরা একখানা নতুন মাসিকপত্র বার করছি, তার নামকরণের ভার আপনার উপরে।'

'ওঃ! এই কথা! আমি তো ভেবেছিলুম চাঁদা আদায়।' আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। 'তা নামের জন্যে অতদূর আসার দরকার কী ছিল? চার ইয়ারের পত্র যখন, তখন 'চার ইয়ারী পত্র' নাম রাখলেই হতো।'

'কিন্তু পাঁচজনে যদি না লেখেন, দশজনে যদি না কেনে তাহলে কাগজখানা যে ফুটপাথেই মারা যাবে।' ওদের একজন যুক্তি দেখায়। সেই বোধহয় নাটের গুরু।

'কথাটা ভুল নয়।' আমি চিন্তা করি। 'পাঁচজনের মুখ চেয়ে যদি পত্রিকা চালাতে হয় তবে 'পঞ্চ ম-কার' এমন কী দোষ করল? হু-হু করে বিকোবে।'

'আমরা কি নারাজ? কিন্তু গবর্নমেন্ট ও নাম অনুমোদন করলে তো? তার সম্ভাবনা কম। যদি না আপনি সহায় হন।' এই বলে আমার দিকেই বল পাশ করে।

আমি সাত পাঁচ ভেবে বলি, 'কেন নয় 'সাত-পাঁচ'? তা হলে সর্বদিক রক্ষা হয়।'

দেখা গেল ওরা আগে থেকে তৈরি হয়ে এসেছে যে ওদের পত্রিকাটির নাম হবে 'যুগযন্ত্রণা।' তাতেই নাকি যুবসমাজের মর্মবাণী ব্যক্ত হয়।

'বেশ, বেশ। সেই ভালো।' আমি ওদের হাত এড়াবার জন্যে তারিফ করি।

'সত্যি! আপনার মতো লেখকের নৈতিক সমর্থন এত সহজে পাব এটা আমাদের কাছে স্বপ্ন। এখন তা হলে বলুন লেখাটা কত তাড়াতাড়ি পাচ্ছি। সাত দিনের মধ্যে?' ওরা কাবুলীওয়ালা।

'কই, লেখার অঙ্গীকার তো দিইনি। লেখা কি মাসিকপত্র বার করার মতো সহজ ব্যাপার নাকি? বিশেষত আমার পক্ষে?'

'ওসব অজুহাত চলবে না। চলবে না। আমাদের পত্রিকায় ফী মাসে একটা ফীচার থাকবে। 'আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের অভিজ্ঞতা।' ছোট বড়ো সব লেখক-লেখিকাকেই আমরা আসরে নামাচ্ছি। এখন আপনাকে দিয়েই শুরু।' ওরা আমাকে আপ্যায়িত করে দেয়।

'আচ্ছা, দেখি।' এ-ছাড়া আর কী-ই বা বলতে পারি একালের যুবকদের?

আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের অভিজ্ঞতা যে কী তার উত্তর একশো দিক থেকে ভাবা যেতে পারে। পরীক্ষায় ফেল করা থেকে প্রেমে ফেল করা, মাতৃশোক থেকে পুত্রশোক, লেখা সম্পাদকের দপ্তর থেকে ফেরৎ আসা থেকে লেখার জন্যে গালাগাল খাওয়া। এমনি নানাদিক থেকে ভেবে সাত দিনের ছ' দিন কাবার। এমন সময় আমার সমবয়সী সুহৃদ্ দেবদাসের আবির্ভাব। দেবদাস তো নয়, দেবদূত।

'কী নিয়ে এত ভাবনা? গিরি জিতবে না বেড্ডি জিতবে? আরে, ওসব ছেড়ে দাও, ভাই। আমরা তো ভোটার নই।'

দেবদাস আপন মনে সিগারেট ধরান।

'তা নয় হে! এ আরো সীরিয়াস। আজকের মধ্যেই আমাকে লিখতে হবে আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের অভিজ্ঞতা কী।' আমি তাঁকে সব কথা শোনাই।

'তুমি আমাকে জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই শুনিয়েছ। তার মধ্যে আমাকে সব চেয়ে দুঃখ দিয়েছিল কোন্‌টা বলব?' তিনি গালে হাত দিয়ে বসেন।

' কোন্‌টা?' অধীর হয়ে উঠি আমি।

'কেন, সেই গল্পটা। গুণ্ডা আর গে লেডিজ।' তিনি খেই ধরিয়ে দেন।

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বলি, 'দুঃখের হতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের?'

'আমার দিক থেকে। তোমার দিক থেকে হয়তো নয়। আমার এই ষাট বছরের জীবনে এমন কাণ্ড আমি কখনো শুনিনি। ছি ছি ছি ছি! বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এইজন্যেই তো আমি তীর্থে যাবার কথা ভাবি। হিমালয়, তুমিই সত্য।' দেবদাস আর একটা সিগারেট ধরান। চেন স্মোকার।

আমি আমার পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করছিলুম। ওর চেয়ে দুঃখের কি কিছুই নেই? ওই সবচেয়ে দুঃখের? না, বোধহয়, কিন্তু সময় যে নেই। তা ছাড়া পাঠকদের বিচারই যখন শেষ বিচার তখন হয়তো দেবদাসের মতটাই ঠিক।

'তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো 'যুগযন্ত্রণা' ওটা ছাপাবে না। ওদের কতকগুলো বাঁধি গৎ আছে। দুঃখ বলতে ওরা বোঝে তারই একটা। এ-ধরনের দুঃখ ওদের ছকের বাইরে। কাজেই তুমি যত খুশি সময় নাও। আর কোনো পত্রিকায় দিয়ো। তবে ওরাও ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি ওদের শালীনতায় বাধে। আজকাল আবার, এই এক ধুয়ো উঠেছে—শালীনতা, শ্লীলতা,' দেবদাস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেন।

'আচ্ছা, তুমিই বল গল্পটা, তোমার যদি মনে থাকে। ওটা শুনে তুমিও তো অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছিলে রামবাগানে। অনেক তথ্য তোমারও তো আবিষ্কার।' আমি ওঁরই শরণাপন্ন হই। পুলিসের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ও আমার পাড়াতেই বসবাস করছে।

আমারি অভিজ্ঞতা আমার কানে ফিরে আসে পল্লবিত ও মুকুলিত হয়ে। এটাও একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমি কফির অর্ডার দিই। দেবদাস বলতে থাকেন।

।। দুই ।।

তুমি থাকতে আয়রণসাইড রোডে, আমি থাকতুম বালীগঞ্জ সারকুলার রোডে। পার্টিশনের বছর দুই পরে তোমাকে একদিন ওঁরা আরো একটা পদ দেয়। তুমি এসে বললে, 'ওহে দেবদাস, এখন থেকে আমি চতুষ্পদ।'

তার মানে প্রথমে তুমি ছিলে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেবার অধিকর্তা। উপরন্তু হলে কৃষি আয়কর ট্রাইব্যুনালের সভাপতি। অধিকন্তু হলে কমিউনিস্ট প্রভৃতি আটক-বন্দীদের মুক্তি বিষয়ে পরামর্শদাতা। সবাইকার তুমি নাড়ীর খবর রাখতে। শেষ কালে তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো গুণ্ডা আইনের ভার। কলকাতার গুণ্ডামহলের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো। তবে তার আগেই বেশির ভাগ পাকিস্তানে পালিয়েছিল।

তুমি উত্তেজিত হয়ে বলতে, আমি কি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো? এইসব আজে-বাজে

মামলা শুনে কী হবে, শুনি? এসব কাজ একজন জজের জজ সম্মানের উপযুক্ত নয়। আমি তা শুনে বলতুম, এটা তোমার দুর্যোগ নয়, এটাই তোমার সুযোগ। একালের সমাজের চারটি বড়ো বড়ো দিক্‌পাল স্তম্ভই হলো শ্রমিক, কৃষক, কমিউনিস্ট ও গুণ্ডা। চারটি স্তম্ভ মিলে তোমাকে চৌকস করছে। সুতরাং তোমার অমন স্তম্ভীভূত হওয়া কি উচিত?

আবার একদিন তুমি মহাবিরক্ত হয়ে বললে, 'দেবদাস, ওরা আমাকে আরো একটা স্তম্ভ দেখিয়েছে। আমি আরো স্তম্ভীভূত।'

'শুনি ব্যাপার কী?' তুমি শান্ত হও। আমি তোমাকে ঠাণ্ডা করি।

'গুণ্ডার পরে কী, কল্পনা করতে পারো?' তুমি বললে।

'গুণ্ডার পরে কী? খাটাল?' আমি পরিহাস করি।

'হাসির কথা নয়। রে লেডিজ।' তুমি ইংরেজীতে বললে।

'আমার, ভাই, অত বাঁকা ইংরেজী ভালো আসে না। আমরা যখন ওদের উল্লেখ করি তখন সোজা ইংরেজী ব্যবহার করি। সেটা আবার তোমার কানে বাজে।'

তোমার কাছেই শোনা গেল পুলিস প্রোসিকিউটার নাকি বলেছিলেন যে তিনি রামবাগানশুদ্ধকে এনে হাজির করে দিতে পারতেন কিন্তু তোমার আদালতে স্থানাভাব। তাই বারোজন বারবনিতাকে সাক্ষী দিতে এনেছেন। তুমি যদি আরো চাও তো আরেকদিন এনে দেবেন। তামাম রামবাগান বিক্ষুব্ধ। লোকটা জ্বালিয়ে খেলে।

লোকটার বর্ণনা তুমি দিয়েছিলে মনে আছে। সাধারণ গুণ্ডার মতো নয়। কোনো কারণে ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়স। দেখতে যেন একটি বুনো মোষ। বন্যতা যদি না থাকত তা হলে একটি কেষ্ট ঠাকুর। যেমনি কালো তেমনি সুগঠিত ও সুদর্শন। তার চোখের চাউনি কখনো শিষ্ট, কখনো রুষ্ট; কখনো বিনীত, কখনো উগ্র। তাকে সমস্তক্ষণ ধরে রাখতে হচ্ছিল। নইলে সে হয়তো আদালতের মধ্যেই সাক্ষীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু তার মুখে কথা ছিল না। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়, এই পর্যন্ত।

পুলিসের কাগজপত্র ও সাক্ষ্য থেকে তুমি অবগত হলে যে লোকটার দেশ এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত পাবনা জেলায়। জাতে বেদে বই। ওর পূর্বজীবন সম্বন্ধে পুলিসে কোনো রেকর্ড আছে কিনা জানবার উপায় নেই। বিভিন্ন সূত্রে যতদূর শোনা যায় সে গান-বাজনা নিয়ে থাকত। সংসারের কাজকর্ম করত না। তাই বাপে খেদানো ছেলে। জমিজমা যথেষ্ট ছিল কিন্তু ওদের সমাজে স্ত্রী-সংখ্যা নিদারুণ কম, তাই বিয়ের আশা ছিল না বিয়ের বয়সে। প্রথা হচ্ছে কোনো এক বিধবার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক পাতানো। অনেকেই সেটা করে। তাতে সমাজে পতিত হতে হয় না। চল্লিশ বছর বয়সে হলো একটা দশ বছরের খুকীর সঙ্গে সামাজিক বিবাহ হয়। আরো কয়েক বছর বাদে ম্যালেরিয়ায় স্বামী করেন পরলোকগমন আর বিধবাটি করে প্রথার অনুসরণ।

এ লোকটি বছর পাঁচেক আগে ভিন্নজাতের একটি সুন্দরী বিধবার সঙ্গে পাবনা থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর মতো ভিক্ষা করেই দু'জনের চলছিল। হঠাৎ দেখা গেল বৈষ্ণবীটি নিখোঁজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান পাওয়া গেল যে একজন বাবুর রক্ষিতা হয়ে সে রামবাগানে বাড়ি ভাড়া করে বাস করছে। দুলীর নাম এখন মন্দাকিনী হয়েছে। সে তো গোকুল দাসকে দেখে চিনতেই পারে না। দারোয়ানকে বলে ভাগিয়ে দিতে। গোকুল সেইখানেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। মন্দাকিনীও দরজা খুলবে না। মন্দাকিনীর মানুষটি এসে তাকে যা-তা বলে অপমান করেন, যেন তিনি ওর সঙ্গিনীকে ভুলিয়ে আনেননি, সেই তাঁর সঙ্গিনীকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

ধর্ম সইবে? এই হলো গোকুলের মর্মভেদী প্রশ্ন। বিসূচিকা হয়ে বসন্ত হয়ে মরণ হবে না? গোকুল অভিশাপ দেয়। কিন্তু কে তার অভিশাপ অঙ্গে মাখে? মন্দাকিনী যেন অন্যজগতের নারী। কলকাতার নাগরিক। বাবু ওবাড়ি তার নামেই নিয়েছেন, তাকেই লিখে দেবেন। তার সুখে বাদ সাধছে কে? না গোকুল বলে নিষ্কর্মার ধাড়ী। যে কোনোদিন একখানা শাড়ি পর্যন্ত কিনে দিতে পারেনি। বাবুর সোহাগ পেতে হলে গোকুলের সঙ্গে পিরীত করা ছাড়তে হবে। দুলী তার মনঃস্থির করে ফেলেছিল। গোকুল কী করবে? কতদিন ওভাবে পড়ে থাকবে?

তখনো পার্টিশন হয়নি। গোকুল অনায়াসেই পাবনায় ফিরে যেতে পারত। তার বাপও তাকে ঘরে ফিরে যেতে দেখলে সুখী হতো। পাঁচজনে মিলে তাকে একটা ধান্দায় লাগিয়ে দিতে পারত। চাষ ছাড়া কি আর কোনো কাজ নেই? তবে সে ছিল কর্মভীরু। আর তার চেয়ে বড়ো কথা, কেউ তার বিয়ে দিতে পারত না। পাত্রীই নেই। পাত্রী জন্মাতে না জন্মাতেই ওর চেয়ে বয়স্ক পুরুষেরা বায়না দিয়ে কিনে নেয়। গোকুল তা হলে কিসের আকর্ষণে দেশে ফিরবে? আরো পাঁচ বছর বাদে ফিরলেই বা এমন কী ক্ষতি?

তার এই সঙ্কটে তার সহায় হয় তার চেহারা। শ্যামবর্ণ সুশ্রী যুবক। দরকার হলে কাঠ চিরতে, কয়লা ভাঙতে, জল তুলতে পারে। গায়ে অসুরের জোর। যে কোনো গৃহস্থবাড়িতে তাকে চাকর রাখবে। কিন্তু তার উপর দয়া করে পাশের বাড়ির বাড়িউলি তাকে দেয় আরো বড়ো পদ। সে গান শেখাবে ও সংসারের ফাই-ফরমাস খাটবে। সুকন্ঠ গায়ক। ভজন কীর্তনে সুপটু। হাতের কাছে তেমন একটি গায়ক পেয়ে বাড়িউলি বর্তে যায়।

গোকুল কলকাতা শহরে ওর চেয়ে ভালো কিছু পেতো না। সেও বর্তে গেল। ধীরে ধীরে ওর হৃদয়েরও পরিবর্তন হলো। ও আর দুলীর দিকে তাকায় না। তার কথা ভাবে না। একটু একটু করে আকৃষ্ট হয় বাড়িউলির একমাত্র কন্যার প্রতি। পান্নাও সমান আকর্ষণ অনুভব করে। বাড়িউলি জানত যে মেয়ের একদিন বিয়ে দিতে হবে। ওদের সমাজে ওইটেই প্রথা। আর সব বিষয়ে ওরা গৃহস্থের মতো। কেবল একটি ছাড়া। সেখানে ওরা স্বাধীনভাবে উপার্জন করে। উপার্জনের সনাতন ধারা তো আছেই। তাছাড়া কীর্তন গাওয়া, থিয়েটার করা ইত্যাদিও আছে। আগে ছিল বাই নাচ। এখন সেদিন নেই। পান্না—যার পোশাকী নাম মালঞ্চ—গান শিখে সৎভাবে উপার্জন করতে চায়। সনাতন বৃত্তিকে সে ঘৃণা করে।

বাড়িউলি একটি ঘরজামাই খুঁজছিল। উচ্চবর্ণের হলেই সে সানন্দে কন্যাদান করত। গোকুল যদিও জাত গোপন করেছিল, বলেছিল ও জাতবৈষ্ণব তবু ওর সামর্থ্য দেখে বাড়িউলির বুঝতে বাকী ছিল না যে ও চাষার ছেলে হলধর। ওদিকে পান্নার আসল বাপ হলো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুবর্ণবণিক। এখন যদিও সম্পর্ক নেই তবু মাঝে মাঝে খোঁজ নেয় মেয়েটা আছে কেমন। পাত্রস্থ হয়েছে কিনা। এছাড়া আর একটি বাপও ছিল। বাড়িউলি ওকে বিদায় করে দিয়েছে। ও নাকি মারধোর করত। কাশীতে না কোথায় আছে, মাসোহারা পায়।

শেষকালে গোকুলের সঙ্গেই পান্নার শুভবিবাহ হয়ে গেল। আর গোকুলই ক্রমে ক্রমে বাড়ির কর্তার মতো হয়ে উঠল। তার অমতে কিছু হবার জো নেই। আর সেও যা বলে তা ন্যায্য কথা। নেশা করে না, অন্য কোনো দোষও নেই। তবে অলসস্বভাব। শয়নসুখী।

বিয়ের পরে গোকুল ওর নাম পাল্টায় ভদ্র সমাজে মিশতে হলে গোকুল দাস বৈরাগ্য নাম সাজে না। তার চেয়ে নয়নসুখ ক্ষেত্রী অনেক বেশি মানায়। পাড়ায় এখন এই নামেই তার পরিচয়। পাঁচজনের সঙ্গে মিশে ও ভদ্রলোকের নকল করতেও শেখে। কাপড়চোপড় কথাবার্তা ভদ্রলোকের নকল। ওকে তুমি বললে ও খুব চটে যায়। ওকে আপনি বলতে হবে। বাবু বলতে হবে।

তবে উপার্জন তো এক পয়সাও নেই। পায়ের উপর পা রেখে জীবন কাটায় শুধু শাশুড়ীর অনুগ্রহে। ওদিকে শাশুড়ীরও তো বয়স হয়ে গেছে। এ বয়সে নতুন বাবু ধরা যায় না। সঞ্চয় ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন রোজগারের বয়স পান্নার। একদিন নয়নসুখ আবিষ্কার করে যে তার স্ত্রী তার শোবার ঘরে নেই, গেছে অন্য একটি ঘরে। সে ঘরটা অতিথিদের জন্যে রক্ষিত। অতিথি বলতে কী বোঝায় সে তা জানতে পেরেছিল। কিন্তু অতিথিরা শাশুড়ীর অতিথি বলে সে গুরুজনকে কিছু বলত না। এবার তার বুকে শেল বেঁধে। অতিথি কি তবে তার স্ত্রীর অতিথি? স্বামীকে একা ফেলে সে অন্য ঘরে গিয়ে অতিথি সেবা করবে?

পরের দিন সে তার বৌকে কড়া ধমক দেয়। ও বেচারীর সত্যি কোনো দোষ ছিল না। ও নিজের ইচ্ছায় যায়নি। ওকে ওর মা বন্ধ করে রেখেছিল। দোর খুলে দেয়নি। যে ব্যাপারটা ঘটে গেল সেটা ওর ইচ্ছাবিরুদ্ধ। এই নিয়ে নয়নসুখ ওর সঙ্গে ঝগড়া না করে শাশুড়ীর কাছেই কৈফিয়ৎ চায়। ফল হয় না। শাশুড়ী স্পষ্ট বলে দেয় যে এ-বাড়িতে উপার্জনক্ষম বলতে দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন নেই তখন ওরকম তো মাঝে মাঝে হবেই। তবে নয়নসুখের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও হবে। সেও আরেকজনের সঙ্গে রাত কাটাতে পারবে। যতবার ততবার। তার জন্যে খরচ যা লাগবে বাড়িউলি দেবে।

নিচের তলায় তিন ঘর ভাড়াটে ছিল। তাদের ঘরেই পালা করে নয়নসুখের নিমন্ত্রণ। পান্নার তাতে বুক ভেঙে যায়। নয়নসুখেরও কি ভাঙে না? কিন্তু কিছুদিন বাদে দু'জনেরই অভ্যাস হয়ে যায়। কিন্তু ভালোবাসায় ফাটল ধরে। সে ফাটল দিন দিন বাড়তে বাড়তে একদিন পদ্মার মতো চওড়া হলো। একূল থেকে ওকূল দেখা যায় না। অথচ অন্য উপায় নেই। নয়নসুখ তো গতর খাটাবে না। গলা খাটিয়ে বড়ো জোর দুটি ভিক্ষার চাল হয়। কিন্তু সে এখন বাবু হয়েছে। বৈরাগীর মতো ভিক্ষা করবে তা কি হয়? অবশ্য দেশে ফিরে যাবার পথঘাট খোলা ছিল তখনো। পাকিস্তান হয়নি। কিন্তু কলকাতা ওর মাথা খেয়েছিল। আর স্বাচ্ছন্দ্যের মাশুল যদিও সাধ্যাতীত তবু চাষবাস করে খাওয়া আর তার পোষায় না। শয়নসুখই নয়নসুখের কাল হয়।

তখন পর্যন্ত ও ভায়োলেণ্ট হয়নি। নেশাখোর হয়নি। ওপাড়ায় যারা থাকে তারা মদ না খেয়ে থাকতে পারে না। ও তার ব্যতিক্রম হবে কী করে? তবু একটা মাত্রা মানত। কিন্তু বাপ হবার পরে ওর মনে পাপ ঢুকল। ও কেবলি আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আর ওর ছেলের চেহারার সঙ্গে মেলায়। মিল খুঁজে না পেলে অনর্থ বাধায়। বৌকে মারে, শাশুড়ীকে মারতে যায়। মদের বোতল ছুঁড়ে ফেলে। জানালার শার্শী ভেঙে যায়।

তারপর ও মদের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে দেয়। কে ওকে অত মদ জোগাবে? তখন শুরু হয় ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়। পথচারী দেখলেই ও গিয়ে হাত পাতে। টাকাটা সিকেটা পেলে ছেড়ে দেয়। নয়তো শাসায়, দেখে নেব। ওপথ দিয়ে লোক চলাচল যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আর খরিদ্দার হবে কে? ব্যবসা চলবে কী করে? আমাদের এই ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রে ওটাও তো একটা ব্যবসা। ব্যবসার পেছনে আছে বড়ো বড়ো রাঘব বোয়াল। ওদের দেখতে পাওয়া যায় না। ওরাই এসে পুলিসের কাছে লাগায় যে নিরীহ বারবনিতারা না খেয়ে মারা যাচ্ছে। ওদের রক্ষা করতে হলে নয়নসুখকে সরাতে হবে। ওকে গুণ্ডা বলে ঘোষণা করে কলকাতার বাইরে চালান দিতে হবে। না গেলে ফাটক। পুলিস তাই কোর্টের শরণাপন্ন।

অবশ্য প্রোসিকিউটার প্রারম্ভে অত কথা বলেননি। বলিয়েছেন সাক্ষীদের দিয়ে। তাছাড়া যেকথা তিনি অপ্রকাশ রেখেছেন সে সব মামলার পরে বেসরকারী অনুসন্ধানে আমিই নিজের কৌতূহলে আবিষ্কার করেছি। বিশ বছর বাদে সমস্তটাই তালগোল পাকিয়ে গেছে।

এই বলে দেবদাস থামলেন। কিন্তু তাঁর মুখের কথা থামলেও মুখের ধোঁয়া থামল না। কফিতে তাঁর তেমন রুচি দেখা গেল না।

॥ তিন ॥

এবার আমি খেই তুলে নিই। বলি, হ্যাঁ, এখন আমার একটু একটু করে মনে পড়ছে কেসটা। আমার এজলাসে কদাচ কখনো এক আধজন পে লেডীর ডাক পড়েছে। সাক্ষী দিতে। কিন্তু পর পর সাত আটজনের ডাক সেই প্রথম ও সেই শেষ। আরো ডাক পড়ত। আমিই অনিচ্ছা জানাই। একই পয়েন্টে বলবে তো? নতুন কিছু তো নয়।

নয়নসুখ নাকি প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকেও মদের জন্যে মাধুকরী করত, না দিলে ছোরা দেখাত। বেচারিদের দুঃখের উপার্জনের একটা অংশই ছিল ওর জন্যে বাঁধা। টাকা কি গাছে ফলে? তার জন্যে কত কষ্ট করতে হয়। ও বিনা মেহনতে পরের মেহনতের রোজগার কেড়ে খাবে। কোন্ সুবাদে শুনি?

নয়ন উকীল দেয়নি। ওকে সুযোগ দিয়েছিলুম ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করতে। ও জেরা করে না। করতে জানে না। শুধু গুমট করে থাকে। আর মধ্যে মধ্যে বলে 'মিথ্যা কথা।' ওর শাশুড়ীকে দেখে ও দস্তুরমতো ক্ষেপে যায়। মহিষাসুরের মতো শিঙ বেঁকিয়ে তেড়ে আসে আর কী। কিন্তু স্ত্রীকে দেখে অন্যমানুষ হয়ে যায়। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। দুই হাত জোড় করে একবার ওর দিকে তাকায়, একবার আমার দিকে। কী যে বলতে চায় বোবা লোকটা তা কি আমি বুঝব?

'নয়নসুখ, তুমি কিছু বলতে চাও?' আমি ওকে জিজ্ঞাসা করি। যদিও সেটা সাক্ষীর জবানবন্দীর মাঝখানে নিয়ম নয়। আমার মনের ইচ্ছা ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা মিটমাট ঘটানো।

নয়নসুখ বলে, 'ধর্মাবতার, ও ধর্ম সাক্ষী করে জবাব দিক, ওর ছেলে কার ছেলে? আরেকটি হবে শুনছি। ওটি কার?'

প্রোসিকিউটার আপত্তি জানান। ওটা জেরার যোগ্য প্রশ্ন নয়। ও সব প্রসঙ্গ এই মামলায় অপ্রাসঙ্গিক। সাক্ষীকে প্রোটেকশন দেওয়া আদালতের কর্তব্য।

আমি চোখ রাঙিয়ে বলি, 'আমার কর্তব্য আমি ভালো বুঝি।' তারপর আদালতে উপস্থিত এক ছোকরা উকীলের দিকে ইশারা করি। তিনি আমার কাছে এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি এ মামলায় আমাইকাস কিওরি হতে রাজী আছেন?'

'ইওর অনার যদি আমাকে তার সুযোগ দেন তাহলে নিশ্চয় রাজী হব।' এই বলে তিনি নয়নসুখের তরফে দাঁড়ান।

কেসটা খুবই সরল। লোকটা যে একটা পরগাছা সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু পরগাছা হলেই গুণ্ডা হতে হবে এমন কী কথা আছে? তাহলে তো ঘরে ঘরে গুণ্ডা। গুণ্ডা প্রমাণ করতে হলে আরো কিছু প্রমাণ করতে হবে। সেই আরো কিছুটা এ কেসে কী? ছোরা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? ছোরা দেখিয়ে টাকা আদায় করে? বেশ তো পীনাল কোডের কোনো এক ধারায় দণ্ডদানের জন্যে কোনো এক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নিয়ে যাও। হোক ছ' মাস কি এক বছর

সাজা। কিন্তু গুণ্ডা আইনেব আসামী কবা কেন? জজেব কাছে নিয়ে আসা কেন? আমি কি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ কবব?

প্রোসিকিউটার ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, গুণ্ডাব ডেফিনিশন যা তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। একে ছেড়ে দিলে পাড়াব লোকেদেব ও পাড়া ছাড়তে হবে। বাইবেব লোকবা তো আসা বন্ধ কবেইছে। বামবাগানে আব কি লালবাতি জ্বলবে? বামবাগান লালবাতি জ্বালাবে।

নযনসুখেব পক্ষে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি একজন পসাবহীন উকীল। কিন্তু বুদ্ধিমান যুবক। আব তাব ব্যবহাব এত নরম। তিনি বলেন, পুলিসেব চোখে আমাব ক্লায়েন্ট একজন গুণ্ডা ছাড়া আব কিছু নয়, কিন্তু সমাজেব চোখে সে একজন স্বামী ও পিতা। সে যদি অন্যত্র বাসা নিয়ে স্ত্রীকে তাব সঙ্গে সহবাস কবতে উকীলেব নোটিশ দেয় তাহলে স্ত্রীকে তাব ঘবে যেতে হবেই। যদি সেপাবেশন হয়ে যায় তাহলে সে দাবী কববে তাব ছেলেব কাস্টডি। বেটি হবে সেটিবও। সব ক'টা তুরুপেব তাস নযনসুখেব হাতে। সেই জন্যেই ওকে গুণ্ডা বানিয়ে দেশ থেকে বহিষ্কাবেব প্যাঁচ কষা হচ্ছে। ওব বিপদ হয়েছে এই যে ও বড়ো গবিব। মামলাব টাকা জোগাড় কবতে পাবে না। ওব যদি টাকা থাকত আমি ওব হয়ে একটা পালটা মামলা দায়েব কবতুম ওব শাশুড়ীব বিরুদ্ধে। অপবেব বিবাহিতা স্ত্রীকে অসৎ উপার্জনে লাগিয়ে তাব অর্থ আত্মসাৎ কবে ওব শাশুড়ী যা কবছে তা কি আইনেব বক্ষকদেব দৃষ্টিতে অপবাধ নয়? তাব বেলা এঁবা নিষ্ক্রিয় কেন?

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেবোয়। পুলিস পক্ষ কাবু হয়। আমি নযনসুখকে গুণ্ডা বলে ঘোষণা কবতে অস্বীকাব কবি। তাকে বলি, 'তুমি খালাস। কেউ তোমাকে আটক কববে না। তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পাবো।'

সে বিশ্বাস কবতে পাবছিল না যে সে সত্য মুক্ত। আব সে যাবেই বা কোথায়? সর্বশেষে উকীলবাবু তাকে বাইবে নিয়ে যান।

এবপবে প্রোসিকিউটাব আমাব সঙ্গে নেপথ্যে সাক্ষাৎ কবেন। বলেন, 'আপনি যা কবেছেন আমি হলেও এই কবতুম। ওটা গুণ্ডা আইনেব কেস নয়। কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছুই আমাদেব কবতে হয় যা কম মন্দ। এখন ছেড়ে তো দেওয়া হলো ওকে। ও যাবে কোথায়? ওই পাড়াতেই তো। ওই বাড়িতেই তো?'

কিন্তু ছেড়ে না দিলেও সেই প্রশ্ন উঠত। এখন পাকিস্তান হয়েছে। এখন তো ওকে বলতে পাবা যেত না 'সাবণ জেলায় ফিরে যাও'। আইনটা যখন তৈবি হয়েছিল তখন পাকিস্তান হয়নি। আপনাবা ওব উপবে নজব বাখুন। ওকে একটা সুযোগ দিন। লোকটা তো একদিনে খাবাপ হয়নি। একদিনে শুধবেও যাবে না। সময় দিন ওকে। বহিষ্কাবেব হুকুম দিলে ও নিশ্চয় অমান্য কবত। তখন জেলে পুবতে হতো ওকে। সেটা কি ভালো হতো? তাব চেযে চেষ্টা করুন ওকে বাঁচাতে। একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দিন। ওব আত্মসম্মান ফিবে এলে ও অন্য মানুষ হয়ে যাবে।'

প্রোসিকিউটাব বললেন, 'আচ্ছা, চেষ্টা কবা যাবে।'

কোর্ট থেকে ফিবে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকি। হায়, নযনসুখেব কেসটা যদি অত সহজ হতো। কেই বা ওকে কাজ দেবে দিলে কী কাজ দেবে, যা ও পাববে। দুনিয়া বড়ো কঠিন ঠাঁই। সবাইকে বাজিয়ে নেয়। যে কাজেব যে উপযুক্ত নয় তাকে ছাড়িয়ে দেয়। নযনসুখও কোথাও সুবিধে কবতে পাববে না। সে যোগ্যতাই তাব নেই। তারপর ওকে মাটি কবেছে ফ্রী আহাব, ফ্রী বিহাব, ফ্রী আবাস। ওব ধারণা জন্মেছে, উওম্যান যদি ফ্রী হয ওয়াইন কেন ফ্রী হবে না?

সবাব বাড়া দুঃখ ও সঠিক জানে না ওটি কাব সন্তান। যেটি আসছে সেটিই বা কাব। কোনোদিন কি ও সঠিক জানবে? কোনোদিন শান্তি পাবে? তা হলে কেনই বা কাজকর্ম কবতে

চাইবে? ভিক্ষা করলেই বা ক্ষতি কী? মানুষ খাটে স্ত্রীর জন্যে, পুত্রের জন্যে, পরিবারের জন্যে। ওর স্ত্রী কি ওর স্ত্রী, ওর ছেলে কি ওর ছেলে, ওর পরিবার কি ওর পরিবার?

বেচারা নয়নসুখ। আমি ওর জন্যে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকি। এমন সময় তুমি এলে। তোমাকে সব কথা বলে হালকা হলো মনটা। তুমিও তো পুলিসের কর্মচারী। চেষ্টা করে দেখতে পারো কী করে লোকটাকে বাঁচানো যায়।

তুমি স্বয়ং ও পাড়ায় গিয়ে খোঁজখবর নিলে। গিয়ে দেখলে নয়নসুখ নিরুদ্দেশ। ওর বৌ কান্নাকাটি করছে। তুমি অবাক হলে। যে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে এসেছে, যে ওকে গুণ্ডা বলে কলকাতা থেকে বিতাড়ন করতে পারলেই বাঁচে, অথবা জেলে পুরতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়, সে কেন ওর জন্যে কাঁদে? আরো অবাক হলে যখন দেখলে যে শুধু ওই একজন নয়, আরো অনেকেই কাঁদছে। অথচ সাক্ষী দেবার সময় ওরাই বলেছিল নয়না একটা গুণ্ডা।

মাসখানেক বাদে তুমি আবার খোঁজ নিয়েছিলে ও ফিরেছে কি না। না, ও ফেরেনি। কেউ বলতে পারে না ও কোথায়। বেঁচে আছে কিনা কে জানে। হয়তো গঙ্গায় ডুবে প্রাণ হারিয়েছে। এবার তুমি ওর নিন্দুকদের মুখে ওর প্রশংসা শুনলে। চোখের জল মুছতে মুছতে ওর প্রতিবেশিনীরা তোমাকে যা শোনায় তা ওর গুণকীর্তন। ও ছিল অতি সাদাসিধে, অতি মনখোলা। ওর দয়ামায়ার অন্ত ছিল না। আর গাইত বাজাত কী অপূর্ব। তা দোষ কার নেই? শরীর থাকলেই দোষ থাকে। যেমন শরীর থাকলেই ব্যাধি থাকে। তা বলে কি ওকে ঘেন্না করতে হবে? না, কেউ তা করে না। ওকে ভালোবাসে সবাই। কিন্তু গেল কোথায় মানুষটা? দেশের বাইরে, না জগতের বাইরে?

কিন্তু একজনও বোঝে না পুরুষের বুকে শেল বেঁধে কেন। চোখেই বা শূল ফোটে কেন। ওদের নাকি বদ্ধমূল সংস্কার যে নারী তার কপালদোষে বহু পুরুষের সঙ্গ করলেও তার সন্তান তার বিবাহিত স্বামীর সঙ্গেই হয়।

অবশেষে তুমি পুলিসের কাছেই সন্ধান পেলে যে ওরাই নয়নসুখকে আদালতের বাইরে গিয়ে শাসায়, ও যেন আর রামবাগানে মুখ না দেখায়। দেখালে নির্ঘাত জেল। তারপরে ও যে কোথায় গেল কেউ তা জানে না। জেনে কাজ কী? রামবাগান তো নিরাপদ।

তুমি বললে, ও যেখানেই গিয়ে থাক বেঁচে গেছে। এমন কি যদি পরলোকেও গিয়ে থাকে তা হলেও বেঁচে গেছে। ও যদি গুণ্ডা আইনের কবলে পড়ে বহিষ্কৃত হতো তা হলেও বেঁচে যেত। সব সহ্য হয়, কিন্তু একটি কথা আছে, যেটি সহনাতীত।

সে কথাটি কী কথা? জানতে চাইলুম আমি।

তুমি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, 'সেকথাটি ভাড়ুয়া বা ভেড়ে।'

আমি চমকে উঠি। 'ও যে গুণ্ডার চাইতেও খারাপ।'

'হাঁ, গুণ্ডাও ওর তুলনায় রেসপেকটেবল।'

কবেকার কথা। তার পরে বিশ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে কত কী ঘটেছে। দুঃখের অভিজ্ঞতা কি ওই প্রথম না ওই শেষ। তবু ওকেই আমি শিরোপা দিই। তোমার সঙ্গে আমি একমত। মনুষ্যত্বের অমন অবমাননা, পৌরুষের অমন অধঃপতন চোখে দেখা যায় না।

সেবার একটা কথা তোমাকে বলিনি। আজ কনফেস করি। গে লেডিজ বলতে আমার ধারণা ছিল 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী'। আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। যাদের চাক্ষুষ করি তারা কেউ সুন্দরী নয়, রূপসীও নয়। কিন্তু তাদের অনেকেই মাতা ও কন্যা ও বধূ। তারা আর দশজন গৃহস্থের মেয়ের মতনই। কেবল ওই একটা জায়গায় অমিল। আদালতে ওরা অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত ব্যবহার করেছিল। হাঁ, ওদেরও ডিগনিটি আছে। ওরা খেটে খায়। ওরা শ্রমজীবী। অথচ

কর্মটা ঘৃণ্য। বৃত্তিটা জঘন্য। কিছুতেই আমি মেলাতে পারিনি। ডিগনিটির সঙ্গে লেবারের। লেবারের সঙ্গে ডিগনিটির। কী যন্ত্রণা!

পরের দিন আমার তরুণ বন্ধুরা আমার লেখা পড়ে নিরাশ হয়। বলে, 'এর মধ্যে যুগযন্ত্রণা কোথায়?'

আমি বলি, 'এ যে যুগ-যুগ যন্ত্রণা।'

(১৯৬৯)

সোনার ঠাকুর মাটির পা

সভাভঙ্গের পর হল থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ আমার পিঠের উপর ছোট্ট একটি কিল। ভাবি ভিড়ের চাপে কারো হাত ঠেকে গেছে। তাই কিল খেয়ে কিল চুরি করি। ট্রামে বাসে অমন তো কত হয়। কিন্তু কিলের পর চড় পড়তেই আমার হুঁশ হয়।

পেছন ফিরে দেখি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নবকলেবর। তেমনি শীর্ণ ঋজু দেহযষ্টি। কাঁচাপাকা একমুখ দাড়িগোঁফ। চোখের দুষ্টু হাসি। হাঁ, তেমনি কিল চড়। আদরের পদ্ধতি। সে কি জীবনে ভোলা যায়!

'কি রে, চিনতে পারছিসনে! হা হা হা হা হা।' জড়িয়ে ধরে বলেন নব প্রফুল্ল। হাসিটা কিন্তু আচার্যদেবের নয়।

'চিনতে পারছি বইকি। কিন্তু নামটি তো মনে আসছে না।' আমি সঙ্কোচের সঙ্গে বলি। ইদানীং আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়েছে। নামগুলোই ভুলে যাই, মুখগুলো মনে থাকে।

'হাসালি। হা হা হা হা হা! বদনদাকে এর মধ্যেই ভুলে গেলি। আউট অফ সাইট আউট অফ মাইণ্ড।' তিনি আরো গুটিকয়েক কিল চড় মারেন।

'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয়শিষ্য না হলে অমন সুমধুর করস্পর্শ আর কার হবে। কিন্তু বাইশ বছর বাদে হঠাৎ রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো তুমি উদয় হলে কোন্ বনান্ত থেকে। আমি তো জানতুম তুমি পাকিস্তানে বাস করছ।' আমি চিনতে পারি ও দুই হাত ধরে নাড়ি।

'কেন, পাকিস্তানে যাব কোন্ দুঃখে? আমার বাড়ি যদিও ওপারে আশ্রম তো এপারে। বালুরঘাট মহকুমায়। তবে আশ্রম ছেড়ে কোথাও বড়ো একটা যাওয়া হয় না। চার পাঁচ বছর অন্তর একবার কলকাতা ঘুরে যাই, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি। তোর সঙ্গে দেখা হয় না, তার কারণ তুই শান্তিনিকেতনে থাকিস।' তিনি আমার সঙ্গে চলতে চলতে বলেন।

'এখন কিছুদিন থেকে কলকাতায়। কেউ তোমাকে জানায়নি?' আমি বিস্মিত হই।

'না। এমনি খবরের কাগজে দেখলুম আজ তোর বক্তৃতা আছে। তাই তো দেখা পেলুম। যাক, তুই আমাকে ভুলে যাসনি তা হলে।' বলে তিনি আবার আদর করেন।

'কী যে বল, বদনদা। পঞ্চাশ বছরের বন্ধুতা কি ভোলা যায়! চল, আমার সঙ্গে চল।' এই বলে ওঁকে আমার জন্যে আনা গাড়ীতে তুলি।

বদনদা খদ্দরের ঝোলাসমেত গাড়ীতে উঠে বসেন।

'সত্যি, পঞ্চাশ বছর এমন কিছু বেশি সময় নয়। এই তো সেদিনকার কথা। তোর সঙ্গে

যেদিন প্রথম আলাপ। পুরীব জগন্নাথেব মন্দিবে। তোব ঠাকুমাব সঙ্গে তুই আমাব জ্যাঠাইমার সঙ্গে আমি। চাবজনে মিলে মহাপ্রসাদ ভাগাভাগি কবে সেবা কবি। মন্দিবেব চত্ববে বোজ আমাদেব দেখা ও সেবা হতো। ধর্মে মতি ছিল না মহাপ্রসাদে রুচি ছিল বলা শক্ত। তাবপব কলকাতা ফিবে এসে বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেব সংস্পর্শে আসি। ওসব পূজা আর্চা আব ভালো লাগে না। এব'ব থেকে দবিদ্রনাবাযণই আমাব দেবতা। মহাপ্রসাদ হচ্ছে তাঁবই সেবাব অন্ন। তাব থেকে তিনি দযা কবে যা দেন সেইটুকুই আমাব ভোজ্য।' গাড়ীতে বসে বলে যান বদনদা।

'তাবপব তোমাকে আবাব দেখি চাব বছব বাদে পাটনায়।' আমাব মনে পড়ে যায়।

'সেই চাববছবেব ভিতবেই আমি অন্য মানুষ হয়ে যাই। গান্ধীজীব ডাকে অসহযোগে ঝাঁপ দিতে গিয়ে কলেজ ছাড়ি। বিজ্ঞান ছাড়ি। আচার্যদেবকেও ছাড়ি। খদ্দবেব ব্রত নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুবি। সাবা উত্তবভাবত পবিক্রমা কবি। হাঁ, ইতিমধ্যে জেলেও যেতে হয়। সেটা আমাব অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। শুধু গঠনেব কাজ তো লক্ষ্য নয। লক্ষ্য স্বাধীনতা। তাব জন্যে সত্যাগ্রহ। আমিও একজন সৈনিক।' বদনদা বোমন্থন কবেন।

গুজবাটে গান্ধীজীব সঙ্গে সাববমতী আশ্রমে মাস কযেক কাটিয়ে সেই যে প্রব্রজ্যা নেন তাব সমাপ্তি ঘটে আসামে। তাবপব গান্ধীজীবই আদেশে তিনি আশ্রম স্থাপন করে সেইখানেই স্থিব হয়ে বসেন। উত্তববঙ্গেব দিনাজপুব জেলায। ওঁদেব বাড়িব খুব কাছে। সেখানে তিনি কেবল খাদি তৈবি কবেন তা নয, সঙ্গে সঙ্গে কবেন টিনেব কাজ। টিন কেটে লণ্ঠন, ল্যাম্প, কুপি। তাব সঙ্গে যোগ দেয লোহাব কাজ। লাঙলেব ফাল, দা কাটাবি ছুবি। কাস্তে কোদাল। কাঠেব কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলে।

'তৈবি কবা তত কঠিন নয, বিক্রি কবা যত কঠিন। হাটে হাটে পাঠাতুম, জলেব দবে ছাড়তুম। ঘব থেকেই লোকসানেব কড়ি জোগাতে হতো। বাবা ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। স্বদেশী যুগে উনিও বকমাবি পবীক্ষা নিবীক্ষা কবে বিস্তব টাকা জলে দিয়েছিলেন।' দাদা বলেন।

'আমাব মনে আছে তোমার আশ্রমেব লণ্ঠন আমি মোহনপুবেব হাটে কিনেছিলুম। তোমাব সঙ্গেও দেখা হয তাব কিছুদিন বাদে। তুমি তখন সত্যাগ্রহ কবে বেড়াচ্ছ। বেআইনী নুন তৈবি। তোমাকে গ্রেপ্তাব কবতে বলেছিল, কবিনি। তুমিও আমাকে বিব্রত কবলে না বলে অন্যত্র ধবা পড়েছিলে।' কবেকাব সব কথা মনে পড়ে আমাব।

'গ্রেপ্তাব হলে তোব হাতে না হওযাই ভালো। আমাব যখন অর্জুনবিষাদ। তোবও তাই। ইংবেজেব সঙ্গে ভাবতীযেব সংগ্রাম যেন তোব সঙ্গে আমাব সংগ্রাম না হয।' বদনদা আব একবাব হেসে ওঠেন। হা হা হা হা হা।

'হাঁ, তোমাব ট্রাযাল হতো আমাবও ট্রাযাল। তোমাব ভাগ্যে নুন অন্য জাযগায পাওয়া গেল। আমাবও ভাগ্যে বলতে পাবি।' আসলে নুন নয, নোনা মাটি।

আবো কতক্ষণ স্মৃতিচাবণেব পব বদনদা হঠাৎ চিন্তাব মোড় ঘুবিয়ে দিযে বলেন, 'কিন্তু এতকাণ্ড কবে কী শেষটা লাভ হলো বে। সেসব অঞ্চল তো এখন পাকিস্তানে।'

দু'জনেই চুপ কবে থাকি। মোটব ততক্ষণে চৌবঙ্গী দিয়ে ছুটেছে।

'হা হা হা হা হা। তুই না আমাকে বলেছিলি স্বাধীনতাব দিন যে, আমাদেব নতুন বাজত্ব দু'শো বছব টিকবে। বাইশ বছব যেতে না যেতে এ কী দেখছি। চতুর্দিকে ফাটল। চতুর্দিকে ভাঙন। যেন মোগল বাজত্বেব শেষ দশা। যে বেটে জল ঢুকছে জাহাজ ডুবতে কতক্ষণ। জোব দশ বছব।' বদনদাব গলা কাঁপে।

'ও কী বলছ, বদনদা।' আমি ওঁব নৈবাশ্য সহ্য কবতে পাবিনে।

'না, না, হাসির কথা নয়। আমি বড়ো দুঃখেই হাসছি রে। গান্ধীকে খুন করে তাঁর গুণ গাওয়া হচ্ছে ইনিয়ে বিনিয়ে। একজনও মানুষ বিশ্বাস করে না যে এ স্বাধীনতা মিলিটারি ভিন্ন আর কেউ রক্ষা করতে পারে। অথচ বাপু বেঁচে থাকলে সবাই বিশ্বাস করত যে মিলিটারি নয়, তিনিই পারতেন রক্ষা করতে।' বদনদা আর্দ্রকণ্ঠে বলেন।

আমরা ফিরছিলুম গান্ধী শতবার্ষিকী সভায় যোগ দিয়ে। বদনদার কলকাতা আসার উদ্দেশ্যও তাই। প্রবীণ গান্ধীবাদীরা দেশের নানা স্থান থেকে এসে জড়ো হন। দেখেন দেশের লোক চলে যাচ্ছে তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। তাঁরা মুষলপর্বের অর্জুনের মতো অসহায় দর্শক। দস্যুদের বিরুদ্ধে গাণ্ডীব তুলবেন যে, গাণ্ডীবই তাঁদের চেয়ে ভারী।

'মস্ত ভুল করেছি বিয়ে করে।' বদনদা হারানো খেই হাতে নিয়ে বলেন। 'বাপুর বারণ ছিল, স্বরাজ না হওয়া তক বিয়ে কোরো না। তার মানে কি এই যে, স্বরাজ হতে না হতেই বিয়ে করতে পারো? তোর সঙ্গে শেষ দেখার পর চটপট বিয়ে করে ফেলি। মেয়েটি আমার জন্যে পার্বতীর মতো তপস্যা করছিল। আমারও দরকার ছিল আশ্রমের জন্যে একজন সেবী ডাক্তার। বিয়ের পরেও অসিধার করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু বিনতাকে তার মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হতো না। অধর্ম হতো। তেমনি সুনুকেও জন্মলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায় হতো। সুনু, সুবিনয়, আমাদের একমাত্র সন্তান। কলকাতায় ওর এম. এ. পড়ার একটা কিনারা করে দিতে পারিস?'

ভাগ্যিস গাড়ীর ড্রাইভার ছিল হিন্দুস্থানী। নইলে শুনে কী মনে করত।

'বিয়ে করে তুমি ভুল করেছ, কেন ভাবছ? ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য, এইরকমই তো শাস্ত্রে লেখা। বয়সটা অবশ্য বানপ্রস্থের। 'ভুল' বলছ সেইজন্যেই কি?' আমি সুধাই।

'সেটাও একটা কথা বইকি। কিন্তু সেইজন্যে নয়। বিয়ে যতদিন করিনি ততদিন দেশের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কারো ভবিষ্যৎ ভাবিনি। বিয়ের পরে বাপ হয়ে অবধি ছেলের ভবিষ্যৎই ভেবেছি। দেশের ভবিষ্যৎ নয়। তোর কাছে গোপন করে কী হবে, ছেলেকেই আমি আশ্রমের ট্রাস্টি করে যেতে চেয়েছিলুম। আশ্রমটা যে আমারি ব্যক্তিগত অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তা বোধ হয় জানিস্।' বদনদা খুলে বলেন।

'ভালোই তো। সুনুরও একটা জীবিকা জোটে।' আমি মন্তব্য করি।

'সুনু কী বলে শুনবি? বলে আমার ওতে বিশ্বাস নেই। অহিংসাতেও না। ওর মতে মহাত্মা তাঁর কাজ যা তা চুকিয়ে দিয়ে গেছেন, আর কারো জন্যে বাকী রেখে যাননি।' বদনদা কাঁদো কাঁদো ভাবে বলেন।

'তাই নাকি। তা হলে সুনুর ভবিষ্যৎ কোন্ পথে?' আমি জিজ্ঞাসু হই।

'পাশ। চাকরি। বিয়ে। গতানুগতিক পথে। নয়তো ছাত্র রাজনীতি, তার থেকে কমিউনিজম, তার থেকে নকশালপন্থা। তোরা পাঁচজনে ওকে সৎপরামর্শ না দিলে ও যে একদিন বোমা ছুঁড়বে না তাই বা কী করে জানব? হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। সুনু কি দুনিয়ার বার।' বদনদা আমার হাতে হাত রেখে থর থর করে কাঁপেন।

॥ দুই ॥

আমার কুকুর বিন্দি আমাকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে আসে। বদনদাকে দেখে তাঁকেও চার পা তুলে সম্বর্ধনা জানায়। তিনি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, 'আমারও এ রকম একটি পাহাড়ী কুকুর আছে। একটুও হিংস্র নয়।'

'কই, আমার বোনটিকে দেখছিনে কেন।' দাদা আসন নিয়ে বলেন।

'তিনি অনেকদিন বাদে বাপের বাড়ি গেছেন। থাকলে কত খুশি হতেন তোমাকে দেখে।' এরপর আমি তাঁকে চা অফার করি।

'দিলে 'না' বলব না। আশ্রম থেকে ও পাপ বিদায় করতে পারিনি। আমার বৌ তো দিনে সাত আট কাপ খায়। লেডী ডাক্তার কিনা। চাঙ্গা হওয়া চাই। তবে সুনুকেও সমান চাতাল করে তুলেছে। এখন ও কলকাতায় এসে চায়ের দোকানে বা কফি হাউসে আড্ডা দেবে তো। চা বাগানের কুলীর রক্ত চুষবে।' দাদা বিমর্ষ হন।

'চা থেকে কত বিদেশী মুদ্রা আসে খবর রাখো, বদনদা? অত বড়ো একটা ইণ্ডাস্ট্রি উঠে যায় এই কি তোমার মনের ইচ্ছা?' আমি তর্ক করি।

'ওই বিদেশী মুদ্রাই তোরা বুঝিস। শুনতে পাই বাঁদর চালান দিয়েও বিদেশী মুদ্রা লুটছিস। এর একটা নৈতিক দিক আছে সেটা কেউ দেখবে না। দেখবে শুধু ভৌতিক দিকটাই। অমনি করেই নাকি দেশ ধনবান হবে, বলবান হবে।' দাদা ফুৎকার করেন।

আমি চা ঢেলে দিই। বিস্কুট এগিয়ে দিই।

'আবার বিস্কুট। কেন, মুড়ি ঘরে নেই? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মুড়ি খেতেন ও খাওয়াতেন। খেয়েছিস ওঁর সঙ্গে আত্রাইতে। মনে নেই।' দাদা মনে করিয়ে দেন।

'কিন্তু বিস্কুট তো এখন আমরাই তৈরি করছি।' আমি আবার তর্ক করি।

'মদও তো আজকাল আমরাই চোলাই করছি। মৈশুরে আঙুর ফলছে। কিন্তু গরিব দেশবাসীকে বিস্কুট ধরিয়ে ওদের মাথা খাওয়া কি পাপ নয়? এর পরে মদও ধরাব তো। একবার যদি ও রসের স্বাদ পায় তবে বঙ্গোপসাগর হবে মদ্যোপসাগর। সাগর শুষে ফেলবে অগস্ত্য ঋষির বংশধর আমাদের তৃষ্ণার্ত দেশবাসী।' দাদা শিউরে ওঠেন।

মুড়িও ছিল বাড়িতে। দাদা বিস্কুট ঠেলে দিয়ে মুড়ি নিয়ে বসেন। বলেন, 'আমার সব চেয়ে ভালো লাগে মোটা চালের ভাত, তার পরেই মুড়ি। পেটও ভরে। মনও ভরে।'

আমরা দু'জনে ছাদে যাই। আরাম কেদারা নিয়ে বসি। দিকে দিকে তেতলা চারতলা বাড়ি। সাততলা আটতলাও দেখা যায়। দাদা চোখ বুজে বলেন, 'এ তোরা করছিস কী। এ যে সোনার ঠাকুর মাটির পা।'

কথাটা এককালে আইরিশ কবি জর্জ রাসেলের বইয়ে পড়েছিলুম। যাঁর ছদ্মনাম এ. ই.। দাদা মনে পড়িয়ে দিলেন।

'তোদের সভ্যতা, তোদের সংস্কৃতি, তোদের রাষ্ট্র, তোদের সমাজ এই বাইশ বছরে সোনার ঠাকুরের আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু পা দুটি তো মাটির। সেই শ্রমিক আর সেই কৃষক। তাদের না আছে পুঁজি, না আছে জমি। গ্রামে গেলে দেখবি চড়া সুদে কর্জ করছে, যেটুকু আছে সেটুকুও বিকিয়ে যাচ্ছে। ধনী আরো ধনী হচ্ছে, গরিব আরো গরিব হচ্ছে। সোনার ঠাকুর একদিন দেখবেন যে তাঁর

মাটির পা আর বইতে পারছে না। এমন মাথাভারী ব্যবস্থা কেউ কি পারে বইতে? তখন কী হবে, জানিস? না আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে?' দাদা আমাকেই হাতের কাছে পেয়ে ভয় দেখান।

'সেইজন্যেই তো সোশিয়ালিজমের কথা উঠেছে।' আমি কাটান দিই।

'ওর মানে কী, রজত? আমার অল্পবিদ্যায় এই বুঝি যে রাষ্ট্রই হবে সমস্ত অর্থের মালিক, যেমন সমস্ত অস্ত্রের মালিক। এক হাতে অস্ত্রের মনোপলি আর অন্য হাতে অর্থের মনোপলি নিয়ে রাষ্ট্রই হবে হীরের ঠাকুর। কিন্তু মাটির পা তো যেমনকে তেমন রয়ে যাবে। না পাথরের পা হয়ে যাবে?' বদনদা সংশয়ের স্বরে বলেন।

'কে জানে। আমরা তো হাতে কলমে পরখ করে দেখিনি।' আমি পাশ কাটাই।

'আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বলে যে অস্ত্র ও অর্থ কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তার চেয়ে সর্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণ শ্রেয়। কিন্তু সে যে কতদিনে হবে, তা আমার জ্ঞানগম্য নয়। মহাত্মা বেঁচে থাকলে তিনিই আলো দিতেন। তাঁর অভাব প্রত্যেকদিনই অনুভব করছি। বরং আরো বেশি করে।' দাদা বিলাপ করেন।

'কেন, তিনিই কি বলে যাননি আত্মদীপো ভব?' আমি সান্ত্বনা দিতে যাই।

'আত্মদীপ হতে চাইলেও পারছি কোথায়?' দাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'এই দ্যাখ না কালের হাওয়া আমার আশ্রমেও বইছে। কর্মীরা ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে। ভাগচাষীরাও রায়তী স্বত্ব দাবী করছে, না দিলে জমি জবরদখল করবে। আমার কি সহানুভূতি নেই? কিন্তু আমি হলুম প্র্যাকটিকাল মানুষ। মজুরি বা মাইনে বাড়ালে বাড়তি দাম খদ্দের দেবে না, অগত্যা সরকারের কাছেই হাত পাততে হবে। তা কি পারি কখনো? আর জমিতে ভাগচাষীর রায়তী স্বত্ব স্বীকার করার পর ও জমি আর আশ্রমের থাকে না। তা হলে আশ্রমের চলে কী করে?'

'তা হলে তুমি এক কাজ কর, বদনদা। ওদের সবাইকে পার্টনার করে নাও। ওরা জানুক যে আশ্রমটা ওদেরি।' আমি পরামর্শ দিই।

'ওকথা যে কখনো মাথায় আসেনি তা নয়, রজত। কিন্তু দক্ষ কর্মীরা যে যেখানে দু'পয়সা বেশি পাবে সেখানেই চলে যাবে। এই ওদের রীতি। অদক্ষ কর্মীদের স্থিতিও কি সুনিশ্চিত? স্বাধীনতার পূর্বে যাদের পেয়েছি তারা আমাকে ছাড়েনি। সুখে দুঃখে আমার সঙ্গেই থেকেছে। তাদের অনেকেই মৃত। অনেকে আবার পাকিস্তানে চলে গেছে। নতুন লোক নিয়ে ভাঙা হাট চালিয়ে যাচ্ছি রে। এরা কি অংশীদার হতে চায়, না অংশীদারি পেলে টিকবে?' বদনদা দাড়ি ছেড়ে মাথায় হাত দেন।

ভাবনার কথা বইকি। আমি চুপ করে থাকি। কিছুদিন আগে আরেক বন্ধুর আশ্রম দেখতে গিয়ে দুঃখিত হয়েছিলুম। হাতীশালে হাতী আছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া। লোক আছে, লস্কর আছে। তবু রাজপুরী খাঁ খাঁ করছে। ঘুমন্ত পুরী। কারণ বন্ধুটি নেই।

এ কাহিনী শুনে বদনদা বলেন, 'একে একে নিবিছে দেউটি। আমিই বা আর কদ্দিন। আমার পরে আমারটিও ঘুমন্ত পুরী হবে। তাতে প্রাণসঞ্চার করবে কে। বিনতা আমার সহধর্মিণী। তারই তো এ ভার বহন করার কথা। কিন্তু ও কী বলে শুনবি?'

আমি কান পেতে রই। বিন্দি আমার পায়ের কাছে শুয়ে।

'বিনতা বলে, তোমরা এটার নাম রেখেছ সত্যাগ্রহাশ্রম। এটা তো সেবাশ্রম নয় যে আমিও চালাতে পারব। সত্যাগ্রহাশ্রম করেছ সাবরমতীর অনুসরণে। সেখানকার নিয়ম ছিল শান্তির সময় সংগঠন, সংগ্রামের সময় সত্যাগ্রহ। এখানকার নিয়মও যদি তাই হয় তবে একদিন সত্যাগ্রহের ডাক আসতে পারে। তুমি থাকলে সত্যাগ্রহে নামবে, দ্বিধা করবে না। কিন্তু আমি কি তা পারি? আমার

হাতে সব সময়ই একরাশ প্রসূতি ও শিশু। শুনছিস তো? আমার নামকরণেই আমি জব্দ। তখন কি ছাই জানতুম যে সত্যাগ্রহের পাট উঠে যাবে?' বদনদা আক্ষেপ করেন।

'সত্যি উঠে গেছে নাকি?' আমি প্রশ্ন করি।

'মেকী সত্যাগ্রহ এখানে ওখানে হচ্ছে। যারা করছে তারা কেউ গান্ধীবাদী নয়। খাঁটি সত্যাগ্রহ এখন খাঁটি গব্য ঘৃতের চেয়েও দুর্লভ।' বদনদা হাসেন। কিন্তু হা হা হা করেন না। করলে হয়তো হাহাকারের মতো শোনাত।

আরো কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে আমরা দু'জনে ছাদ থেকে নেমে আসি। নৈশভোজনের সময় হয়েছিল। আমি বদনদার জন্যেও রাঁধতে বলে দিয়েছিলুম। কিন্তু তার অনুমতি নিইনি। এবার অনুমতি চাই।

'সে কী! আমি যে আমার শালীপতির অতিথি। ওঁরা যে আমার জন্যে অভুক্ত বসে থাকবেন। অ্যাঁ, করেছ কী, রজত!' তিনি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করেন।

'সেই যে মহাপ্রসাদ সেবা এটা তারই একটা অক্ষম অনুকরণ, বদনদা। তোমার যেটুকু ইচ্ছা খেয়ো। ওঁদের ওখানকার জন্যে পেটে জায়গা রেখে দিয়ো।' আমি প্রস্তাব করি।

'না, না, তা কি হয়? তোর সঙ্গে বাইশ বছর বাদে খাচ্ছি। পেট ভরেই খাব। ওঁরা কিছু মনে করবেন না।' তিনি ঠাণ্ডা হন।

॥ তিন ॥

আহার করতে বসে বদনদা কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন। আশ্চর্য প্রার্থনা। কখনো কারো মুখে ও রকম প্রার্থনা শুনিনি। ঠিক যেন খ্রীস্টানদের গ্রেস বিফোর মীট। আমিও মনে মনে উচ্চারণ করি। মুখ ফুটে বলতে চক্ষুলজ্জা।

'এই যে দুটি খেতে পাচ্ছি এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই বা ক'জন পাচ্ছে? এই বা ক'দিন পাব? আমার অন্নদাতাদের যেন আমি না ভুলি। যেন ওদের শ্রমের মূল্য দিই ওদেরি মতো শ্রমে আর স্বেদে। আর ওদের যেন সেবা করি অহেতুক প্রেমে।'

বদনদার এই প্রার্থনা কার উদ্দেশে নিবেদিত তা জানিনে। হয়তো ঈশ্বরের, হয়তো মানবের। হয়তো ওটা প্রার্থনাই নয়, একটা সংকল্পবাক্য। অভিভূত হয়ে শুনি। তারপর আহার শুরু হলে জিজ্ঞাসা করি, 'এটা কি খ্রীস্টানদের মতো গ্রেস বিফোর মীট?'

'যা বলেছিস। আমাদের হিন্দুদের প্রথা হচ্ছে ভগবানকে অর্পণ করে প্রসাদ সেবা করা। ওদের প্রথা হচ্ছে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাওয়া। আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে খাই। কিন্তু কাকে? ঈশ্বরকে? না, ভাই, তাঁকে নয়। তিনি তো ঐশ্বর্যময়। আমার ঐশ্বর্যে কাজ কী। আমি চিনি দরিদ্রনারায়ণকে। ভুখা নারায়ণকে। নাঙ্গা নারায়ণকে। যিনি লাঙল ধরে মাঠে মাঠে ফসল ফলান। যিনি তাঁত ধরে ঘরে ঘরে লজ্জা নিবারণ করেন।' বদনদা যেন তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন।

আমি এটা প্রত্যাশা করিনি। বলি, 'বেশ তো, কিন্তু এর মানে কী? 'এই বা ক'দিন পাব'।'

'দ্যাখ, রজত, আমার এ প্রার্থনা আজকের নয়। এটা আমি অন্তর থেকে পাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়। তখন আমি জেলে নয়, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। চোখের সামনে দেখি হাজার হাজার

মহাপ্রাণী না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। আমিই বা কে যে দু'বেলা দু'মুঠো অবধারিতরূপে দিনের পর দিন পাব। মন্বন্তরটা কীভাবে হলো তোর মনে আছে নিশ্চয়। কলকাতার ব্যবসায়ী আর সরকারের ঠিকাদার গাঁয়ে গাঁয়ে লোক পাঠিয়ে যে কোনো দামে চাল কিনে আনে। চাল তো নয়, মুখের গ্রাস। কেনা তো নয়, কাগজের নোট ধরিয়ে দিয়ে লুট। দেখে আমার গা জ্বলে যায়। জীবনে অমন কন্‌ফিডেন্স ট্রিক দেখিনি। সেদিন থেকেই আমার মন উঠে গেছে তোদের এই সভ্যতার উপর থেকে। শুধু ইংরেজ রাজত্বের উপর থেকেই নয়। এটা একটা কনফিডেন্স ট্রিক। এই যে টাকা দিয়ে চাল কেনা। যা তোরা প্রতিদিন করছিস। কেন, শ্রম দিয়ে কিনিসনে কেন? স্বেদ দিয়ে কিনিসনে কেন? প্রেম দিয়ে প্রতিদান হিশাবে নিসনে কেন?' বলতে বলতে দাদা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

আমি কেমন করে তাঁকে বোঝাব যে টাকা পয়সার উদ্‌ভব হয়েছে বিনিময়ের সুবিধার জন্যে। তাতে সকলেরই সুবিধা। চাষীদের কি কিছু কম! ওই একটি বার ওরা ঠকেছিল। পরে ওরাও চালাক হয়ে গেছে।

বদনদা খেতে খেতে বলেন, 'দুনিয়া জুড়ে যে ইনফ্রেশন চলেছে তার থেকে চাষীরও কিছু ফায়দা হচ্ছে, তা ঠিক। কিন্তু ওই কনফিডেন্স ট্রিক আবার মন্বন্তর ডেকে আনবে। আর সেবারকার মতো গ্রামের লোকরাই লাখে লাখে মরবে, এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, রজত। আমি কেন পাপের ভাগী হতে যাই। আমি চাই সময় থাকতে এর প্রতিবিধান। কিন্তু কার কাছে গেলে প্রতিবিধান হবে? সকলেই তো পাপের ভাগী। এই কনফিডেন্স ট্রিক থেকে সকলেই তো লাভবান হচ্ছে। কেউ কম, কেউ বেশি। তা সত্ত্বেও আমি জানি এ খেলা চিরকাল চলতে পারে না। এর কুফল ফলবেই।' দাদা ওয়ার্নিং দেন।

আদি খ্রীস্টানদের মতো তিনি ব্যাকুলভাবে বলেন, 'যাও, খেটে খাও। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাও। মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা ফিরে পাও।'

এরপরে দাদা আবার হা হা হা হা হা করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'নিজের ছেলেকেই বোঝাতে পারলুম না। যে আমার নিজের হাতে গড়া। আমার সহকর্মীদের একজনও যদি শুনত আমার কথা। সকলেই বোঝে টাকা, আরো টাকা। মজুরি আরো বাড়াও। মাইনে আরো বাড়াও। আমার কি ছাই নাসিকের মতো একটা ছাপাখানা আছে যে যত খুশি ছেপে বিলিয়ে দেব? আর মেকী দৌলতের নহর বয়ে যাবে। অসত্যমেব জয়তে হা হা হা হা হা!'

'তবে এবার তোদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি, রজত। লোকে এবার পড়ে পড়ে মরবে না। মারবে ও মরবে। বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ যা হবার তা হবে।' দাদার দু'চোখ জ্বলতে থাকে। তারপর আবার স্নিগ্ধ হয়।

'দেশকে তুমি অহিংস রাখতে পারবে না?' আমি অশান্ত বোধ করি।

'আমি কেন, স্বয়ং মহাদেবও পারবেন না।' তারপর কী ভেবে বলেন, 'কে জানে পারতুম হয়তো। যদি ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ না করতুম। বেশিদিনের জন্যে নয় যদিও।'

'ব্রহ্মচর্য! ব্রহ্মচর্য দিয়ে কখনো বিপ্লব রুখতে পারা যায়।' আমি তো অবাক। বদনদার কি ভীমরতি হয়েছে। বাহাত্তরের আর কত দেরি।

'অহিংসা দিয়ে পারা যায়, যদি অহিংসার সঙ্গে থাকে ব্রহ্মচর্য। তেমন দু' চারজন সাধক এখনো রয়েছেন। সেইজন্যেই তো আশা হয় যে আমরা সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারব। কিন্তু তাঁরাই বা আর কদ্দিন? আমাদের জেনারেশনটাই ঝরে ঝরে যাচ্ছে। একে একে নিবিছে দেউটি।' বদনদা করুণ স্বরে বলেন। বিলাপের মতো শোনায়।

নীরবে আহারপর্ব সারা হয়। একজনের বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক করে কী হবে?

আমি অন্য প্রসঙ্গ পাড়তে গেলে বদনদা আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, 'রুশ বিপ্লবের সময় অভিজাত ঘরের অঙ্গনাদের দেখা গেল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে। একটুকরো হীরের বিনিময়ে একটুকরো রুটির সন্ধানে। তা হলেই বুঝতে পারছিস কোন্‌টার চেয়ে কোন্‌টার মূল্য বেশি। তোদের মূল্যবোধ যদি এখন থেকেই শোধরাত তা হলে বিপ্লব কোনোদিন ঘটতই না। বিপ্লবকে অহিংসা দিয়ে রোধ করার প্রশ্নও উঠত না।'

তর্ক করব না বলে মুখ বুজে থাকি। দাদা বলে যান, 'তাছাড়া সবাই তো একরকম সুনিশ্চিত যে অহিংসার যুগ ফুরিয়েছে। তার আর কোনো ভূমিকা নেই ইতিহাসে। তাই যদি হয় তবে বিপ্লবের দিন অহিংসার কাছে অত বড়ো একটা দাবী পূরণ করবেই বা কে, যদি বহুকালের ও বহুজনের প্রস্তুতি না থাকে।'

দাদা একটা লবঙ্গ মুখে দিয়ে বলেন, 'মাটির পা দুটি গলে গেলে সোনার ঠাকুরটি টলে পড়বেন, এর মধ্যে এমন এক ভবিতব্যতা আছে যে আমরা ক'জন অহিংসক এর খণ্ডন করতে পারিনে। তা বলে কি আমাদের কর্তব্য নেই? আমরা সাক্ষীগোপাল?'

আমারও তো সেই একই জিজ্ঞাসা। 'আমরাও কি সাক্ষীগোপাল?'

দাদা বাল্যকালে ফিরে যান। বলেন, 'কাসাবিয়াঙ্কার কাহিনী মনে পড়ে?' 'The boy stood on the burning deck.' আমি আবৃত্তি করতে শুরু করি।

'আমিও সেইরকম একটা জ্বলন্ত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। জাহাজের গায়ে গোলা পড়ছে। জাহাজের প্রতি অঙ্গে আগুন। অবধারিত মরণ। সকলেই পালাচ্ছে। আমাকেও বলছে পালাতে। আমি কিন্তু আমার পদতলভূমি থেকে ভ্রষ্ট হব না। একচুলও নড়ব না। বাপুজীর আদেশ, আমাকে স্বস্থানে স্থির থাকতে হবে। কাসাবিয়াঙ্কাকে যখন বলা হয় তোমার পিতা নিহত, বেঁচে থাকলে আদেশ ফিরিয়ে নিতেন, সে তা বিশ্বাস করে না। বলে, পিতার আদেশ আমাকে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। হাঁ, আমাকেও এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বাপুজীর আজ্ঞা।' দাদা দুই চোখ মোছেন।

'তার মানে কি ভূগোলের বিশেষ একটি স্থানে?' আমি প্রশ্ন করি।

'তার মানে, জীবনের বিশেষ একটি পোজিশনে। আমরা বরাবরই গঠনের ও সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। শান্তির সময় পাটাতন পরিষ্কার করি, সংগ্রামের সময় আগুনের সঙ্গে মোকাবিলা করি। দগ্ধ হবার ভাগ্য থেকে তো কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে না। ওই দগ্ধ হওয়াটাই আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা।'

বদনদার বদনে অপূর্ব আভা।

বারুণী

বারুণী তিথিতে আমার জন্ম একথা আমার পারিবারিক মহলের বাইরে জানতেন শুধু একজন। তিনি আর আমি একদা এক স্টেশনে পোস্টেড ছিলুম। তাও অল্প কিছুকাল। বোধহয় একটা বছরও নয়। তবু সেই সুবাদে বারুণীর সময় ফী বছর তাঁর চিঠি পেতুম। তাতে থাকত এই ক'টি কথা।

'আজ শুভ বারুণী তিথি। এই তিথিতে আপনার জন্ম। আপনার সুদীর্ঘ পরমায়ু প্রার্থনা করি।'

বিশ বছর ধরে বারুণীতে স্মরণ করা আর কারো বেলা দেখিনি। আমার নিজেরি মনে থাকে না করে বারুণী এল আর গেল। আমরা আজকাল ইংরেজী কেতায় জন্মদিন পালন করি। ওসব তিথি টিথি বড্ড সেকেলে। কিন্তু ভালো লাগত কোনো একজনের মনে আছে দেখে। চিঠি লিখে আমিও ওঁকে ধন্যবাদ জানাতুম, সেই সঙ্গে শুভকামনা।

এর পর একদিন রহস্যভেদ হলো। এবার যে চিঠিখানি এল তাতে ছিল, 'আজ শুভ বারুণী তিথি। আজ আমার অকিঞ্চিতকর জীবনের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হলো। এই যথেষ্ট নয় কি? দেশের বর্তমান দুর্দশা দেখে আমি মর্মে মর্মে পীড়িত।' এর পর আমার সুদীর্ঘ পরমায়ু কামনা।

বোঝা গেল একই তিথিতে জন্ম বলে আপনার জন্মতিথিতে তিনি আমাকেও স্মরণ করতেন। এর পর থেকে আমিও তাঁর সুদীর্ঘ পরমায়ু প্রার্থনা করে ফী বছর চিঠি লিখি। বছর কয়েক বাদে তাঁর চিঠি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। অগত্যা আমার চিঠিও।

একই তিথিতে জন্ম যদিও, বয়সের ব্যবধান বিশ একুশ বছর। প্রথম যখন তাকে দেখি তখনি তাঁর মথার চুল শাদা। তা বলে কর্মশক্তি কম নয়। কিছুকাল একসঙ্গে কাজ করার পর আমি বদলী হয়ে যাই, তিনি যথাকালে অবসর নিলেও প্র্যাকটিস থেকে অবসর পান না। সেই স্টেশনেই ডাক্তারি করেন। বছর দশেক যেতে না যেতে জায়গাটা পড়ে যায় পাকিস্তানে। তিনি কিন্তু পালিয়ে আসেন না। মুসলমানরা তাঁকে ছাড়বেও না। হিন্দুদেরও মুরুব্বি বলতে তিনিই। তিনি চলে এলে ওদের কে আর রইল।

॥ দুই ॥

টুর করে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ স্ত্রীর চিঠি। বয়ে নিয়ে এসেছে স্পেশাল মেসেঞ্জার। 'ছোট খোকার জ্বর। নতুন ডাক্তার দেখছেন। ভয়ের কারণ নেই।'

তার মানে ভয়ের কারণ আছে। তা নইলে পিয়ন পাঠানো কেন? তখনকার দিনে টেলিফোন ছিল না। টেলিগ্রাফ অফিসও গোটা মহকুমায় একটা কি দুটো। মোটরযোগ্য রাস্তাই বা ক'মাইল। ট্রেনের আশায় বসে না থেকে সাইকেলে করে স্টেশনে ফিরি। অর্থাৎ মহকুমা শহরে। সেখানে আমি তখন সাবডিভিজনাল অফিসার।

'কী হয়েছে? ম্যালেরিয়া?' ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি প্রথম দর্শনে।

'না, সার। ম্যালেরিয়া নয়।' তিনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেন, 'আপনার স্ত্রীকে বলবেন শান্ত হতে। দিন কয়েক ভোগাবে। আমার সন্দেহ, প্যারাটাইফয়েড। এখানে তো টেস্ট করার ব্যবস্থা নেই। বলেন তো কলকাতায় টেস্ট করিয়ে আনতে পারি।'

আমরা তাঁর অভিজ্ঞতার উপরেই ছেড়ে দিই। সত্যি, তাঁর রোগনির্ণয় অভ্রান্ত। ঠিক সময় জ্বর ছেড়ে যায়। তার পরেও তিনি আসতে থাকেন। ছেলে কেমন আছে দেখতে। এমনি করে আলাপ জমে ওঠে।

ওদিকে একটা সরকারী সম্বন্ধও ছিল। তিনি সরকারী ডাক্তার। জেল কিংবা ডাক্তারখানা কোথাও কিছু ঘটলে সটান আমার কাছে এসে হাজির। 'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলুম,

সার। এক সেকেণ্ড সময় যদি দেন।'

একদিন দেখি ডাক্তার ধুতি পাঞ্জাবী পরে বাবুবেশে এসেছেন সন্ধ্যাবেলা, যখন আমি আমার বাংলোর আপিস ঘরে নিরিবিলিতে বসে মাসিকপত্রের পাতা ওলটাচ্ছি আর সাহিত্য জগতের খোঁজ খবর রাখতে চেষ্টা করছি। বহুদিন সেখান থেকে নির্বাসিত আমি এক যক্ষ।

'কী ব্যাপার, ডাক্তার? এ বেশে তো আপনাকে দেখা যায় না। কোথাও নেমন্তন্ন আছে নাকি?' আমি রঙ্গ করি।

'না, সার। সব সময় কি সাহেব সেজে থাকতে ভালো লাগে? সন্ধ্যাবেলা আমি একটু পায়ে হেঁটে বেড়াই। আজ মনে হলো আপনার এখানে প্রোফেসনাল কল হয়েছে, অফিসিয়াল কলও হয়েছে, হয়নি কেবল সোশিয়াল কল। অবশ্য আমাকে যদি আপনার সমাজের একজন বলে গণ্য করেন।' তিনি স্মিতহাস্যে বলেন।

মানুষটির স্বভাবে স্নিগ্ধতা ছিল। ভদ্রতাও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। ইতিমধ্যে জনপ্রিয়ও হয়েছেন খুব। তবে প্র্যাকটিস তখনো জমেনি সরকারী মহলের বাইরে।

'আপনার আর আমার সমাজ পৃথক নাকি? বসুন, এক পেয়ালা চা দিতে বলি। না, কফিই আপনার পছন্দ?' আমি সামাজিকতার উদ্‌যোগ করি।

সেদিন তিনি তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে অনেক কথা শোনালেন। কোথায় কোথায় কাজ করেছেন। প্রথম চাকরি তো যুদ্ধের সময় মেসোপোটেমিয়ায়। চাকরি করবেন না বলে স্থির করেছিলেন, তাই প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নেমেছিলেন স্বগ্রামে। কেউ পয়সা দেয় না। পণ্ড শ্রম। স্বদেশীযুগের ছাত্র তিনি, স্বদেশীব্রত ভঙ্গ করে বিদেশীর কাছেই আত্মসমর্পণ করেন। যুদ্ধের পরে নানা ঘাটে জল খেয়ে সম্প্রতি গোরাই নদীর ঘাটে ভিড়েছেন। এর পবে বোধ হয় গঙ্গার ঘাট। তাবপরে ঘাটের মড়া।

আমি শিউরে উঠি। 'ও কী বলছেন, ডাক্তার সেনশর্মা?'

'সার, আপনার অবসর নিতে এখনও আটাশ বছর দেবি। যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন। বঙ্কিমের ভাষায় বলি, তুমি কী বুঝিবে, সন্ন্যাসী! আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে যখন ভাবি যে আর আমি সরকারী চাকরিতে থাকব না, আর আমার বাড়িতে প্রতি রবিবার সকালে আড্ডা বসবে না, আড্ডা দিতে আর কোনো সরকারী কর্মচারী আসবেন না। আই শ্যাল বি এ ম্যান অফ নো ইম্পর্টান্স।' ভদ্রলোক অতি দুঃখে হাসেন।

'আপনার ওখানে খুব আড্ডা জমে নাকি? কে কে আসেন।' আমি কৌতূহলী হই।

'কে না আসেন? অবশ্য আপনি বাদে। আপনারা হলেন সাহেব সুবো, আপনাদের সামনে আমরা আড্ডা দেব, এত বড়ো বুকের পাটা কি আমাদের আছে? তবে লালবাগে যখন ছিলুম হকিন্স সাহেব মাঝে মাঝে উদয় হতেন। বলতেন, মে আই সী এ রিয়াল বেঙ্গলী আড্ডা? শুনুন কথা। সত্যিকার বাঙালী আড্ডা কি সাহেবদের দেখানো যায়? আমরা তখন যে যার কাছা কোঁচা সামলাতে ব্যস্ত। কারো কারো মুখভরা পান। কেউ নস্যি নাকে নিয়েছে। দৌড়, দৌড়। তখন সাহেব আর আমি দু'জনেই আড্ডা দিই। মেসোপোটেমিয়া, ইস্ট আফ্রিকা অনেক কিছু দেখেছি কিনা। একবার সাফারিতে যেতে হয়েছিল। সে গল্প আমি সবাইকে বলেছি। আপনাকে বাদ। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না, সার।' ডাক্তার বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করেন।

'আচ্ছা, আরেকদিন শুনব আপনার সাফারির গল্প। যদিও শিকারে আমার লেশমাত্র আগ্রহ নেই, ডাক্তার সাহেব।' ভদ্রতা করে সাহেব বলি তাঁকে।

'আহাহা! এ কী করলেন আপনি! সাহেব বলে আমার মাথা বিগড়ে দিলেন। এর পরে কি মাটিতে পা পড়বে আমার! তবে এই প্রথম নয়, সার। ল্যান্সলট মার্টিন সাহেবও আমাকে ডাক্তার

সাহেব বলে সম্বোধন করতেন। বলতেন, যুদ্ধে গিয়ে আপনি যে সার্ভিস দিয়েছেন তার জন্যে এম্পায়ার টিকে আছে। শুনুন কথা। এম্পায়ার টিকে আছে আমার জন্যে।' ডাক্তার বদ্ধকণ্ঠে হাসি চাপেন।

'কথাটা ভুল নয়। কেবলমাত্র ইংরেজরাই যদি লড়ত তা হলে এম্পায়ার রাখতে পারত না। লড়েছে ভারতীয়রাও। আপনার মতো আন্‌নোন ইণ্ডিয়ান।' আমি বলি।

ডাক্তারের একটা মস্ত গুণ তিনি জানতেন কোন্‌খানে থামতে হয়। আর কথা না বাড়িয়ে তিনি শুধু এইটুকুই নিবেদন করেন যে আমার হাতে যদি কোনোদিন সময় থাকে আমি যেন তাঁকে ডেকে পাঠাই, স্রেফ গল্প করার জন্যে।

তেমন সুযোগ ঘটত কোনো কোনো দিন। মহকুমা শহরে আর কেই বা আছেন যাঁর সঙ্গে একটু গল্প করা যায়। মুনসেফ বাদে। কিংবা দু' তিনজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার বাদে।

অবশেষে একদিন ডাক্তার তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করেন। বলেন, 'আমি নগণ্য একজন সাব-অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন, এইজন্যেই কি আপনি আমার সেবা নেন না? কই, হকিন্স, মার্টিন, জেকবসন এঁরা তো কেউ আমাকে উপেক্ষা করতেন না।'

আমি যেন আকাশ থেকে পড়ি। 'কেন, আমি তো আপনাকে দরকার হলেই কল দিই। ছোট খোকার প্যারাটাইফয়েডের সময় আপনার চিকিৎসায় আমরা মুগ্ধ। আচ্ছা, আপনাকে উপেক্ষা করে আর কোনো ডাক্তারকে কি আমি কখনো ডেকেছি?' আমি প্রশ্ন করি।

'না, না, তা করেননি। সেটা ঠিক। কিন্তু কেউ কেউ মনে করতে পারে আমি হয়তো আপনার মতো লোকের অসুখ সারাবার যোগ্য নই। আমাকে একটা চান্স দিন, সার।' ডাক্তার আর্জি পেশ করেন।

'অসুখ করলে তো চান্স দেব।' আমি বিব্রত হয়ে বলি। 'তা ছাড়া অসুখ করলে আমি প্রকৃতির উপর ছেড়ে দিয়ে দেখি আপনা হতে সেরে যায় কি না। প্রকৃতির নিয়মগুলোও আমি যথাসাধ্য মানি। শরীরকে আমি শীত বর্ষা গ্রীষ্ম সব কিছু সহ্য করতে শিখিয়ে সীজন করেছি। তবে সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে গিয়ে একটা অসুখ বাধিয়েছি। সে আর সারতে চায় না। প্রকৃতিও হার মেনে যায়।'

'অসুখটা কী, জানতে পারি কি?' ডাক্তার গোপনীয় ভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

'ক্যাটার। দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার গলা খ্যাঁকরাতে হয়।' আমি উত্তর দিই।

'হাঁ, আমিও লক্ষ করেছি। তা ক্যাটারও তো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবার মতো নয়। এখন থেকে না সারালে পরে গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। আমি আজ এক্ষুনি আপনার গলা দেখতে চাই। ইউ আর মাই পেশেণ্ট।' ডাক্তার টর্চ আর চামচ চাইলেন।

আমার চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়ে তাঁর উৎসাহ দেখে কে? বলতে পারবেন হকিন্স, মার্টিন, জেকবসন, সিন্‌হা এঁরা সবাই তাঁর ট্রিটমেণ্টে ছিলেন।

তা মন্দ ফল হলো না। আমি আগের চেয়ে ভালো বোধ করলুম। একখানা চিঠি লিখে তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম। তিনি সে চিঠি বাঁধিয়ে রাখলেন।

একদিন সত্যি আমার অসুখ করে। আমি তো ভেবেছিলুম প্রকৃতির উপর ছেড়ে দেব। কিন্তু আমার প্রকৃতি তা হতে দেন না। বলেন, 'কী জ্বর কে জানে। রোগনির্ণয়ে তো দোষ নেই। ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।'

সেনশর্মা একগাল হেসে বলেন, 'প্রকৃতি? প্রকৃতিই যদি রোগ সারাবে তো মেডিকাল সায়েন্স রয়েছে কী করতে? মিস্টার সিন্‌হা, লেখক হিসাবে আপনি অত্যাধুনিক, কিন্তু অসুখবিসুখের বেলা প্রিমিটিভ কেন?' এই বলে আমার সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করেন।

'কতকটা রুশোর পাল্লায় পড়ে। কতকটা গান্ধীর। ষোল সতেরো বছর বয়স থেকেই আমি প্রকৃতিপাগল। সভ্যতাকে আমি দু' চক্ষে দেখতে পারিনে। কিন্তু কেউ কেউ তো দুই নারী নিয়ে ঘর করে। আমারও তেমনি প্রকৃতি ও সভ্যতা।' আমি রসিকতা করি।

চুপ করো। 'তোমার না অসুখ।' বলে আমার এক নারী ধমকে ওঠেন।

ডাক্তার আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে বলেন, 'এবার আপনি ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জার পাল্লায় পড়েছেন। যুদ্ধের শেষে সেবার যে ইনফ্লুয়েন্‌জা হয়েছিল এটা সে ইনফ্লুয়েন্‌জা নয়। ভয়ের কারণ নেই। তবে আপনাকে দিন সাতেক ছুটি নিতে হবে।'

ছুটি নেওয়া আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। ছুটির দিনেও আমি খাটি। বিছানায় শুয়েই সরকারী কাজ করি, মহকুমা চালাই। আর যতখুশি নভেল নাটক পড়ি।

দু' বেলা আসাযাওয়া করতে করতে কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন প্রিয়ব্রত সেনশর্মা।

স্বদেশীযুগের গল্প শোনান, যখন তিনি কলেজ ছেড়ে কিছুদিন আন্দোলন করে শেষটা গুরুজনের নির্বন্ধে ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে ভর্তি হন। নইলে ডাক্তারি শিখতে তাঁর রুচি ছিল না।

সুযোগ পেলে তিনি বিজ্ঞান পড়তেন, বিলাত যেতেন, আচার্য জগদীশচন্দ্রের মতো কিছু একটা আবিষ্কার করতেন। পেতেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। কত বড়ো বড়ো সাহেবের সঙ্গে সমানে মিশতেন। কোথায় লাগে হকিন্স, জেকবসন্, মার্টিন!

অসুখটা যখন প্রায় সেরে এসেছে তখন আমি একদিন তাঁকে বলি, 'আমার সত্যিকার যা অসুখ তা স্বয়ং ধন্বন্তরীরও অসাধ্য। আপনাকে সেইজন্যে বলিনে।'

তিনি আমার দিকে গম্ভীরভাবে একদৃষ্টে তাকান। বলেন, 'স্বয়ং ধন্বন্তরীর অসাধ্য এমন কোনো অসুখের নাম তো হয় ক্যান্সার, নয় ব্রেন টিউমার। আপনি ছুটি নিয়ে বিলেতে ছুটে যান না কেন?'

'সেখানে গিয়েও কোনো ফল হবে না, ডাক্তার।' আমি মাথা নাড়ি।

'তা বলে আপনি শুধু প্রকৃতির উপরে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকবেন।' তিনি বিরক্ত হন।

'কেসটা যে ফিজিকাল নয়, প্রকৃতি কী করতে পারে?' আমি বিষণ্ণ স্বরে বলি।

'বলছেন অসুখ, অথচ ফিজিকাল নয়। তা হলে কি মেণ্টাল? কই, আপনাকে তো কখনো অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়নি।' তিনি ধাঁধায় পড়েন।

'সিকনেস কতরকমের আছে, ডাক্তার। সব কিছু কি আপনাদের এলাকায় আসে? শুনতে চান তো বলতে পারি। ডাক্তারকে পেশেণ্ট হিশাবে নয়, মানুষকে মানুষ হিশাবে। জীবনে আপনি কত দেখেছেন, আপনি মানুষ হিশাবে বহুদর্শী। তা ছাড়া কত স্নিগ্ধ আপনার স্বভাব! আর কত কোমল আপনার হাত! আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ডাক্তার সেনশর্মা। সেইজন্যে আপনার সঙ্গে সমানের মতো ব্যবহার করি।' তাঁকে আশ্বাস দিই।

তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'কিন্তু সিকনেস শুনে আমি অস্বস্তি বোধ করছি, সার।'

'শুয়ে শুয়ে ভাবছি আমার জীবনের কথা। শুধু আমার জীবনের কথা নয়, দেশের জীবনের মানবজীবনের কথা। সুখ আর কতটুকু দেখতে পাচ্ছি! অ-সুখই তো বেশির ভাগ। অ-সুখ থেকে অসুখ। এই সর্বব্যাপী অসুখের মধ্যে আমি একা সুস্থ থাকব কী করে? যখন নিত্য ছোঁয়াচ লাগছে আমার মনে।' আমি ভেঙে বলি।

তিনি শান্ত হয়ে শোনেন। বলেন, 'আমার তাড়া নেই। আপনি বলে যান।'

'ভালো কথা, ডাক্তার,' আমার মনে পড়ে যায়, 'আজ বারুণী। আমার জন্মতিথি। বাইরের কাউকে বলিনে, কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনি এখন ঘরের লোকের সামিল হয়ে গেছেন।

আজ ওঁর হাতের তৈরি কেক খেয়ে যাবেন।'

'ওঃ আজ আপনার জন্মতিথি? কী চমৎকার! আমার চেনাজানা আরো একজনেরও জন্মতিথি আজ। আচ্ছা, সার, মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। আপনার সুদীর্ঘ পরমায়ু কামনা করি।' ডাক্তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নাড়া দেন।

'হাঁ, যা বলতে যাচ্ছিলুম। ছেলেবেলা থেকেই আমার শিক্ষা ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। তাঁর রাজ্যে অন্যায় অবিচার থাকতে পারে না। আমার মা একথা আমাকে কতবার যে বলেছেন তার লেখাজোখা নেই। আমার বাবা বলেছেন ভগবানের ইচ্ছার উপর সব কিছু ছেড়ে দিতে। তিনি ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি করবেন। আমার বাল্যকালের বিশ্বাস প্রথম যৌবনেও বলবান ছিল। ভগবানের কাছে পাঁচশো বছরও বেশি সময় নয়। তিনি যদি ঠিক জিনিসটি করতে পাঁচ শতাব্দী সময় নেন তা হলেই বা এমন কী ক্ষতি! ইতিহাস তো অন্তহীন। আমি যদি দেখতে না পাই কী আসে যায়!' আমি বলে চলি।

'আপনাকে বাধা দিতে চাইনে, সার। আমার শুনতে ভালো লাগছে। আপনি অসঙ্কোচে বলে যান।' ডাক্তার সমজদারের মতো বলেন।

'আজ আপনিই আমার ফাদার কনফেসর।' আমি হাসি। 'তারপর যা বলছিলুম। মা বাবার কাছে ওই শিক্ষা যখন পাই তখন আমার কোনো স্বকীয় উপলব্ধি হয়নি। ধর্ম ছিল আমার কাছে শেখানো ধর্ম। পরে যখন উপলব্ধির বয়স হয় তখন আমি আপনি বুঝতে পারি যে আমি সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে চলেছি। সৌন্দর্যের থেকে সৌন্দর্যে আমাব যাত্রা। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতীতি হয় যে এ জগৎ কেবল রূপের জগৎ নয়, রসের জগৎ। আমিও চেষ্টা করলে রস সৃষ্টি করতে পারি। ডাক্তার, কত বড়ো একটা আবিষ্কার বলুন তো। আচার্য জগদীশের চেয়ে কিসে কম?' আমি সকৌতুকে বলি।

'যথার্থ বলেছেন আপনি।' তিনি সায় দেন। 'এর জন্যে আপনাকে ডক্টরেট দেওয়া উচিত। তা হলে আপনিও হন ডাক্তার।'

'রক্ষে করুন। আমি প্লেন মিস্টার থাকতে চাই। মিস্টার এন. কে. সিনহা।' সত্যি, আমি আচার্য হতে ভয় পাই। 'হাঁ, যা বলছিলুম। রসের জগতে আমিও রস সৃষ্টি করতে পারি, এই আবিষ্কারের পর যা ঘটে তা এর চেয়েও বড়ো আবিষ্কার। আমি প্রেমিক। আমি কান্ত। না, ফাদার কনফেসর, ওর বেশি খুলে বলব না।'

'ও।' বলে তিনি চমকে ওঠেন। বোধ হয় একটু নিরাশ হন।

'বিলেত গিয়েও আমার জীবনদর্শন স্থির ছিল। তবে শেষের দিকে আসন্ন ঘটনা ছায়াপাত করতে আরম্ভ করে। কী বিরাট নাটকের প্রস্তাবনা চলেছে। কী নির্মম ট্র্যাজেডী। কিন্তু তখনো আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। দেশে ফিরে আসার পর ধীরে ধীরে আমার চোখ ফুটছে। হিটলারের অভ্যুদয়ের দিন থেকেই আমি একপ্রকার অস্বস্তি অনুভব করছি। তার সঙ্গে যদি জুড়ে দেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি তা হলে এর নাম অস্বস্তির বাড়া। এটা একপ্রকার ম্যাইলেজ।' আমি বানান করে বলি, 'malaise'।

'ফরাসী শব্দ বুঝি?' ডাক্তার মাথা চুলকে বলেন, 'কখনো শুনিনি।'

'আচ্ছা, কেস হিস্টরি তো আগে শুনুন। তারপরে আলোচনা হবে। বলুন দেখি এই পরিস্থিতিতে কে কী করতে পারে। যখন শুনি একজন ইংরেজকে গুলী করে মারা হয়েছে তখন আমার বুকেও গুলী বাজে। ইংরেজের একটা মানবিক দিকও তো আছে, সে তো শুধু ইংরেজ নয়। আমিও ইংলণ্ডে বাস করেছি, ইংরেজের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়েছি। অনেক ইংরেজকে আমি

জানি যারা বাঙালীর সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী। পেডি, স্টীভেন্স এঁরা এদেশের বন্ধু। স্টীভেন্সকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্নেহ করতেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে বলে ওঠেন, আহা, অমন ভালো সাহেবটাকেও মেরে ফেললে গো! না, তাঁদের কারো সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, তবু আমারও বুক থেকে রক্ত ঝরেছে।' আমি বুকে হাত রেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকি।

'আর যারা ফাঁসীর কাষ্ঠে প্রাণ দিল তাদের বেলা?' ডাক্তার কঠোর হন।

'তাদের জন্যেও আমার প্রাণ কাঁদে। এ কী নিষ্ঠুর খেলা। একজন গুলী খাবে। তার বদলা একজন ফাঁসী যাবে। মহাত্মার উপদেশ শোনে না কেন কেউ? কিন্তু মহাত্মাও তেমন কিছু করে দেখাতে পারলেন কই? গণসত্যাগ্রহ তো ব্যর্থ হলো। দেশ স্বাধীন হচ্ছে কী করে? চারদিকে এমন এক হতাশার আবহাওয়া। দম আটকে আসে। ছুটি নিয়ে তীর্থভ্রমণ করে এলুম। কিন্তু দেখলুম ভগবানে সে বিশ্বাস আর নেই। শুনবেন, ডাক্তার, আজকাল আমি আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিনে।' আমি স্বীকারোক্তি করি।

'সে কী! ভগবানের দোষ কোথায়!' তিনি বিস্মিত হন।

'প্রার্থনা করে হবে কী! অন্তর্যামী যিনি তিনি কি আমার মনের কথা জানেন না যে আমাকে জানাতে হবে? আর তিনি করবেনই বা কী! তিনি তো ঠুঁটো জগন্নাথ। হিটলার যে ইহুদী উচ্ছেদ করছে, স্টালিন যে কুলাকদের উৎসন্ন করছে, পারছেন তিনি ঠেকাতে? হয়তো পাঁচশো বছর পরে এর মধ্যেও তাঁর কল্যাণহস্ত উন্মোচিত হবে, কিন্তু আজকে আমার মতো সেনসিটিভ প্রকৃতির মানুষ এসব সইতে পারবে কী করে। আমি যে অসাড় হয়ে যাচ্ছি। ভিতরে ভিতরে বরফের মতো জমাট। আমার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে! কবি আর ইনটেলেকচুয়ালদের পক্ষে এর মতো দুর্দিন কি ইতিহাসে আর কখনো এসেছে? ডাক্তার, আমার মা বাবার শিক্ষা আজ আর কাজ দিচ্ছে না।' আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বলি।

'আর আপনার নিজের উপলব্ধি?' তিনি মনে করিয়ে দেন।

'সে আর এক দুঃখ। সুন্দর, সুন্দর, সব কিছু সুন্দর, সব মানুষ সুন্দর, সব প্রাণী সুন্দর, সব জিনিস সুন্দর, সব ক্রিয়া সুন্দর, সব অবস্থা সুন্দর, মনে মনে যতই জপ করি না কেন, মন জানে যে বাস্তবে তা নয়। গুলী সুন্দর নয়, ফাঁসী সুন্দর নয়, জেল সুন্দর নয়, খুনের মামলা সুন্দর নয়, ফেলসানির মামলা সুন্দর নয়, ডাকাতীর মামলা সুন্দর নয়, ওসব নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া সুন্দর নয়, বছরের পর বছর কাবার করা সুন্দর নয়, যৌবন পার করে দেওয়া সুন্দর নয়। আর কবে আমি বাঁচব, ডাক্তার, এখন যদি না বাঁচি। বুড়ো বয়সে পেনসন নিয়ে বাঁচা কি বাঁচা?' আমি কাতর স্বরে সুধাই।

ডাক্তার আমার নাড়ী হাতে নিয়ে বলেন, 'হুঁ। একটু টেম্পারেচার রয়েছে।'

'আমার ইচ্ছে করছে,' আমি কনফেস করি, 'সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালাতে। টলস্টয়ের মতো শেষবয়সে নয়, আজ এখনি আমার বত্রিশ বছর বয়সে। কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে। এদের ভার নেবে কে? এই দুটি অপোগণ্ড শিশুর, আর এদের অসহায় জননীর! এমন হবে জানলে বিয়েই করতুম না! চাকরিই নিতুম না। আপনি বলছেন একটু টেম্পারেচার রয়েছে। ওটা কিসের জন্যে, ডাক্তার! আমার তো আশঙ্কা যে একদিন যক্ষ্মায় দাঁড়াবে। যদি আমার এ ম্যালেইজ না সারে।'

ডাক্তার অভয় দেন যে যক্ষ্মার লেশমাত্র আশঙ্কা নেই। ওটা ইনফ্লুয়েঞ্জারই জের। অলস মস্তিষ্কের অসুস্থ চিন্তা বিকারের রূপ ধরেছে। দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আপিসে আদালতে গেলে কাজের মধ্যে ডুব দিলে টেনিস খেললে ও আড্ডা দিলে আমার আরোগ্য সর্বাঙ্গীন হবে। আর দেহই তো মনের নিয়ামক।

।। তিন ।।

অসুখ সেরে গেল ঠিকই। ডাক্তারের একটা আব্দার ছিল। চাঁদা তুলে একটা ক্লিনিক জুড়ে দিতে হবে স্থানীয় ডাক্তারখানার সঙ্গে। তা হলে আর কলকাতায় রক্ত, থুতু, মল, মূত্র ইত্যাদি পাঠিয়ে টেস্ট করাতে হবে না। এই মহকুমা শহরেই সেটা সম্ভব হবে। শত শত লোকের উপকার হবে। 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

তাই নিয়ে আমরা দু'জনে প্রায়ই আলোচনা করি। ডাক্তার আর আমি। কোন্‌দিন বদলীর হুকুম আসবে, তার আগে লোকহিতকর একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে দিয়ে গেলে কীর্তি থাকবে। প্রত্যেক এস. ডি. ও. একটা না একটা কীর্তি রেখে গেছেন। একজন গড়ে দিয়েছেন থিয়েটারের হল, আর একজন একটা বালিকা বিদ্যালয়।

বাড়িটা কোনোরকমে খাড়া হলো, উদ্বোধনের আগে আসবাবপত্র আর যন্ত্রপাতি জোগাড় করা দরকার, এমন সময় এল আমার বদলীর হুকুম। প্রোমোশনও বটে। ডাক্তার এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে আপসোস যে উদ্বোধনটা আমি চাক্ষুষ করে যেতে পারলুম না। কাজ করল কে! নাম হবে কার।

'নাম যার খুশি হোক, কাজটা তো হলো। এখন আপনি খুশি? আর আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া নয়, টেস্ট করে বলতে পারবেন কোন্‌টা টাইফয়েড কোন্‌টা ম্যালেরিয়া, যদিও আপনার আন্দাজ প্রায়ই অভ্রান্ত, ডাক্তার সেনশর্মা।'

তিনি আমার হাতে হাত রেখে বলেন, 'কী উপকার যে করলেন!'

এবপর তিনি আমাকে সপরিবারে শাকান্নের নিমন্ত্রণ করেন। বলেন, 'সেই যে বারুণীর চা পান এটা তারই উত্তোর।'

আলাপ হলো তাঁর পরিবারের সঙ্গে। অবশ্য ইতিমধ্যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর চেনাশুনা হয়েছিল। মহিলা সমিতির মাধ্যমে।

সেদিন আহারের পর ডাক্তার আমার সঙ্গে সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে আসেন ও আমার আপিসঘরে বিশ্রাম করেন। দেখতে দেখতে গল্প জমে ওঠে।

'সার, সেদিন আপনি যেসব কথা বলেছিলেন আমি এতদিন ধরে মনে মনে ভেবে তার একটা জবাব তৈরি করেছি। আপনার কেসটা প্যাথোলজিকাল নয়, ক্লিনিকাল নয়। বলতে পারা যায় সাইকোলজিকাল অথবা মরাল। আমি তো আদার ব্যাপারী, আমি জাহাজের খবর কী জানি? তবে ছেলেবেলা থেকে আমিও একপ্রকার শিক্ষায় মানুষ হয়েছি, এত বয়সেও সেটা ভুলিনি বা ছাড়িনি। আপনার কি শোনবার সময় হবে?' তিনি জানতে চান।

'নিশ্চয় সময় হবে। এখন তো আমি চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছি। আমার কিসের দায়! এ মহকুমার ভার এখন আমার নয়। গোলাম ফারুকের।' নতুন হাকিমের নাম করি।

'তা হলে শুনতে আজ্ঞা হয়।' ডাক্তার বলেন, 'আপনি সেদিন যেসব মামলার কথা বলছিলেন সেসব কেস প্রথমেই আসে আমার কাছে। তারপর যায় আপনার কাছে। খুনই বলুন, বলাৎকারই বলুন, আমিই প্রথমে তার পোস্ট মর্টেম করি বা অঙ্গ পরীক্ষা করি। কুৎসিতের অভিজ্ঞতা আপনার আর কতটুকু হয়, সার! আপনি শুধু নিজের হাতে রেকর্ড করে যান। আমি যে স্বহস্তে লাশ কাটি, মল মূত্র ঘাঁটি, আর স্ত্রী অঙ্গ স্পর্শ করি। বিকার যা হবার আমারই হয়, সার। আপনি তো নির্বিকার।'

'আরে, না, না। নির্বিকার নই। তবে হাকিমদের সব সময় ভান করতে হয় যে তাঁরা পাষাণমূর্তি। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় কিছুই তাঁরা প্রকাশ করেন না। যদিও অনুভব করেন সবই। আমি তো মনে মনে মূর্ছাও গেছি, কিন্তু কাউকে ঘুণাক্ষরে জানতে দিইনি। নার্ভ স্টেডি রাখতে হয় যেমন ডাক্তারকে তেমনি হাকিমকেও।' আমি তর্ক করি।

'তা হলেও, সার, আপনি স্বীকার করবেন যে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আপনার হয়নি। আমার হয়েছে। সে অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেই আমি আপনাকে দু'চারকথা বলতে সাহস পাচ্ছি। নইলে আপনার পোজিশন আর আমার পোজিশন!' ডাক্তার জিব কাটেন।

'কেন, আমিও মানুষ আর আপনিও মানুষ। মানুষ হিশ্যাবে আপনি কিসে কম? নির্ভয়ে বলুন, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।' আমি অভয় দিই।

'সার, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, সুন্দর আর কুৎসিত একই অঙ্গে বিরাজ করছে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি নয়। বাদ দিলে অঙ্গহানি হবে। সে অধিকার আর্টে আপনার থাকতে পারে কারণ আর্ট হলো আপনার সৃষ্টি, আপনি তার অঙ্গহানি করতে পারেন, কিন্তু জীবনে সে অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়নি, কারণ জীবন হচ্ছে বিধাতার সৃষ্টি, জীবন হচ্ছে সুন্দরে কুৎসিতে মেশা, উভয়কে নিয়েই সে পূর্ণাঙ্গ। আপনারই হোক আর দেশেরই হোক আর জগতেরই হোক জীবন কখনো একটানা সুন্দর বা সত্য বা শিব বা আনন্দময় হতে পারে না। ওসব দাবী আপনি আর্টের জন্যে রেখে দিন। সৃষ্টি করুন বসে নিখুঁৎ আর্ট। কিন্তু জীবন মানে এমন এক ব্যাপার যেখানে কেবলমাত্র মরাল বা কেবল এস্থেটিক থাকতে পারে না। আবার এমন নয় যে এস্থেটিক বা মরাল লেশমাত্র থাকবে না। বা ওদের ছেঁটে বাদ দিতে হবে। দেখবেন যেন স্পিরিচুয়ালকে ঘাড় ধরে বার করে দেবেন না। প্রার্থনা না করতে পারেন, কিন্তু তিনি আছেন ও তিনি নিত্য সজাগ ও সক্রিয়, এটুকু হোঁশ যেন থাকে। নইলে আপনিও তো আর একটা হিটলার কি স্টালিন হয়ে উঠবেন, সার।' ডাক্তার হুঁশিয়ার করে দেন।

আমি কাবু হয়ে বলি, 'তিনি আছেন, এটা আমি এখনো অস্পষ্টভাবে অনুভব করি, ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে আমার একটা অতি মিহি সুতোর মতো যোগসূত্র আছে, এটাও আমার অনুভব। এই সম্বন্ধটার খাতিরেই এখনো আমি তাঁর দিকে তাকাই, তবে কিছু চাইতে ইচ্ছে করে না। তাঁর ইচ্ছাই যখন একমাত্র ও চরম তখন আমি কেন মিথ্যে চেয়ে মরি? আর নালিশই বা করতে যাই কেন? যখন, যা হবার তা হবেই।'

'তিনি আছেন আর তাঁর সঙ্গে আপনার আমার একটা যোগসূত্র আছে, ব্যস্। এই ঢের! এর বেশি কী দরকার? প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হয় করবেন, ইচ্ছে না হয় না করবেন। প্রার্থনা করলেই যে ফল ফলে তা নয়। না করলেও যে ফলে না তাও নয়। উপাসনার বেলাও সেই কথা। তিনি ওসবের প্রত্যাশী নন, গ্রাহ্যই করেন না। আমার কথা যদি বলেন, আমি ওসবের পক্ষেও না, বিপক্ষেও না। আমি শুধু এইমাত্র জানি যে এই বিশ্বসংসার যদি একটা বিশাল যন্ত্র হয়ে থাকে তবে আমি হচ্ছি তার সামান্য একটা পার্ট। কিংবা যদি একটা বিরাট নাট্য হয়ে থাকে তবে আমারও তাতে অকিঞ্চিৎকর একটা পার্ট আছে। অকিঞ্চিৎকর হলেও অনাবশ্যক নয়। আই হ্যাভ মাই ইম্পর্টান্স। তারপর,' তিনি হঠাৎ আমার সঙ্গে কোলাকুলি করে বলেন, 'এটাও মনে রাখবেন যে সংসার সরোবরে হাঁসের মতো আমরা সাঁতার দিচ্ছি। অথচ জল আমাদের ডানায় লেগে থাকছে না। হাঁসের মতো আমরা পাঁকও ঘাঁটছি। তবু ডানা আমাদের নির্মল। সার, আপনার এ অসুখ সেরে যাবে।'

কাহিনী

চণ্ডাশোক

রিভলভার না পিস্তল দিয়ে সেদিন কী মর্মান্তিক ট্র্যাজেডীই না ঘটে গেল বীরভূমে। ওই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল দুই প্রতিবেশীতে।

'চন্দ, আপনি হলে পারতেন? না, আপনি হলে রিভলভারই ধরতেন না। আপনি যে আবার ঘোর অহিংসাবাদী।' মালাকার বলেন ঠেস দিয়ে।

'অশোকও তো ঘোর অহিংসাবাদী ছিলেন। কিন্তু জীবনের প্রথমদিকে নয়। কলিঙ্গের যুদ্ধের পরে।' চন্দ বলেন রহস্যময় করে।

'সে কী! আপনিও পারতেন! আমার বিশ্বাস হয় না একথা।' মালাকার বলেন।

'আর একটু হলেই ঘটে যেত ওইরকম এক ট্র্যাজেডী। ঘটেনি যে এর জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়।' চন্দ তাঁর যৌবনকালে ফিরে যান।

'কবে! কোথায়? কেমন করে?' এক নিশ্বাসে বলে যান মালাকার।

'বছর সাঁইত্রিশ আগে। অ্যাণ্ডারসনী আমলে। আমি যখন শ্যামপুরের মহকুমা হাকিম। সেসব কথা শুনতে কি আপনার ভালো লাগবে?' চন্দ ইতস্তত করেন।

'বুঝেছি। টেররিস্টের পাল্লায় পড়েছিলেন।' মালাকার যেন সবজান্তা।

'আপনার আন্দাজ ঠিক নয়। ব্যাপারটা নারীঘটিত।' চন্দ মজা করে বলেন।

'আরে, তা হলে তো এক্ষুনি শুনতে হয়। এ যে রীতিমতো গোয়েন্দা কাহিনী। হাকিম, রিভলভার, নারী। বলুন, বলুন। না শুনে আমি উঠছিনে।' ভদ্রলোক জাঁকিয়ে বসেন ও সিগারেট ধরান।

বাকীটা চন্দর আত্মকথা।

।। দুই ।।

রিভলভার বা পিস্তল আমি কতবার কতজনকে দিয়েছি। মানে তার লাইসেন্স দিয়েছি। ইনসপেকশনের সময় কতবার নাড়াচাড়া করেছি। আমার দেহরক্ষীদের রিভলভার রোজ রাত্রে কনফিডেনশিয়াল আলমায়রার ভিতরে নিজের হাতে বন্ধ করেছি। কিন্তু নিজে কখনো রিভলভার রাখিনি। যখন ইচ্ছা ছিল তখন দরকার ছিল না, আমার দেহরক্ষীদেরই তো রিভলভার ছিল। যখন সন্ত্রাসের যুগ শেষ হলো তখন দেখি ইচ্ছাটাই লোপ পেয়েছে। তার কারণ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে একটা কাণ্ড। একটা বিপ্লব।

শ্যামপুরে আমি কেবল মহকুমা হাকিম নই, আমি সরকারী হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট। একদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে স্টাফের সকলের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁদের একজন হলেন সুশীলা সরকার। ট্রেণ্ড মিডওয়াইফ। অবিবাহিতা, হিন্দু তরুণী। সুরূপা নয়, কিন্তু ফরসা আর তন্বী। সদ্য পাস করে কলকাতা থেকে এসেছেন। সরকারী ডাক্তারই ওকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ভরসা দিয়ে আনিয়েছেন, কিন্তু মিডওয়াইফের কল তো সাধারণত রাত্রে। মেয়েটি একা বেরোতে ভয় পায়। ওঁর সঙ্গে যায়ই বা কে? মা তো অসুস্থ। তাই আমার কাছে ওঁর নিবেদন আমি যেন সরকারকে লিখে একটি আয়ার বন্দোবস্ত করি।

তখনকার দিনে সরকারকে লিখে বছরে তিনশোটি টাকা বরাদ্দ করাও শক্ত ছিল। আমি চেষ্টা করি যদি কোনোখান থেকে প্রাইভেট ডোনেশন যোগাড় করতে পারি। মহকুমা হাকিমরা এসব বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। খোঁজ নিতে আরম্ভ করলুম কে কে রায়সাহেব হতে চান। কিংবা লোকাল বোর্ড নমিনেশন পেতে চান।

ওদিকে পারিবারিক প্রয়োজনে লেডী ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। লেডী ডাক্তার তো নেই, সবে ধন নীলমণি ওই ট্রেণ্ড মিডওয়াইফ। মিসেস চন্দ একদিন ওঁকে কল দিলেন। ইনি টাকা নিতে চান না। বলেন, 'আমি নিজের গরজেই এসেছি। আমার একটা নালিশ আছে। সাহেবকে বলতে সাহস হয় না। আপনি যদি দয়া করে শোনেন।'

ওঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে আমার গৃহিণী আমাকে বলেন, 'তুমিই এখানকার শাসনকর্তা। লোকটিকে শাসন করা তোমারই কর্তব্য। মেয়েটাকে অন্য কী ভাবে প্রোটেকশন দিতে পারো ভেবে দেখ। কিন্তু জানাজানি যেন না হয়। হলে ওরই বদনাম হবে। সমাজ তো সেই অযোধ্যার সমাজ। যত দোষ মেয়েদেরই।'

জায়গাটা সত্যি খুবই রক্ষণশীল। খ্রীস্টান মিডওয়াইফ আরো বেশি বয়সের পাওয়া যেত, কিন্তু কেউ ঘরে ঢুকতে দেবে না। হিন্দু চাই। কিন্তু তখনকার দিনে হিন্দুর মেয়েরা ট্রেনিং নিতে এগিয়ে আসত না। এলে কলকাতা শহর ছেড়ে যেত না। এই মেয়েটি অগ্রণী। এঁকে প্রোটেকশন দিতে হবে স্থানীয় রোমিওদের হাত থেকে। সম্প্রতি এক রোমিও জুটেছেন, তিনি দ্বিগুণ বয়সের বিবাহিত পুরুষ। মুনসেফ আদালতের কেরানী। অনাহূতভাবে উপকার করতে এসে তার বিনিময় প্রত্যাশা করেন। রোজ রাত্রে মেয়েটির কোয়ার্টার্সে গিয়ে হানা দেন। কাকুতিমিনতি করলেও নড়তে রাজী হন না।

তখনকার দিনে মহিলারা কেউ দোকানে গিয়ে শাড়ি ব্লাউজ জুতো জামা ওষুধপথ্য কিনতেন না। লোক পাঠালে দোকানদার এসে বাড়িতে পৌঁছে দিত বা লোকের হাতে দিত। মেয়েটির তো পাঠাবার মতো লোক নেই, তাই তিনি প্রতিবেশীদের সাহায্য নিতেন। জানতেন না যে এর একটা অলিখিত শর্ত আছে। আসত যারা তারা দিনের বেলা আসত, এক পেয়ালা চা খেত, আর কিছু প্রত্যাশা করত না। কিন্তু এই লোকটি আরো কিছু চায় বলে রাতের বেলা আসে। সিগারেট ধরায়। ওঠবার নাম করে না। মা না থাকলে কী জানি কী চেয়ে বসত। মাও তো শয্যাশায়ী।

এরূপ ক্ষেত্রে হাকিমরা উভয়পক্ষকে খাস কামরায় ডেকে পাঠাতেন। কাছারির খাস কামরায় বা বাংলোয় খাস কামরায়। আমি ভেবে দেখলুম কোর্টে তলব করার চেয়ে বাংলোয় তলব করাই ভালো। বাইরের কেউ টের পাবে না। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে শহরময় রাষ্ট্র হবে না। নালিশটা যদি প্রমাণ হয় তবে ক্রিমিনাল ট্রেসপাসের দায়ে জেলও হতে পারে, জরিমানাও হতে পারে চাকরিটাও যেতে পারে আসামীর। ফরিয়াদীরও এমন বদনাম রটবে যে তাকে কেউ কল দেবে না, সে আপনা থেকেই ইস্তফা দিয়ে পালাবে।

তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল সেটা আরো নিগূঢ়। একালের হাকিমরা কী ভাবেন জানিনে, সেকালের আমরা দাপটের সঙ্গে শাসন করতে অভ্যস্ত ছিলুম। ইংরেজরা যদিও এদেশে ব্রিটিশ জাস্টিস প্রবর্তন করেছিল তবু তাদের অনেকেরই ধারণা ছিল ব্রিটিশ জাস্টিস এদেশের মাটিতে শিকড় পাবে না। তার বদলে চাই রাফ জাস্টিস। যেটা ওরা ট্রাইবাল এলাকায় চালায়। নতুবা দুষ্টের দমন হবে না, উকীলকে মোটা ফী দিয়ে সব আসামী খালাস হয়ে যাবে। ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যে তো উকীলদের ঢুকতেই দেওয়া হতো না। এক খুনের মামলা বাদে। হাকিমরা আইন ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনে বিচার করতেন, আইনের মূলনীতি অনুসারে নয়। আইনে বলে যতক্ষণ না আসামী দোষী বলে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু ক'টা কেসে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়?

বেণীমাধব কাঞ্জিলাল আমার খাস কামরায় হাজির হলেন একদিন সকালে। ময়লা রং, মজবুত গড়ন, যণ্ডামার্কা মনে হওয়া বিচিত্র নয়। মুনসেফের কেরানী বলে মহকুমা হাকিমকে তিনি যথোচিত সম্মান দেখাতে ইচ্ছুক নন। তাঁরও খুঁটির জোর আছে, হাকিম তাঁর করবেনটা কী? এই যেন তাঁর মুখের ভাব।

আমি মোলায়েম সুরেই শুরু করি। বলি, 'এই যে বেণীমাধববাবু, আসুন, আসুন। আচ্ছা, এই ভদ্রমহিলাকে আপনি চেনেন।'

'চিনি বইকি। হাসপাতালের মিডওয়াইফ। আমার ওয়াইফের লাইফ সেভ করেছেন।' বেণীমাধব নাটকীয় ভঙ্গীতে বলেন।

'সেইজন্যেই কি আপনি রোজ রাত্রে এঁর ওখানে গিয়ে এঁকে বিব্রত করেন? আপনি যিনি একজন বিবাহিত পুরুষ। আর ইনি যিনি একজন অবিবাহিতা মহিলা। বেণীবাবু, কাজটা কি ভালো হচ্ছে?' আমি তাঁর হিতৈষীর মতোই বলি।

ভেবেছিলুম তিনি গলে গিয়ে বলবেন, 'না, সার, কাজটা ভালো নয়। আমি আর অমন কাজ করব না।' তা হলে আমিও তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতুম, 'সাবাস।' মেয়েটিকে নিরাপত্তা যোগানোই তো আমার উদ্দেশ্য। লোকটাকে জব্দ করা তো উদ্দেশ্য নয়। বিশেষত একজন সরকারী কেরানীকে। তাতে সরকারেরও অগৌরব। বেণীবাবু আমার কথার উত্তর না দিয়ে ফস করে পকেট থেকে একটা স্লিপ বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দেন। 'এই দেখুন, সার, ফর্দ। এসব জিনিস আমি ওঁর ওখানে পৌঁছে দিয়েছি। একশো তিন টাকা পাঁচ আনা দশ গণ্ডা আমার পাওনা। এক পয়সাও আদায় হয়নি। সেইজন্যেই তো তাগাদা দিতে যাই।'

লোকটার উদ্ধত ভঙ্গী দেখে আমি বিরক্ত বোধ করি। বলি, 'তা বলে রোজ রাতের বেলায়? রবিবার সকালে গেলেই পারতেন।'

'রবিবারেও আমি অফিসে বসে কাজ করি। রাতেই আমার সময় হয়।' বেণীবাবুর ধৃষ্টতা আমাকে অবাক করে দেয়। কী বেহদ্দ বেহায়া।

এবার আমি মেয়েটির দিকে ফিরে বলি, 'এই হিশাব কি ঠিক?'

'ওষুধপত্র, হরলিকস, আপেল, ডাব, বিস্কুট, বার্লি আমি আনতে দিয়েছিলুম তবে দাম ঠিক লেখা আছে কি না জানিনে। কোনোদিন বলেননি কত দাম। এই যে ফর্দ এটাও আজ প্রথম দেখছি। ব্লাউজ, পেটিকোট, স্নো, পাউডার, আলতা, হেয়ার অয়েল, সাবান আপনা থেকে গছিয়ে দিয়ে যান। বলেন সেফ ডেলিভারির জন্যে বখশিস। আর লেডিজ শু আমি ফিরিয়ে দিই, আমি পায়ে দিইনি।' মেয়েটি অকপটে বলে যায়।

'যত সব বাজে কথা। আমার ন্যায্য পাওনা অবিলম্বে দিতে হবে। আমি একটি পাই পয়সাও

ছাড়ব না।' বেণীবাবু বেপরোয়া।

শুনে আমার পিত্ত জ্বলে যায়। স্বীকৃত দাবী তো চল্লিশ টাকার কিছু বেশি। আমি তার দায়িত্ব নিচ্ছি। সামনে মাসের মাইনে থেকে কাটিয়ে দেব।

না, তা হবে না। দোকানদারের কাছ থেকে ধারে কেনা হয়েছে। দোকানদার আর অপেক্ষা করবে না।

কে সেই দোকানদার? আমি তাকে সবুর করতে বলব।

না, তা হবে না। দোকানদারের কাছে ইজ্জৎ থাকবে না।

স্ত্রীলোকের ইজ্জতের প্রশ্ন নেই?

এইসব স্ত্রীলোকের আবার ইজ্জতের প্রশ্ন! টাকার জন্যে কার বাড়ি না যায়। ধোপা নাপিত গয়লা মুদি মুদ্দফরাস।

আমি আর সহ্য করতে পারিনে। দেহরক্ষীর দিকে ফিরে বলি, 'খোদাবখশ। রিভলভার নিকালো।'

আমার ছায়ার মতো অনুগত সেই পাঞ্জাবী মুসলমান রিভলভার বার করে বাগিয়ে ধরে। ও তো বাংলা বোঝে না। ও ভাবে লোকটা সাহেবকে মারতে যাচ্ছে। যমদূতের মতো চেহারা। কিন্তু যেমন বিশ্বাসী তেমনি সরল। যা করতে বলব নির্বিচারে তাই করবে। যদি ফায়ার করতে বলি তো ফায়ার।

'তারপর, বেণীবাবু! এই হিসাবে ধরা হয়েছে এক টিন সিগারেট। এটাও কি আপনাকে আনতে বলা হয়েছিল? মেয়েরা কেউ সিগারেট খায়?' আমি চেপে ধরি।

'না, ওটা আমারই জন্যে। ওটা আমার দস্তুরি।' বেণীবাবু জবাবদিহি করেন। রিভলভার উদ্যত দেখেও অকুতোভয়!

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, 'শাইলকের মতো আপনি কি চান এক পাউণ্ড মাংস? নারীমাংস? লজ্জা করে না আপনার। আর যাবেন ও বাড়িতে ?'

'আমার দাবী আমি ছাড়ব না। যাব।' বেণীবাবু নাছোড়বান্দা।

'রাতের বেলা যাবেন?' আমি আরো উত্তেজিত হই।

'আর কখন যাব? দিনের বেলা আমার সময় থাকলে তো!' বেণীবাবু অবিচল।

এইবার আমার সম্পূর্ণ ধৈর্যচ্যুতি হয়। আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'খোদাবখশ—'। এর পরের শব্দটা হতো, 'ফায়ার'। তার পরের শব্দটা রিভলভারের আওয়াজ। মেয়েটির মুখ একেবারে ফ্যাকাসে। বেণীবাবুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। নির্দোষ মানুষেরও হাড়ে কাঁপুনি ধরে যায়। দোষী পুরুষের নার্ভ কেমন শক্ত!

খোদাবখশকে ইশারায় বলি, 'যাও।' সে বেরিয়ে যায়। মেয়েটিকে ইশারায় বলি, 'যান।' তিনিও বাইরে যান।

তখনকার দিনে আমার অভ্যাস ছিল ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ানো। বেড়ানোর পর হাতের কাছে রাখা। ছড়িখানা হঠাৎ নজরে পড়ে যায়। খপ করে তুলে নিই।

সে ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। আমরা দু'জনে। বেণীবাবু আর আমি। লোকটা সম্পূর্ণ নির্বিকার। আর আমি সমান উত্তেজিত।

'বেণীবাবু, এখনো সময় আছে। বলুন আপনি অনুতপ্ত।' আমি ছড়ি আস্ফালন করি।

'কিসের জন্যে অনুতাপ করব, সার?' বেণীবাবু পাষাণের মতো নিশ্চল।

'শাইলকের মতো আপনি চান এক পাউণ্ড মাংস। নারীমাংস। সেইজন্যে রাতের বেলা ও

বাড়িতে যান।' আমি যেন আসামীকে চার্জ পড়ে শোনাচ্ছি।

'না, সার। আমি যাই আমার পাওনা আদায় করতে।' আসামীর জবাব।

বিচারক হিশাবে আমার জানা উচিত ছিল যে আত্মরক্ষার জন্যে আসামী যে-কোনো লাইন নিতে পারে। বেণীবাবু তার জন্যে আগে থেকে তৈরি হয়েই এসেছেন।

'কিন্তু আপনার হিশাবে তো মহিলাটির স্বাক্ষর নেই। তিনি স্বীকার যেটুকু করছেন সেইটুকুই আপনার পাওনা। গোটা চল্লিশ টাকার জন্যে আপনি ওঁকে উত্যক্ত করবেন? বলুন, আর ওখানে যাবেন?' আমি ছড়ি উঁচিয়ে ধরি।

'আমি কতবার ওঁর ফাই ফরমাস খেটেছি। কই, তখন তো কেউ বলেনি যে আমি ওঁকে উত্যক্ত করেছি। যে লোকটা এত উপকার করেছে সে কি উত্যক্ত করতেই যায়?' বেণীবাবু যেন ইঙ্গিতে বোঝাতে চান যে সম্পর্কটা অন্যরকম।

'তার মানে উপকারের বিনিময়ে উপভোগ করতে?' আমি সপাং করে এক ঘা কষিয়ে দিই ওর বাম উরুতে।

'ও কী করছেন, সার! আমাকে মারছেন কেন?' বেণীবাবু আমার কাছে কৈফিয়ত চান।

'আপনি চান মেয়েটিকে সিডিউস করতে।' এই বলে আরেক ঘা। এবার ডান উরুতে।

'ও কী বলছেন, সার! এ কী অন্যায়?' বেণীবাবু হাত বুলোতে বুলোতে বলেন। তবু স্বীকার করেন না। অনুশোচনারও লক্ষণ নেই।

আমি হাল ছেড়ে দিই। এত বড় মদ্দকে বেত মেরে শিক্ষা দেওয়া যায় না। বলি, 'আপনি এখন যেতে পারেন, বেণীবাবু। কিন্তু মনে রাখবেন। ব্যাপারটা এইখানেই থামবে না।'

ব্যাপারটা সত্যি সেইখানেই থামল না। এজলাসে বসে কাজ করছি এমন সময় এক চিঠি। লিখছেন মুনসেফ সাহেব। বেণীবাবুর মুখে বিবরণ শুনে তাঁর বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু দুই উরুতে লম্বা লম্বা কাট দেখে তাঁর ভয় করছে যে একটা কিছু ঘটেছে, যাতে মুনসেফী আদালতের কর্মচারীর প্রেসটিজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কর্মচারীটিকে তিনি সদরে জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে অনুমতি দিয়েছেন।

এবার ভয় পাবার পালা আমার। জজ সাহেব যদি হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন তা আমার রাফ জাস্টিসের জন্যে সাধুবাদ কেউ দেবেন না। সকলেই একবাক্যে তিরস্কার করবেন। গভর্নমেন্ট আমাকে নিয়ে মুশকিলে পড়বেন। বদলী আছে কপালে।

মুনসেফ সাহেব প্রস্তাব করেছিলেন যে তিনি স্বয়ং আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে। আমি তাঁকে এক কথায় জানিয়ে দিই যে আমিই তাঁর বাসভবনে গিয়ে আমার বক্তব্য শোনাব কাছারির পরে।

মুনসেফ সাহেব আমাকে এক গাল হেসে অভ্যর্থনা করেন। তারপরে বলেন, 'আপনি কখনো ওরকম কিছু করতে পারেন? কক্ষনো না। তবে কিনা প্রহারের দাগ ছিল।'

'আমি আজ ওকে হাজতে পাঠাতে পারতুম, তাতে কিন্তু আপনাদেরই প্রেস্টিজ হানি হতো, মিস্টার দাস। রোজ রাত্রে এক ভদ্রমহিলার কোয়ার্টার্সে হানা দেওয়া একটা দণ্ডনীয় অপরাধ, কিছুতেই কি বেণীবাবুকে এটা বোঝাতে পারলুম? তবে আমার দু'টি ঘা যে ওই বিশাল বপুতে দাগ কেটে যাবে এতটা আমি ভাবিনি। এর জন্যে আমি লজ্জিত।' আমিই আসামীর মতো সাফাই দিই।

'আরে না, না, ও কী বলছেন, মিস্টার চন্দ! তবে ওই যে শুনছিলুম রিভলভার না কী যেন ওর বুকের দিকে তাক করা হয়েছিল।' মুনসেফ সাহেব কৈফিয়ত চান।

'হ্যাঁ, আর একটু হলে লোকটার প্রাণ যেত। কিন্তু যায়নি তো। এটা প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কেস

নয়। আর আমরাও কাউকে সরাসরি প্রাণদণ্ড দিইনে। আমার সেটুকু হোঁশ ছিল।' আমি সব কথা খুলে বলি।

'বেশ করেছেন, ঠিক করেছেন। তবে আমাকে যদি আগে একবার আপনার কনফিডেন্সে নিতেন তা হলে আমিই জজ সাহেবকে লিখে ওকে বদলী করাতুম। মিস্টার চন্দ, আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়ো। সেই সুবাদে বলছি, যেটা আরো সরলভাবে হতে পারে সেটাকে আরো জটিল করে লাভ কী?' তিনি আমাকে চায়ের আমন্ত্রণ জানান।

জজ সাহেব কী করেন তার জন্যে ভয়ে ভয়ে থাকি। একদিন শুনতে পাই লোকটাকে তিনি এক দুর্গম স্থানে বদলী করেছেন। মুনসেফ সাহেব আমাকে বাড়ি বয়ে শুনিয়ে যান। আমিও তাঁকে চা পানে আপ্যায়িত করি।

কিছুদিন বাদে মেয়েটি এসে কান্নাকাটি করে। সবাই ওকে দোষ দিচ্ছে। ও আর টিকতে পারছে না। ওর জন্যে অন্য কোথাও একটা কাজ যদি যোগাড় করে দিই।

আমার কাকীমা তাঁর সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্যে ট্রেণ্ড মিডওয়াইফ খুঁজছিলেন। মেয়েটিকে তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিই। দেওঘরে ওর চাকরি হয়ে যায়। ওর জন্যে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলুম, কিন্তু পরে কাকীমা আপসোস করে জানালেন যে মেয়েটি কার সঙ্গে ভাব করে অন্তর্ধান হয়েছে। ও বয়সের মেয়েরা বিয়ের সুযোগ পেলে ছাড়ে না। এর থেকে আমারও শিক্ষা হলো। সমস্তটা দোষ হয়তো বেণীবাবুর নয়। কেন যে বেচারাকে মারতে গেলুম! মাত্র একজনের সাক্ষীতে আরেকজনের সাজা হওয়া কি উচিত? আস্তে আস্তে আমার মধ্যে একটা জুডিসিয়াল টেম্পারমেন্ট এল। হাকিমী মেজাজ অবশ্য একদিনে গেল না।

ভেবে দেখলুম যে রিভলভার আমার মতো প্রকৃতির জন্যে নয়। কথায় কথায় যে ফায়ার করতে উদ্যত হয় তাকে অমন একটা প্রলোভনের ধারে কাছেও রাখতে নেই। ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন নরহত্যার মহাপাতক থেকে। আমি যেন তাঁর করুণার যোগ্য হই। আগুন নিয়ে খেলা আর নয়। কোনো অর্থেই নয়।

রিভলভার কেন, স্টেনগান ব্রেনগান নিয়েও নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু নিজের জন্যে কোনো অস্ত্রই চাইনি। এমন কি একটা বন্দুকও না। এসব রাখার চেয়ে না রাখাই নিরাপদ।

।। তিন ।।

মালাকার এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিলেন। বললেন 'তা হলে ট্র্যাজেডীটা ঘটি ঘটি করেও ঘটল না। তবে আর কী হলো! গোয়েন্দা কাহিনী না ছাই!'

চন্দ বললেন, 'না। ট্র্যাজেডীটা ঘটল না। যেটা শেষপর্যন্ত ঘটল সেটা কমেডী। কিন্তু সেটা সেইখানে বা সেই বছর নয়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!'

চন্দ বলতে লাগলেন—

শ্যামপুর থেকে ছুটি নিয়ে হিমালয়ে চলে যাই কিছুদিন পরে। মনটা অশান্ত। শান্তির সন্ধান করি। তারপরে আরো অনেক স্টেশনে বদলী হয়ে অনেক রকম পদে নিযুক্ত হয়ে বছর ছয়েক বাদে বদলী হয়ে আসি শ্যামপুর যেখানকার মহকুমা সেই জেলার সদরে। এবার আমিই সেখানকার

জেলা জজ।

জেলা জজ হিশাবে বছর তিনেক কাজ করার পর ছুটি নিয়ে আবার হিমালয় যাত্রা। কিন্তু তার আগেই আমার সেরেস্তাদার আমার কাছে নিবেদন করেন যে বেণীমাধব কাঞ্জিলাল বলে একটি কেরানী প্রায় নয় বছর হলো শিয়ালার মুনসেফী চৌকিতে পড়ে আছে। ওদিকে ওর পরিবার থাকে শ্যামপুরের বাড়িতেই। দু'টো এস্টাব্লিশমেন্টের খরচ কি এই যুদ্ধের বাজারে ও বেচারা চালাতে পারে? কিন্তু ওর জায়গায় কেউ ওই জংলা জায়গায় যেতে চায় না। তাই বদলীর আবেদন বছরের পর বছর ঝুলে আছে।

বেণীবাবুর কথা আমার মনে পড়ে যায়। এতদিন কেউ আমাকে জানায়নি, আশ্চর্য! জানালে আমি হয়তো প্রতিকার করতে পারতুম। সেরেস্তাদারকে বলি ওকে ডেকে পাঠাতে।

একদিন আমার বাসভবনে বসে কাজ করছি এমন সময় বেণীবাবুর নামের স্লিপ নিয়ে চাপরাশির প্রবেশ।

লোকটি আমার পায়ে পড়ে বলে, 'হুজুর মা বাপ। মা বাপ কি সন্তানকে শাসন করেন না? শাসন না করলে কি মঙ্গল হয়? আমি জাহান্নমের পথে চলেছিলুম, হুজুর। হুজুর ভিন্ন আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারত না। আমার বৌ আমার ছেলেমেয়ে না খেয়ে মারা যেত। ছি ছি! আমি কি একটা মানুষ ছিলুম, না বুনো মোষ! হুজুর আমাকে মানুষ করে দিয়েছেন। আমার চরিত্রের সংশোধন হয়েছে। এতই যদি করলেন, হুজুর তো এখান থেকে চলে যাবার আগে অধীনের একটা ব্যবস্থা করে যান। আহা, হুজুরের মতো বিচারক আর হয় না। হুজুর চলে গেলে জেলা কানা হয়ে যাবে। মিথ্যে বলছিনে, ধর্মাবতার। সত্য বলছি। এমন মানবতা না কী বলে ওকে? এমন মানবতা আর কার? হুজুরের প্রশংসা চোর-ডাকাতেও করে। করে না শুধু পুলিস।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে একটা অর্ডার লিখে পাঠাই। বেণীমাধব কাঞ্জিলালকে শ্যামপুরে বদলি করা হলো। ওর জায়গায় কে যাবে সেটা পরে বিবেচনা করা হবে। সেরেস্তাদার যেন তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন।

বেণীবাবুর সে কী উল্লাস! তিনি আরো একবার পায়ে পড়তেই আমি তাকে দুই হাতে করে তুলে ধরি। বলি, 'আমার মনে তখন থেকেই একটা খেদ ছিল যে আমি সুবিচার করিনি। বেত্রদণ্ড দিলেও নিজের হাতে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে আপনার বদলীর জন্যে আমি দায়ী নই, বেণীবাবু। বদলী রদ করে যদি আপনার কিছু উপকার করে থাকি সে একপ্রকার শোধবোধ। তবে একটা বিষয়ের জন্যে আপনাকে মনে থাকবে। আমারও সংশোধনের দরকার ছিল। আমি ছিলুম চণ্ডাশোক। সেদিন রাগের মাথায় রিভলভার দিয়ে কী যে কাণ্ড করতে যাচ্ছিলুম ভাবলেই মাথা হেঁট হয়ে যায়। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, বেণীবাবু। আর ভুলে যাবেন।'

আঙিনা বিদেশ

অসুখের খবর শুনে অধিরথ একদিন দেখতে আসে। বলে, 'বৌদি, দাদার নাকি অসুখ। কী হয়েছে। কেমন আছেন।'

'জ্বর। বেশি নয়, কিন্তু থেকে থেকে বলে উঠছেন—কী বলছেন তা তুমি ওঁর ঘরে গেলেই শুনতে পাবে। কিন্তু বেশিক্ষণ থেকো না। বেশি কথা বলতে দিয়ো না। ডাক্তারের বারণ।' বৌদি সংসারের কাজে মন দেন।

অধিরথ দাদার শোবার ঘরে ঢুকে দেখে তিনি চোখ বুজে শুয়ে আছেন। পায়ের শব্দ শুনে চোখ মেলে বলেন, 'কে! অধিরথ! ডোন্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।'

অধিরথ ঠাওরায় ওটা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ। কিন্তু দাদার কপালে হাত দিলে বোঝা যায় সামান্য গরম। অত কম টেম্পারেচারে কেউ প্রলাপ বকে?

'কেমন বোধ করছেন, দাদা! আমি তো দেখছি জ্বর খুব কম।' অধিরথ বলে।

'ঘুষঘুষে জ্বর। আসছে আর যাচ্ছে। ছাড়ছে না। সেইজন্যেই তো ভাবনা। কিন্তু ভেবে ফল কী? ডোন্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।' দাদা অধিরথের হাতে হাত রাখেন।

অধিরথ আশ্বাস দিয়ে বলে, 'সেরে যাবে।'

'তা তো যাবেই। সেইজন্যেই তো বলি, ডোন্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।'

'ওর মানে কী হলো, দাদা!' অধিরথের ধাঁধা লাগে।

'কেন, ও তো সোজা ইংরেজী। ফ্রেট মানে কী তা কে না জানে। আর পমফ্রেট যদি না খেয়ে থাকিস তবে বলি, ওটা একরকম সমুদ্রের মাছ।'

'হ্যাঁ, খেয়েছি। বেশ লাগে। কিন্তু ফ্রেট না করে পমফ্রেট খাব কেন? আরো তো পাঁচ রকম মাছ আছে।' অধিরথ তর্ক করে।

'দূর, বোকা! ওটা যে একটা মন্ত্র।' দাদা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন।

'মন্ত্রেরও তো একটা সংলগ্নতা থাকে। না এটাও একটা হিং টিং ছট!' অধিরথ কৌতূহলী হয়।

দাদা এবার বালিশে হেলান দিয়ে বসেন। বলেন, 'পমফ্রেট নামে একটা সমুদ্রগামী লঞ্চ ছিল। আমার জীবনে তার নাম চিরস্মরণীয়। যখনি অকূল পাথারে পড়ি, কূলকিনারা দেখতে পাইনে, তখনি মনে পড়ে যায় ওর নাম। সেবারে যেমন অলৌকিকভাবে উদ্ধার পাই এবারেও তেমনি পাব, এই ভেবে মনটাকে শক্ত করি। হতাশ হবার মতো এমন কী হয়েছে? ডোন্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।'

'হতাশ হবার মতো এমন কী হয়েছে?' অধিরথ কাতরভাবে বলে, 'বাংলাদেশ যার নাম রাখা হয়েছে সেখানে বাঙালী বলে কেউ থাকছে কি? হয় পালিয়ে আসছে, নয় গুলী খেয়ে মরছে। শুনছি দেড় কোটি লোক না খেয়ে মরবে।'

ভদ্রলোকের এক কথা। 'ডোন্ট ফ্রেট। পমফ্রেট। হতাশারও শেষ আছে।'

'আর এপারেও তো মানুষ বলে কেউ থাকছে না। হয় ক্রিমিনাল নয় কাওয়ার্ড। হতাশ হব না তো কী হব, দাদা?' অধিরথ করুণস্বরে বলে।

'তবু আশা রাখতে হবে। ডোন্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।' দাদা অভয় দেন।

'বল, মা তারা, দাঁড়াই কোথা?' অধিরথ দুঃখ করে। 'দিল্লী গিয়ে দেখি পদে পদে ঘুষ, পদে পদে খোশামোদ। কেউ ফেলছে কড়ি, কেউ মাখাচ্ছে তেল। দিল্লী সেই মোগল রাজত্বের শেষভাগের দিল্লী।'

'ডোন্ট ফ্রেট। পমফ্রেট।' বলে দাদা আবার এলিয়ে পড়েন। বোঝা গেল তাঁর আবার মনে লেগেছে। তাপ বেড়ে যাবে না তো!

'থাক, দাদা, ওসব পরে হবে। আগে তো আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। দিন সাতেক বাদে আবার আমি আসছি। তখন পমফ্রেটের গল্পটা শোনাবেন। শুনতে বড়ো কৌতূহল হচ্ছে।' অধিরথ আর ওঁকে বেশি কথা বলতে দিতে চায় না।

'সমস্তটা যদি বলতে যাই অফিসিয়াল সীক্রেট ফাঁস হতে পারে। যদিও দেখছি রুই কাতলারা সরকারের হাঁড়ির খবর ছড়াচ্ছেন, কারো গায়ে আঁচই লাগছে না। আমরা চুনোপুঁটি, তবু ইতিহাসের একটি গুরুত্বসম্পন্ন সন্ধিক্ষণে গুরুভার বহন করতে মনোনীত হয়েছি।' দাদা আবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েন।

পরে একদিন দাদা পমফ্রেটের কাহিনী শোনান।

।। দুই ।।

আমাদের জীবনে ওই তিনটি বছরের তুলনা নেই। উনিশ শো ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ আর আটচল্লিশ। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে আমি শুধু সাক্ষী বা সাক্ষীগোপাল। রঙ্গমঞ্চে আমার কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু সাতচল্লিশ সালের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন টেলিফোন এল, ফতেয়াবাদ জেলার শাসনকর্তা করে আপনাকে পাঠানো হচ্ছে। 'না' বলবেন না। আমরা আর লোক খুঁজে পাচ্ছিনে।

ফতেয়াবাদ চিরকাল শান্তিপূর্ণ ছিল, তেমনি তার পার্শ্ববর্তী ননদিয়া, তেমনি তার অপর পারের রানীমহল। ইদানীং ওদের মাঝখানে একটা লাইন টেনে বলা হয়েছে এর নাম আন্তর্জাতিক সীমান্ত। তাই বর্ডার জুড়ে অশান্তি।

তা ছাড়া রাম রহিমের বিবাদ তো আছেই। এতদিন আমরা বলতুম ওটা তৃতীয়পক্ষের কারসাজি, এখন রাম বলে ওটা রহিমের শয়তানী আর রহিম বলে ওটা রামের দুশমনি। যেন নিজের কোনো দোষ নেই। যেন একহাতে তালি বাজে।

তোর বৌদির একেবারেই ইচ্ছে ছিল না কলকাতা ছাড়তে, আঠারো বছর চাকরির পর এই প্রথম আমরা কলকাতায় থাকবার সুযোগ পেয়েছি, এখনো গুছিয়ে বসতে পারিনি, মাত্র চার মাস কাটিয়েছি। আবার বদলী! কিন্তু আমার ইতিহাসবোধ আমাকে মন্ত্রণা দেয় যে, অ্যাকশন যদি দেখতে চাও তো এই তোমার সুযোগ। তুমিও একজন অ্যাকটর। তুমি নিষ্ক্রিয় দর্শক বা সমালোচক নও।

প্রত্যেকটাই আমার পুরোনো জেলা। যেমন ফতেয়াবাদ তেমনি ননদিয়া তেমনি রানীমহল। আমাকে না চেনে কে? আর আমিই বা কাকে না চিনি? মিলনের দূত আমি ছাড়া আর কে হতে পারে? যাই যখন তখন এই ছিল আমার স্পিরিট। আমি যুদ্ধ করতে যাইনি, সন্ধি করতেই গেছি। রানীমহলের যিনি শাসক তিনি আমারই সিনিয়র ডেপুটি ছিলেন, দু'জনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। আর ননদিয়ার শাসকও একদা আমার সহযোগী ছিলেন। যদিও তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

দেখলুম কেউ আর কাউকে এক দেশের লোক বা আপনার লোক বলে ভাবে না। 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।' এপারের লোকের কাছে ওপারের লোক বিদেশী। ওপারের লোকের কাছে এপারের লোক বিদেশী। সেই একই জেলা, সেই একই মানুষ, তবু অদ্ভুত এক ভানুমতীর খেল একদলকে বানিয়েছে আরেকদলের চোখে বিদেশী।

'সার, আপনি ওপারের লোকের সঙ্গে সাবধানে কথা বলবেন। ওরা বিদেশী। ওরা তো এই জেলাটাকে পাকিস্তানের শামিল করতেই চেয়েছিল, এখানে মুসলমান বেশি কিনা। প্রথমে তো

ওদের ভাগেই পড়েছিল। সে সময় ওদের মূর্তি যদি দেখতেন! আর এখানকার মুসলমানদের স্ফূর্তি! সব পঞ্চম বাহিনী। একজনকেও বিশ্বাস নেই। প্রত্যেকের ধারণা এ জেলা আবার পাকিস্তানের শামিল হবে। তলে তলে চক্রান্ত চলেছে। জানেন সার, রোজ রাত্রে এ শহরে ওপারের ট্রাক আসে, মালপত্র পাচার করে নিয়ে যায়।' পুলিস অফিসার বলেন।

ফতেয়াবাদ যেন আমাদের আলসাস লোরেন। একবার জার্মানী নেয় তো একবার ফ্রান্স ফিরে পায়। তাই নিয়ে মন কষাকষির বিরাম নেই। কেউ মন থেকে ছাড়বে না। সুযোগ পেলেই যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।

দেশভাগের পর যেমন দু'দল বিদেশীর তথা পঞ্চম বাহিনীর আবির্ভাব হয় তেমনি মাল পাচারকারীর। হিন্দু মুসলমান এক দিল হয়ে নতুন একটা ইণ্ডাস্ট্রি পত্তন করে। এমন তাদের কর্মকৌশল যে ওপারের মুসলমান এপারের হিন্দুকে সিগন্যাল দেয় আর এপারের হিন্দু ওপারের মুসলমানকে সিগন্যাল দেয়। দেশ ভুলে, ধর্ম ভুলে দু'পক্ষই দুই রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে সিঁদ কাটে। রাতের বেলাই ওদের কর্মতৎপরতা।

একদিন পদ্মাতীরে রাত কাটিয়ে স্বচক্ষে দেখে এলুম তাদের সিগন্যালের বাতি। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ছেড়ে দেয়। তখন হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। হিন্দী পাকী ভাই ভাই। ধরতে পারে কার সাধ্য! ধরা কারই বা স্বার্থ। সরষের ভিতরেই ভূত। একজন কর্তাব্যক্তি বলেন, 'আমরা কাপড় না যোগালে ওরা কাপড় পরবে কী করে? ভুলে যাবেন না ওদের অনেকেই হিন্দু। শাড়িই তো যাচ্ছে বেশির ভাগ।'

চালের বেলাও সেই একই যুক্তি। 'আমরা চাল না যোগালে ওরা খাবে কী? ভুলে যাবেন না ওদের অনেকেই হিন্দু।' এমনি প্রত্যেকটি বিষয়ে।

এদিকে আবার তারস্বরে চিৎকার। চাল পাওয়া যায় না, চিনি পাওয়া যায় না, কাপড়ের দাম আগুন। যোগাতে যদি না পারি তো ধর্মঘটের হুমকি। কয়েকটা অর্ডিনান্স তখনো বলবৎ ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্যে নয়। আমরা বেগতিক হয়ে এই পরিস্থিতিতেও প্রয়োগ করি। তখন ব্যবসাদারদের কোপদৃষ্টিতে পড়ি। কেউ কেউ তো খোলাখুলি শুনিয়ে দিয়ে যান যে বলবেন নিদান রায়কে।

একদিকে চক্রান্ত, আরেকদিকে কুচক্র। মাঝখানে আমি। দিনরাত ভূতের মতো খাটি। আর খাটাই। সত্যি আমার সরকারী সহযোগীদের তুলনা হয় না। ভারত পাকিস্তান সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাঁদের অনেকের মতভেদ ছিল। কিন্তু আমার নির্দেশ তাঁরা শিরোধার্য করতেন। কী জানি কেন আমার উপর তাঁদের অগাধ আস্থা ছিল। উপরওয়ালাদের বেলা কিন্তু আমি অতটা নিশ্চিত ছিলুম না।

আসলে হয়েছিল এই যে দিল্লীতে করাচীতে একপ্রকার দাবাখেলা চলেছিল, তার জের কলকাতায় আর ঢাকাতে। তারই জের ফতেয়াবাদে আর রানীমহলে। আমরা নিমিত্তমাত্র। তবু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তো ছিল। সেটা আমি প্রাণপণে গার্ড করেছি। একেবারে ঘোড়ে বনে যাইনি।

একদিন সীমান্ত পরিদর্শনে যাই। সঙ্গে পুলিসম্যান। দু'জনের চোখে বাইনোকুলার। দেখতে পাই ওপারে রানীমহল শহর। আমার পুরাতন কুঠি। চোখে জল আসে।

'দেখছেন, সার, দেখছেন। কুঠির গেটের দু'ধারে দুটো কামান বসিয়েছে। গোলা ছুঁড়লে এপারেও এসে পড়বে। পদ্মা যদিও খুব চওড়া তবু কামানের পক্ষে কিছু নয়। এর একটা উত্তর দিতে হবে। আমাদেরও কামান থাকা চাই।'

তখন কি ছাই জানতুম যে ও দুটো মোগল আমলের কামান! সাজিয়ে রাখা হয়েছে শখ করে।

কিন্তু কথাটা সিরিয়াসভাবে নিই।

এর পরে শোনা গেল যে ওদের একখানা লঞ্চ আছে। লঞ্চে করে এক বিহারী মুসলমান অফিসার প্রতিদিন নদীবক্ষে পাহারাদারি করে বেড়ান। আমাদের সওদাগরি নৌকা চলাচলে বাধা দেন। একে আটকান, ওকে পাকড়ান, তাকে চালান দেন। তাঁর মতে ওটা পাকিস্তানের সীমানাভুক্ত নদীস্রোত।

নদীর মাঝখান দিয়ে দুই জেলার সীমান্তরেখা ছিল, এখন সেটা হয়েছে দুই রাষ্ট্রের সীমান্তরেখা। মানচিত্র মেনে চললে নদীর যে অংশে লঞ্চ যাতায়াত করে, স্টীমার যাতায়াত করে, যেটা বর্তমান মুখ্যস্রোত বলে গণ্য তার সবটাই আমাদের এলাকা। আমাদের এলাকায় আমাদেরি নৌকা আটক করবে এতো একপ্রকার আক্রমণাত্মক কর্ম।

চিঠি লিখে জবাব পাওয়া গেল যে, ওঁদের মতে দেশ যখন অবিভক্ত ছিল তখনকার আইন এখন খাটে না। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে মুখ্যস্রোত যেখান দিয়েই প্রবাহিত হোক না কেন তার অর্ধেকটা পাকিস্তানের, অর্ধেকটা ভারতের। ঠিক মধ্যিখানে একটা লাইন টানলে দেখা যাবে যে লঞ্চ সে লাইনের বাইরে যায়নি, নিজের এলাকার ভিতরেই থেকেছে। সীতাদেবীই গণ্ডী অতিক্রম করেছেন, রাবণ রাজা তা করেননি। রাবণের এলাকায় পা দিলে রাবণ তো ধরে নিয়ে যাবেই।

আমি তো শুনে থ। মাটির উপর লাইন টানতে পারা যায়, জলের উপর টানা যায় কি? হয়তো বয়া ভাসিয়ে রেখে একটা আন্দাজী সীমানা দেখানো যায়। কিন্তু তাতেও কি এই উৎপাত থামবে?

দু'তরফের যেমন যুদ্ধং দেহি মনোভাব তাতে আমাদের মাঝিমাল্লাদের কোনোরকম প্রোটেকশন দেওয়া যাবে না। জোর যার নদীপথ তার। নৌকার চেয়ে লঞ্চেরই জোর বেশি। তাই লঞ্চের উত্তর হচ্ছে লঞ্চ। গান-বোটের উত্তর হচ্ছে গান-বোট। সমুদ্রপথ হলে বলা যেত, ক্রুজারের উত্তর হচ্ছে ক্রুজার। ব্যাটলশিপের উত্তর হচ্ছে ব্যাটলশিপ।

উপরে লিখলুম যে ঢাকার সঙ্গে তর্ক করে কোনো ফল হবে না, করাচীও তার সঙ্গে সুর মেলাবে। চাই একখানা লঞ্চ। আমাদেরও লঞ্চ আছে দেখলে এ আপদ থামবে। আমরা অবশ্য ওদের নৌ চলাচলে বাদ সাধব না। নদী হয়েছে অবাধ নৌ চলাচলের জন্যে। আমরা সেটা মানব। ওরা যদি না মানে তবে আমরাও পেছপা হব না।

তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল, সেটা আরও গুরুতর। সেই যে বলে, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর, তেমনি এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর। কয়েকটা চর মানচিত্র বা খতিয়ান অনুসারে ফতেয়াবাদে পড়ে। এপারের লোক সেসব চরে ধান বোনে, ধান কাটে। অন্যান্য ফসল ফলায়, ফসল আনতে যায়। পাকিস্তানের যুক্তি যদি যথার্থ হয় তা হলে তো চরে যাওয়া আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ আর নৌকায় করে যেতে পারবে না।

আমার বন্ধু যতদিন রানীমহলের জেলাশাসক ছিলেন ততদিন তাঁর আশ্বাসের মূল্য ছিল। তিনি বলেছিলেন চাষীরা যে যার ফসল কেটে আনতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না। স্থিতাবস্থা রক্ষিত হবে। সেই বাঙালী মুসলমান অফিসারটিকে বদলী করা হলো ঢাকায়। তাঁর জায়গায় এলেন এক পাঞ্জাবী মুসলিম অফিসার। তাঁর কাছে আমি দরবার করতে নারাজ ছিলুম। তাই লঞ্চের জন্যে চাপ দিই। চাপ না দিয়ে উপায়ও ছিল না। একদিন একটি চাষী মুখ কালো করে বলে যে ওর কাটা ফসল এপারে আনতে দেওয়া হচ্ছে না। ওটা নাকি পাকিস্তানের। চাষীটি এপারের মুসলমান।

আগেকার দিনে ফুলনা ছিল অধিকাংশ লঞ্চের ঘাঁটি। দেশভাগের সময় ফুলনা পড়ে আমাদের ভাগে, তাই লঞ্চগুলো সময় থাকতে আমরা সরাইনি। কারো মাথায় আসেইনি ওকথা। পরে ফুলনা

যায় পাকিস্তানে আর লঞ্চগুলি বেহাত হয়। ওরা আমাদের লঞ্চের ভাগ আমাদের দেয় না।

একখানি মাত্র লঞ্চ ছিল কলকাতায়। সেখানাই আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। কিন্তু সে আবার মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে যায়। ভাগীরথীতে জল নেই। ভাগীরথী উজিয়ে আসতে পারলে তো পদ্মায় পড়বে? আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, এমন সময় একদিন খবর পাই ভাগীরথীতীরে আমার কুঠির ঘাটে একখানা লঞ্চ এসে ভিড়েছে। ছুটে গিয়ে দেখি সমুদ্রগামী লঞ্চ। নাম তার 'পমফ্রেট'। ওটা অসামরিক ব্যবহারের জন্যে নয়, নেভী থেকে আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে সাময়িকভাবে। পরিচালনা করে নিয়ে এসেছিলেন যিনি তিনি একজন নেভাল অফিসার। ক্যাপটেন মালিক। আমার হাতে সঁপে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার আগে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে দেন। আমি লক্ষ করি যে পাটাতন লোহা কিংবা দস্তা কিংবা সেইরকম কোনো এক ধাতু দিয়ে মোড়া। তাই নদীর জলে লঞ্চ চলে কচ্ছপের গতিতে। তা ছাড়া এত রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে ভরা যে পা ছড়াবার ডেক নেই, ক্যাবিন মাত্র একটিই, তাতে আরাম করে থাকা যায় না। তাই লঞ্চ ছেড়ে দিই সারেং টাণ্ডেল সুখানীর হাতে। ওরাই নিয়ে যায় পদ্মায়।

'করেছেন কী, সার। বেড়ালকে দিয়েছেন মাছের ভার। জানেন না ওরা হচ্ছে কেয়াখালীর মুসলমান লস্কর। নিমক খায় এদেশের, কিন্তু প্রাণ পড়ে রয়েছে ওদেশে। দেখবেন লঞ্চ পৌঁছে দিয়েছে রানীমহলে।' ভয় দেখান আমার এক সহযোগী।

'ওরা তো কখনো বেইমানি করেনি। করবেও না।' আমি ভয় পাইনে।

ওয়ারলেসে বার্তা পাওয়া গেল পমফ্রেট যথাকালে তালগোলা ঘাটে নোঙর করেছে। পুলিস চার্জ নিয়েছে। বাঁচলুম। কিন্তু নিষেধ করতে ভুলে গেলুম যে কেউ যেন আমার বিনা হুকুমে ও লঞ্চ ব্যবহার না করে।

পরে একদিন হতবাক হয়ে যাই শুনে, পমফ্রেট বিদেশী লঞ্চের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন এক চড়ায় আটকা পড়েছে।

কী সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি ছুটে যাই। গিয়ে শুনি মহকুমা হাকিমও তাঁর দলবল নিয়ে নড়াতে পারেননি। ডাঙায় থাকা হাতীর পায়ে শিকল বেঁধে, তা দিয়ে লঞ্চের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে হাতীকে দিয়েও নড়াতে পারেননি। অবশ্য হাতীটা লঞ্চের চেয়ে কমজোরী। লোহায় মোড়া লঞ্চ কিনা। আসলে লঞ্চের গুরুভারই হয় তার কাল। হালকা লঞ্চ চড়ায় বেধে যেত না। বিদেশী লঞ্চ তো বেধে যাচ্ছে না।

'গুপ্ত চর নয়। গুপ্তচর!' সহযোগী বলেন। 'সাবোটাশ। তখনি তো মনে রাখা উচিত ছিল যে ওরা কেয়াখালীর মুসলমান। ওদের কাছে ও ছাড়া আর কী প্রত্যাশা করা যায়? আপনি হিন্দু লস্কর আনিয়ে নিন। দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়।'

আমি লস্করদের কোনো দোষ দেখতে পাইনে। লঞ্চ তো ওরা বার করেনি। যিনি বার করতে বলেন তিনি একজন অফিসার। হিন্দু।

টেলিফোনে উপরে রিপোর্ট করি। সাহায্য চাই। উপর থেকে একদল একসপার্ট আসেন। তাঁরা লঞ্চ পরীক্ষা করতে গিয়ে দিশাহারা হন। ওঁদের নৌকা ভেসে যায় মাঝ নদী ছাড়িয়ে। তখন বিদেশীরা এসে ওঁদের পাকড়াও করে রানীমহলে নিয়ে যায়। আর আমি সে বার্তা পেয়ে সোজা কলকাতা চলে গিয়ে সেক্রেটারিয়েটে হাজির হই। নার্ভাস অবস্থায়।

'হিটলারের ডিভিজনকে ডিভিজন সৈন্য খোওয়া গেল, তাঁর নার্ভ বিগড়ায়নি। আমাদের খোওয়া গেছে একদল একসপার্ট। অত সহজে নার্ভ বিগড়াবে।' হেসে বলেন চীফ সেক্রেটারি।

লেখালেখির ফলে একসপার্টদের ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু লঞ্চ পড়ে থাকে ভীষ্মের মতো

শরশয্যায়। পাহারা মোতায়েন থাকে লঞ্চের উপরে ও ঘাটে। যাতে লঞ্চটাও খোওয়া না যায়। তার চেয়ে বিপদের কথা লঞ্চ যদি আপনা থেকে ভেসে যায় পদ্মা থেকে মেঘনায়, মেঘনা থেকে বঙ্গোপসাগরে। তখন শত লেখালেখিতেও ফেরত পাওয়া যাবে না। সমুদ্রের মাছ সমুদ্রেই মিলিয়ে যাবে।

রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখি। পমফ্রেট চালান হয়েছে পাকিস্তানের পাক ঘরে, সেখান থেকে পাকিস্তানের পাকস্থলীতে। না, ওরা তাকে ব্যবহার করছে আমাদেরি বিরুদ্ধে। আমার শিল আমার নোড়া আমারি ভাঙে দাঁতের গোড়া। না, পমফ্রেট পালিয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে, সেখানেই হারিয়ে গেছে। ফিরবে না পমফ্রেট।

এর সঙ্গে জড়িয়েছিল প্রেসটিজের প্রশ্ন। এর পরে কি আমি রানীমহলের শাসকের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলতে পারব? না, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। পমফ্রেট যেন আমার নিজের সম্মানের প্রতীক। ওকে যেমন করে হোক উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু কী করে?

চরের সমস্যাটা ইতিমধ্যে আর সব সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। যা ওদের নয় তা ওরা গায়ের জোরে দখল করে ভোগ করবে। আমাদের চাষীদের আমরা প্রোটেকশন দিতে পারিনে। দিতে পারিনে গয়লাদেরও। যারা চরে নিয়ে গিয়ে গোরু ছেড়ে দেয়। প্রচুর ঘাস। আবহমানকাল যারা এসব অধিকার প্রয়োগ করে এসেছে আজ দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলে তাদের অধিকারও হাওয়া হয়ে গেছে কী করে মেনে নেব একথা? তারা এখন বিদেশী বলে তাদের প্রবেশ মানা, এটাই বা কেমন কথা?

আমি পার্টিশন কামনা করিনি। তবে এটাও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম যে গৃহযুদ্ধ যদি হিন্দু মুসলমানের ধর্মযুদ্ধের মোড় নেয় তা হলে মুসলিমপ্রধান এলাকায় কোনো হিন্দুই নিরাপদ নয়, সে হিন্দুপ্রধান এলাকায় আশ্রয় নেবেই। তেমনি হিন্দুপ্রধান এলাকায় কোনো মুসলমানই নিরাপদ নয়, সে মুসলিমপ্রধান এলাকায় আশ্রয় নেবেই। এমনি করে এক একটি এলাকায় বাস করবে কেবলমাত্র মুসলমান বা কেবলমাত্র হিন্দু। তা হলে তো হিন্দুস্থান পাকিস্তান আপনা হতেই ঘটে গেল। সমগ্র দেশের উপর কংগ্রেসের বা সমগ্র প্রদেশের উপর মুসলিম লীগের একচ্ছত্র রাজত্ব চলতে পারে না। ইংরেজ বিদায় নিলে তো স্বতঃস্ফূর্ত পার্টিশন অবধারিত। আগে ধর্মযুদ্ধ ঠেকাও। সে সাধ্য কি কারো আছে? দুই পক্ষই যে বদলা চায়। না, হিন্দুরাও এর ঊর্ধ্বে নয়। কাজেই পার্টিশন সহ্য করতেই হবে।

পার্টিশন সহ্য করতে হলো এইজন্যেই যে লোকবিনিময় কারো পক্ষে হিতকর নয়। ওটা বন্ধ করতে হবে। যে যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে ও নিরাপদে থাকবে। ফতেয়াবাদে মুসলমান বেশি খুলনায় হিন্দু বেশি। তা হোক, ওরা সমান নিরাপদ। রাষ্ট্র এখন থেকে আর হিন্দু স্বার্থ মুসলিম স্বার্থ দেখবে না, দেখবে নাগরিকমাত্রেরই স্বার্থ।

।। তিন ।।

এসেছিলুম আমি শান্তির দূত, মিলনের দূত হয়ে। হয়ে দাঁড়ালুম তার বিপরীত। চর অপারেশনের জন্যে আমি রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হই। তাঁরা বলেন, এ তো আন্তর্জাতিক ব্যাপার। মিলিটারি ভিন্ন কে এর মোকাবিলা করবে? সেইসূত্রে ছোট বড় অনেক মিলিটারি অফিসার চর পরিদর্শনে

আসেন। লেফটেনাণ্ট জেনারল, ব্রিগেডিয়ার, লেফটেনাণ্ট কর্নেল, মেজর। এমনি বিবিধ র‍্যাঙ্কের। মিলিটারির সঙ্গে এর আগে কখনো এতবেশি দহরম মহরম করতে হয়নি। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

সেসব কথা আজ নয়। আজ শুধু এইটুকু বলি যে যুদ্ধ জিনিসটা একবার যারা দেখেছেন তাঁরাই সব চেয়ে যুদ্ধবিরোধী। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে আর্মির লোক যখন পেশাদার সৈনিক তখন ওরাই তো সব চেয়ে যুদ্ধপাগল সেটা সম্পূর্ণ ভুল। যুদ্ধপাগল যদি কেউ থাকে তো তারাই, যারা কখনো যুদ্ধক্ষেত্রের ধারে কাছেও যায়নি।

ব্রিগেডিয়ার ছিলেন আমাদের হাউস গেস্ট। তোর বৌদিকে বলেন, 'দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধে আমি নানা দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়েছি। তার ফলে আমিই সব চেয়ে অহিংসাভক্ত। আমার কথা শুনুন, আপনার স্বামীকেও বলুন, ননভায়োলেন্স ইজ বেস্ট।'

এর পর লেফটেনাণ্ট জেনারল বলেন আমাকে, 'খান তিনেক চর দখল করা ইণ্ডিয়ান আর্মির পক্ষে ছেলেখেলা। কিন্তু সেই ছেলেখেলায় যদি একজন জওয়ানও নিহত হয় তা হলে গোটা আর্মির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। অমনি বেধে যাবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। আপনি কি চান যে আমরা তার ঝুঁকি নিই? আমার পরামর্শ শুনুন, আর্মির আশা ছেড়ে দিন। তার চেয়ে রাজ্য সরকারের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীকে ও ভার নিতে আহ্বান করুন।'

মহাভারতের যুগে পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। এ যুগে কি তিনখানা চর নিয়ে আর-একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে? আর আর্মিই হবে তার নিমিত্ত? কখনো না। আমি রাজ্য সরকারকে বলে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী আনাই। তাদের সঙ্গে আসে রকমারি অস্ত্র। ওরা যেন আধা মিলিটারি।

তা দেখে আমাদের পুলিস সাহেব বলেন, 'সার, পুলিস কি মরতে এসেছে? খবরদার! একজনও পুলিসের লোক যদি মরে তবে যেখানে যত পুলিস আছে ধর্মঘট করবে।'

তাঁকে এমন আবেগের সঙ্গে কথা বলতে আর কখনো দেখিনি। যেখানে সারা দেশের মর্যাদা নিয়ে টানাটানি সেখানে একজন সিপাহীর প্রাণহানিটাই কি বড়ো হলো? কারো প্রাণহানি হোক এটা আমার কাম্য নয়, এমন কি অপর পক্ষের প্রাণহানিও না। কিন্তু যদি হয় তা হলে কি পুলিসের সবাই অসহযোগ করবে?

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, সার।' তিনি বলেন, 'পুলিসের কাজটা ছিল চোর ডাকাত ধরা। ধরেছি। তারপর হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল করা। করেছি। তারপর হলো টেররিস্টদের সঙ্গে লড়া। লড়েছি। তারপর হলো কমিউনিস্টদের রোখা। রুখেছি। এখন শুনছি কিনা ভিন্ন রাষ্ট্রের সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে গুলী বিনিময় করতে হবে। এও কি পুলিসের কাজ? চাকরিতে ভর্তি করবার সময় সরকার কি বলেছিলেন একথা?'

ইতিমধ্যে আরো খান ছয় সাত লঞ্চও এসে হাজির। সব নেভী থেকে। তাদের সাধারণ নাম ট্যানাক। অপরূপ গড়ন। কিন্তু পমফ্রেটের মতো ভারী নয়। জল কাটে না অত। গঙ্গা যেখান থেকে পদ্মা হয়ে গেছে তার পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় তাদের রাখি। হ্যাঁ, লস্কররা সবাই মুসলমান। ওই কেয়াখালী ভাটিগাঁ অঞ্চলের।

'আপনার গোটা নৌবহরটাই না একদিন ফেরার হয়, সার।' রহস্য করেন এক সহযোগী। 'আরেকদিন ফিরে আসবে পাকিস্তানী গান-বোট বহর হয়ে।'

কিন্তু ওছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। এক একটি লঞ্চের সঙ্গে এক এক দল সারেং টাণ্ডেল দীর্ঘকাল ধরে সংশ্লিষ্ট। ওসব লঞ্চ অকেজো হয়ে যায় ওরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়। ওদের চাই বলেই তো আমরা সেকুলার স্টেট বরণ করেছি। এ রাষ্ট্রে ওদেরও সমান অধিকার ও স্বার্থ। প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আমাদের জাতীয় সম্পদ। প্রত্যেকেই মূল্যবান।

বর্ডারের চাষীরা অধিকাংশই মুসলমান। চরে গিয়ে চাষ করে তারাই। তাদেরই ফসল বিপন্ন। তাদের স্বার্থেই তো আমার চর অপারেশন। নইলে কী আসে যায় আমার? তা বলে লঞ্চ আমি বেহাত হতে দেব না। প্রায় প্রত্যেকটাতে ওয়্যারলেস ফিট করা ছিল। নিয়মিত বার্তা আসত, সব ঠিক আছে।

পমফ্রেটকে আমি খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলুম। তা সত্ত্বেও আমার ভাবনার বিরাম ছিল না। এটা যদি পাকিস্তানের হাতে পড়ে তো দেমাকে ওদের আর মাটিতে পা পড়বে না। ট্রোফি হিসাবে প্রদর্শন করবে ওরা। আর যদি ইঞ্জিন ফেল করে সমুদ্রে ভেসে যায় তো লড়াই করেও ফিরে পাওয়া যাবে না।

এ সঙ্কটের অবসান ঘটায় উত্তরপ্রদেশের গঙ্গায় অসময়ে বন্যা। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! একদিন রেডিওগ্রাম পাই, 'পমফ্রেট উদ্ধার হয়েছে।' ছুটে যাই দেখতে। দেখি তালগোলা ঘাটে নোঙর করেছে। শুনি সারেং টাণ্ডেলরা বন্যার পূর্বাভাস পেয়ে লঞ্চে উঠে বসেছিল। পমফ্রেট ভেসে উঠতেই ইঞ্জিন চালিয়ে দেয়। মানুষকে ধর্মমতের দরুন অবিশ্বাস করতে নেই। যাকে রাখো সেই রাখে।

যে বাঁচায়

বাইরের বারান্দায় বসে খবরেব কাগজ পড়ছি। হিটলারকে নিয়েই ভাবনা। কোন্‌দিন না যুদ্ধ বাধিয়ে বসেন! হঠাৎ কানে আসে ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ। চেয়ে দেখি ঘোড়া আমার কম্পাউণ্ডে ঢুকে কুঠির রাস্তা ধরে ছুটে আসছে আমারি অভিমুখে।

ভেবেছিলুম বারান্দার সামনেই থামবে। ওমা! আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে উঠে আসে ধাপে ধাপে বারান্দার উপর। ভাগ্যিস বারান্দাটা ছিল যেমন দীঘল তেমনি চওড়া। নয়তো ঘোড়ার আক্রমণে আমাকেই ঘরে ঢুকতে হতো।

ঘোড়সওয়ার লাফ দিয়ে নেমে গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠুকে ডান হাত দিয়ে মিলিটারি স্যালিউট করে দাঁড়ান। বলেন, 'গুড মর্নিং, জজ। মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছিলুম। আপনাকে অমন নিবিষ্ট হয়ে কাগজ পড়তে দেখে মনে হলো কিছু একটা ঘটেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার পরে কী? রাশিয়া?'

হেসে বলি, 'গুড মর্নিং, হাফিজ। সপ্তদশ অশ্বারোহীর একজন মাত্রকেই দেখছি। বাকী ষোলজনকে কোথায় রেখে এলেন? সেবারে আপনারা বাংলা জয় করেছিলেন। এবার বাংলো জয় করবেন না তো?'

নবনিযুক্ত অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজ মেহেদী খান্ বুঝতে পারেন না যে আমি সাতশো বছর আগেকার পাঠান আক্রমণের কথা ভেবে বলছি। বুঝিয়ে দিতেই হোহো করে হেসে ওঠেন। তালগাছের মতো মাথায় উঁচু। বহরে ক্ষীণ। সারাক্ষণ খাকী শার্ট আর খাকী প্যাণ্ট পরতে ভালোবাসেন। সরল সাদাসিধে মানুষটি। বিনম্রতার প্রতিমূর্তি। গরিবের মা বাপ। নিজেও থাকেন গরিবী চালে।

'তারপর?' আমি রসিকতা করে বলি, 'মর্নিং ওয়াক বললেন যে! ওয়াক করে কে? মানুষ না ঘোড়া?'

'ঘোড়ারও কসরৎ চাই, জজ। একই সঙ্গে দুজনেরই কসরৎ হয়ে যায়।' বলে হাফিজ ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বসতে বললেও বসেন না। 'বে' রঙের বিরাট অশ্ব। লোভ হয় চড়তে। হাফিজ আমাকে আগেও সেধেছেন। আমি রাজী হইনি। অধঃপতনের ভয়ে। হাফিজ কিন্তু অকুতোভয়। ঘোড়াটাই ওঁকে ভয় করে। পাঠান কিনা।

'তা হলে আসুন, ভিতরে গিয়ে বসা যাক। এক পেয়ালা চা কি কফি? এনি ড্রিঙ্কস?' আমি অফার করি।

'মাফ করবেন, জজ। ওসব আমি খাইনে। আর এই যে ঘোড়া এরও তর সইবে না। তা হলে লড়াই এখন বাধছে না?' হাফিজ কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করেন।

'না, তেমন কোনো খবর দেখছিনে তো।' আমি উত্তর দিই।

ইতিমধ্যে জজ-গৃহিণীও বাইরে এসেছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে হাফিজ আর একটা মিলিটারি স্যালিউট ঠুকে দেন। 'গুড মর্নিং, মিসেস বিশ্বাস।'

'গুড মর্নিং মিস্টার খান্। বসবেন না?' তিনি অনুরোধ করেন।

'ঘোড়া বসতে চাইছে না যে। আমাকে মাফ করবেন।' বলে আরেকবার স্যালিউট ঠুকে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন হাফিজ। ঘোড়া এক পা এক পা করে সন্তর্পণে ধাপে ধাপে নেমে যায়। তারপর ছুটে অদৃশ্য হয়।

'অদ্ভুত লোক!' মন্তব্য করেন মিসেস। 'তোমাদের সার্ভিসে এমন আজব চিড়িয়া তো দেখিনি।'

'আলাপ হলে দেখবে মানুষ চমৎকার। কিন্তু চাকরিতে আমার মতো মিসফিট। ওঁর উচিত ছিল আর্মিতে যাওয়া। পথ ভুলে চলে এসেছেন সিভিল সার্ভিসে। তোমাকে বলা হয়নি যে এখানে আসবার সময় কলকাতায় এক বন্ধুর কাছে শুনি আমাদের সার্ভিসে একজন খাকসার যোগ দিয়েছে।' আমি আতঙ্কের ভান করি।

'খাকসার। তার মানে কী? সীক্রেট সোসাইটি?' তিনি হকচকিয়ে যান।

'না, মিলিটাণ্ট অর্গানাইজেশন। বন্দুক নেই বলে বেলচা হাতে নিয়ে কুচকাওয়াজ করে শুনেছি। ওদের আদর্শ আদিপর্বের ইসলাম। তারই অনুসরণে জীবনযাপন। হিংসা বাদে আর সমস্তই খুদাই খিদমদগারদের অনুরূপ। স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, কায়িক শ্রম, অল্পে সন্তোষ, নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে তুলনীয়।' আমি যতদূর জানি।

এই স্টেশনে আসার পর আমি আরো শুনেছিলুম যে হাফিজের বাসায় গোটাকয়েক চরকা আছে। নিজেও কাটেন, অপরকে দিয়েও কাটান। কেউ ভিক্ষা চাইতে গেলে বলেন, 'এস, একটু চরকা কাটা যাক। কিছু নিতে গেলে কিছু দিতে হয়। শ্রম দাও, মজুরি পাবে। ভিক্ষা নয়, বিনিময়।' যারা রাজী হয় তারা আশার অতিরিক্ত পায়। নারাজ হলে খালি হাতে ফেরে।

হ্যাঁ, অদ্ভুত লোক। কিন্তু খাসা লোক। হাফিজ কেমন করে জানতে পেরেছেন যে আমরাও চরকা কাটি। যদিও আর পাঁচজনকে নিয়ে নয়। যেটা হাফিজ প্রায়ই করেন। সেই থেকে আমার উপর ওঁর একটা অহেতুক পক্ষপাত জন্মেছে। তেমনি আমারও ওঁর উপর পক্ষপাত। হাফিজের পেছনে তাঁকে নিয়ে ক্লাবের সভ্যরা হাসি ঠাট্টা করলে আমিই তাঁর পক্ষ নিয়ে তর্ক করি। যে যার ধর্ম পালন করবে। হাফিজের ধর্মই হলো লোকসেবা। কেউ যদি মদ না খায়, সিগারেট না খায়, তাতে কার কী আসে যায়। কেউ যদি কোরানশরিফ আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলতে পারে তাতেই বা কার

কী ক্ষতি? হাঁ, মেহেদী একজন হাফিজ। ওটা ওব নাম নয়, উপাধি। কোবান ওঁব কণ্ঠস্থ।

লক্ষ কবি মুসলমানবাও ওঁকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন। ছোকবা যদি সামাজিকতা দুবস্ত না হয় তবে চাকবিটি কোনো মতে বাখবে, কিন্তু উন্নতি কববে না। ডিউটিতে অবশ্য খুঁত নেই। কিন্তু ডিউটিই কি সব? শুধু ডিউটি বাজিযেই কি প্রমোশন হযেছে কাবো? সঙ্গে চাই একটু পালিশ। মালিশও জুড়ে দিতে পাবো তাব সঙ্গে।

শবীবকে পটু বাখাব জন্যে হাফিজ নিযমিত টেনিস খেলতে আসেন ক্লাবে। আব কেউ না থাকলে আমবা দু'জনে—হাফিজ আব আমি—সিঙ্গলস খেলি। নযতো আমবা দু'জনে হই পার্টনাব। ডবলস খেলি। এমনি কবে আমাদেব চেনাশোনা জমে ওঠে। এক একদিন আমবা অপেক্ষমান সভ্যদেব খেলাব কোর্ট ছেড়ে দিযে পাযে হেঁটে নদীব ধাবে বেড়াতে বেবই। গল্প জমে ওঠে। হাফিজ প্রাযই ধর্মেব প্রসঙ্গ তোলেন।

'গীতা যখন পড়েন তখন কি আপনি একটানা পড়ে যান? না একটি শ্লোককে চিবিযে চিবিযে নিঃসত্ত্ব কবে পবিপূর্ণভাবে হজম কবে তাবপবে আব একটিতে দাঁত বসান?' হাফিজ একদিন আমাকে প্রশ্ন কবেন। যেন আমি কতবড়ো একজন ধার্মিক।

'আমি একটানা পড়ে যাই। মানে বুঝতে চেষ্টা কবি। তাব বেশি নয। একটি একটি কবে হজম কবতে গেলে বছব ঘুবে যাবে।' আমি কুণ্ঠাব সঙ্গে বলি।

'না না, ধর্মগ্রন্থ ওভাবে পড়তে নেই। পড়লে জ্ঞান হতে পাবে, উপলব্ধি হয না। আব উপলব্ধিই তো আসল।' হাফিজ শুধু মুখস্থ কবে ক্ষান্ত নন।

'আপনি কি হিন্দুদেব ধর্মগ্রন্থও পড়েন?' আমি আশ্চর্য হযে শুধাই।

'পড়ি বইকি। তাব থেকে প্রেবণাও মাঝে মাঝে পাই। তবে আমাব কাছে কোবানেব মতো আব কিছু নয। এব জন্যে আমাকে ক্ষমা কবতে হবে।' উত্তব দেন তিনি।

'ক্ষমাব কী আছে? আপনাব পক্ষে সেইটেই তো স্বাভাবিক।' আমি আশ্বাস দিই।

'কিন্তু আপনাদেব বিরুদ্ধে আমাদেব একটি অভিযোগ আছে, জজ। আপনাবা যখন ধ্বনি দেন হিন্দু মুসলমান এক হো তাব মানে কি এই নয যে, হিন্দু মুসলমান এক নয? হিন্দুত্ব ও ইসলাম এক নয। গীতা কোবান এক নয। যা এক নয তা এক হবে কী কবে? এক হতে পাবে কখনো? হিন্দু মুসলমান ববাববই দুই ছিল, ববাববই দুই থাকবে। তাদেব একত্বটা স্বপ্ন। তাদেব দ্বিত্বটা[*] বাস্তব। দ্বিত্ব যেমন কবে হোক বজায বাখতে হবেই, নইলে আমাদেব অস্তিত্ব লোপ পেযে যাবে। আপনাদেব কী? আপনাবা তো মেজবিটি।' বলতে বলতে হাফিজ গবম হযে ওঠেন। যেন ইসলাম বিপন্ন।

আমি ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা কবি যে, হিন্দু মুসলমান যেমন ধর্মেব দিক থেকে দুই তেমনি বাজনীতিব দিক থেকে এক। অর্থনীতিব দিক থেকে এক। ধ্বনি যখন দেওযা হয তখন ধর্মেব কথা ভেবে দেওযা হয না। বাজনীতি অর্থনীতিব কথা ভেবেই দেওযা হয।

'আঃ! সেইখানেই তো আপত্তি। যাবা ধর্মে ভিন্ন তাবা বাজনীতিতে এক হয কী কবে? অর্থনীতিতেই বা এক হয কী কবে? তাদেব বাজনীতি অর্থনীতিও দুই হবে। কাবণ ইসলাম তো কেবল একটা ধর্মমত নয, ইসলামেব আদিপর্বে বাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিও তাব অঙ্গীভূত ছিল। ইসলাম হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ জীবন। মুসলমানবা তো সুদ খাবে না। তাবা হিন্দুদেব সঙ্গে এক অর্থনীতিব শবিক হবে কী কবে? তেমনি, ইসলামী শবিযৎ যদি মানে তবে হিন্দুদেব সঙ্গে এক বাষ্ট্রেব নাগবিক হবে কী কবে?' হাফিজ আমাকে চেপে ধবেন।

আমি তো পাঠানেব হাত থেকে পবিত্রাণেব উপায খুঁজে পাইনে। বলি, 'এটা তো ঠিক যে,

আমরা একসঙ্গে সাতশো বছর বাস করেছি। দুপক্ষকেই কিছু কিছু ছাড়তে হয়েছে, কিছু কিছু নিতে হয়েছে। ধর্মে না হোক, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে। ভারতবাসী হিশাবে আমাদের একটা জাতীয় সত্তাও তো আছে।'

'সেখানেও আমার আপত্তি। ন্যাশনালিজম একটা নতুন ধর্ম। আপনারা সে ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন, আমরা কি পারি? আমরাও যদি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট হই তা হলে কি আরব ইরানী তুর্ক আফগানরা আমাদের কাছে এলিয়েন হয়ে যায় না? আমাদের প্রোফেটও কি তবে এলিয়েন? আপনাদের যেমন ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস আমাদেরও তেমনি হাফিজ সাদী রুমী। তাঁরাও কি আমাদের কাছে এলিয়েন? না, জজ, হিন্দু ভাইদের জন্যে আমরা আরব ভাইদেব ইরানী ভাইদের পর করে দিতে পারব না।' হাফিজ ছেলেটি অকপট।

'তা হলে কি আপনারা আপনাদের আরব ভাইদের জন্যে হিন্দু ভাইদেব পর করে দেবেন? ধর্ম এক নয় বলে কি দেশ এক হবে না? জাতি এক হবে না? কই, এসব তো আগে কখনো শুনিনি? এ কী কথা শুনি আজ মুসলিমের মুখে! আমরা দুই সম্প্রদায় হলেও একই দেশের সন্তান। আমাদের মাতৃভূমি এক।' আমি স্মরণ করিয়ে দিই।

এই হাফিজই পরে একদিন বলেন, 'আপনি এখনো বিশ্বাস করেন যে, আপনাদের সঙ্গে আমরা এক নেশন গড়ব? না, জজ, তা কখনো হতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান এক নয়, দুই। এই দ্বিত্বকে গোড়াতেই স্বীকার করে নিতে হবে। দ্বিত্বই যেমন প্রথম কথা দ্বিত্বই তেমনি শেষ কথা। হিন্দুই বলুন আর মুসলমানই বলুন ধর্মই জনগণের জীবন। এত যে তাদের দুঃখ কষ্ট মেহনৎ ও দারিদ্র্য সমস্তটাই সহ্য হচ্ছে ধর্মের জন্যে। ধর্মই তাদের শান্তি দেয়। ধর্মই তাদের মুখে হাসি ফোটায়। অথচ ধর্ম তাদেব এক নয়। দুই। ধর্ম দুই বলেই নেশনও দুই। এ যুক্তির আব খণ্ডন নেই, জজ। যদি ন্যাশনালিজম মেনে নিতে হয়।'

মুসলিম মানস কোন্ খাতে বইছে দূর থেকে তার আভাস পাচ্ছিলুম। কিন্তু অতটা পরিষ্কার আর কখনো হয়নি। আমি শিউরে উঠি। ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষ কি হিন্দু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র? না যুদ্ধ এড়াতে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ভূমি? তখনো জিন্নাসাহেব পার্টিশনের দাবী তোলেননি। কিন্তু ইকবালের মুখে পাকিস্তানের ধ্বনি উঠেছিল।

যাক, তার দেরি আছে। ইংরেজরা তো এখনি বর্জন করছে না। আমি বলি, দুই যেমন সত্য একও তেমনি। আমাদের প্রচ্ছন্ন একত্বই আমাদের দ্বিত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে শেখাবে। আমরা যদি হাতে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করি তাহলে আমাদের মধ্যে একপ্রকার সংগ্রামী একতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা সংগ্রামকালের একতাকে শান্তিকালের একতায় সম্প্রসারিত করব। আর ইউরোপে যদি মহাযুদ্ধ বাধে আর এদেশের সৈনিকরা তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাহলেও একপ্রকার কমরেডশিপ গড়ে উঠবে হিন্দু সৈনিকে আর মুসলিম সৈনিকে। নেশন গড়ে ওঠে একসঙ্গে লড়তে লড়তে। অন্যান্য দেশে তাই হয়েছে। এদেশেও তাই হবে।

হাফিজ তাঁর নিজের যুক্তিতেই অটল। 'কথাটা অত সহজ নয়। যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সারা দেশে এমন এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাতে হিন্দুও মুসলমানের অধীন নয়, মুসলমানও হিন্দুর অধীন নয়। কংগ্রেস আর লীগ যদি কোয়ালিশনে রাজী হতো তা হলে একসঙ্গে মন্ত্রিত্ব করতে পারত। ইংরেজ বিদায় নিলে পরে এক সঙ্গে রাজত্ব করতে পারত। কিন্তু সে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হতো কি? অন্যান্য দল তাদের হটাত। তা হলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে আর কী বোঝায়? হিন্দু ভারত, মুসলিম ভারত। দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। হাসছেন যে! কেন নয়?'

আমি বলি, 'বাংলাদেশ যদি মুসলিম ভারতে পড়ে তা হলে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের হিন্দুরা

আমার চোখে এলিয়েন হয়। আমিও তাদের চোখে এলিয়েন। রামকে আর কৃষ্ণকে আর বুদ্ধকে কি এলিয়েন ভাবতে পারি কখনো? গান্ধীকে এলিয়েন ভাবতে পারি?'

'গান্ধী বলছেন কেন? বলুন মহাত্মা গান্ধী।' হাফিজ আমার ভুল শুধরে দেন।

'মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব বরাবরই প্রেরণাময়। জিন্নাসাহেবের নেতৃত্ব তেমন নয়। তিনি যোদ্ধাও নন। তিনি ধর্মেরও ধার ধারেন না। লোকসেবাও তাঁর মিশন নয়। আমরা খাকসাররা তাঁকে দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। কিন্তু মুসলিম জনমত ক্রমে ক্রমে তাঁকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। দেশের এখন দুই কেন্দ্র। মহাত্মা গান্ধী ও কায়দে আজম জিন্না।'

হাফিজের সঙ্গে আমার প্রায়ই তর্ক বাধত হিংসা অহিংসা নিয়ে। হাফিজ কিছুতেই স্বীকার করতেন না যে অহিংসা দিয়ে দেশ স্বাধীন হবে ও তারপরে আত্মরক্ষা করতে পারবে। বেশ, তবে হিংসা দিয়েই হোক। হচ্ছে না কেন? আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, 'তার জন্যে অস্ত্র চাই। কিন্তু অস্ত্র কোথায়?'

'অস্ত্র পেলেও কি আমরা ইংরেজদের সঙ্গে পারব? বাহাদুর শা, নানা সাহেব পেরেছিলেন? ওসব অলীক কল্পনা।' আমি হেসে উড়িয়ে দিই। 'বন্দুকের বদলে বেলচা দিয়েও কিছু হবে না, হাফিজ।'

'বুঝি। কিন্তু ট্রেনিংটা তো একই। আমরা ট্রেন্ড হয়ে থাকছি। একদিন বন্দুকও কেমন করে জুটে যাবে। যুদ্ধটা তো একবার বাধুক।' যুদ্ধের উপর বরাত দেন হাফিজ।

অন্য একদিন বেড়াতে বেড়াতে হাফিজ আমাকে বলেন, 'আপনাকে আমরা ভালোবাসি।'

তা শুনে আমি একটু চমক বোধ করি। 'আমরা' বলতে কারা? কিন্তু তা নিয়ে জেরা করিনে। শুনে যাই ওঁর কথা। ওঁর বিশ্বাস আমি গান্ধীপন্থী, আমি অহিংসাবাদী, আমি লোকের সেবা করি। আমি একজন দরবেশ কি ফকির।

'আরে, না। আমি ওসব কিছু নই।' হাফিজকে আশ্বস্ত করি। 'আমি চাই বাঁচতে ও বাঁচাতে। আমার মতে যে বাঁচায় সেই বাঁচে। যে মারে সেই মরে। জীবনটা কি মারবার ও মরবার জন্যে? না বাঁচবার ও বাঁচাবার জন্যে?'

'মহাত্মাও তো বলছেন যীশুখ্রীস্টের ভাষায়, তলোয়ার যে ধরে তলোয়ারেই সে মরে। কিন্তু আমার বংশের ধারাই যে অন্যরূপ। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন রোহিলা। রোহিলখণ্ড জয় করে নেন। জয় করতে গিয়ে যা করেন তার চিহ্ন এখনো দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে গেলে দেখবেন হাড়ের পাহাড়। কত মানুষ যে মেরেছেন তার সুমারি হয় না। প্রাণ দেওয়া নেওয়া আমাদের কাছে একটা খেলা। আমরা যেমন মারতে ভালোবাসি তেমনি মরতে। মরণকে আমরা নিই খেলোয়াড়ের মতো। লড়াই যেন পোলো খেলা। তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। নইলে জীবনে মরচে ধরে যায়। যুদ্ধহীন জীবন কি একটা জীবন? কবে লড়াই বাধছে, বলুন।' হাফিজ মনে করেন আমি সবজান্তা।

একদিন সত্যি সত্যি বেধে যায় যুদ্ধ। হিটলার বাধিয়ে দেন। তখন হাফিজ ছুটে আসেন আমার কাছে। বলেন, 'এবার মহাত্মা কী করবেন?'

'যুদ্ধে সহযোগিতা গান্ধীনীতি নয়। কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন।' আমি উত্তর দিই।

হাফিজের ওটা বিশ্বাস হয়নি। শেষে যেদিন সত্যি সত্যি কংগ্রেস পদত্যাগ করে সেদিন তিনি সকৌতুকে বলেন, 'আপনারা অমন করে পালিয়ে গেলেন কেন? জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলিম লীগকে বখরা দিয়ে হিটলারের সঙ্গে লড়তে পারতেন।'

'তাহলে স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে লড়ত কে?' আমি জানতে চাই।

'কেন, বোসবাবু? আবার কে?' হাফিজের হীরো হলেন সুভাষচন্দ্র।

॥ চার ॥

এরপরে একদিন হাফিজ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। যেতে হবে কোথায় যেন সেটলমেন্ট ক্যাম্পে। সেখান থেকে যথারীতি মহকুমা হাকিমের পদে। আর হয়তো দেখা হবে না। মানে, এই স্টেশনে। আমার শুভকামনা জানাই।

সেদিন তিনি তাঁর জীবনকাহিনীর খানিকটে শোনান। কেমব্রিজে যখন তিনি শিক্ষানবীশ তখন একদিন পনেরো মিনিটের নোটিসে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় অপারেশন টেবিলে। অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্যে অপারেশন। অতি বিপজ্জনক কেস।

অপারেশন টেবিলে শুয়ে জ্ঞান হারাবার আগে তিনি আল্লাতালার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। নিজের জন্যে একটুও হাতে রাখেন না। তাঁর আর কোনো প্রার্থনা নেই, একমাত্র প্রার্থনা এই যে আল্লার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। পরের দিন জেগে দেখেন বেঁচে আছেন। ডাক্তার তাঁকে অভিনন্দন করে শুধান, বাঁচলেন কী করে? এ কেস তো বাঁচবার কেস নয়। তিনি বলেন, খোদার ফজলে।

'আমার প্রার্থনায় কোনো ফাঁকি ছিল না, জজ। থাকলে সেই টেবিলেই আমার মৃত্যু হতো। সেই যে বেঁচে গেলুম সেটা মরে যাওয়ার পর নতুন করে বাঁচা। তখন থেকেই আমি আপনাকে উৎসর্গ করে দিয়েছি মানুষের সেবায়। মানুষের সেবাই তো আল্লার সেবা। আমার আয়ুষ্কাল তো শেষ হয়েই গেছল। এটা একটা বাড়তি আয়ুষ্কাল। এটা আত্মসুখের জন্যে নয়। হ্যাঁ, সেই ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, এমন রিল্যাক্স্‌ড দেহ তিনি দেখেননি। বিশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাসে কী না হয়!'

গান্ধীজীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের প্রসঙ্গ ওঠে। হাফিজ বলেন, 'হ্যাঁ, উনিও একজন ম্যান অফ ফেথ। লোকে ভাবে পলিটিসিয়ান! কত না ক্যালকুলেট করে চাল দেন। তা নয়। অন্তরের বাণী শুনে চালিত হন।'

হাফিজের সঙ্গে এই হয়তো শেষ দেখা। কিছুদিন থেকে আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলুম। ছেড়ে দিলে আর কখনো এক স্টেশনে পরস্পরকে পাওয়া যাবে না। তাই ভারাক্রান্ত মনে বিদায় দিই। বলি, 'খোদা হাফেজ।' তিনিও একটু হেসে তাই বলেন।

বছর চারেক বাদে কলকাতার পথে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে হঠাৎ একদিন পুনর্দর্শন। সেই খাকী শার্ট ও খাকী প্যান্ট পরা মানুষটি। সঙ্গে সেইরকম পোশাকে আরেকজন। নেমে এলেন ওঁরা ট্রাম থেকে বোধ হয় আমাকে লক্ষ করে।

'হ্যালো, জজ! কেমন আছেন আপনি? আর মিসেস বিশ্বাস? আর ছেলেমেয়েরা?' একনিশ্বাসে প্রশ্ন করে যান হাফিজ।

'ভালো। ভালো। সবাই ভালো। আর আপনি? শুনেছি বিয়ে করেছেন। মিসেস কেমন আছেন?' আমি তাঁর হাতে হাত রেখে শুধাই।

'ভালো। আপনাকে একটা খবর দিই। এইমাত্র ইস্তফা দিয়ে এলুম। এখন আমি মুক্ত।' হাফিজের মনে বিষাদ, মুখে হাসি।

'ও কী? ব্যাপার কী? কেন আপনি অমন কাজ করতে গেলেন?' আমি তো বিস্ময়ে বিমূঢ়। ওঁদেরি তো রাজত্ব। মানে, মন্ত্রীর গদি।

'ডেকে পাঠিয়েছিলেন চীফ সেক্রেটারি। গেলুম সেক্রেটারিয়েটে। হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। দিলুম লিখে ইস্তফাপত্র। ব্যাস, আমি এখন খালাস। আচ্ছা, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? আপনাকে আটকে রাখলুম।' হাফিজ বলেন।

'আমিও যাচ্ছিলুম ট্রাম ধরতে। পার্ক সার্কাসে আমার বন্ধুর ওখানে। আপনারাও আসুন না। যদি হাতে অন্য কোনো কাজ না থাকে।' আমি প্রস্তাব করি।

তিনজনে মিলে ট্রামে উঠে বসি। বিকেলবেলা। কিন্তু ছুটির সময় হয়নি। ফাঁকা ট্রাম। পাশাপাশি বসে আলাপ করি।

'হুজুরদের কাছে আমি এক পয়সাও চাইনি। ওঁদের কোনো কমিটমেন্টই নেই। সবটাই দায়িত্ব আমার। আমিই আমার মহকুমার লোকদের অন্ন যুগিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি এতদিন। আমার নিজস্ব একটা পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হলে প্রদেশময় দুর্ভিক্ষ হতো না। এই যে চারদিকে হাহাকার পড়ে গেছে, এ হাহাকার আমার মহকুমায় নেই। কিন্তু এর জন্যে কেউ কি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে? খাদ্যমন্ত্রী আমার উপর খাপ্পা। কেন আমি দুর্ভিক্ষ ঘটতে দিইনি? কেন তাঁর পেটোযা কালোবাজারী ও মজুতদারদের রাতারাতি ফেঁপে উঠতে দিইনি? কেন ধানচালের রপ্তানি বন্ধ করেছি? অবাধ বাণিজ্য, অবাধ গতিবিধি, এসব নির্দেশ কেন অমান্য করেছি? আরে, করেছি কি আমি নিজের স্বার্থে? না জনগণের স্বার্থে?' হাফিজ জবাবদিহি চান আমার কাছে। যেন আমিই সরকার বাহাদুর।

আমি এর কী জবাব দিতে পারি! দুঃখিত হয়ে বলি, 'তা আপনি ছুটির দরখাস্ত করলেন না কেন? দুর্ভিক্ষ তো বেশিদিন থাকবে না, উজীরদের ওজারতের মেয়াদও ফুরিয়ে যাবে। তাঁরা কেউ পারমানেণ্ট নন, আপনিই পারমানেণ্ট।'

'ছুটি নেওয়া মানে তো পালিয়ে যাওয়া। আমি কি এসকেপিস্ট? যেখানে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিপন্ন সেখানে আমার কাজ কি চাচা, আপনা বাঁচা? না ওদের বাঁচানো?' হাফিজ আবার আমার কাছে জবাব চান। আমাকে নিরুত্তর দেখে ক্ষেপে যান। বলেন, 'এই শয়তানী সরকার মানুষকে বাঁচাবে না, যদি কেউ বাঁচাতে যায় তাকে শাসাবে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাটাই একটা পাপ। জজ, আপনিও দায়ী। এই ব্যাপক নরহত্যার জন্যে।'

আমি চমকে উঠি। সাফাই দিই, 'এ ব্যাপারে আমার কী দায়িত্ব! আমি একজন জজ। আমি কি কখনো অন্যায় বিচার করেছি?'

'না, না, আপনিও দায়ী। এই সরকারের প্রত্যেকটি কর্মচারীই দায়ী। কারো বিবেক নির্মল নয়। সকলেরই ইস্তফা দেওয়া উচিত।' হাফিজ তর্জনী উচিয়ে বলেন, 'অমন করে আপনার বিবেককে ভোলাতে পারবেন না। আল্লার দরবারে আপনার বিরুদ্ধেও ফরিয়াদ আনবে ওরা, ওই যারা কাতারে কাতারে মরছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা।'

ব্যথিত হই। বলি, 'চাকরিটা ছেড়ে দিলে আপনার সংসার চলবে কী করে? বাঁচবেন কী করে?'

'আল্লার উপরে বিশ্বাস থাকলে ও তাঁর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে তিনিই আবার বাঁচাবেন, সেবার কেমব্রিজের অপারেশন টেবিলে যেমন বাঁচিয়েছিলেন। আমার এই জীবনটাই তো উদ্বৃত্ত জীবন। এর জন্যে এত ভাবনা!' হাফিজ হেসে উড়িয়ে দেন।

সেদিন আমার বন্ধুর ওখানে দু'জনাকে দু'পেয়ালা চা দেওয়া হয়। আর কিছু ওঁরা নেবেন না।

বিদায় বেলায় দেখি দুটি পেয়ালার দুটি পিরিচে দুটি আনী। তাজ্জব বনে যাই। বলি, 'এটা তো চায়ের দোকান নয়, হাফিজ।'

'কিছু মনে করবেন না, জজ্। আমরা খাকসার। বিনিময় না দিয়ে গ্রহণ করিনে। নিলে আমাদের সঙ্ঘের নিয়মভঙ্গ হয়। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ। আচ্ছা, তাহলে আসি। আপনার স্ত্রীকে আমার সেলাম জানাবেন। আপনাকেও সেলাম।' এই বলে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে মিলিটারি স্যালিউট দেন হাফিজ। আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলে ডান হাত দিয়ে ঝাঁকানি দেন। গুড বাই।

জীবনে আর দেখা হয়নি। তবে ওপার বাংলা থেকে একদিন একটি ছাত্র তাঁর আদরের নিদর্শন এক থান খদ্দরের চাদর দিয়ে যায়। তাঁর নিজের হাতের কাজ। সেই অমূল্য সম্পদের বিনিময় দিই কী করে? এখনো দিতে পারিনি।

যুবরাজ

কবে একবার 'মুকুট' নাটকে ও যুবরাজ সেজেছিল। তার আগে ও পরে কত কী পার্ট নেয়। কোনোবার রঘুবীর, কোনোবার প্রবীর, কোনোবার আলেকজাণ্ডার না দস্যু, কোনোবার মার্ক অ্যানটনি না ব্রুটাস। কিন্তু সেই যে যুবরাজ সাজা তারপর থেকেই ওর নাম দাঁড়িয়ে যায় 'যুবরাজ'! আমরাই ওটা তামাশা করে চাউর করে দিই।

কেবল যে ইস্কুলে বা খেলার মাঠে তাই নয়, দোকানবাজারেও সেই নাম রটে যায়। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় দু'ধারের দোকান থেকে ডাক আসে, 'সেলাম, যুবরাজ সাহেব। আইয়ে। দেখিয়ে।' ওকে খোশামোদ করে ওরা দামী দামী চিজ গছিয়ে দেয়। ও হাসিমুখে নেয়, কিন্তু বাড়ি গিয়ে এমন বকুনি খায় যে আমরা হেসে কুটিকুটি। তবু ওর মতো সদ্‌মেজাজী ছেলে আমি কম দেখেছি।

পরিহাস হিসাবে যেটার আরম্ভ সেটা পরে সীরিয়াস হয়ে ওঠে। যুবরাজের ছদ্মবেশ ধারণ করতে গিয়ে ওর ধারণা দাঁড়িয়ে যায় ও ছদ্মবেশী যুবরাজ।

অদ্ভুত! না? তখনো আমি মনস্তত্ত্বের বই পড়িনি। ফিকসেশন কাকে বলে তা জানতুম না। জানলে বলতুম ওটা একটা ফিকসেশন। ছেলেটা কিছুতেই ওটা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। ছদ্মবেশী যুবরাজ দিন দিন অসহ্য হয়ে ওঠে। ওর ব্যবহারই বদলে যায়। আমাদের কাউকেই ওর চোখে লাগে না। আমরাও ওর ধারে কাছে যাইনে।

এমন সময় ওর বাবা কাঠের কারবার গুটিয়ে নিয়ে হাজারিবাগ বা কোডার্মা চলে যান সেখানে মাইকার কারবার করেন। ওর সঙ্গে আমাদের ছেদ পড়ে যায়। কোনো পক্ষ কোনো পক্ষের খোঁজখবর নেয় না। তবে আমার বাবার সঙ্গে ওর বাবার হৃদ্যতা ছিল বলে বিজয়ার চিঠি ফী বছর আসত ও যেত। সেই ভাবে যোগাযোগ বজায় থাকত।

স্কুলের পড়া শেষ হলে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ও কেমন করে একদিন সন্ত্রাসবাদী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে। বোমার মামলার আসামী হয়ে হাজতে যায়। ওর গুরুজন অনেক

কাঠখড় পুড়িয়ে ওকে খালাস করে আনেন। কিন্তু চোখে চোখে রাখা কি সম্ভব? তাই কোনো মতে একটা পাসপোর্ট যোগাড় করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেন। কপালে যদি থাকে তো ব্যারিস্টার হয়ে ঘরে ফিরবে। বিলেতে কিন্তু ওর মন বসে না। 'দাদা'দের গোপনীয় নির্দেশে ও জার্মানীতে গিয়ে জোটে। উদ্দেশ্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ।

পরবর্তীকালে জার্মানীতে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি, তবে শুনতে পাই ও একজন মান্যবর ব্যক্তি। হামবুর্গে ওর আস্তানা। ওখানে আমি যাইনি। ও নাকি ছদ্মবেশী এক রাজকুমার। রাজনৈতিক কারণে ইনকগনিটো চলাফেরা করে। তবু ওর মাথায় পাগড়ি দেখে লোকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। দেখতেও সুপুরুষ।

ও জানত না যে ক্ষমতা আসবে হিটলারের হাতে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিল বলে হিটলারের পুলিস ওর হাতে হাতকড়া পরায়। পরে রাজবংশীয় শুনে মাফ চেয়ে ছেড়ে দেন। ও কিন্তু আর একটা দিনও জার্মানীতে থাকে না। হামবুর্গ থেকে কেটে পড়ে স্টকহলমে। সেখান থেকে লেনিনগ্রাডে। ওখানকার কমিউনিস্ট মহলে একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠতে ওর বাধে না। প্রোলিটারিয়াটের জন্যে সর্বত্যাগী যে জন সে তো সর্বত্র স্বাগত।

ভালোই চলছিল রাশিয়ায়। পরে একসময় স্টালিনের নির্দেশে শত শত পার্টি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে চালান দেওয়া হয়। সেখান থেকে অনেকেই প্রেরিত হন সাইবেরিয়ায়। যাদের বরাত আরো মন্দ তারা পরপারে। উদ্যত খড়্গ একদিন যুবরাজের স্কন্ধেও পড়বে। এই ভয়ে বেচারা ঊর্ধ্ব শ্বাসে দৌড় দেয় আবার সেই বিলেতে। ওরা ঢুকতে দেয়, কিন্তু টিকতে দেয় না। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের যুগ বিগত হয়েছে, যুবরাজের বিরুদ্ধে পুলিসের অভিযোগ প্রত্যাহার করতে একটিবার ক্ষমাপ্রার্থনাই যথেষ্ট হলো। যুবরাজ এবার স্বদেশের মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, আর রাজনীতি নয়।

ওর বাবার কারবার তখন জমজমাট। ছেলেকে পার্টনার করে নেন। ছেলে যে এতকাল ভেরেণ্ডা ভেজেছে তা নয়। তিন চারটে ভাষায় অনর্গল কথা বলতে শিখেছে। এনজিনীয়ার হয়েছে। কিসের এনজিনীয়ার তা আমি জানিনে। বিলেতে কিছুদূর আইনও পড়েছিল। ওর বিদ্যাবুদ্ধি এবার কাজে লেগে গেল। অর্থপ্রসূ হলো।

যুদ্ধের সময় কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস। মাইকা ব্যবসায়ীদের পৌষমাস। যে টাকাটা ওরা লোটে তা দিয়ে কলকাতায় একখানা ম্যানসন বানায়। সেটাও ভাড়া লোটে। যুবরাজকে প্রায় দেখা যায় গাড়ি হাঁকিয়ে কলকাতা হাজারিবাগ করতে। ওদিকে ওর বাবা যক্ষের মতো ধন আগলে পড়ে থাকেন হাজারিবাগে না কোডার্মায়।

রায় বাহাদুর খেতাব ঘোষিত হবার কয়েকদিন পরেই আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় তাঁর দেহান্ত হয়। দারুণ শক পায় যুবরাজ। ও তো স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল যে হাজার পঞ্চাশ টাকা সদাব্রত করে যিনি রায় বাহাদুর হলেন লাখ দুয়েক টাকা খয়রাৎ করলে তিনি অমনি রাজা উপাধি পাবেন। তখন আর ছদ্মবেশী কেন, প্রকাশ্য রাজকুমার হতে ওর বাধা কোথায়?

শক পেলে কারো কারো মাথা খারাপ হয়ে যায়। যুবরাজের বেলা হলো অন্যরূপ। বাল্যকাল থেকেই ওর ভিতরে একটা ধর্মভাব ছিল। সেই সুপ্ত ধর্মভাবের পুনর্জাগরণ ঘটে। পিতা চলে গেছেন কিন্তু পরমপিতা তো রয়েছেন। তাঁর রাজ্য সারা জগৎজুড়ে। স্পেস জুড়ে। টাইম জুড়ে। তাঁর রাজ্যই কি তারও যৌবরাজ্য নয়? পিতার দেহান্ত হয়েছে বলে তারও যৌবরাজ্যের অন্ত হয়েছে তা নয়। সে যেমন যুবরাজ ছিল তেমনি যুবরাজ থেকে গেল। যদিও আর কেউ সেকথা জানতে পেল না।

তার চরিত্রেও এই উপলব্ধির প্রতিফলন পড়ে। সে যথারীতি তার অতিথি বা ইয়ারদের পানীয় অফার করে কিন্তু নিজে পান করে না। ইউরোপে গিয়ে যে পানদোষ অভ্যাস করেছিল সেটা এক কথায় ছেড়ে দেয়। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'আমার লিভার খারাপ। এখন থেকে সাবধান না হলে নির্ঘাত মরণ।'

আসলে তা নয়। ছেলেবেলা থেকেই সাধুসন্তের সংস্পর্শে এসে ওর প্রত্যয় হয়েছিল যে ইংরেজীতে তিনটি কথা আছে, তিনটিই ডবলিউ দিয়ে আরম্ভ। তার একটি তো ওয়াইন, অরেকটি উওম্যান, আরেকটি ওয়েল্‌থ। কিন্তু উত্তর জীবনের উদ্দামতায় এ প্রত্যয় অবিচল থাকে না। বাড়ির আওতার বাইরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শিথিল হয়। আর দশজন যুবকের মতো তারও ধারণা জন্মায় যে পুরুষের জীবনে এই তো পুরুষার্থ। এসব যার জীবনে হয়নি তার জীবনের অভিজ্ঞতা কতটুকু!

হঠাৎ একদিন কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে যায়। একটা পার্টিতে। 'নন্দন না? চিনতে পারছিস আমাকে?' ও আমার কাছে এসে দুই হাতে ঝাঁকানি দেয়।

'আরে, এ যে মুকুল! আমাদের যুবরাজ। তুই না হাজারিবাগে থাকিস?' আমি ওর দু'হাত ছেড়ে দিইনে।

'কলকাতায়ও আমাদের আপিস আছে। এখানে ওখানে দুই জায়গায় ঘুরপাক খাই। একদিন চল না আমার সঙ্গে আমার গাড়িতে। ঘুরিয়ে এনে দিয়ে যাব তিনদিন পরে। তোর সঙ্গে রাজ্যের কথা আছে। ওঃ কতকাল পরে দেখা! নন্দন রে, তুই ছাড়া কে আছে এ পোড়া দেশে যার চোখে আমি যুবরাজ।' সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে।

'কেন, নরেন, যেদো, ভূতো এরাও তো আছে। হ্যাঁ বেঁচে আছে সব ক'টা পুরোনো পাপী। দেখা হলেই বলে, যুবরাজের সমাচার কী? কোনোদিন তো ভুলেও চিঠিপত্র লিখিস না!' আমি অনুযোগ করি।

'সবাইকে আমার ভালোবাসা জানিয়ে দিস।' ও গাঢ়স্বরে বলে।

বয় ড্রিঙ্কস নিয়ে আসে। আমাকে লেমন স্কোয়াশ তুলে নিতে দেখে সেও তাই করে। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বলি, 'শুনেছিলুম তুই জলস্পর্শ করিসনে। সুরাই তোর একমাত্র পানীয়।'

'লোকে যতটা রটায় ততটা নয়। ও অভ্যাস এক কথায় ছেড়ে দিয়েছি। কেউ কারণ জানতে চাইলে বলি, লিভার খারাপ। আসলে তা নয়। তুই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোর কাছেই খুলে বলতে পারি।' ও আমাকে এক কোণে নিয়ে যায়। অপরের কান এড়িয়ে।

'তা হলে এই ব্যাপার! তিনটে ডবলিউর একটা এতদিনে ঘুচল!' আমি ওর কথা শুনে বিস্মিত হই।

তখন কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি যে যুবরাজ তার চেয়ে আরো এক-পা এগোবে। ও তো সাধুসন্ত নয়। যদিও সাধুসন্তর সঙ্গে মিশতে ভালোবাসে। ওদের বাড়িতে তো একটা আস্ত অতিথিশালাই ছিল সন্ন্যাসী বৈরাগীদের জন্যে।

বছর পাঁচেক অদর্শনের পর আবার একদিন দেখা। এবার আসানসোলে। সেখানে আমার একটা সরকারী কাজ ছিল। যুবরাজ ওই পথ দিয়ে পাস করছিল। আমাকে ধরে নিয়ে গেল রেল স্টেশনে রিফ্রেশমেন্ট রুমে।

'চল না তোকে হাজারিবাগ নিয়ে যাই। আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব।' প্রস্তাব করে যুবরাজ।

'দূর! তা কি হয়। আমি যে সরকারী কর্মচারী। নিজের এলাকার বাইরে গেলে তার আগে অনুমতি নিতে হয়।' আমি ওর প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিই।

এই স্থির হয় যে পুজোর ছুটিটা আমি হাজারিবাগে কাটাব। ওর অতিথি হব। সস্ত্রীক। বিদায়ের সময় ও আবেগের সঙ্গে বলে, 'তুই ছাড়া আর কেউ আমাকে চিনবে না রে ও পোড়া শহরে। কেউ বলবে না যে আমি যুবরাজ।'

সেবার পুজোর বন্ধে আমাদের অন্য কোথাও যাবার পরিকল্পনা ছিল না। গেলুম হাজারিবাগ। সেখানে বিরাট চার মহলা বাড়ি ওদের। যুবরাজের মহলে এক সুটঘর আমাদের জন্যে বরাদ্দ। স্বাধীনভাবেই থাকি।

আমার স্ত্রীর সময় কাটে ওর স্ত্রীর সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলে। ভদ্রমহিলা যৌবনেই জরতী। কিন্তু কেন তা ভেঙে বলেন না। চিরকাল ঐশ্বর্যের কোলেই লালিত হয়েছেন। এখানে তো ঐশ্বর্যের সায়রে ভাসছেন। পদ্মাসনা লক্ষ্মীর মতো। দুঃখের মধ্যে এই যে বছরখানেক আগে পুত্রশোক পেয়েছেন। তাঁকে সমবেদনা জানান আমার গৃহিণী। তিনিও তো ভুক্তভোগী।

যুবরাজ আমাকে মোটরে করে শহরের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যায়। একটু নিভৃত জায়গা পেলে আমরা মোটর থামিয়ে পায়চারি করি বা পাথরের উপর বসি।

'দ্যাখ, নন্দন, তুই ছাড়া আর আমার আছেই বা কে যার কাছে দুটো প্রাণের কথা বলে প্রাণটা জুড়োবে! চিঠিপত্রে এসব বলা যায় না। আর জানিস তো, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। সাহিত্য অতি সামান্যই পড়েছি। ভাব প্রকাশ করতে আমি অক্ষম।' যুবরাজ গৌরচন্দ্রিকা করে।

'তোর যা মনে আসে তা নির্ভয়ে বলে যা। আমি ভাবগ্রাহী।' ওকে উৎসাহ দিই।

'আমার জীবনে যেন শোকের মিছিল চলেছে, ভাই। পিতৃশোকের চার বছর যেতে না যেতে পুত্রশোক। যুবরাজের যুবরাজ চলে গেল রে! আর কেন বেঁচে থাকা! কার জন্যেই বা বেঁচে থাকা!' যুবরাজ ভেঙে পড়ে।

আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা জানাই। বলি, 'মৃত্যুর উপরে কি কারো হাত আছে? জন্মের উপরেও নেই।'

ও দপ করে জ্বলে ওঠে। 'কে বলে জন্মের উপরে নেই?'

আমি হকচকিয়ে যাই। ও ঢোক গিলে বলে, 'আছে, আছে, জন্মের উপরে হাত আছে। আমি ব্রহ্মচর্যের শপথ নিয়েছি আজীবন।'

আমি চমকে উঠি। 'সে কী রে। তোর এমন দুর্মতি হলো কেন! তোর তো ছেলে বলতে ওই একটিই ছিল। আর একটি হবে কী করে? না ওই মেয়েই তোর একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে?'

রুমাল দিয়ে চোখ মোছে যুবরাজ। ধরা গলায় বলে, 'আর আমি কাউকে এ পৃথিবীতে আনতে চাইনে, নন্দন। এখানে মৃত্যুযন্ত্রণা আছে। আহা, কী যন্ত্রণা পেয়ে গেল খোকন আমার!'

সমবেদনা জানাই। আমিও তো ভুক্তভোগী। বলি, 'অমৃতের সন্তানকে মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে যেতে হয়, মুকুল। আসতে হয় জন্মের দুয়ার দিয়ে।'

'আমি কিন্তু আর ও-খেলায় পার্ট নিতে পারব না, নন্দন। নো মোর। নো মোর। আমার স্ত্রীকে বলেছি আমাকে ক্ষমা করতে।' যুবরাজ কাতর কণ্ঠে বলে।

দাম্পত্য ব্যাপারে আমার কি কোনোরকম কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত? আমি চুপ করে শুনে যাই। ও বলে যায়, 'ওর সম্মতি আছে কিনা জানতে চাই। ও বলে, হ্যাঁ।'

এত দুঃখেও আমার হাসি পায়। 'মেয়েদের রীতি জানিসনে দেখছি। ওরা যখন বলে, না, তখন তার মানে—হ্যাঁ। ওরা যখন বলে, হ্যাঁ, তখন তার মানে—না।'

যুবরাজ স্বীকার করে যে কথাটা বোধহয় সত্য। ওর মা এখনো বেঁচে। তিনি একদিন ওকে বলেন, 'ছি, বাবা! অমন শপথ কি নিতে আছে! বৌটাকে অমন করে দগ্ধানো কি ভালো! ওর কত

কষ্ট হচ্ছে।'

'তুই এর উত্তরে কী বললি?' আমি আগ্রহী হই।

'বললুম, মা, আমি কী করব! প্রবৃত্তিমার্গ পেছনে ফেলে এসেছি। এখন আমার সামনে নিবৃত্তিমার্গ। চল্লিশ পার হয়েছি। আর ওসব ভালো লাগে না।' যুবরাজ বলে যায়।

'কিন্তু তোর স্ত্রীকে দেখে তো মনে হয় না যে ত্রিশ পেরিয়েছেন। এত কম বয়সে কি নিবৃত্তি আসে? জোর করে আনতে গেলে চুলে পাক ধরবে না।' আমি অভিযোগ করি।

'যাঃ। ওটা শোক থেকে।' যুবরাজ এক কথায় ডিসমিস করে।

এর পরে ও আমাকে বোঝায় যে ধর্মজীবন আর কামজীবন দুই একসঙ্গে চলতে পারে না। একটার খাতিরে অপরটাকে পথ ছেড়ে দিতে হবেই। নয়তো যেটা হবে সেটা ভণ্ডামি।

'কেন, প্রাচীনকালের মুনিঋষিরা কি ভণ্ড ছিলেন? সকলেরই তো স্ত্রীপুত্র ছিল।' আমি উদাহরণ দিই।

'ওঁদের কথা আলাদা। আমি তো মুনিঋষি নই। আমি দেখলুম আমি দু'দিক রাখতে পারব না। সেইজন্যে এই সিদ্ধান্ত নিলুম। তাছাড়া তোকে তো আমি আগেই জানিয়েছি যে, একটা ডবলিউ আমি ছেড়েছি। এটা হলো আরেকটা ডবলিউ।' যুবরাজ পুরোনো কথা মনে করিয়ে দেয়।

হ্যাঁ, মনে পড়ে তার সেই তিন ডবলিউ—ওয়াইন, উওম্যান, ওয়েল্‌থ।

'এর পরে কি আরো এক ডবলিউ ত্যাগ করবি? না, না, ওসব করতে যাসনে। চিরকাল সম্পদের কোলে মানুষ।' আমি শশব্যস্ত হয়ে বলি।

'আপাতত ওকথা ভাবছিনে, ভাই। তবে ধীরে ধীরে আপনাকে গুটিয়ে নিচ্ছি। কার জন্যে এমন ভূতের মতো খাটা! আমার যুবরাজ তো চলে গেল।' ও হাহুতাশ করে।

তবে ওর দৃষ্টি একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। ও বুঝতে পারছে যীশু কেন বলেছিলেন, আমার রাজ্য এ জগতের নয়।

'তেমনি আমার যৌবরাজ্য এ জগতের নয়। অন্য কোনো জগতের। সেই যে জগৎ তার সন্ধান কে আমাকে দেবে! গুরু ছাড়া আর কে দিতে পারে।' ও জানতে চায়। আমি তো গুরুবাদে বিশ্বাস করিনে। তাই ওকে উৎসাহ দিইনে। বাধাও দিইনে। ও যদি ওতেই শান্তি পায় আমি বাধা দেবার কে?

।। দুই ।।

এরপরে বারো তেরো বছর কেটে যায়। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ থাকে না। মাঝে মাঝে ওর কথা মনে পড়ে। কিন্তু চিঠি লিখতে সময় পাইনে। অকালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে বসে সরস্বতীর ধ্যান করি।

হঠাৎ একদিন মস্ত এক গাড়ি এসে গেটের সমানে দাঁড়ায়। বাইরে এসে দেখি—যুবরাজ। সপত্নীক। সকন্যক।

'রঞ্জনাকে তোদের বিদ্যাভবনে ভর্তি করে দিতে এসেছি। শ্রীসদনে থাকবে। যদি আপত্তি না থাকে তোর স্ত্রী হবেন ওর লোকাল গার্জেন।' এই বলে যুবরাজ তাঁর কাছে আবেদন জানায়। তিনি

রাজী হয়ে যান সানন্দে।

'কিন্তু উঠেছিস তোরা কোথায়? গেস্ট হাউসে? কেন, আমাদের এখানে কেন নয়? একটা টেলিগ্রাম করে দিলেই চলত। আমরা নিরাশ হলুম।' আমি দুঃখিত হয়ে বলি।

'তোর ঠিকানা জানা ছিল না যে।' এই হলো ওর কৈফিয়ত। 'এখানে এসেই শুনি যে তুই থাকিস রতনপল্লীতে।'

এরপরে ওর কন্যার জন্যে যথা কর্তব্য করা গেল। ওরা সেইদিনই ফিরে যাবে, নইলে গেস্ট হাউস থেকে আমাদের ওখানে স্থানান্তরিত হতো। যাই হোক, আহারাদি করা গেল একসঙ্গে। আহারের পর বিশ্রাম। আমরা দু'জনে এক ঘরে, মহিলারা অন্য ঘরে। বেশিক্ষণের জন্যে নয়।

'তারপর, যুবরাজ! তোর ব্যক্তিগত জীবনের কী সমাচার?' নাটকীয়ভাবে শুধাই। 'তোর ধর্মজীবন নির্বিঘ্ন তো? না তপস্বীদের মতো প্রলোভনে ভরা!'

'মাধুরী এতদিনে মানিয়ে নিয়েছে। লক্ষ করলে দেখবি ওর মুখে চোখে একপ্রকার আভা। দেবী! দেবী! মানবী বা অপ্সরা নয়। ইচ্ছে হয় প্রণাম করতে। কিন্তু সম্পর্কে বাধে।' যুবরাজ ওর সহধর্মিণীর প্রশংসায় শতমুখ হয়।

আমি এটাও লক্ষ করি যে আভা কেবল একজনের মুখে চোখে নয়, আরেক জনেরও। সত্যি, অবাক হই। মহত্তর উপলব্ধি না হলে শুধুমাত্র তপশ্চর্যায় ওরকম আভা ফোটে না।

'হ্যাঁ, তোকে একটা খবর দিই। আমি আরো একটা ডবলিউ বর্জন করেছি। ওয়াইন উওম্যানের পর ওয়েল্‌থ।' যুবরাজ বলে।

'ঐশ্বর্যও বিসর্জন দিলি! তাহলে তোর এখন চলছে কী করে?' আমি চমৎকৃত হই।

'বিনোবাজীর কথামতো মালিকানা ছেড়েছি। কারবার এখন আমার ভাইদের। আমার নয়। আমি এখন বিভিন্ন কোম্পানীর কনসাল্টিং এন্‌জিনীয়ার। ওরা যথারীতি ফী দেয়। তাতেই আমার চলে যায়। মেয়ের বিয়ের পরে সেটাও ছাড়ব কিনা ভাবছি। ইচ্ছে আছে হিমালয়ে গিয়ে কোনো এক আশ্রমে শেষ জীবনটা কাটাতে। ওরা আজকাল বেশ মডার্ন হয়েছে। গুহাতে যাঁরা থাকেন তাঁরাও ইলেকট্রিসিটি পান। খবর নিচ্ছি সহধর্মিণীকেও থাকতে দেওয়া হয় কিনা। আমি তো কামিনী ত্যাগ করিনি, কামিনীও আমাকে ত্যাগ করেনি। ত্যাগ যা করেছি তার নাম কামনা।' যুবরাজ খাটো গলায় বলে যাতে ওঘর থেকে কেউ শুনতে না পান।

ও শুনিয়ে যায় ওর জীবনদর্শন। আমি শুনে যাই।

'দেখ, নন্দন, আমি তোর মতো বিদ্বান নই। বুঝিয়ে বলতে পারব না। বুঝিই বা কতটুকু! যেটা অনুভব করেছি সেইটেই গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করছি। যীশু বলে গেছেন ভগবানের রাজ্য খুঁজতে। কিন্তু মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ যে জন, সে জন ভগবানের রাজ্য খুঁজে পাবে কী করে! তাহলে প্রথমেই তাকে মায়ার বন্ধন কাটাতে হবে। মায়ার রাজ্যের সীমান্ত পার হতে হবে। সীমান্ত কি একটা? একটার পর একটা। যেমন বৃত্তের পর বৃত্ত। বহু কষ্টে তিন তিনটে সীমান্ত অতিক্রম করেছি। এর পরেও দেখছি আরো আছে। কিন্তু এখনো তেমন স্পষ্ট হয়নি, ভাই। তাই তোকে আজ বলব না। পরে আবার যখন দেখা হবে তখন বলব।' প্রতিশ্রুতি দেয় যুবরাজ।

কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না। একদিন ধাঁ করে এসে ধাঁ করে চলে যায়। বলে, 'মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওর বিয়ে। আজ বসতে পারব না। মাফ করিস।'

ওর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম। যাইনি। হাজারিবাগ তো কাছে নয়। শুভেচ্ছা জানিয়েছিলুম।

আশা করেছিলুম আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে। বাকীটা শুনতে পাব। কিন্তু হয়ে উঠল কই!

একদিন শ্রাদ্ধের চিঠি এল। যুবরাজ আমাদের মায়া কাটিয়ে লোকান্তরে গেছে।

হায় হায় করে ওঠে মনটা। তবু জানি ও যেখানেই যাক না কেন সেখানেও তার আপন যৌবরাজ্য। যৌবরাজ্যের কি ইতি আছে। পরম পিতার রাজ্যের মতো এপারে ওপারে দু'পারেই তার বিস্তার।

স্বস্ত্যয়ন

মনে পড়ছে না সেবার কার কী হয়েছিল, শুধু মনে আছে ডাক্তার এলেন বেশ একটু রাত করে। এসেই মাফ চাইলেন।

বললেন, 'হোপলেস কেস, সার। তবু শেষ না দেখে উঠে আসতে পারিনে। বিবেকে বাধে। পাছে পেসেন্টের মনে কষ্ট হয়। যে লোকটি চলে যাচ্ছে তাকে একটু সঙ্গ দেওয়াও তো আমার কতর্ব্য। যতক্ষণ তার জ্ঞান থাকে।'

আমার বাড়ির কাজ সেরে অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তিনি বিদায় নিতে পারতেন, কিন্তু নিলেন না। বাইরের বারান্দায় আমার পাশে চেয়ার পেতে বসে সিগারেট ধবালেন। বললেন, 'কথাটা ঠিক বোঝাতে পারলুম না, সোম সাহেব। ডাক্তারের সঙ্গে পেসেন্টের যে সম্পর্ক সেটা মৃত্যুর বেলা ঠিক খাটে না। মনে হয় একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের যে সম্পর্ক সেটা তার চেয়ে গভীর। প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকের অঙ্গ। সেইজন্যে আমি শেষ মুহূর্তটি অবধি থাকি। তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। অপরকে বলিনে, আপনাকে বলছি। আপনি ম্যাজিস্ট্রেট বলে নয়, দার্শনিক বলে।'

তাঁকে সেদিন বেশ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। অন্যান্য দিনেব মতো প্রফুল্ল নয়। বললুম, 'দার্শনিক না আর-কিছু।'

'দার্শনিকদের মতো আমারও একপ্রকার শেষ জিজ্ঞাসা আছে। আমি জানতে চাই জীবনের প্রান্তবিন্দুতে এসে কে কী বলে যায়। অন্তিম উক্তিটা শুনতে চাই। মহাপুরুষদের অন্তিম উক্তি লিপিবদ্ধ কবে রাখা হয়। কিন্তু যারা অতি সাধারণ মানুষ তারা যা বলে যায়, তাও কি কম অপূর্ব! মৃত্যু সব সময়ই রহস্যময়, কিন্তু তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষ যে বার্তা রেখে যায় তার থেকে যথেষ্ট আলোক পাওয়া যায়। শুনবেন কয়েকটি বার্তা?' ডাক্তার আমার দিকে উৎসাহভরে তাকান।

আমিও উৎসুক বোধ করি। 'শুনব বইকি। যদি শোনাতে চান।'

সেদিন তিনি আমাকে কাহিনীর পর কাহিনী শুনিয়ে যান। আমিও তাঁর জন্যে কফির অর্ডার দিই। এ সব কথা তিনি বিশেষ কাউকে বলেন না। সমস্ত আমার মনে নেই। থাকবে কী করে! কবেকার কথা! কেটে গেছে আন্দাজ ত্রিশ বছর।

'শুনবেন, আজকের পেসেন্টটি কী বলে গেল? এটা ওটা পাঁচ রকম কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় বলল, আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, এবার তবে আসি। নমস্কার। একটু বাদে সব শেষ। পরক্ষণটাই যেন পরকাল। দুটি ক্ষণের মধ্যে একটুও ফাঁক যেন নেই। জীবন আর মরণ আর

মরণোত্তর কাল যেন একটাই কনটিনুয়াস প্রোসেস। এই যেমন আপনার এখান থেকে একটু বাদে আমি উঠব, গাড়িতে বসব, বাড়ি যাব।' ডাক্তার বলতে থাকেন, 'বাড়ি যাওয়ার কথায় মনে পড়ে আর একজনের অন্তিম উক্তি তিনি বলেন, আমি হোমসিক। বাড়ির জন্যে আমার মন কেমন করছে। আর এখানে খেলা করতে ভালো লাগছে না, ডাক্তার। ওই যে, আমার মা আমাকে ডাকছেন। শুনতে পাচ্ছ না? খোকা, আয়, ঘরে আয়। যাই মা। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।'

তিনিও অভিভূত। আমিও অভিভূত। বলি, 'সত্যি ভাববার মতো কথা।'

তিনি উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলে যায়। আমি তাঁকে আরও কিছুক্ষণ বসতে অনুরোধ জানাই। 'আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে, ডাক্তার মিত্র। এক বছর ধরে চিন্তা করছি। এতদিন বাদে পেয়েছি উপযুক্ত জন আর উপযুক্ত ক্ষণ। আচ্ছা, একজনের অন্তিম উক্তি আপনার স্মরণ আছে! বলতে পারেন, যাবার সময় মিসেস সরখেল কি কিছু বলে যান? শুনেছি, আপনি সে সময় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।'

'কে! মিসেস সরখেল!' ডাক্তার এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। চমকে ওঠেন। 'হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখতে এসেছিলুম। তখনো তিনি জীবিত। মনে হলো জ্ঞান আছে। সমবেদনা প্রকাশ করে বলি, আহা, এমন কাজ কে করল, ম্যাডাম! প্রত্যাশা করি একটি কি দুটি শব্দের উত্তর। আমি। কিংবা স্বামী।'

'কোন্‌টি শুনলেন?' আমি অধীরভাবে শুধাই।

'কোনোটিই না। ভদ্রমহিলা নিরুত্তর। হয়তো অসমর্থ নয়তো অনিচ্ছুক। কিন্তু শান্ত, সমাহিত। কষ্ট হচ্ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যক্ত হচ্ছিল না ওঁর কথায় বা কাজে। আমি আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিনি। পরে সিভিল সার্জন এলেন। এলেন ডাক্তার চক্রবর্তী। ততক্ষণে শেষ দশা। আমরা তিনজনে পরীক্ষা করে দেখি ওই একটাই জখম। বিভলভার ওই ঘরেই পড়েছিল। গুলীবিদ্ধ হয়ে রক্তস্রাব ও মৃত্যু।' ডাক্তার কাতর স্বরে বললেন।

'ওকথা আপনাদের সার্টিফিকেটেই আছে। কিন্তু যেটা নেই, সেইটেই আমার জিজ্ঞাসা। গুলীটা কার গুলী? বিভলভারটা যাঁর?' আমি সুকৌশলে বলি।

'গুলীটা বুকের তলার দিক থেকে উপরের দিকে তির্যকভাবে বিঁধেছিল। তার থেকে মনে হতে পারত যখমটা স্বকৃত। বিভলভারটা কার সেটা তো পরীক্ষা করে দেখিনি। আলামতে হাত দেওয়া বারণ। ওটা পুলিসের কাজ।' তিনি সুকৌশলে এড়ান।

'জখমটা অন্যকৃত হওয়া কি অসম্ভব মনে হতে পারত?' আমি জেরা করি।

'কেসটা কি রিওপেন করতে যাচ্ছেন, সার! কিন্তু করে কোনো ফল হবে কি? অন্যকৃত হওয়া অসম্ভব না হলেও জখমের অবস্থান থেকে সে রকম অনুমান করা শক্ত। আপনি যদি চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে থাকেন, এগিয়ে যান। আমি কিন্তু আমার সার্টিফিকেটের বাইরে একটি কথাও বলব না। স্বকৃত না অন্যকৃত এটা আমার অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এটা আসলে ডাক্তারের বিজনেস নয়।' তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন। 'তবে কেউ যদি মৃত্যুকালীন উক্তি করে সেটা আমার ধর্তব্য।'

আমি মাফ চেয়ে বলি, 'ডাক্তার মিত্র, আপনি কেবল ডাক্তার নন, আপনি মিত্র। সেই সুবাদে আপনাকে ও রকম প্রশ্ন করেছি। না, এ কেস রিওপেন করা হবে না। আমার এখানে বদলী হয়ে আসার আগেই সরখেল সাহেব ছুটি নিয়ে চলে গেছেন, পুলিস সাহেব যবনিকা টেনে দিয়েছেন। কমিশনার সাহেবও অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিয়েছেন যে ওটা আত্মহত্যার থিওরির সঙ্গে মেলে। আমি অবশ্য দু'রকম থিওরিই শুনেছি। সেইজন্যে অশান্ত বোধ করেছি। সত্যটা কী সেটা কেমন করে জানব? কে জানাবে? অথচ জানা আমার চাই। ঘটনাটা যে এই বাড়িতেই ঘটে। যে বাড়িতে

আমি আছি। ওই ঘরটা আমরা বন্ধ রেখে দিয়েছি। কিন্তু সব ক'টা ঘর তো বন্ধ রাখা চলে না। একটা ঘর ছিল ভদ্রমহিলার ছবি আঁকার স্টুডিও। নিজেই খরচপত্তর করে জানালায় শার্সি লাগিয়েছিলেন। সেটা হয়েছে আমার স্টাডি। সেখানে পড়তে বসে রোজ মনে পড়ে সেই অপরিচিতা পরলোকবাসিনীকে। যাঁর বয়স বোধ হয় আমারই বয়স বা তার কাছাকাছি কারণ তাঁর স্বামী আমার বছর চারেকের সিনিয়র। না, আলাপ ছিল না, তবে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল। রূপগুণের খ্যাতি শুনেছিলুম। ভেবেছিলুম একদিন রবিবার দেখে আমার পুরোনো স্টেশন থেকে মোটরে করে আসব সস্ত্রীক। সেটার আগেই কাগজে দেখি এখানে ঘটে গেছে এক ট্র্যাজেডী। তখন তো ভাবতেই পারিনি যে, আমাকেই মাস দুই বাদে এই জেলায় ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সরখেলের জায়গায়। কেমন যোগাযোগ দেখছেন? এই ঘটনা পরম্পরা কি নিছক আকস্মিক না এর আর কোনো গূঢ় তাৎপর্য আছে? আমি এর মর্ম ভেদ করতে চাই বলেই জিজ্ঞাসু।'

ডাক্তার মিত্র কী ভেবে বলেন, 'তা সরখেলসাহেব তো একদফা স্বস্ত্যয়ন করিয়েই গেছেন। আপনিও করাতে পারেন আরেক দফা। যদি সোয়াস্তি চান।'

স্বস্ত্যয়নে আমার বিশ্বাস ছিল না। অশরীরী কোনো অস্তিত্ব অনুভবও করিনি। বলি, 'আপনি যা ভেবেছেন তা নয়, ডাক্তার মিত্র। সেরকম স্বস্ত্যয়ন আমি চাইনে। সত্যটা কী সেটা নিশ্চিতভাবে জানাও তো একপ্রকার স্বস্ত্যয়ন। কিন্তু কিছুতেই জানতে পারছিনে কী ভাবে ঘটনাটা ঘটে, কার হাত দিয়ে ঘটে, কেন ঘটে।'

ডাক্তার বিষণ্ণভাবে বলেন, 'হোপলেস কেস, সার। আপনি এর কূলকিনারা করতে পারবেন না। ঘটনার পেছনেও ঘটনা থাকে।' পিছনের ঘটনাগুলো কবে কোথায় ঘটেছিল কে বলতে পারে! তা হলে কেন'র উত্তর পাবেন কী করে? বাকী থাকে কীভাবে ও কার হাত দিয়ে? কী ভাবে'র উত্তর আমি দিয়েছি। কার হাত দিয়ে'র উত্তরটা যে দু'জন দিতে পারতেন তাঁদের একজন লোকান্তরে, অপর জন স্থানান্তরে। একজন নিরুত্তর, অপরজন সেদিন আমাদের যা বলেছিলেন তার সার কথা তিনি নির্দোষ। তিনিও বাড়ির চাকরবাকরদের মতো বাইরে থেকে গুলীর আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন ও দেখেন, তাঁর স্ত্রী মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে আছেন।'

॥ দুই ॥

ঘটনাটা ঘটে সন্ধ্যাবেলা। সেদিন ওদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল বাইরে। তাই দু'জনে তার জন্যে তৈরি হতে চললেন যার যার ড্রেসিং রুমে। ঘর দুটো পাশাপাশি নয়, মাঝখানে ডাইনিং হল।

ড্রাইভার গাড়ি বারান্দায় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। চাপরাশিরাও ছিল সেইখানে বা তার কাছাকাছি জায়গায়। কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক আপিস কামরায় বসে টাইপ করছিলেন। সাহেব খানা খেতে গেলে তিনিও ছুটি পাবেন। সাহেবের একমাত্র সন্তান একটি দশ বছরের কন্যা। সে ছিল পড়ার ঘরে। সঙ্গে ছিলেন তার গভর্নেস।

হঠাৎ ও রকম একটা দুর্ঘটনা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। তার অব্যবহিত কোনো কারণও ছিল না। দাম্পত্য কলহ কেউ লক্ষ করেনি। মনোমালিন্য যদি হয়ে থাকে তো সেটা প্রকাশ্যে নয়। সকলের ধারণা ওঁরা একটি সুখী দম্পতি। আমরাও দূর থেকে তাই শুনেছিলুম।

আমার এই স্টেশনে বদলী হয়ে আসার পর আমার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসতেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন পুরোনো আলাপীও ছিলেন। আগেও একবার আমি এখানে নিযুক্ত হয়েছিলুম, নিম্নতর পদে। দেখা করতে এসে তাঁরা আমাকে শহরের লোকের মতামত জানাতেন। শহর নাকি ব্রাউনিংএর রোমের মতো দুই ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক শহর বলে, আত্মহত্যা। বাকী অর্ধেক বলে, তা নয়। তবে এঁরা কেউ নালিশ করতে বা সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসেন না। বেনামী চিঠি লিখতেও এঁদের সাহস হয় না। আমি কী করতে পারি!

আমার আলাপীরা যদিও দ্বিমত, তবু একটা জায়গায় তাদের মিল ছিল। তাঁরা একজনের উল্লেখ বার বার করেন। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট চৌধুরী সাহেব। ওঁকে নাকি প্রায়ই দেখা যেত সরখেলদের লনে টেনিস খেলতে, মিসেস সরখেল যেসব চ্যারিটি শো করতেন তাতে সাহায্য করতে। তাসের পার্টনার হতেও নাকি তাঁকে ডাক পড়ত। বড়সাহেব ছোট সাহেবকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আর মেমসাহেব তো ছিলেন তাঁর বৌদির মতন। বলা বাহুল্য চৌধুরী অল্পদিন আগে বিলেত থেকে ফিরেছেন, এখন কাজ শেখা আর বিভাগীয় পরীক্ষা পাস করা নিয়ে ব্যাপৃত। বিয়ে হয়নি, তার দেরি আছে। তাঁর বাংলোয় তিনি একাই থাকতেন। চাকরবাকর সমেত।

আমার আলাপীদের ধারণা চৌধুরীই এর মূলে। ঘটনার পরে বড়সাহেব নাকি স্বয়ং ছোটসাহেবের বাড়ি গিয়ে বলেন, 'তোমার কাছে ওঁর চিঠিপত্র আছে শুনেছি। থাকে তো আমাকে দাও।' চৌধুরী বিনা বাক্যে একরাশ চিঠি বার করে তাঁর হাতে দেন। চিঠিতে কী ছিল কেউ জানে না। হয়তো বা আত্মহত্যার পূর্বাভাস ও কারণ।

এমন কথাও শোনা গেল যে, ঘটনার কিছুদিন আগে থেকে এ বাড়িতে চৌধুরীকে আর দেখা যেত না। তিনি টেনিস খেলতে যেতেন কলেজের সাহেবদের সঙ্গে। সম্ভবত সরখেল কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে দুর্মুখরা তাঁর কান ভারী করেছিল। মাতৃমঙ্গলের জন্যে মিসেস সরখেল আয়োজিত 'মুক্তধারা'র অভিজিত সাজবার জন্যে কি আর পাত্র পাওযা গেল না? কৃষ্ণ চৌধুরী না হয় বিলেতে একবার ওই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলে শোনা যায়, কিন্তু দেশে কি ওঁর চেয়ে উপযুক্ত অভিনেতার অভাব? কলকাতা থেকে আনিয়ে নিলেই হতো। কতই বা খরচ পড়ত! তেমনি টিকিট বিক্রি হতো কত বেশি!

ওই দুর্ঘটনাব পর থেকে চৌধুরী ওর ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা আসন্ন বলে কোথাও বেবন না। শুধু অফিসে একবার হাজিরা দিয়ে যান। আমার সঙ্গে দেখা হলে পাশ কাটান। তবে বাড়িতে একবার কল করতে এসেছিলেন। সে সময় আমি লক্ষ করি যে যুবকটি সত্যি অসামান্য। প্রশ্নেব পর প্রশ্ন করে আমাকেও ভাবিয়ে তোলেন। ফৌজদারি আইন, রাজস্ব আইনের কূট প্রশ্ন। আমি ওঁকে অভয় দিয়ে বলি যে প্রশ্নগুলো অত কঠিন হবে না। আরো সোজা প্রশ্ন আসবে। এটা তো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নয়।

রং যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যাম। তা নইলে চৌধুরীর চেহারা ও গঠন অনিন্দনীয়। তাঁর কথাবার্তা চালচলন পোশাক পরিচ্ছদ মার্জিত রুচির পরিচায়ক। ওঁর ভিতরে একটা গভীর আত্মবিশ্বাস ছিল, লোকে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভ্রম করতে পারে। চাকরি ছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে, যাতে ওঁর প্রচুর আগ্রহ। খেলাধূলা, অভিনয়, ছবির সমঝদারিও তার মধ্যে পড়ে। সুজাতা সরখেলের ছবির সমঝদার এই মফঃস্বল শহরে ওঁর মতো আর কেউ নয়। চারু সরখেল তো চিনির বলদ। স্ত্রীর রূপ দেখেই তিনি বিয়ে করেন, কলাবিদ্যার কদর বোঝেন না।

সুজাতা কলকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মেয়ে, চারু সে সমাজের নন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র, কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কবিতা লেখা, ছবি আঁকা প্রভৃতি তাঁর চোখে

একপ্রকার বিলাসিতা। দেশের বা দশের কী লাভ হচ্ছে তাতে। তবে মাতৃমঙ্গল জিনিসটা ভালো। এতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে। লোকে তো এমনিতেই চাঁদা দেবে না, নাটক অভিনয় করে যদি টাকা ওঠে সেটাও এমন কিছু মন্দ নয়। টিকিট বিক্রির জন্যে তিনিও তাঁর মোসাহেবদের লাগিয়ে দেন। 'মুক্তধারা' সেদিক থেকে বেশ সফল হয় বলতে হবে। মাতৃমঙ্গল দাঁড়িয়ে যায়।

তবে অভিনয়ে বিস্তর খুঁত ছিল। স্থানীয় অ্যামেচারদের না নিলে তারা বয়কট করত। সরখেল এই নিয়ে আনপপুলার হতে নারাজ। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন দমন করতে গিয়ে যথেষ্ট অপ্রিয় হয়েছিলেন। এ জেলায় নয়, অন্যত্র। তবু সেই অখ্যাতি তাঁর পিছু নিয়েছিল। যেখানেই বদলী হতেন, সেখানেই লোকে বলাবলি করত, 'এই সেই মেদিনীপুরের হাকিম না?' তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরামর্শ দেন স্থানীয় অভিনয় যশঃপ্রার্থীদের একটা সুযোগ দিতে। আমি হলে তার সঙ্গে আরো একটা পরামর্শ জুড়ে দিতুম। 'মুক্তধারা' অভিনয় করা চারটিখানি কথা নয়। ওর চেয়ে সোজা বই অভিনয় করলে সাফল্যের সম্ভাবনা অধিকতর। মফঃস্বলের এরা গিরিশ ঘোষ, ডি এল রায়, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের নাটকেই অভ্যস্ত। ইদানীং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে মেতেছে। নেহাত যদি রবীন্দ্রনাথের বই মঞ্চস্থ করতে হয় তো 'বিসর্জন' কী দোষ করল!

'মুক্তধারা' যে বাছাই করা হয় সেটা চৌধুরীর মুখ চেয়ে। শ্রীমান আর কোনো ভূমিকায় নামবেন না, কারণ রিহার্সালের জন্যে অত সময় নেই। অভিজিতটা ওঁর মুখস্থ। মিসেস সরখেল স্থানীয় অ্যামেচারদের ডেকে পাঠান। তারা তো তাঁর আহ্বান পেয়েই কৃতার্থ। নাটক নির্বাচনের ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো নাটক তেমন উচ্চাঙ্গের নয়। উচ্চতম আদর্শের দিক থেকে আবার 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারা'র জুড়ি নেই। দুটির মধ্যে 'মুক্তধারা'ই তাঁর বেশি পছন্দ, কারণ ওতে মেয়েদের ভূমিকা কম। মফঃস্বলে নন্দিনীর পার্ট নেবে কে? ছেলেদের দিয়ে মেয়েদের পার্ট মানায় না। তা ছাড়া অভিজিত সাজবার জন্যে তৈরি লোক পাওয়া যাচ্ছে যখন তখন বঞ্জন সাজবার জন্যে পাত্র খুঁজতে হবে কেন?

নেপথ্যে যে আর একটি নাটক অভিনীত হচ্ছিল, যার পাত্রপাত্রী সুজাতা ও চারু ও কৃষ্ণ বাইরের দর্শকরা কেউ তার দিকে তাকায়নি। খেয়াল হয় যখন সেটি বিয়োগান্ত হয়। ও রকম একটা পরিণতি কেউ কল্পনা করেনি। বিশেষত ম্যাজিস্ট্রেট পত্নীর বিয়োগ। মাতৃমঙ্গলের মতো একটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানের যিনি জননী ও ধাত্রী, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেটি সম্ভব হয়েছে ও বহুজনের হিতসাধন করেছে, তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ যদি স্বাভাবিকও হতো তবু সারা শহরের উপর শোকের ছায়া নেমে আসত। এ যে মর্মান্তিকভাবে অস্বাভাবিক।

চৌধুরীর মুখভাব অধ্যয়ন করি। মার্লোর নাটকের একটি পঙ্ক্তি আমার মনে আসে, সেটা হেলেনের উদ্দেশে বলা।

'Is this the face that launche a thousand ships ..!'

এই কি সেই মুখ? এই কি সেই মুখ যার জন্যে এত বড়ো একটা ট্র্যাজেডী ঘটে গেল? ওঁর অন্তরে হয়তো নিবিড় বেদনা ছিল, কিন্তু নিপুণ অভিনেতার মতো সে বেদনা উনি মুখোশ দিয়ে ঢেকেছিলেন। কোথাও কোনো শোকের আমেজ না পেয়ে আমি তো অবাক। ব্যাপারটা কি তবে নিছক স্বামীস্ত্রীর ব্যাপার? কিংবা স্ত্রীর একার? তৃতীয় ব্যক্তি কি এর মধ্যে জড়িত নন? তবে চিঠির তাড়া পাওয়া গেল কী করে ওঁর বাংলোয়। চিঠিগুলো কি নিতান্ত একতরফা?

ওঁদের দু'জনের প্রণয়সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সম্ভবত একরকম সাহচর্য। ইউরোপে অমন কত হয়। চৌধুরী বহুদিন ইউরোপে থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন। হয়তো জানেন না এদেশের জনমত কী ভাবে নেয়। তা বলে ওঁর সারা জীবন মেঘাচ্ছন্ন হবে? এ ঘটনা

চিরকাল ওর পশ্চাদ্ধাবন করবে? এমন কী পাপ করেছেন বেচারা! ভালোবাসা কি পাপ? ভালোবাসা পাওয়া কি পাপ?

আমি প্রথমটা ওঁর উপর বিরূপ ছিলুম। যেন ও ছেলেটিই সেই ট্র্যাজেডীর জন্যে দায়ী। ক্রমে ক্রমে বিরূপভাবটা কেটে যায়। কিন্তু সরখেলের উপর সন্দেহ অত সহজে মেটে না। রিভলভারটা যদি তিনি স্বয়ং ব্যবহার না করে থাকেন, তা হলেও জবাবদিহির দায় খণ্ডাবেন কী করে? কেন তালাবন্ধ করে রাখলেন না? কেন স্ত্রীর হাতে পড়তে দিলেন? সন্ধ্যার অনেক আগেই পড়েছিল নিশ্চয়। সম্ভবত কয়েকদিন থেকেই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। ইতিমধ্যে সরখেল কি চোখের মাথা খেয়েছিলেন? দেখতে পাননি যে রিভলভারটা অদৃশ্য? সময়মতো আবিষ্কার ও উদ্ধার করলে কি অমনটি ঘটত?

ভদ্রলোকের পক্ষেও কতক লোক ছিলেন। তারা বলেন, দশ বছরের মেয়েটার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেই তাঁকে রাতারাতি আবার বিবাহ করতে হলো। প্রতিপক্ষের মতে তা নয়, বিয়ে যাকে করলেন তার উপর আগে থেকেই নজর ছিল। স্ত্রীও নাকি সেটা জানতেন। পথের কাঁটা সরে যাওয়াটা সন্দেহজনক নয় কি?

॥ তিন ॥

বুঝতে পারিনে আমার নিয়তি কেন আমাকে এঁদের নিয়তির সঙ্গে জড়ায়। কেনই বা আমি এই বিষয়ে এত ভাবি? ভেবে কূলকিনারা পাইনে। অস্বস্তি বোধ করি।

সুজাতা হয়তো সত্যি সত্যি সুখী ছিলেন না। স্বচ্ছন্দে ছিলেন। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, মোটরে করে ঘুরে বেড়ান, মেয়ের জন্য গভর্নেস রাখেন। এই তো সুখ। আর কী চাই। কে জানে হয়তো ওটা ছিল সোনার খাঁচায় পোষা পাখীর সুখ। ছবি এঁকে আপনাকে ভুলিয়ে রাখতেন। মাতৃমঙ্গল নিয়ে ব্যস্ত থাকাও তাই। কারো কারো পক্ষে এগুলিও এক একটি নেশা।

কিংবা এই হয়তো সত্যিকার কাজ। সুখ যা কিছু এর মধ্যেই নিহিত ছিল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাড়ম্বর জীবনযাত্রায় নয়। উচ্চপদস্থের আবার উচ্চতরপদস্থদের পদধারণও করতে হয়। তাঁদের স্ত্রীরা যদি তেজস্বিনী হয়ে থাকেন, তবে সহ্য করবেন কেন? সাংসারিক উন্নতির জন্যে তাঁরাও কি তাঁদের আত্মাকে বিকিয়ে দিয়েছেন?

আমি যেন কান পেতে শুনতে পাই একজন বলছেন আরেকজনকে, 'তোমার এই কর্মজীবনটা মিথ্যা জীবন। এত হাঁকডাক, এত প্রতাপ। সব মিথ্যা। সব মায়া। তৃপ্তি এর মধ্যে এক আনাও নেই। ষোল আনাই অতৃপ্তি। খাওয়াপরার অভাব নেই বটে, কিন্তু মানুষ কি কেবল অন্ন দিয়েই বাঁচে? অমৃত কোথায়!'

'তোমার সন্তোষের জন্যে আমি কী না করেছি, বল? কষ্ট করে পড়শুনা করেছি, পরীক্ষা পাস করেছি, চাকরি পেয়ে চাকরিতে উন্নতি করেছি, একদিন দেখবে কমিশনার হব। আর কী করতে পারি বল? কলকাতার পোস্টিং তো আমার হাতে নয়। চেষ্টা করে দেখতে পারি। তাতে যদি তুমি সুখী হও।' উত্তরে বলছেন আরেকজন।

'দূর! কলকাতা পোস্টিং কে চায়? সেখানেও সেই মিথ্যা জীবন। দিনমান মিথ্যা কাজ।

মাঝরাত অবধি মিথ্যা পার্টি। মিথ্যা ফ্যাশনের পেছনে মিথ্যে ছোটা। তবু তো এখানে প্রকৃতির পরশ পাই। আর পাই জনজীবনের। তোমার সঙ্গে টুরে যাই যখন, তখন আমি বাঁচি। সেও যে আজকাল আর ভালো লাগে না। তুমি যত উঁচুতে উঠছ তত বিচ্ছিন্ন হচ্ছ সাধারণের কাছ থেকে। এর চেয়ে মহকুমায় ছিলুম ভালো। তোমাকে ফের মহকুমা হাকিম করে না?' প্রথম জনের উক্তি।

'পাগল নাকি! একবার প্রমোশন পাবার পর আবার ডিমোশন! ছুটি নিয়ে পালিয়ে যাব না? ছুটি না পেলে পদত্যাগ করব না? আর মহকুমার জীবনটাও কি মিথ্যা জীবন ছিল না? অত খুঁত খুঁত করলে কি বেঁচে থাকা চলে? বাঁচতে চাইলে অনেক কিছু পরিপাক করতে হয়। অনেক কিছু দেখেও না দেখতে হয়, শুনেও না শুনতে হয়। শুধু কি ঘরের বাইরে?' দ্বিতীয় জন ইঙ্গিতে বোঝাতে চান ঘরের ভিতরেও।

'কী বললে! কিসের ইঙ্গিত করলে তুমি!' প্রথম জন চেপে ধরেন।

'সবাই যা বলে। যার ইঙ্গিত করে।' দ্বিতীয় জন গম্ভীরভাবে বলেন।

কেন'র উত্তর অন্বেষণ করতে গিয়ে আমি কার হাত দিয়ে'র একটা মনগড়া সমাধানে উপনীত হই। এর পিছনে ছিল আমার নিজস্ব এক আবিষ্কার। মাতৃমঙ্গল পরিদর্শন করে পরিদর্শন পুস্তকে মন্তব্য লিখতে গিয়ে একদিন নজরে পড়ে যায় মিসেস সরখেলের মন্তব্য। মনে হলো হাতের লেখাটা একটু যেন নার্ভাস। আর বলবার কথাটা কেমন যেন সকরুণ, স্পর্শকাতর, আবেগভরা, আরনেস্ট।

শুনলুম মাতৃমঙ্গল চালানো সুমসৃণ ছিল না। মহিলা সমিতিতে তাঁর একটি প্রতিপক্ষও ছিল। তারা কাজ করতে নয়, কাজ পণ্ড করতে ওস্তাদ। তা ছাড়া যেমন হয়েই থাকে, যে ভদ্রলোকের উপর বিশ্বাস করে টাকাপয়সার ভার অর্পণ করা হয়েছিল তিনি শত তাগাদা সত্ত্বেও হিশেব দিচ্ছিলেন না। আদায় হয়েছিল যত বরবাদ তার চেয়ে কম নয়। তাই চাঁদেরও কলঙ্ক ছিল। স্বামী তার ভাগী হতে নারাজ। বলেন, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করলে কি ও রকম হতো! সব শালাকেই আমি চিনি। যে যত বড়ো ভালোমানুষ সে তত বড়ো শয়তান।

এর পরে আমি একটু একটু করে মেনে নিই যে ঘটনাটা নিজের হাত দিয়েই ঘটে। যাতে শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারি। আমার সোয়াস্তির জন্যে একপ্রকার স্বস্ত্যয়ন।

আমার স্ত্রী কিন্তু এর শরিক ছিলেন না। ওখানকার আর দশজন মহিলার মতো তাঁরও মত ছিল সরখেলবিরোধী। বছর তিনেক বাদে যখন ওখান থেকে বদলী হই, তখন ওই নিয়ে আবার কথ উঠলে তিনি বলেন, 'এ বাড়িতে একজনের মৃত্যু ঘটে, এই পর্যন্ত সত্য। কিন্তু কার গুলীতে ঘটে এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। যার যেমন মনে হয় সে তেমন বিশ্বাস করতে পারে। মিসেস সরখেলে কত প্রশংসা শুনেছি। কত রূপ! কত গুণ! কত লোকের কত উপকার করেছেন! কই, মিস্টার সরখেলের প্রশংসা তো শুনিনি। মেজাজটা রুক্ষ। বাড়িতেও হাকিমী ফলাবেন। মরতে বাধ্য করা কি মেরে ফেলা নয়?'

বদলী হয়ে যে স্টেশনে যাই সেখানেও এই প্রসঙ্গ ওঠে। যাঁর জায়গায় যাই তিনি জানতে চা ব্যাপারটা আসলে কী? আত্মহত্যা না আর কিছু?

'আর কিছু বলে তো মনে হলো না, ঘোষ।' আমি উত্তর দিই।

তা শুনে ঘোষ যা বলেন তা লিখে রাখবার মতো। 'সরখেলকে তো আমি চিনি। আমার সমসাময়িক। লোকটা কাপুরুষ। গুলী করবার মতো পৌরুষ কি ওর আছে? তবে বুলী করতে পারে।'

খুনের মামলায় সাক্ষী দিতে এসে কেউ যদি অমন কথা বলে তবে ওটা সাফাইয়ের কাছ

করে। প্রকাশ্যে যেটা অপমানকর প্রচ্ছন্নভাবে সেটা রক্ষার উপায়।

নেতি নেতি করেও সত্যকে জানা যায়। এমনি করে আমার স্বস্ত্যয়ন সাঙ্গ হয়। কী ভাবে হয়েছিল, কার হাত দিয়ে হয়েছিল এসব বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। কিন্তু কেন হয়েছিল তা আজও অজ্ঞাত। হয়তো জানতে পেতুম যদি সরখেলকে হাতের কাছে পেয়ে সাহস করে শুধাতুম। হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে সাক্ষাৎ ঘটেছিল একদিন কলকাতায়। মূল ঘটনার আট নয় বছর বাদে। সেবারেও আমি তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হই, কিন্তু তাঁর নিয়তির সঙ্গে আমার নিয়তি সংযুক্ত হয় না।

বেচারার তখন ভগ্ন দশা। যদিও বয়স এমন কিছু হয়নি। তখনো চল্লিশের কোঠায়। সাংসারিক সাফল্যেরও ব্যত্যয় ঘটেনি। তবু সেই ট্র্যাজেডী তাঁর চেহারায় ছাপ রেখে গেছে। দেখে দয়া হয়। এক নারীর বদলে আরেক নারী পাওয়া যায়, কিন্তু সুজাতার মতো নারীর সঙ্গ পাওয়া যায় না। সরখেলের বোধ হয় এতদিনে চৈতন্য হয়েছে তিনি কী হারিয়েছেন। থাক, আর কেন পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলা? কোন্ অধিকারে? কোন্ সুবাদে?

তার পরে আরো অনেক বছর অতীত হয়েছে। সরখেল আর নেই। তাঁর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ে। আরো উপরে উঠবেন কী করে?

তাঁর চেয়ে, আমার চেয়ে, উর্ধ্বে উঠেছেন সেদিনকার সেই কৃষ্ণ চৌধুরী। কে না জানে তাঁর নাম? মাঝে মাঝে কাগজে তাঁর ফোটো দেখি। আর মার্লোর নাটকের পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করি। 'এই কি সেই মুখ—'

মনে মনে পূরণ করতে ইচ্ছে হয়, 'যার জন্যে প্রাণ দিলেন রমণী উত্তমা?' দূর! বিশ্বাস হয় না। রহস্যই ছিল, রহস্যই রয়ে গেল। সেই ভালো।

অসিধার

আমরা বাঙ্গালোর হয়ে মাদ্রাজ যাব শুনে আমাদের বম্বের বন্ধু সুধাময় চন্দ বলেন, 'বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেন্টে প্রাক্তন বিপ্লবী বরকত আলী গুপ্তর সঙ্গে আলাপ করতে ভুলবেন না।'

বরকত-আলী গুপ্ত! এ কেমনধারা নাম! মুসলমান হলে গুপ্ত কেন? হিন্দু হলে বরকত আলী কেন? আমার ধাঁধা লাগে। সেটা অনুমান করে চন্দ বলেন, 'রুশ দেশের বিপ্লবীদের নাম লেনিন কেন? ট্রটস্কি কেন? স্টালিন কেন? বিপ্লবের পথে নামলে পদে পদে নাম বদল করতে হয়। আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় পালানোর সময় যদি বলতেন ওঁর নাম বিমলানন্দ গুপ্ত তাহলে ইংরেজরা তো টের পেতোই, মহাজরীনরাও ওঁকে অবিশ্বাস করে ওঁদের সঙ্গে নিত না। কিন্তু এখন আর উনি বরকত আলী গুপ্ত বলে পরিচয় দেন না। ওখানকার লোক জানে ওঁর নাম বি গুপ্ত। ফিনল্যাণ্ড ফেরত আর্কিটেক্ট।'

চন্দ ছিলেন গুপ্তর সহপাঠী। তাঁর কাছেই শোনা গেল গুপ্তর আদি নাম ছিল বিমলাপ্রসাদ গুপ্তভায়া। ম্যাট্রিকুলেশনের সময় সেটা পালটে যায়। কলেজে তিনি হন বিমলানন্দ গুপ্ত। জীবনযাত্রা বিবেকানন্দের অনুসরণ। উদ্দেশ্য আমেরিকা গিয়ে ধর্মপ্রচার। তার আড়ালে সশস্ত্র পন্থায় দেশোদ্ধার। কাউকে জানতে দিতেন না যে বিপ্লবীদের দলে তিনি নাম লিখিয়েছেন। হঠাৎ একদিন ধরা পড়েন

এবং অন্তর্বীণ হন। পরে এক সময় ছাড়া পেয়েই নিরুদ্দেশ হয়ে যান। শেষে জানা গেল তিনি মস্কোতে গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর নাম বরকত আলী গুপ্ত। দেশ যদি স্বাধীন হয় তা হলেই তিনি ফিরবেন, নয়তো নয়।

পরে কিন্তু কমিনটার্নের সঙ্গেই তাঁর খিটিমিটি বেধে যায়। ওদের মতে ভারতের স্বাধীনতা বুর্জোয়াদের কর্ম নয়। না জাগিলে সব শ্রমজীবী সেনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না। বুর্জোয়াদের হাতে হাতিয়ার ধরিয়ে দিলে কী হবে? সব তো ইংরেজরাই কেড়ে নেবে। বরকত আলীর উপর ফরমাস হলো, যাও, শ্রমিকদের জাগাও, কৃষকদের জাগাও। ওরাই যাতে ইংরেজের উত্তরাধিকারী হয়। গুপ্ত ভেবেছিলেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহাজরীনদের কমাণ্ডার হয়ে খাইবার পাশ দিয়ে ঢুকলেই অমনি চারদিকে সাড়া পড়ে যাবে, যেখানে যত ভারতীয় সৈন্য আছে তারা হিন্দু মুসলমান শিখ নির্বিশেষে আবার এক মিউটিনি বাধাবে। বাস! লাল কেল্লা ফতে। ভারত স্বাধীন। এই তো কেমন সোজা থীসিস। এর জন্যে তাঁকে কমিউনিস্ট হতে হবে কেন? মার্কসবাদের দীক্ষা নিতে হবে কেন? তিনি যেমন কলমা না পড়েও মহাজরীনদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়েছেন তেমনি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো না পড়েও কমিউনিস্টদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হতে পারবেন না কেন?

আসলে তিনি 'আনন্দমঠ' পড়ে ন্যাশনালিস্ট। হিন্দু জাতীয়তাবাদী। দায়ে ঠেকে মহাজরীনদের সঙ্গে মিলেছেন। দায়ে ঠেকে কমিউনিস্টদের সঙ্গেও মিশতে রাজী। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি সমাজবিপ্লব রূপে কল্পনা করতে অনিচ্ছুক। কমিউনিজমের বাহক হয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করবেন না। মস্কোতে তাঁর পক্ষেও কতক রুশ বন্ধু ছিলেন। তবে তাঁদের প্রভাব বেশি নয়। বছর পাঁচেক অপেক্ষা করে তাঁর জ্ঞানোদয় হলো যে সোভিয়েত নেতাদের দৃষ্টি এশিয়ার উপরে নয়, ইউরোপের উপরে। আগে ইউরোপে তাঁদের শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা না করে তাঁরা পারস্যের দিকে ভারতের দিকে বা চীনের দিকে পা বাড়াবেন না। ইতিমধ্যে যদি কেউ তাঁদের সাহায্য চায় তাঁরা ফরমাস করবেন, যাও, মজুরদের জাগাও। কিষাণদের জাগাও। আরে, ওটা কি ক্ষত্রিয়ের কাজ। ওতে বারুদের গন্ধ কোথায়! গোলার আওয়াজ কোথায়!

বিষম বিষাদগ্রস্ত হয়ে বরকত আলী গুপ্ত ফিনল্যাণ্ডে আশ্রয় নেন। রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে আর্কিটেক্চার শিক্ষা করেন। তারপর শিক্ষানবীশী সূত্রে ইউরোপের নানা দেশে ঘোরেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল দেশকে স্বাধীন না করে তিনি পানিগ্রহণ করবেন না। তার দেরি আছে দেখে তিনি ব্রতভঙ্গ করেন। এক আইরিশ কন্যার সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়। উনিও এককালে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামে সংযুক্ত ছিলেন। ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল। দুজনে মিলে মনস্থির করেন যে ভারতে এসে স্বাধীন ব্যবসা করবেন। কিছুদিন বম্বেতে কাটিয়ে দু'চার জায়গায় চেষ্টাচরিত্র করে অবশেষে বাঙ্গালোরে মনের মতো কাজ ও বাস করবার মতো অবস্থান পান। সেখানে বারো মাস না শীত না গ্রীষ্ম।

চন্দ বলেন, 'আপনাকে আমি একটা পরিচয়পত্র দিচ্ছি। ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য যদি গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহ থাকে।'

আমি বলি, 'তাঁর যদি আমার সম্বন্ধে আগ্রহ না থাকে?'

'থাকবে, থাকবে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর অসীম আগ্রহ। আপনি বাংলাদেশে কাজ করেন, ছুটি নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন শুনলেই তিনি লুফে নেবেন। আশ্চর্য হব না, যদি হোটেল থেকে তাঁর বাড়িতেই ধরে নিয়ে যান।' চন্দ বলেন প্রত্যয়ভরে।

চিঠিখানা চন্দ কি মনে করে অগ্রিম পাঠিয়ে দেন ডাকযোগে। আমি 'হ্যাঁ' কি 'না' বলিনে। কে জানে হয়তো গুপ্তর পেছনে গুপ্তচর ঘুরছে। আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারে। সরকারী

চাকুরে আমি। প্রাক্তন বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করি কোন সুবাদে? তবে কি আমিও তলে তলে বিপ্লবপন্থী? অথচ কৌতূহল আমার ষোলআনা। অমন একটি চরিত্র আমি পাই কোথায়?

ভোরবেলা বাঙ্গালোর স্টেশনে নেমে দেখি হোটেল থেকে লোক এসেছে আমাদের নিতে। জিনিসপত্র নামাচ্ছি এমন সময় পেছন থেকে কানে আসে, 'মাফ করবেন, আপনিই কি মিস্টার সান্যাল?'

চেয়ে দেখি অপরিচিত এক ভদ্রলোক। বাঙালীর মতো সাজপোশাক। আমার চেয়ে এক দশকের বড়ো। তার মানে [illegible]। রংটা ফর্সা না হলেও মলিন নয়। আকারটা না লম্বা না বেঁটে। গড়নটা বেশ মজবুত। চেহারাটা অনেক পোড় খাওয়া। যাকে বলে সিজনড। মুখে দাড়ি নেই, গোঁফ নেই, তবু কেমন যেন মনে হলো ইনিই বরকত আলী গুপ্ত।

'মিস্টার গুপ্টা, আই প্রিজিউম।' আমি ইংরেজীতে উক্তি দিই।

তিনি আমার দুই হাত ধরে ঝাঁকানি দেন। তারপর মিসেস সান্যালকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বলেন, 'আমার গৃহিণীও আসতে চেয়েছিলেন আপনাদের স্বাগত জানাতে। নানা কারণে পারলেন না।'

এখনো আমি বুঝতে পারিনি যে [illegible] আমরা তার ওখানে উঠি। হোটেলের লোকটিকে তিনি আড়ালে ডেকে নিয়ে উর্দুতে বলেন, 'আগাসাহেবকে গুপ্তসাহেবের সেলাম জানাবে। এঁরা আমার মেহমান।' এই বলে তার হাতে কিছু গুঁজে দেন।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলেন, '[illegible] দয়া করে অধমের গরিবখানায়। [illegible] পরিচয় না দিলেও আপনারা আমার অচেনা নন। বাংলা মাসিকপত্র আমি ওদেশেও পড়তুম। এদেশেও পড়ি।'

বাড়িতে নিয়ে [illegible] করেন গুপ্ত দম্পতি। [illegible] আমাদের আশাতীত। ভেবেছিলুম [illegible] ওদের সঙ্গে কাটিয়ে [illegible] হোটেলে উঠে যাব। [illegible] সাজানো গোছানো [illegible] বাস করলুম [illegible]। সঙ্গে [illegible] ছেলেমেয়ে ও দুই চাকর। [illegible] দেওয়া কি উচিত? [illegible] ও পাড়াতে দুটি ছেলেমেয়ে [illegible] তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল আমাদের ছেলেমেয়েদের। [illegible] ওরা সঙ্গী পেয়ে [illegible]। তা ছাড়া বাগানেও [illegible] যথেষ্ট জায়গা। খেলাধুলার পক্ষে অপর্যাপ্ত নয়। [illegible]

দেশ দেখা তো শুধু দৃশ্য দেখা নয়। মানুষ চেনা ও পরকে আপন করা। গুপ্তরা একবেলার মধ্যেই আপনার জন হয়ে ওঠেন। শুনলুম মাস কয়েক আগে গৃহকর্তার [illegible]বিয়োগ হয়েছে। মাথার চুল সাক্ষ্য দেয়। হৃদয়ের শূন্যতা পূরণের জন্যেও বোধহয় আমাদের মতো অতিথির প্রয়োজন ছিল।

নিজের কাজকর্মের ক্ষতি না করে আমাকে সঙ্গ দেওয়া গুপ্তর পক্ষে কঠিন। তবু তিনি যখনি একটু ফাঁক পেতেন গাড়ি ছুটিয়ে আসতেন ও আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে যেতেন পায়ে হেঁটে বেড়াতে। কিংবা সবাইকে মোটরে করে।

আমার অশেষ কৌতূহল ছিল তার বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি শুনতে। লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না। ট্রটস্কি লোকটা কেমন। স্টালিন কী করে ক্ষমতা হাত করেন। ভিতরকার রহস্যটা কী। গুপ্ত যতটুকু জানতেন ততটুকু বলতেন, তাতে আমার কৌতূহল মিটত না।

'দেখুন, মিস্টার সান্যাল,' গুপ্ত বলেন, 'আমার পোজিশনটা একবার কল্পনা করুন, কমিউনিস্ট নই, আমি ন্যাশনালিস্ট। ভাষাও ভালো বুঝিনে। আমাকে ওরা বিশ্বাস করে ওদের মনের কথা বলতে যাবে কেন? পরস্পরকে ওরা বিশ্বাস করে না। কে যে গুপ্তচর, কে যে নয়, তাই

ওরা জানে না। আমি বাইবে বাইরে ভেসে বেড়াই। আমাদেব মধ্যে যাবা কমিউনিস্ট দীক্ষা নেয তারা হয়তো আপনাকে ভিতরের খবর বলতে পারত। কিন্তু তাদেব পেটেব খবব পেট থেকে বেবোবার আগেই কারো কারো সন্দেহজনকভাবে মৃত্যু ঘটে। কেউ কেউ পালিযে গিয়ে প্রাণ বাঁচায। বিপ্লব একটা ছেলেখেলা নয়। প্রাণ নিযে ছিনিমিনি খেলা। যদি সফল হয় সবাই ধন্য ধন্য কবে। বিফল হলে কিন্তু সান্ত্বনা নেই।'

অন্তরঙ্গতার সুবে এব পবে তিনি আমাকে যা বলেন তা আমাকে দুঃখ দেয। 'বিপ্লবের আবো একটা দিক আছে, সান্যাল। না দেখলে বিশ্বাস হতো না। বাস্তায ঘাটে পার্কে ময়দানে জোড়ে জোড়ে জড়াজড়ি কবে শুয়ে আছে। এতটুকুও আব্রু নেই। শবম নেই। আমি তো দারুণ শক পাই। হাজাব হাজার মানুষ মাবা গেলেও আমি এত শক পেতুম না। মাবতে ও মবতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু এ কী! আমি দৌড় দিই।'

আমি ওদেব পক্ষ নিয়ে বলি, 'যুদ্ধেব শেষে বিপ্লবেব শেষে ওবকম একটু-আধটু হয়েই থাকে, মিস্টাব গুপ্ত। মহাযুদ্ধ যেদিন শেষ হয সেদিন লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন দুজন বিশিষ্ট ভাবতীয সম্পাদক। তাঁবাও সেই একই দৃশ্য অবলোকন কবে স্তম্ভিত হন। যতজন যাব তাব সঙ্গে বাস্তাব কোণে বা পার্কেব ভিতবে সেদিন যা ঘটে তা চাব বছবেব উপবাসেব ক্ষুধাব পব মচ্ছব।'

মচ্ছব! তিনি উষ্মাব সঙ্গে বলেন, 'ভাবতেব মাটিতে চাইনে অমন মচ্ছব। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে বক্তগঙ্গা বইতে পাবে। কিন্তু মচ্ছব! মচ্ছব কদাপি নয। এব মূলে কী বয়েছে, জানেন? মেটিবিয়ালিজম। ধর্মে অবিশ্বাস। বাশিযাব কমিউনিস্টবা গড মানে না। পশ্চিমেব ক্যাপিটালিস্টবাও কি মানে? তাদেব উপাস্য ম্যামন।'

॥ দুই ॥

ছেলেবেলা থেকেই তাঁব ধর্মে মতি। বাজনীতি তাঁকে ভাসিযে নিয়ে গেলেও আকাশেব দিকে চেযে তিনি ধ্রুবতাবা অন্বেষণ কবেছেন। তাই বলে তিনি গোঁড়া হিন্দু নন। তাই যদি হতেন তবে একজন আইরিশ ক্যাথলিক মহিলাকে সহধর্মিণী কবতেন কী করে? ধর্মেব মর্ম একই পবম সত্তাব কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁবই সঙ্গে সাযুজ্য। কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ঈশ্বর, কেউ বলে গড। নামে কী আসে যায?

এই পর্যন্ত বোঝা যায়, কিন্তু এব পবে তিনি যা বলেন তা মেনে নেওযা শক্ত। ব্রহ্মচর্য বিনা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান যদি না-ও হয় তবু ব্রহ্মচর্য পালন কবা চাই। বংশবক্ষাব জন্যে, মানবজাতিব অস্তিত্বেব জন্যে বিবাহ কবতে পাবো, কিন্তু একটি কি দুটি সন্তানের পব আব না। ধর্মেব জন্যে কাম পবিত্যাগ কবতে হবে। তিনিও তাই কবেছেন।

পাবিবাবিক ব্যাপাবে অনুসন্ধিৎসা আমাব স্বভাব নয। আমি তো এড়িয়ে যেতেই চাই। কিন্তু তিনি চান আমার নৈতিক সমর্থন।

'আবো কযেক মাস আগে এলে আমাব মাকে দেখতে পেতেন। এইখানেই তাঁর দেহান্ত হয। যাবাব আগে একটা কথা আমাকে বলে যান। বাবা, বৌটাব দিকে তাকানো যায় না। মুখে হাসি নেই, যৌবনে যোগিনী, অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছে। কেন, বাবা, তুমি তো সাধুসন্ত নও, বিবাহিত

পুরুষ। তুমি বিবাহিতা স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না কেন?' গুপ্ত আমাকে শোনান।

'তার পর?' আমি উত্তরের অপেক্ষা করি।

'আমি বলি, মা, পরমহংসদেবও তো ছিলেন বিবাহিত পুরুষ। তিনি কেন বিবাহিতা স্ত্রীকে স্পর্শ করতেন না? ধর্মের অনুশাসন কামিনী স্পর্শ না করা। মা তখন বলেন, বাছা, তুমি যাঁর নাম করলে তিনি কাঞ্চনও স্পর্শ করতেন না। পয়সা ছুঁলে তাঁর গা জ্বালা করত। তোমাকে তো দেখি দুই হাতে মোহর কুড়োতে। কামিনীতে যার এত অনাসক্তি কাঞ্চনে তার এত আসক্তি কেন?' আমি শুনতে থাকি।

গুপ্ত বলতে থাকেন, 'বড় কঠিন প্রশ্ন। বিয়ে করেছি। ছেলেমেয়ে হয়েছে। আমি যদি চোখ বুজি ওরা খাবে কী? দাঁড়াবে কোথায়? স্ত্রীরও তো একটা সংস্থান চাই। পরমহংসদেবের তো সে ভাবনা ছিল না। শিষ্যরাই সে ভার নিয়েছিলেন। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে। যে যার নিজের বৌ ছেলে নিয়ে পৃথক হয়ে গেছে। আমি কি সাধ করে মোহর কুড়োই? যারা আমার সার্ভিস নিচ্ছে তারা ধনী লোক, আমার ন্যায্য পারিশ্রমিক আমাকে না দেবেই বা কেন? তার মোটা একটা ভাগ তো আশ্রমেই যাচ্ছে। আমার গুরুদেবের শ্রীচরণে। তিনিও কাঞ্চন স্পর্শ করেন না। কামিনী তো নয়ই। চিরকুমার। কিন্তু আশ্রমের প্রয়োজনে আমাদের প্রণামী গ্রহণ করেন।'

এর পরে ওঠে শ্রীগুরুর প্রসঙ্গ। ওঁর গুরু বাল্যকালে গৃহত্যাগ করে কোথায় চলে যান কেউ জানে না। চল্লিশ বছর ধরে একটি নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় একাকী ধ্যান করেন। তাঁকে একবেলা খাবার যুগিয়ে আসত একটি কাঠুরিয়া নারী। সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে। কী এক নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম প্রেরণায় চল্লিশ বছর ধরে। কেউ যখন ওঁকে চিনত না সেই অশিক্ষিতা হরিজন নারী ওঁকে আবিষ্কার করে, কিন্তু গোপন রাখে।

পাহাড় থেকে নেমে এসে উনি একটি গাছতলায় বাস করেন। তারই চারদিকে গড়ে ওঠে তাঁর আশ্রম। একদিন নয়, দিনে দিনে। দু'বেলা শত শত ব্যক্তি দর্শনপ্রার্থী হন। ওঁদের দুটি একটি কথা বলেন। বলতে বলতে ধ্যানস্থ হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালে অনুভব করতে পারা যায় তিনি সকলের দ্বারা পরিবৃত হয়েও পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত। এ জগতে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁকেই এ জগতের প্রয়োজন। দেশ বিদেশ থেকে যারাই আসেন তাঁরাই কিছু না কিছু পেয়ে ফিরে যান। প্রাপ্তিটা বিশুদ্ধ আত্মিক। তিনি মন্ত্রও দেন না, রোগও সারান না, মনস্কামনাও পূর্ণ করেন না। তাঁর অলৌকিক কোনো বিভূতিও নেই।

'যাবেন নাকি আমার সঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে?' জিজ্ঞাসা করেন গুপ্ত।

'এ যাত্রা নয়। পরে যদি সময় পাই আবার আসব।' উত্তর দিই আমি।

'বয়স হয়েছে। বেশিদিন তাঁকে এ শরীরে ধরে রাখতে পারা যাবে না। আমি তো সেইজন্যে আশ্রমের কাছে একটা কুঁড়েঘর করেছি। ছুটি পেলেই ওখানে গিয়ে হাজির হই। আমাকে দেখে কী মনে হয় আপনার? কিছু কি পেয়েছি?' গুপ্ত শুধান।

সত্যি, তাঁর মুখে প্রগাঢ় প্রশান্তি, চোখে অপূর্ব আভা। কামের চক্রে ঘুরছেন অনবরত, তবু তিনি ইংরেজীতে যাকে বলে সিরীন। আমার অবাক লাগে তাঁকে দেখে। কিন্তু ওই যে অসিধার ব্রত ওটা আমি সমর্থন করিনে। গুপ্তজায়ার দিকে তাকানো যায় না। ভালোবাসার অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছেন। স্পর্শ না করে কি ভালোবাসা যায়? নারীকে কামিনী বলাটাই অপরাধ। কাঞ্চনের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করাটা তো ঘোরতর অন্যায়। এসব মধ্যযুগীয় সংস্কার থাকতে স্বাধীনতাও হবে না, বিপ্লবও হবে না। আধ্যাত্মিক উন্নতিও কি হবে? সহধর্মিণীকে সঙ্গে না নিয়ে অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় কি?

যাক, গুপ্তকে এসব কথা শোনাইনে। শুধু বলি, 'হ্যাঁ, আপনি কিছু পেয়েছেন। পাবার মতো জিনিস বটে। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে শেয়ার করা উচিত।'

'সেইখানেই তো ব্যথা।' তিনি ব্যাকুলভাবে বলেন। একসঙ্গে এতদূর এসে এখন পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে পারছিনে। তিনি এ বিষয়ে আশ্চর্য রকম নীরব। মহাগুরুর আশ্রমে নিয়ে যেতে চাই। কিছুতেই যাবেন না। গেলে হয়তো মনে শান্তি পেতেন। আমি যেমন পেয়েছি। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গৃহকর্ম করে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করছেন। সামাজিকতারও ত্রুটি নেই। আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। যদিও অনেকবার বলেছি আয়ারল্যাণ্ড ঘুরে আসতে। পতিগত প্রাণ। এমন সাধ্বীকে কষ্ট দিতে কে চায়। কিন্তু উপায় কী। আমি যে অসহায়।'

এইবার আমাকে বলতে হয়, 'তা বলে স্ত্রীর উপর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওটা চাপিয়ে দেওয়া যায় কি?'

'তা যদি বলেন তবে নিজের উপরেই বা ওর বিপরীতটা চাপিয়ে দিই কী করে? আমারও তো ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন থাকতে পারে।' গুপ্ত বাধা দেন।

বেশ বুঝতে পারি যে এদের দু'জনের মধ্যে একটা আড়াআড়ি চলেছে। একটা সংকটের ভিতর দিয়ে ওঁরা যাচ্ছেন। আমরা সেই ক্রাইসিসের আঁচ পাচ্ছি। কিন্তু কী বা করতে পারি আমরা! আমরাও অসহায়।

বিয়েটা হয়তো ভেঙে যাবে না। ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাদের মুখ চেয়ে একসঙ্গে থাকতে হবে। তা ছাড়া মিসেস গুপ্ত তেমন স্ত্রী নন যিনি স্বামীকে ছেড়ে থাকতে পারবেন। গুপ্তও কি তেমন স্বামী নাকি? পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে দিন-রাত খাটছেন। ইচ্ছে থাকলেও তিনি আশ্রমিক হবেন না।

'সব মানুষকে একদিন না একদিন নির্বাচন করতে হয়। আমাকেও করতে হবে, ভাই। যখন আমি আশ্রমে গিয়ে আমার শেষ দিনগুলো কাটাব ভেবেছি। কিন্তু মহাগুরু কি ততদিন থাকবেন? ওখানকার একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগে না। ভোজনের সময় ব্রাহ্মণদের এক পঙক্তি। অব্রাহ্মণদের আলাদা। মহাগুরু যদিও ব্রাহ্মণ তবু অব্রাহ্মণদের পঙক্তিতেই বসেন। বলেন, চল্লিশ বছর আমি হরিজনের হাতে খেয়েছি, আমার পৈতেও নেই। তবে কেউ যদি আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে আমি তাকে কিছু বলতে চাইনে। তোমরাও নীরব থেকো।' গুপ্তর মুখে শুনি।

শুনে ভাবি, ধর্মের নামে এই যে অধর্ম চলেছে এতদিন এর পরিণাম ভোগ করতে হবে দক্ষিণের এই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুদের। পরলোকে সদগতি হবে কি না জানিনে, কিন্তু ইহলোকে এর সাজা আছে। ইতিহাসের চাকা ঘুরতে ঘুরতে একদিন এমন এক জায়গায় আসবে যেদিন স্পৃশ্যরাই পড়বে চাকার তলায়। অস্পৃশ্যরা উঠবে উপরে। যে যত নীচু সে তত উঁচু। যে যত উঁচু সে তত নীচু।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা কৌতুক প্রশ্নের উদয় হয়। 'আচ্ছা, আমি যদি আপনার মহাগুরু সন্দর্শনে যাই আমাকেও কি উনি অসিধারের উপদেশ দেবেন?'

গুপ্ত তা শুনে উল্লসিত হন। 'সত্যি, যাবেন আপনি ওঁকে দর্শন করতে? চলুন না একদিন। না, আপনাকে উনি অমন উপদেশ দেবেন না। কাউকেই দেন না। আমাকেও দেননি। উপদেশ দেওয়াটাই ওঁর রীতি নয়। উনি কেবল ওঁর আত্মোপলব্ধির কথাই শোনান। এই বহির্জগতের অন্তরালে এক অন্তর্জগৎ রয়েছে। ডুবুরির মতো উনি তাতে ডুব দেন। তুলে নিয়ে আসেন মণিমুক্তা। আমাদের হাতে বিলিয়ে দেন। আপনিও কিছু পাবেন।'

আমি একটু চাপাচাপি করতেই তিনি হোহো করে হেসে ওঠেন। 'অর্জুন যে অর্জুন তাঁকেও শ্রীভগবান অসিধারণ করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন। অসিধার অবলম্বন করতে বলেননি। বললেও

কানে যেত না। আমাদের মহাগুরুকেও আমরা ভগবান বলে ডাকি। তিনিও জানেন যে আমরা'ও এক একটি পার্থপ্রতিম। তাই অসিধার প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। নিয়ম করে দিলে আশ্রয় খালি হয়ে যাবে। দুটি একটি ভক্তকে নিয়েই তো আর ভগবান হওয়া চলে না।'

আমিও সে হাসিতে যোগ দিই। অসিধারাব্রত তত শক্ত নয় অসিধার যত শক্ত। তাই গীতায় ভগবানও সে বিষয়ে নীরব। কেবল বলেন, হে অর্জুন, যুদ্ধ করো।

ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধি বাধি করছে। তা নিয়ে দেশের সবাই দোলায়িত। যুদ্ধে হিটলারকে জিততে দিলে ব্রিটিশ নেভী পড়বে ওর হাতে। একদিন ভারতে এসে হানা দেবে। তখন ওকে রুখবে কে? রুখতে হলে ইউরোপেই রুখতে হয়। রুখবে যে তাকে সাহায্য করতে হয়। অপর পক্ষে ইংরেজদের জিতিয়ে দিয়ে আমাদের লাভটা কী হবে? ওরা কি আমাদের ঘাড় থেকে নামবে?

গুপ্তকে আমি একান্তে শুধাই। 'যুদ্ধ বাধলে আপনার মতো বিপ্লবীর কর্তব্য কী? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অসিধারাব্রত, না ফাসিবাদের বিরুদ্ধে অসিধারাব্রত?'

তিনি অন্তরঙ্গ সুরে উত্তর দেন, 'না, ভাই। এ বয়সে আর অসিধারাব্রত নয়। এখন অসিধার।' এই বলে গম্ভীর হয়ে যান।

বাঙ্গালোর থেকে বিদায়ের পর আর দেখা হয় না। চিঠি লেখালেখিও ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। লোকমুখে শুনতে পাই মহাগুরুর তিরোভাবের পর গুপ্তদের জীবনে পুত্রশোক আসে। কন্যার উচ্চশিক্ষার অনুরোধে তাকে নিয়ে তার জননী সাগরপারে যান ও তার সঙ্গে থাকেন।

বরকত আলী গুপ্ত একদিন বিমোহিত হয়ে দেখেন অসির ধার দিয়ে তাঁর জন্মভূমিকে দু খানা করা হয়েছে। বরকত আলীকে নিয়ে এক নেশন, গুপ্তকে নিয়ে আরেক নেশন। এরই নাম নাকি দেশের স্বাধীনতা। যার জন্যে তিনি একদিন মহাজ্ঞানন্দের সঙ্গে দুর্গম গিরি কান্তার মরু লঙ্ঘন করেছিলেন।

জোড়-বিজোড়

রাজধানীতে গেলে আমার সন্ধ্যাবেলাটা কাটে পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন মালিকদম্পতি। স্বামী পাঞ্জাবী, স্ত্রী বাঙালী। মিসেস মালিক জানতে চাইলেন কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কার কার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কয়েকজনের নাম করি। শেষে বলি, 'শুনছি শোভাকররা এখন এখানে। তাঁদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।'

'না, না, ওঁদের সঙ্গে দেখা না করাই ভালো।' মিসেস মালিক বিষণ্ণভাবে বলেন। 'ওঁরা এখন একটা সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন। বিব্রত হবেন।'

'সঙ্কট!' আমি শঙ্কিত হয়ে বলি, 'তাহলে তো একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। গুরুতর অসুখ বুঝি! কার অসুখ?'

মিসেস মালিকের পাশে বসেছিলেন তাঁর বান্ধবী মিসেস রাও। স্বামী মহারাষ্ট্রীয়, স্ত্রী বাঙালী। দু'জনের দিকে চেয়ে চোখের ভাষায় শুধান, কী বলা যায়?

'আচ্ছা, পরিতোষবাবু,' বাঁশরী মালিক বলেন, 'আপনি তো ওঁদের পুরনো বন্ধু। আপনাকে জানাতে দোষ কী? আর কাউকে জানাবেন না কিন্তু। জানেন তো দিল্লীর সমাজ কী ভীষণ!'

আমরা সবাই পরস্পরের কাছাকাছি সরে আসি। মিসেস মালিক যা বলেন তার মর্ম শোভাকরদের কন্যা ঊর্মি তার স্বামী যোশিকে ছেড়ে এক ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে পালিয়ে যায়। যোশীর মতো সজ্জন এ সংসারে ক'জন! সে ক্ষমা করে ও ধৈর্য ধরে। ঊর্মির কিন্তু লেশমাত্র আগ্রহ ছিল না ফিরে আসতে। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে বিবাহভঙ্গের যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। সুতরাং যোশী যেন তাকে ডিভোর্স করে। ডিভোর্সের মামলার রুদ্ধকক্ষে শুনানী হয়। প্রতিবাদীরা হাজির হন না। ডিভোর্স মঞ্জুর হয়।

উভয়পক্ষই এখন নিষ্কণ্টক। ঊর্মি বিয়ে করছে অ্যালেনকে। আর যোশীও নাকি এক জার্মান মেয়েকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে। এখন সমস্যা হয়েছে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে। মা যদি তাদের ভার পায় তবে ইংরেজ সৎবাপ তাদের আদর করবে না। বাপ যদি তাদের ভার পায় তবে জার্মান সৎমা তাদের আদর করবে না। মিসেস শোভাকর ওদের ভার নিতে রাজী, মিসেস যোশী অর্থাৎ যোশীর মা যদি আপত্তি না করেন। লজ্জায় অপমানে ভাবনা চিন্তায় ডকটর ও মিসেস শোভাকর এখন জর্জর। কেউ দেখা করতে গেলেই তো প্রশ্ন করবেন, ঊর্মি কেমন আছে? কী উত্তর দেবেন?

মালিক বলেন, 'ঊর্মির বিয়েটা বোধহয় আজকালের মধ্যেই হচ্ছে।'

রাও বললেন, 'যোশীর বিয়ের কিন্তু দেরি আছে। বাচ্চা দুটির সুব্যবস্থা না করে ও বিয়ে করতে পারছে না।'

শোভাকরদের কথা ভেবে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। কী বলে সান্ত্বনা দিই তাঁদের! কত আশা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। যোশীও উচ্চপদস্থ অফিসার। ইংরেজটি তাঁরই সহকর্মী ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় অবসর নিয়ে এক বিলিতী কোম্পানীর ম্যানেজার হয়েছে। বছরে দু'বার করে বিলেত যায়। ঊর্মি হয় তার সহযাত্রিণী। যোশী তো ওকে একবারও বিলেত নিয়ে যেতে পারেনি।

গালে হাত দিয়ে বাঁশরী মালিক বলেন, 'সত্যি, পরিতোষবাবু, কেন এরকম হয়?'

একই প্রশ্ন মিসেস রাওয়ের মুখে। তাঁর চোখ ছলছল করে। 'কেন এরকম হয়?'

আরো দু'জন মহিলাও সেখানে ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি আমারই দিকে। করুণ দৃষ্টি। তাঁরাও বোধহয় জানতে চান কেন এরকম হয়।

'ওসব হলো মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। আমি ওর কী জানি?' আমি দুঃখ প্রকাশ করি।

'না, না, আপনি ঠিক জানেন। আপনি নামকরা সাহিত্যিক। আপনার মতো লোকের কাছেই তো আমরা এর ব্যাখ্যা আশা করি।' মিসেস মালিক চাপ দেন।

'সাহিত্যিকরা কবে থেকে সবজান্তা হলেন? সত্যি, আমরা এর ব্যাখ্যা জানিনে। প্রেম যখন আসে তখন বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কেউ বাঁচে। কেউ মরে। একজনের বেলা কমেডী। আরেকজনের বেলা ট্র্যাজেডী। সমাজের নিন্দা প্রশংসাটা সমাজের সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে। প্রেম কি তার পরোয়া করে? করলে কি ইলিয়াড লেখা হতো? না শকুন্তলা? তবু তো ভালো যে আজকাল ডিভোর্স সম্ভব হয়েছে। নইলে আরো কেলেঙ্কারি হতো। যোশীরও কি আবার বিয়ে করবার উপায় থাকত?' আমি সান্ত্বনাবাণী শোনাই।

আমার পাশে বসেছিলেন আমার বন্ধু তালুকদার। তিনি রসিকতা করেন। লোকে যা বলে সেটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বলেন, 'যার যাতে মজে প্রাণ। কী ইংরেজ কী জার্মান!'

সকলের মুখে হাসি ফোটে। এরপরে আমরা খাবার ঘরে যাই ও টেবিলের চারপাশে আসন

নিই। সবশুদ্ধ আটজন।

আমার পার্শ্ববর্তিনী ছিলেন ডানদিকে কুমারী ছায়া দত্ত। আর বামদিকে তাঁর মাসী শ্রীমতী সুরুচি রাও। কথাবার্তা যা হলো তা শ্রীমতীর সঙ্গেই। কুমারীর মুখখানি আঁধার। ছায়া যেন কেবল নামে নয়, মুখে। রংটাও মলিন। মাসী কিন্তু ধবধবে ফরসা, তেমনি রূপবতী। কিন্তু বয়স হয়েছে সেটা ঢাকতে চান।

আলাপ করে জানতে পারি যে ছায়ার বাবা কলকাতার ডাকসাইটে ব্যারিস্টার জি এইচ ডাট। একদা আমাকে তাঁর বাড়ির গার্ডেন পার্টিতে আমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে বা মেয়েকে সেখানে দেখিনি। অত বড়ো ব্যারিস্টারের কন্যা কেন যে দিল্লীতে মাসীর কাছে থাকে ও সামান্য চাকরি করে তার মর্মভেদ করতে পারিনে। ফেরবার পথে আমার বন্ধু তালুকদারকে জিজ্ঞাসা করি।

'জানো না বুঝি?' তালুকদার উত্তর দেন, 'ছায়ার মা বাবার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তাই ওর মুখ অমন ছায়াচ্ছন্ন। ও প্রতিজ্ঞা করেছে যে বাপের সঙ্গে সংস্রব রাখবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এতদিন মার কাছেই ছিল লণ্ডনে। এখন মাসীর কাছে এসেছে। মাসীর ইস্কুলে পড়ায়। আরো ভালো চাকরির সন্ধানে আছে।'

'বলো কী হে, আবো এক ডিভোর্স! প্রেমের বন্যায় ভেসে গেল কে? স্বামী না স্ত্রী?' আমি আশ্চর্য হই।

'তা তো জানিনে। বাপের সাহায্য নিচ্ছে না, এর থেকে অনুমান হয় বাপেরই দোষ। প্রেম কেন বলছ? প্রেমের একটা বয়স আছে। পঞ্চাশোর্ধ্বে লোকে বানপ্রস্থ যায়। প্রেমের বানে ভেসে যায় না।' বন্ধু রসিকতা করেন।

এরপর ওঠে মাসীর প্রসঙ্গ। আমি ওঁর আর ওঁর স্বামীর প্রশংসা করি। বিদ্যা আর সুন্দর মিলে যেমন বিদ্যাসুন্দর তেমনি সুন্দরী আর বিদ্বান মিলে কী? সুন্দরী বিদ্বান?

'তোমাকে আরো একটা চমক দিতে হচ্ছে।' তালুকদার বলেন, 'রাও ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী।'

'ওঃ! বিধবা হয়েছিলেন বুঝি!' আমি সুবোধ বালকের মতো শুধাই।

'বিধবার বিবাহ আজকাল আর চমকপ্রদ নয়। সধবাবিবাহই চমকপ্রদ। তার মানে আরো এক ডিভোর্স। কার দোষে, জানিনে। আর দোষটাও তো আজকাল গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চমকটাও বেশিদিন থাকবে না।' বন্ধু ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

'বলো কী হে? আরো একটা ডিভোর্স। এক সন্ধ্যায় তিন তিনটে বিবাহভঙ্গ? এর পরে হয়তো শুনব যে মালিকরাও সেই তালে আছেন।' আমি আঁধারে ঢিল ছুঁড়ি।

'না, না। তার কোনো সম্ভাবনা নেই।' তালুকদার আমাকে আশ্বাস দেন। 'তবে বলা যায় না। মালিককে মাঝে মাঝে পরকীয়ার সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। সেটাই তো এখনকার ফ্যাশন।'

কুলদীপ সিং মালিক সুপুরুষ। বিয়ে ভেঙে গেলে তাঁর আবার বিয়ে হবে। ভাবনা তাঁর জন্যে নয়। তাঁর রুগ্ণা স্ত্রীর জন্যে। যদিও অশেষ গুণবতী।

।। দুই ।।

এব বছবখানেক বাদে দার্জিলিং যাই সপবিবাবে বেডাতে। হঠাৎ দেখা হযে যায় ম্যালে কলকাতাব ব্যাবিস্টাব জি এইচ ভাটেব সঙ্গে। তিনি একটু এগিযে এসে হাতে হাত মেলাতেই আমি আমাব স্ত্রীব সঙ্গে পবিচয কবিযে দিই। তখন তিনিও আমাদেব নিযে গিযে পবিচয কবিযে দেন তাঁব স্ত্রীব সঙ্গে। তাবপব তাঁবা লোকেব ভিডে হাবিয়ে যান। আমবাও। দার্জিলিং-এ আব তাঁদেব সঙ্গে দেখা হয না

কী রূপ। কী রূপ। ধাঁধিযে দেয। এত বযস হযেছে, তবু কী চার্মিং। এব মতো নাবীব জন্যে মুনিদেবও মতিভ্রম হয, ব্যাবিস্টাব কোন ছাব। গৌববর্ণা সুতনুকা দীর্ঘাঙ্গী সেই ললনাব বযস বোধ হয পঁযতাল্লিশেব কাছাকাছি এতদিন কি তিনি অনূঢা ছিলেন? কে জানে। দার্জিলিং-এব বন্ধুবা কেউ এঁদেব চিনতেন না। এঁবা কলকাতা থেকে বেডাতে এসেছিলেন গ্রীষ্মেব মবসুমে।

আবো বছবখানেক বাদে একদিন আকস্মিকভাবে বহস্যভেদ হয কলকাতায নয, যেখানে আমি থাকি সেখানে শান্তিনিকেতনে ঘবে বসে।

কলকাতা থেকে সুষমা সর্বাধিকাবী মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসেন। উৎসব দেখতে। আমাদেব সঙ্গে দেখা কবে যান। আমাব স্ত্রীব সঙ্গে তাঁব অনেকদিনেব বন্ধুতা। একদিন চা খেতে খেতে সন্ধ্যা পেবিযে যায। তিনজনে আমবা অন্ধকাবে বসে গল্প কবি।

কথাটা ওঠে তাঁব পবলোকগত স্বামীব প্রসঙ্গে ভদ্রলোক এত গুণবান হযেও সাফল্যেব মুখ দেখে যেতে পাবলেন না তাঁব সঙ্গে তুলনা হয না এমন ব্যাবিস্টাব এখন প্রফেসনেব শিখবে। ভাগ্য। ভাগ্য।

আমি তামাশা কবে বলি হযতো বৌ ভাগ্য থেকে সৌভাগ্য।

তিনি সেটা গাযে পেতে নেন। সত্যিই তো। আমাব মতো চেহাবা কি বড ব্যাবিস্টাবেব ঘবে মানায। কেমন কবে এন্টাবটেন কবতে হয তাও কি জানতুম।

'আমাকে মাফ কববেন, মিসেস সর্বাধিকাবী। আপনাব কথা মনে কবে বলিনি।

আমি দুই হাত জোড কবি।

তিনি প্রসন্ন হযে অভয দেন। 'কথাটা কিন্তু যেলনা নয মিস্টাব দেব। বাঁদবেব গলায মুক্তোব হাব বাঁদবকেও ডাবনেব খেলায জিতিযে দেয। এবাব তো সে মুক্তোব হাব ছিডে ফেলে হীবেব হাব পবেছে। উঠবে। উঠবে। আবো উঁচুতে উঠবে।'

সর্বাধিকাবী, ঘোষাল ও দত্ত তিন বন্ধুতে মিলে বিলেত যান ব্যাবিস্টাব হতে। সর্বাধিকাবী সবচেযে জ্ঞানী, ঘোষাল সবচেযে ধনী, দত্ত সবচেযে চতুব। প্রথম দুজন বিবাহিত।

ঘোষালেব বিযে হযেছিল শ্যামবাজাবেব একটি বনেদী পবিবাবে। ও বাডিব ধনভাণ্ডাব শূন্যেব কোঠায, কিন্তু রূপসম্ভাব অফুবন্ত। ওদেব এক একটি মেযে এক একটি ডানাকাটা পবী। তেমনি সামাজিকতায সিদ্ধহস্ত। দত্তব উচ্চাভিলাষ ওই বাডিব একজনকে বধূরূপে পাওযা। কী কবে সেটা সম্ভব। ওঁবা ব্রাহ্মণ, এবা কাযস্থ। ওবা বনেদী, এবা ভুইফোড। দত্তব বংটাও ফবসা নয। তবে ওঁব চেহাবায একটা ব্যক্তিত্বেব ছাপ ছিল। কথাবার্তায মুগ্ধ কবে বাখতেন। ইংবেজীতে যখন সওয়াল কবতেন ইংবেজ জজসাহেববাও চমৎকৃত হতেন। বছব পাঁচেকেব মধ্যেই তিনি তাঁব সমবযসীদেব মাথা ছাডিযে ওঠেন।

ঘোষালেব স্ত্রীব নাম সুকৃতি। প্রস্তাবটা দত্ত তাঁব কানেই তোলেন। তাব মেজ বোন সুনীতিকে নাকি দত্ত অনেকদিন থেকে ভালোবাসেন। কিন্তু কথাটা পাড়তে সাহস পান না। প্রত্যাখ্যাত হলে তাঁব মানসম্মান থাকবে না। বন্ধুমহলে হাস্যাস্পদ হবেন। একটি মেয়ে তাঁকে জিল্ট কবেছে শুনলে আব কোনো মেয়ে তাঁকে ববমাল্য দেবে না।

সুকৃতিব দৌত্য সফল হয়। সুনীতিও বাজী, তাঁব গুবজনও নিমবাজী। ব্রাহ্মণ কায়স্থেব বিবাহ তো শাস্ত্রীয মতে সম্পন্ন হতে পাবে না। বিয়েটা হলো অবশেষে ব্রাহ্মমতে। হাইকোর্টেব জজ থেকে আবম্ভ কবে বড়ো বড়ো কৌঁসুলীবা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। তাদেব হোমবাচোমবা মক্কেলবাও। গোঁড়াদেব কেউ এলেন না। কিংবা এলেন, অথচ খেলেন না। কনেব বাবা মেয়েব পাশে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েব মাও জামাইকে আশীর্বাদ কবলেন। দত্তব উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হলো।

সুন্দবী হলেও সুকৃতিব মতো সুন্দবী কেউ নয়। না সুনীতি, না সুরুচি। বিধাতা যেন নিখুঁত কবে তাকে গড়েছেন। কিন্তু যে সমাজে তাঁকে মিশতে হয় সে সমাজে ঘোষালেব তেমন প্রতিপত্তি নেই। ব্যাবিস্টাব হিশাবে তিনি নিচুব সাবিতে। তাব বাবা বেখে গেছেন অগাধ সম্পত্তি। তিনি তাই ভোগ কবছেন। ভোগ বলতে যা যা বোঝায় তাব কোনোটিতেই তিনি উদাসীন নন। যদিও ঘবে অমন অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী নাবী।

বিবাহেব প্রথম দশ বছব সুনীতি ঘুণাক্ষবেও টেব পাননি যে তাঁব স্বামীব হৃদয় অন্যত্র ন্যস্ত। সেখানে বাজত্ব কবছেন সুকৃতি। পবে ধীবে ধীবে বুঝতে পাবেন যে দত্ত তাঁকে কখনো চাননি, চেয়েছিলেন তাব দিদিব জন্যে। যাতে দিদিব সঙ্গে মেলামেশাব পথ সুগম হয়। দিদিও সেটা আঁচতে পাবেননি। দত্তকে তিনি স্বামীব বন্ধু হিশাবেই নিয়েছিলেন। কল্পনাও কবতে পাবেননি যে আব কোনো সম্পর্ক সম্ভব। প্রথম পবিচয়েব বছব পনেবো বাদে টেব পান যে তিনিই তাব স্বামীব বন্ধুব হৃদয়েব বানী। তখন থেকে তাঁব প্রভাব এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা কবেন। কিন্তু স্বামীব মতিগতি দেখে তাবও ধাবণা জন্মায় যে বিয়েটা ব্যর্থ হয়েছে।

তিন বোনেব মধ্যে সুরুচি ছিলেন সব চেয়ে শিক্ষিতা, সব চেয়ে মার্জিত, সবচেয়ে অ্যাকমপ্লিশড। এ বিষয়ে কাবো সন্দেহ ছিল না যে তাব খুব ভালো বিয়ে হবে। তাব নিজেব পছন্দ রুদ্র বলে এক বয়স্ক ডাক্তাব, তিনি আবাব খৃস্টান। এক বোনেব যখন অসবর্ণ বিয়ে হয়েছে তখন আবেক বোনেব অসবর্ণ বিয়ে হবে না কেন? না বাবাব মত ছিল না। কিন্তু দাদাবা আধুনিক। তাদেব একজন মেম বিয়ে কবেছেন। তিনি নিজে খ্রীস্টান। সেই নজীবে বোনেবও বিয়ে হয়ে যায় খ্রীস্টানেব সঙ্গে। স্ত্রীব প্ররোচনায় স্বামী যান বিলেতে উচ্চতব শিক্ষাব জন্যে। স্ত্রীও সাথী হন। ওখানে গিয়ে সুরুচি তিন চাব বকম ট্রেনিং নেন। এমন সময় যুদ্ধ বেধে যায়। রুদ্র দম্পতি দেশে ফিবতে পাবেন না। আটকা পড়েন। সেইখানেই তাঁদেব একটি মেয়ে হয়।

যুদ্ধেব শেষে যখন দেশেব জন্যে সুরুচি হোমসিক তাঁব স্বামী বলেন তিনি বিলেতেই বাড়ি কিনে বসবাস কববেন। প্যানেল কিনে প্র্যাকটিস কববেন। দেশেব চেয়ে বিলেতেই আবো সুবিধে। আবো বেশি আয়। সুরুচি তাতে সায় দেন না। মেয়েকে যদি ভাবতীয় ধবনে মানুষ কবতে না পাবেন তবে তাব ভবিষ্যৎ অন্ধকাব। এই নিয়ে যে মতভেদ দেখা দেয় তাব নীট ফল হয় ছাড়াছাড়ি। ডাক্তাব তাঁব প্র্যাকটিস ছেড়ে তাব পেসেন্টদেব ফেলে ভাবতে আসতে পাবেন না। সুরুচি তাব প্রতিষ্ঠিত কিণ্ডাবগার্টেন ছেড়ে তাঁব ছাত্রছাত্রীদেব ফেলে বিলেতে যেতে পাবেন না। মিলনেব কোনো আশা নেই বুঝতে পেবে দু'জনেই স্থিব কবেন যে বিবাহবিচ্ছেদই শ্রেয়। সুরুচি তাব একটা কাবণও দেন। যশোবন্ত বাও বলে একজন মহাবাষ্ট্রীয অধ্যাপকেব সঙ্গে তাব বিলেতেই আলাপ হয়েছিল। কলকাতায় সেটা ঘনিষ্ঠতায় পবিণত হয়। বাও যখন দিল্লীতে চাকবি পান সুরুচিও তাঁব সঙ্গে যান

ও স্বামীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা একই হোটেলে বাস করছেন।

ডিভোর্সের পর সুরুচি আইনত মিসেস রাও হন। কিণ্ডারগার্টেনটা দিল্লীতে উঠিয়ে নেন। রাজধানীতে তার প্রচণ্ড চাহিদা। গীত বাদ্য নৃত্য চিত্রকলা সব কিছুরই সেখানে হাতেখড়ি হয়। নিজের মেয়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা ক্লাস জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের জুনিয়ার কেমব্রিজের জন্যে তৈরি করে দিতে পাবা যাবে।

এর পরে মেজদি বলেন তিনি ডিভোর্স করবেন তাঁর স্বামীকে। মেয়েকে নিয়ে বিলেত চলে যাবেন ও সেইখানেই বসবাস করবেন। দত্ত তাঁকে যথেষ্ট কারণ দিয়েছিলেন। পরের বৌকে নিয়ে প্রায়ই তো মোটরে করে ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে যাওয়া হত। কান্তি ঘোষাল জানতেন, মোহিত সর্বাধিকারী জানতেন, অন্যান্য ব্যারিস্টার জানতেন। জজসাহেবরাও জানতেন। একদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে ডিভোর্সের মামলাব শুনানী হয়। সুনীতি মুক্তি পান। গৌরহরিও। মনের আনন্দে দত্ত তাঁর ভূতপূর্ব পত্নীকে মুক্তহস্তে নিষ্ক্রয় দিয়ে বিলেত রওনা করে দেন। কন্যাকে দেন মোটা মাসোহারা। আব এদিকে চেষ্টা কবেন তাঁর বন্ধু কান্তি ঘোষালকে যথেষ্ট কারণ যোগাতে। যাতে তিনিও আব একটি ডিভোর্সেব আবেদন করেন। সুকৃতিব বিরুদ্ধে।

সেটা কিন্তু কঠিন ব্যাপাব। সুকৃতিব বিয়ে তো ব্রাহ্ম বা খ্রীস্টান আইন মতে হয়নি, হয়েছে হিন্দুশাস্ত্র মতে। হিন্দু আইনেব সংশোধনের প্রস্তাব শিকায় ঝুলছে। তাতেও এমন কোনো কথা নেই যে স্ত্রী বা স্বামী অন্যেব সঙ্গে গেলে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ ঘটাবে। শেষপর্যন্ত দত্ত করলেন কী, সুকৃতিকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন পাকিস্তানে। সেই ইসলামী রাষ্ট্রে সুকৃতি ইসলামে দীক্ষা নেন ও স্বামীকে আহ্বান করেন ইসলামেব আশ্রয় নিতে। স্বামী সে আহ্বান গ্রাহ্য না করায় তিনি সেই বিধর্মীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেন। ইতিমধ্যে গৌবহরিও কলমা পড়ে তাঁর স্বধর্মী হয়েছিলেন। তাই সহজেই তাঁদেব নিকা হয়ে যায়। তাব পরে তাঁবা ঢাকা থেকে কলকাতা ফিরে আসেন। আর্যসমাজীবা তাঁদেব বৈদিক মতে শুদ্ধি করেন। নিকাটা যে কেমন করে সিদ্ধ হলো সেটা একটা রহস্য।

ওসব আইনেব কথা ছেড়ে দিয়ে মানবিক দিক থেকে দেখলে তাঁরা সত্যি স্বামী স্ত্রী। কলকাতাব কসমোপলিটান সমাজ সেটা মেনে নিয়েছে। তাঁদেব দেওয়া পার্টিতে সবাই যান। সকলের দেওয়া পার্টিতে তাঁদেরও দেখতে পাওয়া যায়। ক্যালকাটা ক্লাবেব তাঁবাই তো প্রাণ। ঘোষাল যে বিশেষ কাতর তাও তো মনে হয় না। বাড়িতে বৌ থাকতে যেটুকু চক্ষুলজ্জা ছিল সেটুকুও এখন নেই। তিনি কিন্তু ইচ্ছা করলেও আরেকটা বিয়ে করতে পারবেন না, কারণ হিন্দু মতে তাঁর বিবাহভঙ্গ হয়নি। লোকচক্ষে সুকৃতি এখনো তাঁব স্ত্রী। এক স্ত্রী থাকতে আরেক স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে। করতে হলে এখনি করতে হয়। বিয়ে না করেও কি সুখী হওয়া যায় না? যদি বান্ধবীর অভাব না থাকে। বৌভাগ্য না থাক, বান্ধবীভাগ্য তো আছে।

দত্ত আবার বিয়ে করেছেন শুনে তাঁর ভূতপূর্ব পত্নী সম্পূর্ণরূপে দ্বিধামুক্ত হন। তাঁর ডাক্তার ভগ্নীপতিও ভূতপূর্ব। দু'জনেই নিঃসঙ্গ। প্রায়ই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গসুখ চাইতেন। একদিন তাঁরাও রেজিস্ট্রি করে পুনর্বিবাহিত হলেন। তখন ছায়া বেচারীর মুখে আরো এক পোঁচ কালো ছায়া পড়ল। ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো দিল্লীতে ওর মাসীর কাছে। ও এখন মাসীর ইস্কুলে মাস্টারি করে। ওর দেশি ডিগ্রী আছে, একটু চেষ্টা করলে ভারত সরকারেব কোনো একটা বিভাগে কাজ পেয়ে যাবে।

।। তিন ।।

সুষমা সর্বাধিকারী যখন তাঁর কাহিনী শেষ করেন তখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। তার ম্লান আলোয় লক্ষ করি ভদ্রমহিলার চোখে জল।

'কেন, আপনার চোখে জল কেন? কার জন্যে বেদনা বোধ করছেন? ছায়াও সুখী হবে একদিন। দিল্লী মানেই হিল্লি। মানে হিল্লে। পাঞ্জাবীরাই লুফে নেবে। কলকাতা নয় যে চড়া বরপণ লাগবে।' আমি আশ্বাস দিই।

তিনি সান্ত্বনা পান না। 'ছি ছি! মেয়েমানুষের দু-দুবার বিয়ে! জন্মেও শুনিনি। এখন থেকে এটাই কি ডালভাত হবে?'

আমি আরো কয়েকটা গল্প জানতুম। হিন্দু মতে বিবাহবিচ্ছেদ চলতি হয়নি বলে বেচারীরা কালীঘাটে গিয়ে মনকে চোখ ঠারা গোছের বিয়ে করেছে। তাও তো অনেকে মেনে নিয়েছে। মুশকিল বাধবে ছেলেমেয়ে জন্মালে। জনমত বদলালে আইনও বদলাবে।

একটার পর একটা ট্র্যাজেডী কেমন করে কমেডী হয়ে গেল ভেবে অবাক হয়ে যাই আমি। এমন তো সাধারণত হয় না। বিবাহবিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ কি অত সহজ!

'আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি', আমি মন্তব্য করি, 'পিরান্দেল্লোর ছ'টি চরিত্রের মতো এঁরাও সাতটি চরিত্র। এঁরাও একজন নাট্যকারের সন্ধানে ঘুরছেন। এঁদের নিয়ে দিব্যি একখানি নাটক হয়। নাটকের শেষে সাতটি পাত্রপাত্রী মঞ্চের উপর হাত ধরাধরি করে দাঁড়াবেন। প্রথমে ঘোষাল। তার বাঁ হাত ধরে সুকৃতি। তার বাঁ-হাত ধরে দত্ত। তার বাঁ হাত ধরে রুদ্র। তাঁর বাঁ-হাত ধরে সুরুচি। তাঁর বাঁ হাত ধরে রাও। সুকৃতির এক হাত ঘোষালের হাতে, আরেক হাত দত্তর হাতে। দত্তর এক হাত সুকৃতির হাতে, আরেক হাত সুনীতির হাতে। সুনীতির এক হাত দত্তর হাতে, আরেক হাত রুদ্রর হাতে। রুদ্রর এক হাত সুনীতির হাতে, আরেক হাত সুরুচির হাতে। সুরুচির এক হাত রুদ্রর হাতে, আরেক হাত রাওয়ের হাতে। বিজোড় কেবল ঘোষাল। আর সবাই জোড়। জোড়দের মধ্যেও রাও ছাড়া আর সবাই দ্বিজোড়।'

মহিলারা শুনে আমোদ পান কি ব্যথা পান বোঝা গেল না। আমি তখন আমার নাট্যকল্পনায় বিভোর। তবে, হ্যাঁ, সন্তানদের বড়ো দুঃখ! আমার নাটকে আমি তাদের আনতে চাইনে। আনলে দর্শকদের চোখে জল আসবে। আর কান্তি ঘোষালকে আমি বিজোড় রাখতে নারাজ। ওঁর বান্ধবীরা কেউ কি ওঁর ডান হাত ধরবেন না?

উত্তরজীবন

সেই সাহিত্যের আসরে বন্ধুবর বিভাসও ছিলেন। তাঁকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলি, 'তোমার ধারাবাহিক উপন্যাসের নায়িকার নাম পড়ে আমি চমকে উঠেছিলুম। বাঙালীর মেয়ের বিলিতি নাম তো হাজারে একজনেরও হয় না। মাত্র একজনকেই আমি চিনতুম যার নাম ডেইজী। পড়তে পড়তে

ধবে ফেলি যে এ সেই মেয়ে। পদবীটা তুমি পালটে দিয়েছ, নামটা অবিকল তাই। তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে এদেশে এমন কেউ নেই যে তোমাব ভেইজীকে চিনত। কিন্তু ওব পূর্বজীবন সম্বন্ধে কিছুই আমাব জানা ছিল না। তোমাব লেখা পড়ে আমাব চোখেব ওপব থেকে পর্দা সবে গেল। সত্যি কী অপূর্ব ছবি তুমি এঁকেছ বিভাস! আমাব পূর্ব ধাবণা বদলে গেছে। শ্রদ্ধা আমি ওকে আগেও কবেছি। কিন্তু পূজা এই প্রথম। ধন্য তুমি, ধন্য তোমাব উপন্যাসেব নাযিকা। কাব মধ্যে কী মহত্ত্ব লুকিয়ে থাকে তা কি সাধাবণ জীবনে প্রকাশ পায়? প্রকাশেব জন্যে চাই আকস্মিক কোনো ঘটনা। তুমি ছিলে সেই ঘটনাটিব সাক্ষী। তুমি যদি না দেখতে ও না দেখাতে তা হলে অর্ধ শতাব্দী পবে আমিও কি দেখতে পেতুম? আচ্ছা, বিভাস ওব পববর্তী জীবন অবলম্বন কবে কিছু লিখবে?'

বিভাস আমার হাতে চাপ দিয়ে বলেন, 'ওই ঘটনাব পবে ভেইজী বিলেত ফিবে যায়। আমাবও তো বিলেত যাবাব অভিলাষ ছিল। তা তো আব হলো না। পববর্তী জীবন আমাব অজানা। আমাব দৃষ্টিপথ থেকে ও সবে যায়।'

'পরে আবেকজনেব সঙ্গে ওব বিয়ে হয়েছিল, শোননি?' আমি জিজ্ঞাসা কবি।

'তাই নাকি! কোথায়, কবে? ওদেশে না এদেশে?' বিভাস আশ্চর্য হন।

'এই দেশেই। বছব দশেক বাদে। তখন আমি আবিষ্কাব কবি যে ওব স্বদেশী নাম সুলেখা। তুমি জানতে? উপন্যাসেব কোনোখানে তো পাইনি।' আমি বলি।

'না, জানতুম না তো। বিলেতে মানুষ হয়েছিল বলে আমাব ধাবণা ছিল ভেইজী ওব প্রকৃত নাম। সুলেখা। বাঃ! চমৎকাব নামটি তো! জানলে ওই নামটিই ব্যবহাব কবতুম। এখন কথা হচ্ছে তুমি কি ওব উত্তবজীবন নিয়ে কিছু লিখবে? জানো যখন এত কথা। তা হলে আমাব উপন্যাসেবও পাদপূবণ হতো। কবিতাব যেমন পাদপূবণ হতো সংস্কৃত ভাষায় তেমনি উপন্যাসেবও কি হতে পাবে না? একজন খানিকটা লিখে ছেড়ে দেবে, আবেকজন বাকীটা লিখে পূবণ কববে।' বিভাস প্রস্তাব কবেন।

'আমি যদি কিছু লিখতুম তা হলেও শেষকথা হতো না। ও মেয়ে আমাব দৃষ্টিপথ থেকেও সবে যায়। আমি যতটুকু জানি ততটুকু দিয়ে উপন্যাস হয় না। হতে পাবে হয়তো একটা ছোট গল্প। কিন্তু তাতে ওব মহত্ত্ব ফোটানো যাবে না। মানুষেব জীবনে মহত্ত্বেব সুযোগও তো বাব বাব আসে না। সে সুযোগ জুটিয়ে দেয় নিয়তি। লণ্ডন থেকে যে মেয়ে কলকাতা এল ছুটি কাটাতে সে হয়তো বাগ্‌দত্তা হয়ে বিলেতে ফিবে যেত, যাব সঙ্গে বিয়েব সম্বন্ধ হচ্ছিল সে ছেলেটিও বিলেতে গিয়ে ব্যাবিস্টাব কি সিভিলিয়ান হতো। তাব পবে একদিন হতো মধুবেণ সমাপয়েৎ। কিন্তু ঘটল কিনা ঠিক বিপবীত। চাঁদপুবে বেধে গেল কুলীদেব ধর্মঘট। তাদেব দুবদশাব কাহিনী পড়ে ছেলেটি চলল ভলান্টিযাব হয়ে। ওদিকে চট্টগ্রামে থাকেন মেয়েটিব পিতৃবন্ধু। সেখানকাব কমিশনাব। মেয়েটি যাত্রা কবে চট্টগ্রাম অভিমুখে। চাঁদপুবে পৌঁছে খবব পায় ছেলেটি গুর্খাদেব আক্রমণে আহত। মাত্র একদিনেব আলাপ। ভালোবাসাব সঞ্চাব কি অতটুকু পবিচয়ে হয়? তবু দেখতে যায় ছেলেটিকে। অবস্থা দেখে সেবাব ভাব নেয়। সে কী সেবা! চাঁদপুবে চিকিৎসাব সুব্যবস্থা হবে না বলে ছেলেটিকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। সেখানে হাসপাতালে বাখা হয়। মেয়েটি হাসপাতালেই পড়ে থাকে সেবাব ভাব নিয়ে। শহবেব সেবা বাড়ি হলো কমিশনাবেব। আবামে সে থাকতে পাবত ও বাড়িতে। কিন্তু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে তোলাই যে ওব ব্রত। ও যে একালেব সাবিত্রী। যমেব হাত থেকে কেড়ে আনবে ওব সত্যবানকে। আহা, বেচাবী! পুবাণে কি দু'বাব ও বকম হয়েছে? ছেলেটি চলে গেল। যাবাব আগে জেনে গেল যে মেয়েটি ওকে গভীবভাবে ভালোবাসে। মবণকে শান্তভাবেই ববণ কবল। সে মৃত্যুও বীবেব মৃত্যু। মহিমময়।' আমি গদ্‌গদ হয়ে বর্ণনা কবি।

বিভাস নীরবে শুনে যান। আমি আর একটু জুড়ে দিই। 'তোমার কাহিনীর ফাঁকে কী তেজ তুমি ফুটিয়েছ! মেয়েটিও বীরাঙ্গনা। এক স্বদেশীওয়ালার সেবা করারও তো সেদিনকার সাহেবদের চোখে অপরাধ। বিশেষত একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের কন্যার পক্ষে। কিন্তু সাহেবদের মধ্যেও মনুষ্যত্ব ছিল। ওদেরও তুমি মহৎ করে এঁকেছ। মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত করেছ শুধু একজন কমবয়সী বাঙালী সাহেবকে। যিনি ওই গুর্খাদের হুকুম দিয়েছিলেন। মেয়েটির তো ওর উপর জাতক্রোধ হবার কথা। কিন্তু শুনে অবাক হবে যে ওই হাকিমই পরে বড়ো হাকিম হন আর যে স্টেশনে তিনি নিযুক্ত হন সেই স্টেশনেই ওরা তিন বোনে দেশে ফিরে এসে তাঁর কুঠিতে অতিথি হয়। ওদের খাতিরে যে পার্টি দেওয়া হয় সে পার্টিতে আমারও ডাক পড়ে। আমিও সদ্য প্রত্যাগত। পরিচয়টা হয়েছিল লণ্ডনে আরো এক পার্টিতে।'

বিভাস সত্যি অবাক হন। 'ট্র্যাজেডীর মূলে তো মিস্টার মুস্তফী।'

'বলতে পারো তাঁর জনাই সতীশের প্রাণটা গেল। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে তাঁকে হুকুম দিতে হয়েছিল সে পরিস্থিতি তো তুমি আমি দেখিনি। পরবর্তী বয়সে লক্ষ্য করেছি তিনি যেমন ন্যায়পরায়ণ তেমনি দয়ালু। প্রথম দিকে হয়তো খুব কড়া ছিলেন। হয়তো জানতেন না গুর্খারা অতখানি নিষ্ঠুর হবে। ঘটনাটার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি দুঃখিত। নয়তো ডেইজী, লিলি, আইরিস তাঁর অতিথি হবে কেন? তুমি লিখেছ তাঁর বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে। তাঁর স্ত্রীকে আমি দেখেছি। অতি চমৎকার মহিলা।' আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি।

'তা হলে ছবিখানাকে সমাপ্ত করবার পালা তোমারই।' বিভাস আমার চোখে চোখ রাখেন। তিনি যেন তাঁর প্রথম যৌবনে ফিরে গেছেন।

আমিও ফিরে যাই আমার প্রথম যৌবনে। কিন্তু ছবিটি সমাপ্ত করতে নয়। ওটি অসমাপ্ত।

।। দুই ।।

'ওহে সুশান্ত, কাল দুপুরে তোমারও নিমন্ত্রণ আছে। আমাদের সঙ্গে যেয়ো। এখানকার বাঙালীদের সবাইকে খেতে বলেছেন মিস্টার ও মিসেস পালিত।' একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে খবর দেন শৈলেনদা। আমাদের গৃহকর্তা।

আমার বন্ধু অনিলেরও নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা সদলবলে যাই। দাদা, বৌদি ও আমরা দুই বন্ধু। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আরো একজন ছিল। বৌদির ভাই প্রদীপ। লণ্ডনের রাস্তায় শাড়ি অবশ্য প্রায়ই দেখা যেত। ধুতি কিন্তু সেই প্রথম। যতদূর আমি জানি। পালিতরা নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ধুতি পরে আসতে হবে। যে যাই মনে করুক।

পথে সেদিন আমাদের দেখতে ভিড় জমে যায়নি। বরঞ্চ আমরাই ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলুম। মাসটা বোধহয় সেপ্টেম্বর। আমাদের পক্ষে যথেষ্ট শীত। মেয়েরাই জানে কী করে ওরা শাড়ি পরে কাটায়। ঘরের ভিতরে আমরা মাঝে মাঝে ধুতি পরেছি। ধুতি পরলে বেশ দেশের মতো মনে হয়। তা বলে বাইরে বেরোনো! ইংরেজরা কী ভাববে! ইংরেজ না বলে আমরা বলতুম নেটিভ। নেটিভরা কী ভাববে!

পালিতদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। ওই পাড়ারই অপর প্রান্তে। পালিত আমাদের দেশের

বিখ্যাত এক নেতার পুত্র। কট্টর স্বদেশী। তাঁর সহধর্মিণীও আর একটি গান্ধারী। তাই নিজ বাসভূমে পরবাসী। শ্বেতাঙ্গিনী হয়েও শাড়ি পরেন। দু'বেলা স্নান করেন। কী শীত কী গ্রীষ্ম। বাংলাও শিখেছেন। বাঙালীর মুখে ইংরেজী শুনলে বাংলায় কথা বলেন। সেদিন আমাদের মধ্যাহ্নভোজন হলো ভারতীয় ধারায়। বসতে হলো মেজেতে আসন পেতে।

একমাত্র ব্যতিক্রম স্যার সুনীল রায়। প্রায় সিকি শতাব্দী ইনি ইংলণ্ড প্রবাসী। রংটাও নেটিভদের মতো ফরসা। আমি তো প্রথমে এঁকে নেটিভ বলেই ভ্রম করেছিলুম। চেয়ারে বসতে বসতে এমন হয়েছে যে মেজেতে এঁর কষ্ট হয়। পালিত তাই এঁকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দেন। রহস্য করে বলেন, 'স্যার সুনীল, আপনিই আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান। বাংলায় বলতে হবে কিন্তু।'

বাংলা উনি ভালোই বলেন। তবে কথায় কথায় ইংরেজীর ফোড়ন দেন। আমরা হাসি চাপি। স্যার সুনীল কিন্তু ভোজনের বেলা বিশুদ্ধ বাঙালী। প্রত্যেকটি পদ চেয়ে নিয়ে খান ও খেয়ে তারিফ করেন। সুক্তো থেকে শুরু করে দই সন্দেশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি তাঁর প্রিয়। পোশাক সাহেবদের মতো, রুচি কিন্তু বাঙালীদের মতো। কাঁটা চামচ সরিয়ে রাখেন। হাত লাগিয়ে না খেলে কি তৃপ্তি হয়!

লেডী রায় ও তাঁদের তিন কন্যার সঙ্গে সেইদিনই আমার পরিচয়। মেয়েদের নামগুলো শুনে আশ্চর্য হই। এঁরা তো খ্রীস্টান নন, তবে তিন কন্যার নাম কেন ডেইজী, লিলি ও আইরিস? তিনটি প্রসিদ্ধ ফুল। হতে পারে ওঁরা ফুলের মতো দেখতে। বড়ো ও মেজ দুই বোন পেয়েছেন বাপের চেহারা ও রং। ছোটটি মায়ের মতো। অতটা ফরসা নন, তবে আরো সুন্দর। তিনজনই প্রাণবন্ত। তিনজনেই তন্বী। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে পেট ভরে খেতেই চান না। একটু মুখে দিয়েই সরিয়ে রাখেন! মা কিন্তু আর তন্বী নন। তবু মোটের উপর সুগঠিতা। আহারে তাঁর অনীহা। পাছে ফিগার নষ্ট হয়ে যায়। কন্যাদের উপর তাঁর প্রখর দৃষ্টি।

নাম ছাড়া কিছুই ওঁদের বিদেশী ছিল না। তবে আজন্ম বা আশৈশব ইংলণ্ডে মানুষ হওয়ার ফলে ইংরেজীই ছিল এঁদের কাছে আরো স্বাভাবিক। মেয়েদের সারিতে ওঁরা আর ছেলেদের সারিতে আমরা মুখোমুখি বসে কখনো বাংলায় কখনো ইংরেজীতে বাক্যবিনিময় করছিলুম। ওঁদের মধ্যে মুখরা ছিলেন আইরিস, একটা কথার উত্তরে দশটা কথা শুনিয়ে দেন। লিলি একেবারেই নীরব। চাউনিটিও করুণ। গড়নটিও রোগা। ডেইজীকে মনে হয় ভারিক্কি। বয়সের তুলনায় গম্ভীর। সমীহ না করে পারিনে। কার কত বয়স বলা শক্ত। তবে আমার অনুমান ডেইজী আমার সমবয়সিনী। আমি তখন পঁচিশ বছরে পড়েছি। কন্যাটির সঙ্গে এই বিষয়ে আমার মিল। আর সব বিষয়ে অমিল বাইরের দিক থেকে। আমি সেইজন্যে বিশেষ আগ্রহ বোধ করিনি। তাঁর সম্বন্ধে যেমন আমি আমার সম্বন্ধে তেমনি তিনি। আগ্রহ যেটা লক্ষ করলুম সেটা তাঁর মায়ের।

তাঁর ভাবে ভরা মোহনীয় বড়ো বড়ো দুটি চোখ তুলে আমার দিকে তিনি তাকান। ভোজের পর কাছে এসে দুটি একটি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি এখানে কী পড়তে এসেছি, কোথায় পড়ি ইত্যাদির উত্তর দিতে হয়। তা শুনে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে আবার দেখা হবে। তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার একবার পরিচয় হয়েছিল। কলেজের সোশিয়ালে। জানতেন আমি এখানে কী করি। তিনিও আশা করেন যে দেশে ফিরে যাবার আগে আরো একবার দেখা হবে।

সন্ধ্যাবেলা শৈলেনদা দুষ্টু হাসি হেসে বলেন, 'কি হে! রানীকে কেমন লাগল?'

'রানী? কোন্ রানী?' আমি তো বিমূঢ়।

'লেডী হবার আগে রানী ছিলেন যিনি।' তিনি রহস্যময় করে বলেন।

বৌদি আমাকে বুঝিয়ে দেন যে লেডী রায় একদা রানী কিরণময়ী ছিলেন। দেশের লোক

এখনো তাঁকে সেই নামেই চেনে।

আমার মনে পড়ে যায় যে ছেলেবেলায় রানী কিরণময়ীর কবিতার বই আমি দেখেছি। সোনার জলে নাম লেখা। ইনি কি তিনি?

'তিনিই। বাল্যকালে জমিদারের ঘরে বিয়ে হয়েছিল। তাদের রাজা খেতাব। পনেরো ষোল বছর বয়সে বিধবা হন। চোখের জলে কবিতা লিখে দেশবাসীকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে দেন। বছর পঁচিশ বয়স যখন, তখন ঘটে যায় এক অঘটন। রাজবাড়ির প্রাচীর টপকে রানী পালিয়ে যান গঙ্গার ধারে। সেখান থেকে জাহাজে করে বিলেত। যাঁর সঙ্গে ইলোপ করেন তিনি রাজা না হলেও রাজশ্যালক। অবশ্য সেই রাজার নয়। বিলেতে তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। পারিবারিক প্রভাবে চাকরিও জুটে যায়। বিলেতেই তাঁরা বসবাস করেন। মহাযুদ্ধের সময় তাঁদের বহুমূল্য সহযোগিতার প্রতিদানে তাঁরা হন স্যার সুনীল ও লেডী রায়।' শৈলেনদা বলেন ফূর্তি করে।

বৌদি বলেন, 'বিলেতে বাস করে সবই মিলে যায়। মেলে না কেবল জামাই। তার জন্যে তাঁরা দেশের মুখাপেক্ষী। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে দেশে যাওয়া আসা করতে হয়। মেয়ে তিনটি এখনো পাত্রস্থ হয়নি বলে বাপমায়ের মনে যা দুঃখ তা বাঙালী বাপমায়েরই মতো। তার জন্যে তাঁরা বাঙালীয়ানা করতেও রাজী। নয়তো সাহেবিয়ানায় তাঁদের জুড়ি নেই। শুনলে তো তিন বোনের নাম। আচ্ছা, সুশান্ত, কোন্‌জনাকে তোমার সব চেয়ে পছন্দ? যদি কিছু মনে না করো।'

জানতুম বৌদির কোথায় দুর্বলতা। আমার জন্যে তিনি সম্বন্ধ করতে চান, কতকটা মেয়েলী শখের খাতিরে। আগেও করেছেন।

আমি কি সহজে ধরাছোঁয়া দিই! জানি যে একজনকে কথা দিলে আর কারো প্রেমে পড়া যায় না। আমার প্রেমের স্বাধীনতা আমি বিবাহের জন্যে বিকিয়ে দেব? কিন্তু বৌদি তা শুনে রাগ করবেন। বলি, 'সবাইকে আমার সবচেয়ে পছন্দ।'

দাদা হোহো করে হেসে ওঠেন। 'তার মানে তুমি সকলের সঙ্গেই ফ্লার্ট করতে চাও? তারপর দেশে ফিরে গিয়ে গুরুজনের নির্বন্ধে লক্ষ্মীছেলের মতো বিয়ে।'

'ধিক, ধিক, সুশান্ত। ধিক তোমাকে।' বৌদি সে হাসিতে যোগ দেন।

'এমন সুযোগ হাতে পেয়েও তুমি হাতছাড়া করলে। ওদের একজনকে বিয়ে করলে তুমি কত উঁচুতে উঠতে। তোমার শাশুড়ী হতেন রানী বা লেডী। তোমার পিসশাশুড়ী হতেন মহারানী। বাকিংহাম প্যালেস থেকে তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ আসত। ভাইসরয়েস হাউস থেকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ। গভর্নমেন্ট হাউস থেকে ডিনারের নিমন্ত্রণ। বিশ বছর যেতে না যেতে তুমি হতে স্যার সুশান্ত ঘোষ।'

এর পরেও যতবার ও প্রসঙ্গ উঠেছে বৌদি বলেছেন, 'এই ছেলে! এখনো সময় আছে। বলতো চেষ্টা করি। কিন্তু কোন্‌টিকে তুটি চাও?'

'কোন্‌টি আমাকে চায়?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করি।

তিনি এর জবাব দিতে পারেন না। বলেন, 'খোঁজ নেব নাকি?'

'কাজ কী, বৌদি?' আমি সিরিয়স হয়ে বলি, 'চাকরি করলেও চাকরিতে বেশিদিন আমি থাকব না। একথা শুনলে কোনো মেয়েই আর আমাকে চাইবে না। এঁরাও না। কাউকে মিথ্যে আশা দেওয়া উচিত নয়। দেখবেন, এঁদের প্রত্যেকেরই ভালো বিয়ে হবে। যা যা পেলে মেয়েরা সুখী হয় প্রত্যেকেই তা পাবেন। আমাকে বাদ দিন।'

।। তিন ।।

বছরখানেক বাদে আমার বিলেতের মেয়াদ সারা হয়। আমি দেশে ফিরে আসি ও কলকাতার অদূরে একটি জেলায় নিযুক্ত হই। মুস্তফী সাহেব ছিলেন তখন সেই জেলার উচ্চ পদে। একদিন তাঁর ওখানে কল করি। মিসেস মুস্তফীর সঙ্গেও আলাপ হয়।

আমার অপর বন্ধু হেমন্ত কিছুদিন পরে আমার সঙ্গে যোগ দেন। তিনিও সেইখানে নিযুক্ত। আমরা মাঝে মাঝে মুস্তফীদের ওখানে নিমন্ত্রিত হই। আমরা জুনিয়র, তাঁরা সিনিয়র। আমাদের সভ্যভব্য করে তোলার অলিখিত দায়িত্ব তাঁদেরই। টেনিস তো আমরা একসঙ্গে খেলিই। ক্লাবে গিয়ে সামাজিকতাও করি।

হঠাৎ একদিন মিসেস মুস্তফী আমাদের দুই বন্ধুকে সন্ধ্যাবেলা যেতে বলেন। কলকাতা থেকে তাঁর বন্ধুরা এসেছেন। তাই একটু আনন্দের আয়োজন করেছেন। আমরা যদি না যাই তবে তিনি বিমর্ষ হবেন।

গিয়ে দেখি—ওমা, সেই তিন কন্যা! ডেইজী, লিলি, আইরিস। পরস্পরকে আমরা চিনতে পারি। তা দেখে মিসেস মুস্তফী বলেন, 'বিলেতে আলাপ ছিল বুঝি? তা হলে আমাকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না।'

তবে হেমন্তকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। তিনি থাকতেন কেমব্রিজে। তাই লণ্ডনে আলাপের সুযোগ হয়নি। সন্ধ্যাবেলাটা কাটল কতরকম পারলর গেম খেলে। শেষে একসময় দেখি নাচ শুরু হয়ে গেছে। গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে। জনাকয়েক সাহেব মেম সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরই উৎসাহ বেশি। মুস্তফীরাও কম যান না।

আর কুমারী রায়রাও। নাচতে গিয়ে তাঁরা দেখেন পার্টনার কম পড়ছে। দু'জন পুরুষ সাংখ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয় বসে আছে। হেমন্ত আর আমি। নাচতে আমরা জানিনে। সে বিদ্যা শিখিনি। শিখতে আমি চেয়েছিলুম। শৈলেনদা ও বৌদি শিখতে দেননি। হাসাহাসি করেছেন।

নাচের জন্যে নারীর কাছে প্রার্থী হওয়া পুরুষেরই কর্তব্য। আমরা আমাদের কর্তব্য করিনি। আর সহ্য করতে না পেরে আইরিস আমাদের সম্মুখীন হন। বলেন, 'ও কী! আপনারা বসে আছেন কেন? নাচবেন না?'

লজ্জা পেয়ে হেমন্ত বলেন, 'আমার মাথা ভীষণ ধরেছে।'

আইরিস আমার দিকে তাকাতেই আমি বলি, 'আমারও।'

'মানুষ তো মাথা দিয়ে নাচে না।' শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করেন আইরিস। তারপর আমাদের উপেক্ষা করে চলে যান।

ডেইজীর সাথী জুটেছিল। কে একজন ইংরেজ। জোটেনি বেচারী লিলির। ওই মেয়েটি এত লাজুক! আর আইরিসের। যে সব চেয়ে উদ্দাম। একটু পরে লক্ষ্য করি ওই দুই কন্যা দু'জনে দু'জনের হাত ধরাধরি করে নাচছে। নাচের আসরে ওটাও অনুমোদিত। তবে দৃষ্টিকটু। বিশেষত দু'জন পুরুষ মানুষ বেকার বসে থাকতে।

ডিনার টেবিলে আমাদের দুই বন্ধুর মাঝে ডেইজী। আমার ডানদিকে আইরিস আর হেমন্তর বাঁদিকে লিলি। কথাবার্তা যৎসামান্য হলো। তাও হালকা বিষয়ে। বিলেতের সেই মধ্যাহ্নভোজের প্রসঙ্গ তুলি। কন্যারা সেদিনকার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে সুখী হন।

শুনলাম স্যার সুনীল ও লেডী রায় ওদেশের পাট চুকিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছেন। অবসর গ্রহণের পর বাকী জীবনটা স্বদেশেই কাটাবেন। কলকাতায় ওঁদের পৈত্রিক ভবন। এখন ওঁরা সেইখানেই থাকবেন। তবে পঁচিশ বছর ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বাস করায় ওর গরমকালটা হয়তো সহ্য হবে না। দার্জিলিং-এ বাড়ি কিনতে চান।

বয়সের অনুপাতে ডেইজীকে বেশ পরিণত মনে হলো। স্বভাবটা চটুল নয়। জীবনে এমন কিছু উপলব্ধি করেছেন যেটা অদৃশ্য এক ছাপ রেখে গেছে। তা বলে কি তিনি হাসবেন না, খেলবেন না, নাচবেন না? করবেন সব কিছুই, কিন্তু সংযতভাবে। যৌবনেরও তো একটা দাবী আছে। তখন অবশ্য ঘুণাক্ষরেও আমি জানতুম না যে সাত বছর আগে প্রিয়জনকে তিনি হারিয়েছেন। বোধ হয় সেই দুঃখ ভুলতে না পেরে এতদিন অনূঢ়া রয়েছেন।

ডিনারের পর আরো এক দফা নাচ গান খেলা। কিন্তু আমার বন্ধু হেমন্তর সত্যি মাথা ধরেছিল। আমরা দুই বন্ধু বিদায় নিয়ে উঠে আসি। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের দশা হয়েছিল হংসো মধ্যে বকো যথা। ওঁরা বিবাহযোগ্যা কুমারী, আমরা বিবাহযোগ্য কুমার। তা নইলে কেই বা আমাদের ডাকত! পার্টিটা ছিল ওই তিন কন্যারই খাতিরে। সেদিক থেকে আমাদেরই স্থান অগ্রগণ্য। অথচ আমরাই বেখাপ।

বিবাহের স্বাধীনতা আমার বন্ধুর ছিল না। সে ভার বন্ধুর পিতা স্বহস্তে নিয়েছিলেন। সে স্বাধীনতা আমার ছিল। আমার পিতা সে দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি চেয়েছিলুম বন্ধনহীন থাকতে। তাই ডেইজীর আকর্ষণ অনুভব করিনি। আর দু'জনের কথা তো ভাবাই যায় না। তিনজনের মধ্যে পার্সনালিটি ছিল প্রথমারই। তা ছাড়া একথা গোপন রেখে কী হবে! আমার হৃদয় ছিল অন্যত্র ন্যস্ত। যদিও অন্যজনের সঙ্গে পরিণয়ের সম্ভাবনা ছিল না।

পরের দিন ক্লাবে টেনিস খেলতে গিয়ে দেখি—ডেইজী। কয়েক সেট খেলা গেল। প্রত্যেকবারই আমার বিপরীত দিকে তিনি। তাঁর সাথী কখনো মুস্তফী, কখনো টমসন, কখনো আলী। আমার সাথী কখনো হেমন্ত, কখনো মিসেস মুস্তফী, কখনো কখনো মিস মরিস। ডেইজীই বার বার জেতেন। সমস্তক্ষণ লাফিয়ে লাফিয়ে খেলেন। কী শক্তি! কী একাগ্রতা! কী কৌশল! নিশ্চয়ই ইংলণ্ডে তালিম নিয়েছেন।

টেনিসের পর এক সঙ্গে বসে একটু নরম পানীয় পান করা গেল। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানালুম। তিনি পরিহাস করে বলেন, 'নাচলেন না তো? নাচলে দেখা যেত কার গায়ে কত জোর।'

সেই শেষ দেখা। শেষ কথা 'গুড বাই।'.....

রায়েরা দেশে ফিরে এসেছিলেন মেয়ে তিনটির বিয়ে দিতে। একবছর কি দু'বছর পরে একদিন শুনতে পাই ডেইজীর বিয়ে হয়ে গেছে। তখনি জানতে পারি যে ওঁর আসল নাম সুলেখা। সুলেখা রায়ের বিয়ে মিলন মজুমদারের সঙ্গে। মিলনও বহুদিন বিলেতে ছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হয়নি। এখন তিনি দিল্লীতে বড়ো চাকুরে। বড়লাটের দলবলের সঙ্গে সিমলায় গ্রীষ্মকাল কাটান। বিলেতের আমেজ পান। তা নয় তো বাংলাদেশের মহকুমা হাকিম হয়ে গ্রাম্যদের সঙ্গে গ্রাম্য বনে যাওয়া! খুব বেঁচে গেছেন সুলেখা! আমি তাঁর মনোনয়নের তারিফ করি। মনে মনে অসংখ্য শুভকামনা জানাই।

তারপর কর্মচক্রে পড়ে ভ্রাম্যমাণ আমি কারো কোনো খবর রাখিনে। না সুলেখার, না লিলির, না আইরিসের, না লণ্ডনে দেখা ও চেনা অন্যান্য তরুণীর। না রাখার আর একটা কারণ ইতিমধ্যে আমারও বিয়ে হয়ে গেছে। অন্য নারীতে আমারও আগ্রহ নেই। বিবাহিত পুরুষে অন্যেরও

আগ্রহ নেই। প্রেম এখন একের মধ্যে স্থিতি পেয়েছে। সে আর প্রজাপতির মতো চঞ্চল নয়।

কে জানে ক'বছর বাদে একদিন পুরোনো এক আলাপীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। লণ্ডনের সেই মধ্যাহ্নভোজনের প্রসঙ্গ ওঠে। কে কোথায় আছে, কার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে ইত্যাদি সমাচার জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে যা শুনি তা আমার অজানা।

'আচ্ছা, ডেইজী কেমন আছেন?' আমি শুধাই। 'ডেইজী!' তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হন।

'হ্যাঁ, ডেইজী। যার আসল নাম সুলেখা।' আমি মনে করিয়ে দিই। 'তুমি জানো না?' তিনি করুণ স্বরে বলেন, 'ডেইজী চলে গেছেন অনেকদিন আগে। বিয়ের পরে মা হতে গিয়ে।'

আমি যদি ল্যাণ্ডর হতুম আর একটি 'রোজ এলমার' লিখে সুলেখা রায়কে অমর করে দিতুম। আমার বন্ধু যে উপন্যাস লিখেছেন এতে আমি আনন্দিত।

অমৃতের সন্ধানে

যাতে আমি অমৃত না হব তা দিয়ে আমি কী করব? মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন। সেই প্রশ্নই কি ঘুরে ফিরে এল নতুন এক অর্থ নিয়ে একালের এক পুরুষের মুখে?

সন্তানও তো মানুষকে অমৃত করে। সন্তানের মধ্যেই সে বাঁচে। যাতে আমার সন্তান না হবে তা দিয়ে আমি কী করব? শুধু শুধু স্ত্রীসঙ্গ করে কী হবে?

প্রশ্নটা আমার এক পুরাতন বন্ধুর। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ওর সঙ্গে ত্রিশ বছর বাদে এক বিয়েবাড়িতে। চেনা চেনা ঠেকে। কিন্তু চিনতে পারিনে। দারুণ মুটিয়েছে। নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, 'কামাল পাশা জোরদার। বকসিং। মোটরসাইকেল। হাইগেট। এবার চিনতে পারলে?'

'আরে তুমি! ডেয়ার ডেভিল জো!' আমি ওকে জড়িয়ে ধরি।

চেহারাটা ছিল ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি এক মূর্তি। মাংসল নয়, মাসকুলার। আহারে ছিল অত্যন্ত সংযত। কিন্তু বিহারে? পরে বলব।

ও যখন আসত তখন ঝড় ডাকত। ওর ওই যানটার বিকট আওয়াজ শুনে আমার কাব্যের ঘোর কেটে যেত। ল্যাণ্ডলেডী এসে দরজায় টোকা দিয়ে বলত, 'মিস্টার ডে, ইয়োর ফ্রেণ্ড মিস্টার জো।'

'দেশের হালচাল কী? খবরের কাগজ কোথায়?' কমলাপ্রসাদ জোয়ারদার আমার গত মেলের সাপ্তাহিক ও অর্ধসাপ্তাহিক ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকা সামনে ধরে সিগার টানত। যাবার সময় আমার ভাঁড়ার লুট করে এলাচ লবঙ্গ দালচিনি সুপুরি পকেটে পুরত। আর তার পরিবর্তে আমাকে দিত চকোলেট টফি টার্কিশ ডিলাইট।

'কার জন্যে এসব দিচ্ছ?' আমি অনুযোগ করি।

'তোমার জন্যে নয়, তোমার গার্লসের জন্যে।' বহুবচন ব্যবহার করে।

'যার না আছে মোটরসাইকেল, না আছে মোটর তার গার্লস আসবে কী দেখে? আচ্ছা, রেখে যাও। পাড়ার ছেলেমেয়েদের দিয়ে ভাব জমাব।' ধন্যবাদ দিই।

বকসিং ছিল ওর ব্যাসন। তার থেকে নাকি বেশ দু'পয়সা রোজগার করত। সেটা খরচ হতো

গার্লসের পেছনে। আর গার্লসও ওর পেছনে প্রায়ই লেগে থাকত। মানে ওর মোটর সাইকেলের পিলিয়নে চড়ে বেড়াত। ও যখন ঝড়ের বেগে ওর রথ চালিয়ে যেত তখন মনে হতো রুক্মিণী কি সুভদ্রা হরণ করছেন কৃষ্ণ কি অর্জুন। রংটাও তেমনি কালো। আহা, যেন ব্ল্যাকবোর্ডের পিঠে চকখড়ি।

এক একদিন দেখতুম ওর মেজাজ খুব খারাপ। তাই মুখও তেমনি খারাপ। বোধহয় বকসিং-এ হেরেছে। 'আই শ্যাল ব্লাডি নক আউট হিজ ব্লাডি জ।' আরো কী কী বলে যেত বকসারদের পরিভাষায়। পাঞ্চ করত না কী করত। এমন সব স্ল্যাং উচ্চারণ করত যা আমার অবোধ্য।

'ও কী! তোমার থোঁতা নাক যে ভোঁতা করে দিয়েছে, ভাই!' সমবেদনা জানাই।

'ড্যাম ইট। হী-ব্যাচেলারস ডোন্ট কেয়ার।' ও বুক ফুলিয়ে বলে।

ব্যাচেলার তো এমনিতেই পুরুষ। হী-ব্যাচেলার আবার কী! আমি ওর ভাষার ছিদ্র ধরলে ও হেসে বলে, 'যাদের ভাষা তাদের শুধাও।'

একবার ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়। আমি যাই দেখতে ও সমবেদনা জানাতে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। একটা চোখ বাঁধা। তবু বলে, 'কিচ্ছু হয়নি। একটা গেলেও আরেকটা চোখ তো থাকবে। হী-ব্যাচেলারস ডোন্ট কেয়ার।'

কারো কারো ধারণা জোয়ারদারের জন্যে দেশের ছেলেদের বদনাম হচ্ছে। ছাত্ররাই দেশের রাষ্ট্রদূত। কিন্তু ওর যারা পক্ষপাতি তারা বলত, 'বকসিং-এর ছলে সাহেবের বাচ্চাদের ও যত পিটিয়েছে আর কেউ কি তা পেরেছে? ও যখন দেশে ফিরবে দেশের লোক ওকে বীরের অভ্যর্থনা জানাবে।'

'কিন্তু এর ফলে দেশে ওর চাকরি জুটবে না দেখো। ওইসব মার খাওয়া বিটকেলরাই তো ওর বস হবে।' বিপক্ষপাতীরা বলত।

দেশে ফিরে ওর সত্যি চাকরি জোটাতে কষ্ট হয়েছিল। তবে ইংরেজদের মধ্যে স্পোর্টসম্যানও তো ছিল। কাজের লোক বলে ও কাজ পেয়ে গেল ঠিক, কিন্তু ওর মাথার উপর দিয়ে প্রমোশন পেয়ে গেল যত সব সরাসরি বিলেত থেকে আমদানী গোরা। ওকেই তখন 'সার' 'সার' করতে হলো। মাথা কাটা যায়।

বিলেত থেকে ফিরে আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়ি। কেউ কারো খবর রাখিনে। বছর পাঁচেক বাদে দেহরাদুনে ওর সঙ্গে মুখোমুখি। আমি তখন ছুটিতে। সঙ্গে স্ত্রী পুত্র। ও আমাকে ধরে নিয়ে যায় ওর বাংলোয়। আলাপ করিয়ে দেয় ওর স্ত্রীর সঙ্গে। একদিন সবাই মিলে মুসৌরি ঘুরে আসি ওর গাড়িতে করে। সেইখানেই স্থির হয় যে আস্ত একটা দিন আমরা একসঙ্গে কাটাব ওদের বাংলোয়। প্রাতরাশ থেকে নৈশভোজন পর্যন্ত সব একসঙ্গে হবে। রাঁধবেন দুই গৃহিণী মিলে।

সেদিনকার অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। যা মুখে দেওয়া গেল তার জন্যে নয়, যা কানে এল তার জন্যে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর আমার একটু গড়ানো অভ্যাস। আমি পাশের ঘরে শুয়ে নভেলের পাতা ওলটাই। জোয়ারদার বেরিয়ে যায় অফিসে। রবিবারেও ওর ডিউটি থাকে। ড্রইংরুমে বসে মহিলারা খোশগল্প করেন। কখন এক সময় ওঁরা মিতা পাতিয়েছেন। মিতার কাছে মিতার গোপনীয় কী আছে! চাপা গলায় কথাবার্তা। তা হলেও আমার কানে আসে টুকরো কথা। কিছু বুঝি কিছু বুঝিনে।

পম্পা তাঁর স্বামীর বিলেতের ডায়েরি আবিষ্কার করেছেন। বিহারের বিবরণী। টেলিগ্রাফের ভাষায়। পাতায় পাতায় মেয়েলী নাম। এখানে ওখানে চার অক্ষরের একটি শব্দ। কলেজ শিক্ষিতা

কন্যা পম্পা। তাঁর কাছেও ওটা গ্রীক।

আমার ইনি বলেন একটু হেসে, 'এল দিয়ে আরম্ভ। ই দিয়ে শেষ।'

'না, মিতে। এটা কে না জানে!' পম্পার কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

'তবে কে দিয়ে শুরু। এস দিয়ে সারা।' মিতে হেসে ওঠেন।

'না, মিতে। ওটাও তো অজানা নয়।' পম্পার স্বরে উত্তেজনা। মিতেও গম্ভীর। বলেন, 'তা হলে কী দিয়ে আরম্ভ?'

'এফ দিয়ে।' পম্পার কণ্ঠস্বর কম্পিত।

'আর শেষ?' মিতে যেন বিব্রত।

পম্পা অস্ফুট স্বরে কী বলেন তা শুনতে পাইনে।

মিতে জানতেন না। চারটে অক্ষরই তাঁকে শোনাতে হলো। তখন ডিকসনারীর খোঁজ পড়ল। শব্দটাই নিখোঁজ।

আমারও সেটা জানা ছিল না। ভেবেছিলুম বকসিং-এর পরিভাষা। ড্রইংরুমে আমার যখন ডাক পড়ে আমি বলি, 'ওটা একরকম প্যাঁচ।'

দীর্ঘকাল পরে ডি এইচ লরেনসের লেডী চ্যাটারলি নিয়ে যখন বিলেতে মামলা বেধে যায় তখন বিলিতী রিপোর্টে চার অক্ষরী শব্দটার উল্লেখ দেখে ও তার অর্থ বুঝতে পেরে আমি শিউরে উঠি। আমার মনে পড়ে যায় দেহরাদূনের সেই দুপুর। কী লজ্জা! 'মা ধরণী—'

তা বলে ওর রেকর্ড রাখে কেউ? রাখলে বিয়ের আগের দিন আগুনে পোড়ায়। একমাত্র টলস্টয় দিয়েছিলেন তার ভাবী বধূকে তাঁর ডায়েরি। কাউনটেস ক্ষমা করলেন, কিন্তু ভুললেন না। শেষ জীবনের অশান্তির সেটাও একটা নিদান।

ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে ভাবিনি। বিয়েবাড়িতে দু'জনেব সঙ্গে দু'জনের পুনর্দর্শন। আবার একটা দিন ফেলা গেল আস্ত একটা দিনযাপনেব। কলকাতার বাড়িতে। জোযারদার রিটায়ার কবে কাজকর্মের অভাবে মুটিয়ে গেছে। ওর স্ত্রী কিন্তু তেমনি তন্বী।

।। দুই ।।

এর পরে একদিন জোয়ারদার আমাকে ওর ক্লাবে আমন্ত্রণ করে। প্রথমে হবে বিলিয়ার্ডস। তারপরে ডিনার। মিসেসদের বাদ দিয়ে।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে আমরা এক কোণায় বসে গল্প করি। আর গলাটা ভিজিয়ে নিই। আমারটা নরম পানীয়, ওরটা হুইস্কি।

'মনে করো আমি সেদিনকার সেই জো। আর তুমি সেই ডে।' জোয়ারদার বলে। 'তোমার কি মনে আছে একদিন মোটরসাইকেল অ্যাকসিডেনট বাধিয়ে আমি হাসপাতালে যাই? মাথায় চোট। চোখেও আঘাত।'

'মনে আছে বইকি। আমি তোমাকে দেখতে যাই। এক নার্স ভদ্রতা করে অনুমতি দেয়। আরেক নার্স অভদ্রতা করে তাড়িয়ে দেয়।' আমার মনে পড়ে।

'সেই দুর্দিনে আমার বন্ধুদের পরীক্ষা হয়ে গেল। কে কে দেখতে এল কে কে এল না সব

নোট করে রেখেছি। তুমি এসেছিলে এর মানে তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু। তোমার মতো প্রকৃত বন্ধু আমার বেশি ছিল না। তবে একজন ছিলেন তিনি বন্ধুর বাড়া। ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড।' জোয়ারদার দুই হাত তুলে প্রণাম করে।

'কার কথা বলছ?' আমি জিজ্ঞাসু হই।

'নিত্যদাকে তোমার মনে নেই?' সে মনে করিয়ে দেয়।

'আছে বই কি। দেশেও তো তাঁর সঙ্গে এক কলেজে পড়েছি। তিনি ছিলেন বছর কয়েকের সিনিয়র। জাঁদরেল গোছের চেহারা। ভারিক্কি চালচলন।' মনে পড়ে। আরো মনে পড়ে দেশে ফিরে এসে তাঁর কী হলো। কিন্তু বলিনে।

'সেই নিত্যদাই আমাকে দিয়ে সত্য করিয়ে নেন যে আমি যেন মেয়েদের পেছনে না ছুটি। আমি অক্ষরে অক্ষরে সত্য রক্ষা করেছি। মেয়েদের পেছনে ছুটিনি। কিন্তু ওরা যদি আমার পেছনে ছোটে যদি আমার মোটরসাইকেলের পিলিয়নে চেপে বসে ও আমার তপোভঙ্গ করে তা হলে আমার ওটা কি সত্যভঙ্গ? দ্যাখ, ডে, এক একজন পুরুষ থাকে তাদের শরীরটা ইস্পাত। কিন্তু মনটা একতাল জেলি। জানি, নিত্যদার কাছে আমি অপরাধী। সত্যি, আমার বড়ো দুঃখ হয় যে কথা দিয়ে আমি কথা রাখিনি। ইচ্ছে করে নিজেকে নিজের হাতে চাবকাতে। কিন্তু লাভ কী হবে? কৃতকর্ম তো অকৃত হবে না। নরকেই যেতে হবে আমাকে। কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। সহধর্মিণীও না।' ওর গলা ধরে আসে।

তখনই কিছু কিছু আঁচ করেছিলুম। পরে তো সেই ডায়েরিই ওর কনফেসন। ক'জনের এমন বুকের পাটা যে, যা করবে তা লিখবে!

'ডে, ওল্ড ডে!' জোয়ারদার সেনটিমেনটাল হয়ে পড়ে। 'মাই ট্রু ফ্রেণ্ড! আমার জন্য হাসপাতালে গিয়ে নার্সের কাছে তাড়া খেতে হলো। তোমার কাছে কত কী গোপন করেছি। এখন আর কী হবে? ষাট বছর পার হয়েছি। আর কদ্দিন বাঁচব! মানুষ বাঁচে তাঁর সন্তানের জন্যে। আত্মাই পুত্র হয়ে জন্মায়। পুত্রের মুখে আপনাকে দেখে। ও যেন একখানি আয়না।'

আমি নীরবে শুনে যাই। খেলতে আর উৎসাহ বোধ করিনে।

'অনেক সময় মনে হয় সেই যে নিত্যদার কাছে সত্যভঙ্গ এই তার শাস্তি। যেন শত্রুকেও পেতে না হয়। সন্তান যে কী তা তোমরা কী বুঝবে যাদের উপরে ষষ্ঠীর কৃপা! তোমরা পরিবার পরিকল্পনা বিধান দিচ্ছ, কিন্তু পরিবার যার আদপেই হলো না তার জন্যে তোমাদের কী বিধান? কোথায় তোমার বিজ্ঞান? কিসে আমি আনফিট? কেন আমি আমার সন্তানের মধ্যে সারভাইভ করব না?' ও ঘুষি বাগায়। যেন আমিই ওকে আনফিট বলেছি।

'পূজা-আর্চা মন্ত্র-টন্ত্র সন্ন্যাসী ফকির মাদুলি তাবিজ মানত উপবাস কী না করেছি! কোথায় না গেছি! সাধুর আশ্রমে পীরের দরগায়! তীর্থে তীর্থে ঘুরেছি। শেষে গেলুম তোমার ভিয়েনা। স্পেশালিস্টরা আমাদের দুজনকেই পরীক্ষা করলেন। বললেন, পারফেক্টলি নরম্যাল। হচ্ছে না, জাস্ট ব্যাড লাক। হবে, যদি পার্টনার পরিবর্তন করি।' জো গোপনীয়ভাবে বলে।

'হ্যাঁ, সে রকমও দেখা গেছে।' আমি এক্স ওয়াই মুখার্জির কাহিনী বলি। ওঁর স্ত্রী নালিশ করেন যে উনি পুরুষত্বহীন। মুখার্জি প্রতিবাদ করেন না। বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। পরে আবার বিয়ে করেন। দুটি ছেলেমেয়ে হয়। কী চমৎকার দেখতে! ওদিকে ওই মহিলাটিও আবার বিয়ে করেন। ওঁর কিন্তু ছেলেমেয়ে হয় না। বোধহয় চান না।

'কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারত। তখন আমি মুখ দেখাতুম কী করে! পম্পা অবশ্য পরম পতিব্রতা। ও কখনো অমন কাজ করত না। ও বলে যার অদৃষ্টে যা আছে তাই তো হবে। এসব

কি মানুষের হাতে? আমি কিন্তু পুরুষকার মানি। আমি যে পুরুষ। আমি জানি পার্টনার পরিবর্তন করলে ফল হতো। কিন্তু না হলে তখন কী হতো? মিথ্যে কেন এমন সুখের নীড় ভেঙে দিতুম?' জোয়ারদার উদাসভাবে বলে।

আমি বলি, 'ঠিকই করেছ। অনিশ্চিতের জন্যে নিশ্চিতকে ছাড়তে নেই!'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ডে। কেউ কেউ কিন্তু ও রকম পরামর্শ দিয়েছিল। তখন তো হিন্দু আইন বদলায়নি। পম্পা থাকতেও আমি আর একটি বিয়ে করতে পারতুম। তবে আমার আশঙ্কা ছিল যে পম্পা একালের মেয়ে, সেই হয়তো আমার নামে নালিশ করবে যে আমি ইমপোটেন্ট। আমি যে ইমপোটেন্ট নই তার একঝুড়ি প্রমাণ আছে। লিখিত প্রমাণ। কিন্তু লোকে বিশ্বাস করবে কেন, যখন দেখবে আমি উৎপাদনে অক্ষম? কিন্তু সত্যি কি তাই!' ও বলে ধাঁধার মতো করে।

'তার মানে?' আমি ধাঁধার জবাব চাই।

'তুমি কি জানতে যে গ্রেট বৃটেনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি আমি মোটরসাইকেল চালিয়েছি? জন ও, গ্রোটস থেকে ল্যাণ্ডস এণ্ড। কত জায়গায় রাত্রি বাস করেছি। নির্জনে কোণ দেখে বিশ্রাম করেছি। একা নয় বুঝতেই পারছ। কোথাও কি কোনো চিহ্ন থেকে যায়নি? এই হলো আমার জিজ্ঞাসা। এর উত্তর পাবার জন্যে আমাকে বিলেতে যেতে হয়েছিল আবার ছুটিতে। যেসব জায়গা চষে বেড়িয়েছি সেসব জায়গায় কি চারাগাছ গজায়নি? আমার মতো দেখতে এমন শিশু কি কেউ কোনোদিন দেখেনি? কেউ বলতে পারে না। তবে আমার সন্দেহ দুটি একটিকে আমার মতো দেখতে। রংটা কিন্তু ধবধবে ফরসা। তাদের মায়েরা শুনে তেড়ে আসে। আসবেই তো। ওরা তো আমার চেনা নয়।' জোয়ারদার বিশ্বাস করে বলে।

আমিও বিশ্বাস করে বলি, 'মিসক্যারেজও হয়ে থাকতে পারে।'

'বাঁচালে! তুমি আমাকে বাঁচালে!' উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে জোয়ারদার। 'আমার যেমন মোটা বুদ্ধি এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটি মাথায় আসে না। আমার দোস্ত কর্নেল কিউ ডবলিউ আলী কি মর্দানা নন? তাঁর বেগম সাহেবার রূপ দেখে কার না চোখ ধাঁধিয়ে যায়? কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, ফী বারেই মিসক্যারেজ! জাস্ট আনফরচুনেট! অদৃষ্ট! অদৃষ্ট মানতে হয় হে!'

'ওটা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে।' আমি ফোড়ন দিই।

'তাই নাকি? বেবী আনওয়ানটেড?' জোয়ারদার হাহুতাশ করে। 'কী বুদ্ধুই না ছিলুম হে! কামাল জোরদার কামাল পাশার মতোই নিঃসন্তান হলো। কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে পম্পা চৌধুরী কেন বন্ধ্যা অপবাদের ভাগী হবে? বিধাতার এ কী রকম বিচার।'

'এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না বিবাহের বেলা। কাউকে দোষ না দিয়ে দায়ী না করে সহ্য করতে হয়।' এছাড়া আমি আর কী বলতে পারি!

॥ তিন ॥

ডাইনিং রুমে দিব্যি ভিড়। নরনারী উভয়ের। জোয়ারদার বুদ্ধি খাটিয়ে দুজনের জন্যে টেবল রিজার্ভ করেছিল পাঞ্জাবীদের আটজনের টেবলের পাশে। বাংলার ওরা কী বুঝবে? আমরা যথাসাধ্য ইংরেজী এড়াই।

'সেই যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা সেই অমঙ্গলই আমার চোখ ফোটায়। যদিও দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে।' ওর চশমার একটা কাচ তার সাক্ষী।

'তারপর থেকে তুমি মোটরসাইকেল চালানো ছেড়ে দিলে মনে আছে। পড়াশুনায় আরো সময় দিলে। ভালো পাস করলে।' আমি খেই ধরিয়ে দিই।

'আমি বড়ো আশা করেছিলুম যে ওরাও আমাকে দেখতে আসবে। আসবে সমবেদনা জানাতে।' ও আপন মনে বলে যায়।

'কারা?' আমার খটকা লাগে।

'আমার গার্ল ফ্রেণ্ডরা। যারা আমার সুখের সাথী। আমার দুঃখের দিনে তো কই একজনও এল না হে। ভগবান আমাকে মার দিয়ে শেখালেন যে অনেকজনকে ভালোবাসলে একজনেরও ভালোবাসা মেলে না। আমার উচিত ছিল একটিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তা হলে সেই একজন আসত আমাকে দেখতে, আমার হাতে হাত রাখতে। তার হৃদয়ের পরশখানি দিতে। একটু উষ্ণতা সঞ্চার করতে। আহা, তেমন একটি মেয়ের জন্যে আমি কী না দিতে পারতুম! কী না করতে পারতুম!' ওকে বিষণ্ণ দেখায়।

'কেন, তোমার বিয়ে কি সুখের হয়নি? একটু আগেই তো বলেছিলে সুখের নীড়।' বিস্মিত হই।

'সুখের নীড় তো নিশ্চয়। তা বলে ওটাও কম সুখেব হতো না। কে জানে হয়তো আমার একটি সাধ পূর্ণ হতো। সন্তান সাধ। আমার স্বপ্ন ছিল আমার একটি ছেলে হবে যে আমার মতোই সাহসী। আমার সেই ছেলে কোথায়? আমার স্বপনকুমার!' ওর গলা ধরে আসে।

'ও কি জানত না যে বিলেত থেকে ফিরে এসে নিত্যদা পড়ে যান এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী বিধবা রানীর প্রেমে। রানী তাঁব রাজমর্যাদা খোয়াবেন না। বৈধব্যও খণ্ডাবেন না। কিন্তু সহবাসে তাঁর অরুচি নেই। নিত্যদা কি অমনি পুরুষ যে রানীর প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবেন? তার আত্মসম্মান অতি প্রখর। হয় পতি হবেন নয় পলাতক। কিন্তু প্রেমের টান কাটিয়ে পালাবেন কতদূরে? নারী যে অন্তব বাহির জুড়ে। নিত্যদা শেষকালে শিকাব করতে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হন। নিজেবই গুলী।'

'নিত্যদার পরিণাম কী ট্র্যাজিক!' আমার স্বর কাঁপে।

'বিধাতার আরো এক অবিচার। স্বামীজীদের সঙ্গে মিশে তাঁদের মতো যে শুদ্ধ, তাঁদেরই মতো অপাপবিদ্ধ, তাঁরই কিনা এই শোচনীয় পরিণাম! যারা নির্বোধ তারাই ওঁর নিন্দে করে। বলে ইনফ্যাচুয়েশন। যেন ইনফ্যাচুয়েশন ইচ্ছে করলেই এড়ানো যায়। দেশীয় রাজ্যে চাকরি করতে গিয়ে নিত্যদা পড়ে গেলেন বাঘিনীর মুখে। মারা উচিত ছিল বাঘিনীকেই। কিন্তু পুরুষের ধর্ম শিভালরী। পুরুষ কখনো নারীর প্রাণ নাশ করতে পারে? তার চেয়ে আত্মহত্যা ভালো।' জোয়ারদার হাহুতাশ করে।

'হত্যা কিংবা আত্মহত্যা কোনোটাই ভালো নয়। সব চেয়ে ভালো আত্মসম্বরণ। না পারলে আত্মসমর্পণ।' নিত্যদাকে শ্রদ্ধা করি বলে তাঁর আত্মহত্যার সমর্থন করিনে।

'আমিও কি সমর্থন করি নাকি? ওরকম একটা ডাকিনীর জন্যে কেউ প্রাণ দেয়? চোখ ঝলসানো রূপ যার আছে সে কি কখনো একজনের হতে চাইবে যে তুমি তাকে বিয়ে করবে? একজনের হলেও সে কি কখনো মা হতে চাইবে?' ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

'বিয়ে না করে কি এক সঙ্গে থাকা যায় না? মা না হলেই বা ক্ষতি কী?' আমি ওকে বোঝাই।

'আমার মেয়ে হলে অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী হতো না। হতো অশেষ গুণবতী। ওর মায়ের মতো। আহা, বেচারী পম্পা! আমার জন্যেই ওর জীবনটা ব্যর্থ। আমরা পুরুষ। জীবনে আমরা একভাবে না হোক আরেকভাবে সার্থক হতে পারি। মাতৃত্ব ভিন্ন ওদের জীবনে আর কী সার্থকতা আছে, বল! মেয়ে হয়ে জন্মানো মানে মা হবার জন্যেই জন্মানো। নারী ওই দিয়েই অমৃত হয়।' ও বলে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে।

'মৈত্রেয়ী কি অমৃত হতে চেয়েছিলেন ওই অর্থে? কাত্যায়নীর ছেলেপুলে হয়েছিল, মৈত্রেয়ীর হয়নি। সেইজন্যেই কি তিনি স্বামীর কাছে সন্তান অভিলাষ করেছিলেন? কই, উপনিষদে তো ও কথা লেখে না'। আমি মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন আবৃত্তি করি।

'আমার অত বিদ্যে নেই, ভাই। মৈত্রেয়ী যে কে তাই আমি জানিনে। আর কাত্যায়নীই বা কে?' ও জানতে চায়।

'যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই পত্নী।' আমি জানাই।

'দুই পত্নী কি ভালো? আমার যদি দুই পত্নী থাকত তাহলে দু'জনের একজনও কি আমাকে ভালোবাসত? কর্তব্য করা এক জিনিস, ভালোবাসা আরেক। তারপর সেও তো এক বিষম সঙ্কট। একজনের সন্তান হবে, আরেকজনের হবে না। একজন আমার সন্তানক্ষুধা মেটাবে, আরেকজনের সন্তানক্ষুধা আমি মেটাতে পারব না। তা হলে তাকেও তো আবার বিয়ের অনুমতি দিতে হয়। আমার স্ত্রী হবে আরেকজনের সন্তানজননী! আই শ্যাল ব্লাডি নক আউট হিজ ব্লাডি জ।' বলে পাঞ্জাবীদের চমকে দেয় বিলেতের কামাল পাশা জোয়ারদাব।

এর পর আমাকেও চমকে দিয়ে বলে, 'কাত্যায়নী অমৃত হয়েছিলেন। মৈত্রেয়ী হননি। সেইজন্যেই তো তাঁর প্রশ্ন, যাতে আমি অমৃত না হব তা দিয়ে আমি কী করব? আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। যাতে আমি অমৃত না হব তা দিয়ে আমি কী করব? মানে, শুধু শুধু স্ত্রীসঙ্গ করে কী হবে? এখন তো ওর মা হবার বয়সও পেরিয়ে গেছে।'

ভেবে বলি, 'জো, ওটা এমন একটা সিদ্ধান্ত যেটা একপক্ষ স্বাধীনভাবে নিলে অপর পক্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। চাপা অশান্তি।'

'এ কী জ্বালা, বল দেখি! আমার আত্মার উদ্ধারের সিদ্ধান্ত আমি স্বাধীনভাবে নিতে পারব না? আমি যদি বেঁচে থাকতে শুদ্ধ হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই সেটা হবে স্ত্রীর উপর আমার ইচ্ছা চাপানো? অবশ্য পম্পা তেমন ডিমাণ্ডিং নয়।' ও অন্তরঙ্গ স্বরে বলে।

'দ্যাখ, জো! সত্য করে সত্যভঙ্গ করার চেয়ে সত্য না করাই কি ভালো নয়? সত্যরক্ষা করতে গিয়ে কেন ওঁকে সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করবে?' আমিও বলি অন্তরঙ্গ স্বরে।

'জীবনের শেষপ্রান্তে তুমিও এসে ঠেকেছ। আমিও এসে ঠেকেছি। বল দেখি সত্যি করে? কী আছে হে ওতে!' জো বলে বৈরাগ্যভরে। একালের এক ভর্তৃহরি।

'অমৃত। সন্তান যার হয়নি সেও অমৃত হয়েছে।' আমি ওকে আশ্বাস দিই।

'স্তোকবাক্য। ভবী ওতে ভুলবে ভেবেছ?' জো পানের মাত্রা চড়িয়ে বলে, 'শোন তা হলে আরো একটা গোপন কথা। রিটায়ারমেনটের আগে ছুটি নিয়ে আরো একবার ওদেশে যাই। এবার আমি সন্তানের খোঁজখবর করিনি। করেছি সম্ভবপর জননীদের। নামধাম

ডায়েরিতে টোকা ছিল। ঠিকানা বদলেছে। নিরুদ্দেশ। তবু হলো দেখা কয়েকজনের সঙ্গে। কতক তো আমাকে চিনতেই পারে না। চক্ষেও দেখেনি। কতকের আমাকে মনে আছে, কিন্তু আমার সঙ্গের ঘটনাকে নয়। একেই তুমি বল অমৃত। একজনকেই শুধু পাওয়া গেল যে আমাকেও মনে রেখেছে, ঘটনাকেও। কিন্তু সেও স্বীকার করল না যে তার ফলে তার অবস্থান্তর হয়েছিল। সে আমাকে তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সন্তানদের সঙ্গেও। সমাদরও করল সপরিবারে। বিদায়কালে হাতে চাপ দিয়ে বলল, ফিফটি ফিফটি। তুমি আমাকে তৃপ্ত করেছিলে। আমি তোমাকে তৃপ্ত করেছিলুম। লীভ ইট অ্যাট দ্যাট।'

ততক্ষণে ওর চোখে জল এসে গেছে। বলে, 'আমার কিন্তু সন্দেহ ও সব কথা বলেনি। রহস্যভেদ আমি এ জীবনে করতে পারব না। অমৃত হয়েছি না হইনি? নারীই একমাত্র জানে। পুরুষ বলে আমার যে অহঙ্কার তা সে ডোবায় চোখের জলে।'

পলায়নবাদী

উপরে যে ঘরে বসে তিনি লেখার কাজ করেন সে ঘরে গিয়ে তাঁর ধ্যানভঙ্গ করে বিধু। বলে, 'দাদা, আজকের দিনেও আপনি ওই নিয়ে থাকবেন?'

'কেন, আজ কিসের দিন?' তিনি একটু আশ্চর্য হন।

'স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী। সারা শহর আজ উৎসবমুখর।' সে-ও আশ্চর্য হয়।

'তাই বল।' তিনি তাঁর হাতের কাজ সরিয়ে রাখেন। তাব পরে তাঁর সেই ভক্ত পাঠকের জন্যে চায়ের ফরমাশ করেন।

দু'জনেই ইতিহাসের সেই মহান লগ্নটিতে ফিরে যান। সে যে অপূর্ব অনুভূতি তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে বসেছিল দুই শতকের বিদেশি শাসন। সে যে একদিন সত্যি সরে যাবে এটা বিশ্বাস করত যারা তারাও ভাবত সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষপূর্তির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

'দাদা, আপনি যে কল্পনা করেছিলেন নতুন একখানা মহাভারত লিখবেন, তার কতদূর হলো?' মনে করিয়ে দেয় বিধু।

'এ জীবনে তার কোনো আশা দেখছিনে।' দাদা বিমর্ষ হয়ে বলেন, 'প্রকৃত সত্য কী তা অবগত হতে আরো পঁচিশ বছর লাগবে। মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রকাশ করে যাননি। ব্রিটিশ সরকার, ভারত সরকার বিস্তর দলিল অপ্রকাশিত রেখেছেন। আমরা বাইরে থেকে সংগ্রামটাই দেখছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কথাবার্তাও চলছিল। কখনো সরাসরি, কখনো দূত-মারফত। সে সব এত গোপনীয় যে সারা দেশে চারজন কি পাঁচজনের বেশি জানতেন না। ইংরেজ পক্ষে বড়লাট, কংগ্রেস পক্ষে গান্ধী, বল্লভভাই, জবাহরলাল ও আজাদ, লীগ পক্ষে জিন্না। যার আসল নাম ঝীণা। শেষের দিকে গান্ধীকেও বাইরে রাখা হয়। আজাদকে তো আরো আগে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওই যে একটা খেলা আছে যাকে বলে মিউজিকাল চেয়ার। সে খেলায় শেষপর্যন্ত রইলেন চারজন।

কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন মাউন্টব্যাটেন ও জবাহরলাল।'

বিধুর অত কথা জানা ছিল না। সে তাজ্জব বনে যায়।

দাদা বলে যান, 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে দর-কষাকষিও সংগ্রামের অঙ্গ। ওটা ছিল একটা ড্রন গেম। কোনো পক্ষই কোনো পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারেনি ও পারত না। আরো একবার বল-কষাকষির জন্যেও কোনো পক্ষ ইচ্ছুক ছিল না। ওদিকে সময় বয়ে যাচ্ছিল। দেশ দিন দিন অরাজক হয়ে উঠছিল। শাসকদের মন উড়ুউড়ু। সিভিলিয়ানরা একটানা দশ বছর হোম লীভ পাননি। মিলিটারিও রণক্লান্ত। ওদিকে রুশবাহিনী পূর্ব জার্মানী জুড়ে বসে আছে। ওদের সঙ্গে মুখোমুখি বসতে হলে তার স্থান ভারতবর্ষ নয়, পশ্চিম জার্মানী। মিটমাটের ইচ্ছাটা আন্তরিক বলেই অমন তড়িঘড়ি মিটমাট হয়ে যায়। আর মিটমাটটা ত্রিপাক্ষিক বলেই পার্টিশনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ত্রিপাক্ষিক না হলে সির্ভিল ওয়ার বেধে যেত। ইংরেজ তাতে বাধা দিত না, অংশও নিত না। নিরপেক্ষ থাকত।'

বিধু পীড়াপীড়ি করে। 'দাদা, লিখুন, লিখুন, আপনিই যোগ্যতম পাত্র। আপনি ইংরেজ শিবিরেও ছিলেন, কংগ্রেস শিবিরও দেখেছেন, লীগ শিবিরও আপনার অচেনা ছিল না। মহাভারতে সবাই উপস্থিত থাকবে, কেউ বাদ যাবে না। বিপ্লবীরাও না। তাদের খবরও তো দূর থেকে রাখতেন।'

'তাদের খবর সরাসরি নয়, পুলিস-সূত্রে। মানুষকে আমি পুলিসের চোখে দেখতে চাইনি। তবু দেখতে হয়েছে। বিপ্লবীদের বেলা ওই ভুলটাই করে গেল ইংরেজরা। তেমনি পাল্টা ভুল করল বিপ্লবীরাও। পুলিস সাহেবদেরই ঠাওরাল ইংরেজ জাতি। খুন করে বসল এমন সব ইংরেজকে যারা মানুষ হিশাবে অতিশয় সজ্জন। কবিগুরু একবার বলেন, আহা! অমন ভালো সাহেবটাকেও মেরে ফেললে গো! হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গেও ও প্রসঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। উনি বিপ্লবীদেরও ভালোবাসতেন। ওদের কথা লিখতে এত ইচ্ছে করে, কিন্তু লিখতে দিচ্ছে কে? এই বলে মুখে হাত চাপা দেন। এর পরে দেখি 'চার অধ্যায়' লিখেছেন। রেখে ঢেকে।' দাদা স্মরণ করে বলেন।

'দাদা লিখুন, লিখুন।' বিধু উৎসাহের সঙ্গে বলে। 'মানুষ আঁকতে হবে। শুধু সাহেব বা শুধু বিপ্লবী নয়। আপনি তো মানুষ বড় কম দেখেননি।'

'এমন কী বেশি!' দাদা পেছন ফিরে অতীতের দিকে তাকান।

প্রথমে বলি ইংরেজ শিবিরের কথা। বড়লাটদের মধ্যে একমাত্র উইলিংডনকেই আমি দেখেছি। বাংলার লাটদের মধ্যে প্রায় সবাইকে। অ্যাণ্ডারসন, ব্র্যাবোর্ন, বারোজ, এঁদের সঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনার খেয়েছি। শেষের জনের কাছেই তো খবরটা প্রথম পাই যে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে যাচ্ছে। অ্যাটলীর ঘোষণার পূর্বে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে মিশতে হয়েছে। আর্মি আর নেভি। কিন্তু পুলিসের সঙ্গে আমার বনিবনা হত না। ওরা যাদের ধরত আমি তাদের ছেড়ে দিতুম বা কম সাজা দিতুম।'

'মহাভারতের ওরাই তো ভিলেন।' বিধু বলে পরম প্রত্যয়ভরে।

'গোড়ায় আমারও ধারণা ছিল তাই। কিন্তু ফাসিস্ট ইটালী, নাৎসী জার্মানী আর সোভিয়েট রাশিয়ার হালচাল শুনে আমার মনে হয় দুনিয়ায় আরো খারাপ আছে। আর স্বদেশের ইতিহাস পড়ে জ্ঞান হয় যে অতীতে আরো খারাপ ছিল। ইংরেজ আমলের শেষের দিকে যখন অরাজকতা শুরু হয়ে যায় তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি যে পুলিস ব্যর্থ হলে আমিও ব্যর্থ হব। গান্ধীজীও যে সফল হতেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? যখন শুনতে পাই যে নোয়াখালীতে তাঁর ভক্ত সেজে তাঁকে পাহারা দিচ্ছে কে, বল তো?' দাদা রহস্যময় হাসি হাসেন।

'পুলিস!' বিধু বিস্মিত হয়। 'না, না, তাঁর এত সব সহকর্মী থাকতে!'

'সহকর্মীরা তো খুব বাঁচাল তাঁকে পরে দিল্লীতে। পুলিসের উপর ভার দিলে কি সে ট্র্যাজেডী ঘটত। পুলিসকে তো দেখেছি জবাহরলালকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকতে। নইলে তাঁকেও বেঁচে থাকতে হত না। গান্ধীজী যে শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন সে শক্তি ছাড়াও আরো কয়েকটা শক্তি কাজ করছিল। তারা আরো খারাপ।'

দাদা দুঃখিত হন।

এর পরে কংগ্রেস শিবিরের কথা ওঠে। দাদা বলেন, 'হ্যাঁ, মহাত্মাকে আমি দর্শন করেছি। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর প্রার্থনাসভায় যোগ দিয়েছি। মওলানা মহম্মদ আলীকে ইন্টারভিউ করেছি, মওলানা শওকত আলীর বক্তৃতা শুনেছি। মোতিলাল নেহরুকে দেখেছি। জবাহরলাল নেহরুর সঙ্গে এক টেবিলে বসে সভা করেছি, ভোজন করেছি। তেমনি মওলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গেও। তেমনি সরোজিনী নাইডুর সঙ্গেও। কোনোটা চাকরিতে থাকতে, কোনোটা চাকরি থেকে বেরিয়ে। বল্লভভাইকে দেখি খালি গায়ে গামছা কাঁধে স্নান করতে যেতে। এটা খাস ইংরেজ আমলে। যেবার মহাত্মার সঙ্গে মালিকান্দায় গিয়ে সাক্ষাৎ করি সেইবার। খান্ আব্দুল গফ্ফার খানের দর্শন পাই সেদিন কলকাতার একটি নিভৃত সভায়। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আমি জানতুম পাটনায় ছাত্র অবস্থায়। সুভাষচন্দ্রকে আমি অল্পের জন্যে মিস করি। পরে তাঁর বার্লিনের বেতারভাষণ শুনেছি।'

'নেতাজীকে বাদ দিয়ে মহাভারত নয়। যেমন ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নয়।' বিধু বলে বিধুর স্বরে।

'সেই জন্যেই তো মহাভারতে হাত দেওয়া আমার সাধ্য নয়। তাঁর জীবনের আসল কাজটাই তো ভারতের বাইরে। জার্মানীতে, জাপানে, সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, বর্মায়, থাইল্যাণ্ডে, ইন্দোচীনে।' দাদা পাশ কাটাতে চান।

'ওসব অজুহাত শুনব না। মহাভারত আপনাকেই লিখতে হবে। যেখানে যেখানে ফাঁক থেকে যাবে অন্যেরা পূরণ করবেন।' বিধু নাছোড়বান্দা।

এবার ওঠে মুসলিম লীগ শিবিরের কথা। দাদা বলেন, 'ঝীণা সাহেবকে আমি দেখি ফিরপো থেকে বেরিয়ে গাড়ির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে। সঙ্গে তাঁর কন্যা। যাঁর মা রতনপ্রিয়া পেতিত। রতনপ্রিয়া যেমন পিতার অমতে ভিন্নধর্মীকে বিবাহ করেন, তাঁর কন্যাও তেমনি পিতার অমতে ভিন্নধর্মীকে। নাজিমউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে লঞ্চে করে ঘুরেছি। খানা খেয়েছি। জনতার আক্রমণ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছি। তিনিও আমার সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছেন। তখন নতুন সিগারেট খেতে শুরু করেছি কিনা, আনাড়ির মতো ধরাই দেখে তিনি আমোদ পান। মহকুমা হাকিম অসুস্থ শুনে তিনি খোদ তাঁর বাংলোয় গিয়ে দেখা করেন। সৌজন্য না স্বধর্মপ্রীতি! ঢাকার নবাবের সঙ্গে মোটরে ঘুরেছি। বাংলায় তিনি যে বক্তৃতা দেন, সেটা বাঙালীর অবোধ্য। ফেরবার পথে আমার অভিমত জানতে চান। তাঁর বাংলাজ্ঞান কেমন? আমি বলি, চমৎকার। একথা শুনে তিনি খোশমেজাজে বলেন, ভাষা শেখার আমার একটা ন্যাক আছে। আই অ্যাম রাদার গুড অ্যাট ল্যাঙ্গোয়েজেস। নাজিমউদ্দীন সাহেবও আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেন। গদি হারাবার পর ফজলুল হক সাহেব একবার আমার কোর্টে সওয়াল করেছিলেন। ইংরেজীতেই। কেসটা বিশ্রী। হিন্দু রমণী। মুসলমান পুরুষ। তার থেকে আসে সাধারণভাবে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের প্রসঙ্গ। আফটার অল দে উইল হ্যাভ টু লিভ টুগেদার। এই হলো হক সাহেবের বক্তব্য। তাঁর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য। তখন কি তিনি জানতেন যে ঠিক এই প্রশ্নটি পার্টিশন ডেকে আনবে এক বছর বাদে?'

বিধু বলে, 'কেউ জানত না ছ'মাস আগেও। নোয়াখালীর পর থেকেই ওই লাইনে ভাবতে

শুরু করি আমরা।'

'মানে তোমরা। আমি তখন হেসে উড়িয়ে দিতুম। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেধে যায়। ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে কে? মেজরিটি না মাইনরিটি? দেশ ভাগ করলে মুসলমানরাও হয় মেজরিটি। অতএব করো দেশ ভাগ। তা হলে আবার হিন্দুরা হয়ে যায় মাইনরিটি। অতএব করো প্রদেশ ভাগ। এই হলো লজিক। মেনে যদি নাও তো শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। নয়তো অশান্তিপূর্ণভাবে ব্রিটিশ অপসরণ। তারপরে ওয়ার অফ সাকসেশন। ভারতের ইতিহাসে যা বারবার ঘটেছে। আমার মোহভঙ্গ হয়। কিন্তু তখনো আমি জানতুম না যে এর পরে আসছে মোহমুদ্গর বা মোহরোলার। আমারই বুকের উপর দিয়ে চালানো হবে।' দাদার মুখে যন্ত্রণার ছাপ।

বিধু হকচকিয়ে যায়। 'সে কী, দাদা! আপনার বুকের উপর দিয়ে!'

'দ্যাখ, ভাই! প্রায় পঁচিশ বছর বাদে বুঝতে পারছি আমরা সবাই ইতিহাসের হাতের পুতুল। পেছন থেকে তার টানে ঐতিহাসিক নিয়তি। যাঁদের উপর এতদিন অভিমান করেছি তাঁরাও ফ্রী এজেন্ট ছিলেন না। তবে তাঁদের তুলনায় আমিই ভাগ্যবান। কারণ আমি ছিলাম এস্কেপিস্ট। আমার এস্কেপ রুট খোলা ছিল। চাকরিতে যখন যোগ দিই তখন থেকেই আমার সঙ্কল্প ছিল আমাকে যদি ময়লা কাজ করতে বলা হয় আমি হাত ময়লা করব না। যা থাকে কপালে। তেমনি আমাকে যদি মানুষের রক্তে হাত রাঙাতে হয় আমি হাত রাঙাব না। যা থাকে অদৃষ্টে। আমার সংকল্পে আমি অটল।

'আস্ত ইংরেজ আমলটা নির্বিবাদে কেটে যায়। কেউ আমাকে ময়লা কাজ করতে বলে না। তবে হাত রাঙাবার মতো পরিস্থিতি মাঝেমাঝে উদিত হয়। কারো হুকুমে নয়। ঘটনাচক্রে। আমার ভাগ্য আমাকে রক্ষা করে।' দাদা শিউরে ওঠেন।

'শুনতে হচ্ছে তো।' বিধু আরো কাছে সরে বসে।

'একবার হয়েছিল কী, রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেছি। হঠাৎ চিঠি নিয়ে আসে পুলিসের আরদালী। লিখেছেন ডি. এস. পি.। কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গণে শহরের মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে জমায়েৎ হয়েছে। হিন্দুর ছেলেরা নাকি মুসলমানের ছেলেদের মারবে বলে শাসিয়েছে। দাঙ্গা আসন্ন। এস. পি. বাইরে। আমার আদেশ ভিন্ন পুলিস গুলী চালাতে পারবে না। আমি যখন শহরেই রয়েছি। হ্যাঁ, সে সময় আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বাড়িতে তখনকার দিনে টেলিফোন থাকত না। থাকবার মধ্যে ছিল একটি চাপরাশী। তাকেই সঙ্গে নিয়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। অন্ধকার রাত। পথে দেখি বন্দুকধারী এক কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। তাকে আমার গাড়িতে তুলে নিই। লোকবল অসীম। দেখি না কী হয়। গুলী চালাবার হুকুম দিতে হবে এমন কী কথা আছে! তবে নিয়ামত আলীর মতো আমি জনতার সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করতে পারব না। নিয়ামত আলী ছিলেন এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাছে আমার মোকদ্দমা শোনার শিক্ষানবীশী। তাঁকে একবার পাঠানো হয়েছিল পুলিসের সঙ্গে দাঙ্গা থামাতে। দরকার হলে গুলী চালানোর হুকুম দিতে। তিনি আমুদে মানুষ। জনতার সঙ্গে মোকাবিলার সময় তিনি তাদের হাসিয়ে রসিয়ে তাদের রাগ জল করে দেন।' দাদা তার বৃত্তান্ত শোনান।

'নিয়ামত আলী যদি হাসিয়ে রসিয়ে দাঙ্গা থামাতে পারলেন তো আপনিই বা কেন তা পারতেন না?' বিধু জানতে চায়।

'কারণ তাতে প্রেস্টিজ থাকে না। আমি যে রাজপ্রতিনিধি। সমস্যা তো সেইখানে। আমি রক্তপাতও করব না, রসিকতাও করব না, অথচ শান্তিরক্ষা করব। কেমন করে সেটা সম্ভব। শো

অফ ফোর্স। তাহলে অন্তত পাঞ্চাশজন সশস্ত্র সিপাহী চাই। তাদের জমায়েৎ করতেও সময় লাগে। কে দিচ্ছে অত সময়! গিয়ে দেখি জনতা ইতিমধ্যেই বিদায় হয়েছে। ডি. এস. পি. বলেন ওরা স্বচক্ষে দেখে গেছে যে মুসলমান ছাত্ররা নিরাপদ। বলে গেছে আবার আসবে। তা আসতে পারে। পুলিসও ইতিমধ্যে দলবল বাড়িয়ে নেবে। হোস্টেল-প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখি হিন্দু ছাত্ররা লক্ষ্মণসেনের পন্থা অনুসরণ করেছে। যে দু'চারটি অবশিষ্ট ছিল তারা কান্নাকাটি করছে। তাদের পালাবার পথ থাকলেও গন্তব্য স্থান নেই। সেই ক'জনকে পাহারা দেবার জন্যে চার পাঁচগুণ পুলিস মোতায়েন করতে হলো। তাতে আবার মুসলিম ছাত্রদের প্রাণে আতঙ্ক। তাদের বোঝানো গেল যে ওটা তাদের বিরুদ্ধে নয়। তারা বুঝল, কিন্তু পরের দিন কলকাতায় টেলিগ্রাম করল যে পুলিস নাকি তাদের সারারাত জ্বালিয়েছে আর সেটা নাকি হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষপাতিত্বের ফলে। হিন্দু মুসলমান যে পাশাপাশি বাস করতে পারে না পার্টিশনের দশ বছর আগেই এর পূর্বাভাস পেয়ে মনটা দমে যায়। ওরা চায় মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট। তখন মুসলিম এত কোথায়! পায় একজন ইংরেজকে। তা, পাক, আমি কিন্তু এইজন্যে খুশি যে আমাকে গুলীর হুকুম দিতে হয়নি। দরকার হলে দিতে হতোই। কিন্তু জখম হতো আমার নিজের অন্তর।' দাদা বিবৃত করেন।

বিধুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'না, তেমন পরিস্থিতিতে আর পড়তে হয়নি। কারণ পরে একসময় আমাকে জজ করে দেওয়া হয়। তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ। এবার গুলীর হুকুম নয়, ফাঁসীর হুকুম। কদ্দিন এড়ানো যায়, বল?'

তাঁর মুখভাব দেখে মনে হয় তাঁরই যেন ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। বিধু অবাক হয়।

'তুমি ভাবছ ফাঁসীর হুকুম এমন কী মন্দ। শূলের হুকুম তো ওর চেয়েও নিষ্ঠুর ছিল। কিংবা শিরশ্ছেদের হুকুম। কিংবা পুড়িয়ে মারার হুকুম। দ্যাখ, বিধু! আমার কাছে এটা তর্কের বিষয় নয়। নীতির বিষয়। মানুষকে মারতে নয়, বাঁচাতে হবে এটাই আমার মতে ধর্ম। বাবা-মা যেদিন বৈষ্ণব দীক্ষা নেন সেইদিন থেকেই আমাদের বাড়িতে জীবহিংসা নিষেধ। আরো আগে একদিন একটা দাঁড়কাক আমাদের মাটির ঘরের চালে বসে ডাকছিল। কথা নেই, বার্তা নেই, বাবার বন্দুকটা নিয়ে একজন চাকর কি বামুন তাকে গুলী করে মারে। কাকটা নিচে পড়ে যায়। তার সেই দৃষ্টি ভোলবার নয়। কাক কি তোমার খাদ্য যে তাকে তুমি মারবে? জন্তুরা যে মারে সেটা প্রাণধারণের জন্যে। আমার জীবনের এটা একটা কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা। এ যুগের মানুষের জীবনেও। গান্ধীজীর ও টলস্টয়ের প্রভাবও আমার উপর কাজ করছিল। পারলে চাকরিটাই ছেড়ে দিতুম। তাই যতবার খুনী মামলার বিচার করতে হতো ততবার উভয়-সঙ্কটে পড়তুম। খুন যদি প্রমাণ হয় মৃত্যুই যে বিধান। অথচ আমার হাত দিয়ে মৃত্যু যে হৃদয়ের পক্ষে দুঃসহ। মনের পক্ষে দুর্বহ। এর পরে কি আমার আহারে রুচি হবে, না রাত্রে নিদ্রা হবে। তাই যতবার ও রকম মামলা আসে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়।' দাদা যেন বিলাপ করেন।

'তা হলে আপনি এড়ালেন কী করে? না, পারলেন না এড়াতে?' বিধু প্রশ্ন করে।

'প্রত্যেকবারই একটা না একটা কারণ থাকে যার দরুন আসামী খালাস পায় বা দ্বীপান্তরে যায়। তবে আমি বুঝতে পারছিলুম যে একদিন না একদিন আমাকে প্রাণদণ্ড দিতেই হবে। এমন একটা বেয়াড়া কেস আসবে যে না-দেবার কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন সময় আমি আরো বড় জেলার ভার পাই ও খুনী মামলা বিচারের দায় আমার অতিরিক্ত দায়রা জজদের উপর চাপাই। তাঁদের কিন্তু আপত্তি নেই। অনেকে তো উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। যিনি যতবার প্রাণদণ্ড দেন লোকে তাঁকে তত বেশি ভয় করে, তত বেশি ভক্তি। আমার ইউরোপীয় পূর্ববর্তী তো হপ্তায় দুটো করে খুনী মামলা শুনতেন ও দুই হাতে ফাঁসীর হুকুম দিতেন। অথচ তাঁর মতো দয়ালু

লোক কম দেখেছি। ওটা এমন একটা জেলা, খুন যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মানুষগুলো শক্তের ভক্ত নরমের যম। আমিও দিন দিন কড়া হয়ে উঠি। কিন্তু ওইটুকু বাকী রাখি। কদ্দিন রাখতে পারতুম জানিনে। এমন সময় দেশ ভাগ হয়ে যায়। নতুন সরকার আমাকে কিছুদিন পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করে দেন ও সীমান্তের অশান্তি রোধ করতে পাঠান। এটা অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত। এই পরিবর্তনটা আমি এককালে নিজেই চেয়েছিলুম, কিন্তু ইংরেজ সরকার রাজী হয়নি। ততদিনে ওটা মুসলিম মন্ত্রীদের পরিচালনায় এসেছিল। তাঁদের পলিসি পালন করাও কষ্টকর ছিল। নতুন একটা সুযোগ পেয়ে আমি বর্তে যাই। কলকাতার আকর্ষণ ছেড়ে আমি ভিন্ন আর কেউ যেত না। ওটা নিছক ত্যাগস্বীকার। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নষ্ট।' দাদা পঁচিশ বছর পেছিয়ে যান।

বিধু বলে, 'সীমান্ত তখন অশান্ত ছিল মনে আছে।'

'অমন অ্যাবসার্ড ব্যাপার কেউ কখনো ভাবতে পেরেছে? সীমান্তের দুই পারেই আমি কাজ করেছি। দুই পারেই আমার বন্ধু। দুই পারেই আমার প্রিয়জন। হিন্দু মুসলমান ভেদ আমি মানিনি। সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেরই নিমক খেয়েছি। দেশ ভাগ হয়েছে বলে, ভেদনীতি স্বীকার করলে তো ইংরেজের ভেদনীতিরও সমর্থন করতে হয়। আমি যখন সীমান্ত অঞ্চলে যাই তখন ওপারের মানুষকেও চিনতে পারি। ওরাও চিনতে পারে আমাকে। আমারই পুরাতন সহকর্মী ছিলেন ওপারের ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। সমস্তক্ষণ 'স্যার', 'স্যার' করেন। আমি যেন সেই আমি ও তিনি যেন সেই তিনি। আপিসের লোক আমাকে পরম আত্মীয়ের মতো আপ্যায়ন করে। আমি অভিভূত হই। আবিষ্কার করি যে আমার পুরাতন বাসভবনের সামনে রাখা কামান দুটো পাকিস্তানী কামান নয়, পুরাকীর্তি। খুব একচোট হাসি আমাদের পুলিসের বিদ্যের বহর দেখে। যুদ্ধের উদ্যোগ কোনোখানেই লক্ষ করিনে। আমি আশ্বস্ত হই।' দাদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

বিধু বলে, 'তার পর?'

'তার পরে যেটা ঘটে সেটা বাঙালী মুসলমান বা হিন্দুর দোষে নয়। ইতিমধ্যে ঝগড়া বেধে গেছল কাশ্মীর নিয়ে, হায়দরাবাদ নিয়ে। বাঙালী তার জন্যে দায়ী নয়। অথচ পশ্চিমে ওরা হাতের কাছে হিন্দু না পেয়ে পুবের হিন্দুদের উপর ঝাল ঝাড়ে। হিন্দুরা এপারে পালিয়ে আসে। তখন এপারের মুসলমানদের উপর ঝাল ঝাড়া শুরু হয়। বাঙালীতে বাঙালীতে এমন জাতিবৈর কেউ কল্পনা করতে পারেনি। উৎকটতম সাম্প্রদায়িকতাবাদীর সঙ্গেও আমি মিশেছি। সব হিন্দু সব মুসলমানের চিরশত্রু একথা কারো মুখে শুনিনি। সবাই চেয়েছে একটা মিটমাট। যে যার নিজের শর্তে। কিন্তু সব হিন্দুকে বা সব মুসলমানকে তাড়িয়ে দিয়ে নয়। আমার কাছে দেশভাগই চূড়ান্ত ট্র্যাজেডী। তার উপর লোকভাগ যেন সুপার-ট্র্যাজেডী। আমার বন্ধু খান্ বাহাদুরেরও একই মত।' দাদা তাঁকে স্মরণ করেন।

'বোধ হয় আমার বন্ধু বলে খান্ বাহাদুরকে তাঁর সরকার বদলী করে দেন। নতুন যিনি এলেন তিনি একজন অবাঙালী মুসলমান। আমার সঙ্গে যোগসূত্র কেটে যায়। কয়েকটা চর ছিল আমার মতে আমাদের। কারণ বরাবর আমার জেলা থেকেই শাসন করা হয়ে এসেছে। তাঁদের মতে তাঁদের। কারণ দুই স্বাধীন দেশের মাঝখানে যদি নদী থাকে তবে নদীর বহতা স্রোতের মাঝখান অবধি সীমানা প্রসারিত হয়। তা হলে কিন্তু চরগুলি আমরা হারাই। যারা সেখানে গোরু চরায়, ফসল ফলায় তারা হয়ে যায় অনধিকারী। এ নিয়ে ঝগড়া পেকে ওঠে। বেদখল চর আমরা বর্ষার পরেই দখল করার প্ল্যান আঁটি ও নদীতে ঢল নামার সঙ্গে সঙ্গেই পার হয়ে ঘাঁটি গাড়ি। মূর্খের মতো সরকারকে রেডিওগ্রাম করে জানাই যে অপারেশন সাকসেসফুল।' দাদা চোখ বুজে মাথা নাড়েন।

'মূর্খের মতো বলছেন কেন, দাদা?' বিধু আশ্চর্য হয়।

'মূর্খের মতো নয় তো ইডিয়টের মতো। কখনো বাহাদুরি নিতে যেয়ো না। নিতে গেলে পস্তাবে। আমার রেডিওগ্রাম পেয়ে মেজকর্তা ছুটে আসেন আমাকে অভিনন্দন জানাতে। সঙ্গে আমার উপরওয়ালা। তাঁদের খাতিরে লঞ্চের উপরে বিরাট এক ভোজ দেওয়া হয়। বিরাট এইজন্যে যে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন একপাল সাঙ্গোপাঙ্গ। তাঁরা যখন ক্যাবিনে গিয়ে ভোজের জন্যে তৈরি হচ্ছেন তখন আমি তদারকের জন্যে ডেকের উপর ঘোরাঘুরি করছি। আমার কানে এল সাঙ্গো বলছে পাঙ্গোকে, ওঁরা কেন এসেছেন জান? জবাহরলাল এখন দেশের বাইরে। যা করবার এইবেলা করে নিতে হবে। আমি কলকাতায় এর একটা পূর্বাভাষ পেয়েছিলুম। কিন্তু সীরিয়াসলি নিইনি। তখন একটা সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কেন তা বুঝতে পারিনি। এইবার আমার টনক নড়ে। আমি হুঁশিয়ার হয়ে যাই। চট করে স্থির করে নিই আমার কর্তব্য। যার উপর নির্ভর করছে আমার নিজের ভবিষ্যৎ, আমার দেশের ভবিষ্যৎ, হিন্দু মুসলমান দুই ভাইয়ের ভবিষ্যৎ। চর নিয়ে ঝগড়া যার কাছে অতি তুচ্ছ। কর্তারা শুভাগমন করলেন। মধ্যাহ্নভোজন সমাধা হলো। এর পরে তাঁরা বিশ্রামের জন্যে প্রস্থান করলেন। আমিও আমার সহকর্মীদের সাধুবাদ জানিয়ে আমার ক্যাবিনে গেলুম।' দাদা বিধুকে আরেক পেয়ালা চা ঢেলে দেন।

'তার পর?'

'তার পর শুনি কর্তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তখন ছুটতে হয় তাঁদের সকাশে। তাঁদের ক্যাবিনে তাঁরা দু'জন। আমাকে নিয়ে তিনজন। খুব চুপি চুপি কথাবার্তা। টপ সীক্রেট। মেজকর্তা আমার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পদোন্নতির টোপ ফেলেন। তার পরে আস্তে আস্তে কথাটা পাড়েন। তিনি নাকি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছেন যে যুদ্ধ আসন্ন। অমুকদিনের মধ্যে সীমান্ত সাফ করে দিতে হবে। সীমান্তের এরা হবে পঞ্চম বাহিনী। তখন আমি বুঝতে পারি কেন এই শুভাগমন। আমাকে অভিনন্দন জানাতে নয়, আমাকে দিয়ে যুদ্ধের নাম করে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়ে নিতে। জবাহরলালের অনুপস্থিতির অবকাশে। আমার কাছে ছিল লিখিত সারকুলার। মাইনরিটির গায়ে যেন হাত না দেওয়া হয়। দিলে কঠোর সাজা। এখন ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আমাকেই করতে হবে ক্রিমিনালের মতো কাজ। কর্তারা লিখিত হুকুম দেবেন না। যাতে তাঁদের জবাবদিহি করতে না হয়। কলকাতায় আমাকে ডেকে নিয়ে মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতে যুদ্ধের নামগন্ধ ছিল না। কোনো কারণ দর্শানো হয়নি। আমিও গ্রাহ্য করিনি। তাই সশরীরে আগমন মুখে মুখে আদেশ জারী করতে।' দাদা গম্ভীরভাবে বলেন।

বিধুর মুখ বিবর্ণ। এ কি বিশ্বাসযোগ্য!

'এখন আমিও যদি আমার অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস অফিসারদের মৌখিক আদেশ দিতে যাই তাঁরা নিশ্চয়ই দাবী করবেন লিখিত আদেশ। সীমান্তের সত্তর মাইল জুড়ে বাস করছে সাত লাখ মাইনরিটি। ওরাও তো দাবী করবে লিখিত আদেশ। ওরা প্রথমে পড়েছিল পাকিস্তানের ভাগে। পরে ভারতের ভাগে পড়ে। এমনিতেই ওরা বিক্ষুব্ধ। ইন্ধন যোগালে ওরা মারমুখো হবে। রক্তপাত অনিবার্য। আমাকে পাঠানো হয়েছিল সীমান্তকে শান্ত করতে। বহু যত্নে শান্ত করে এনেছি। শান্তকে আবার অশান্ত করে তুলব? আমি শুধু একটি কথা বলি, ও কাজ করতে গেলে রক্তপাত হবে। মেজকর্তা বলেন, 'হোক না। হোক না।' তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আমি সৈনিকের মতো লড়তে পারি। কিন্তু অমন কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। আমি ইস্তফা দেব। কর্তারা তা শুনে ভড়কে যান। তখন ঝুলি থেকে বাহির হয় বেড়াল।' দাদা কৌতুক করেন।

তার পর বলে যান, 'মেজকর্তা আমার পরামর্শ চান। ওপার থেকে এই যে হাজার হাজার শরণার্থী আসছে এদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের আমরা রাখব কোথায়? আমি

বলি, সীমান্তে নয়। মাইনরিটির জায়গায় নয়। অন্যান্য প্রদেশে বিস্তর জমি খালি পড়ে রয়েছে। তিনি বলেন, কিন্তু ওরা যদি না যায়? তখন আমি বলি, তা হলে আমি এর কী করতে পারি? তিনি চটে গিয়ে বলেন, পলিসি নির্দেশ করব আমরাই। এই যদি হয় আমাদের পলিসি, আপনি ক্যারি আউট করবেন কি করবেন না? আমি বলি, করলে এমন হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে যে আপনাদের ও পলিসি প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মিসচীফ যা ঘটে যাবে তাকে অঘটিত করা যাবে না। তার জন্যে জবাবদিহি করবে কে? আমি ইস্তফা দেব। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সেই যে প্রমোদভোজ তার সমস্তটা খরচ উঠেছিল সীমান্তেরই মাইনরিটি প্রধানদের কাছ থেকে। বিকেলে তাঁরা আসেন দর্শন করতে। কর্তার মুখ অপ্রসন্ন। আমি তাঁদের অভয় দিই। আমি যতদিন আছি আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ওটা আমার চ্যালেঞ্জ। কর্তার কেন সহ্য হবে? তিনি ডিনারে এলেন না। উপরওয়ালাও না। তাঁদের খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সাঙ্গোপাঙ্গ কিন্তু ভূরিভোজনে আপ্যায়িত হলো। এর পরে শুনি তাঁরা নদীর ধারে রাখা রেলের সেলুনে ফিরে গেছেন। গিয়ে বিদায় দিই ও নিই। কর্তার মুখে বাঁকা হাসি। বুঝতে পারি তিনি প্রতিশোধ নেবেন। অনেক রাত্রে সদরে ফেরার সময় ট্রেনে অপূর্ব এক উল্লাস অনুভব করি। আমি না করলে কেউ ও কাজ করত না। লোকগুলো বেঁচে গেল। রক্তপাত হবে না।' দাদা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন। বিধু জানতে চায় তার পরে কী হলো।

'তার পরে হলো আমারই বিতাড়ন। কিন্তু আমাকে বিতাড়ন করলে কী হবে, জবাহরলাল করলেন প্রত্যাবর্তন আর ওই পলিসিটা করা হলো প্রত্যাহার। 'কোথায় যুদ্ধ। কে চায় যুদ্ধ' মিলিটারি অফিসারদের নিয়ে আমি কি কম ঘুরেছি? সবাই তাঁরা যুদ্ধবিরোধী। ব্রিগেডিয়ার সাহেব তো বলেন দু'দুটো মহাযুদ্ধে তিনি লড়েছেন। তাঁর মতো নন্‌ভায়োলেন্ট কেউ নয় মেজর জেনারেল তো আমাকে সতর্ক করে দিয়ে যান যে চর নিয়ে শেষকালে না আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বেধে যায়। চর অপারেশন আমি মাসের পর মাস মাথা খাটিয়ে করেছি। যাতে রক্তপাত না হয়। ওটাও আমাদের এলাকার মাইনরিটির স্বার্থে। চরের ফসল তো ওদেরই সম্পত্তি। ওদেরই অভিযোগ শুনে আমিও কাজে নামি। ওদের শান্তও করেছি, ওদের বিশ্বাসও পেয়েছি।' দাদা প্রীতির সঙ্গে বলেন।

বিধু বলে, 'তার পরে আপনার কী গতি হলো?'

'আবার ফিরে যেতে হলো তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে। সেবার বিদেশী আমলে বা মুসলিম আমলে। এবার স্বদেশী আমলে বা হিন্দু আমলে। স্বদেশী জুতো কিছু কম মিষ্টি নয়। কিন্তু আসল কথা হলো আমাকে একভাবে না হোক আরেকভাবে হাত রাঙাতেই হবে। হয় গুলী চালিয়ে, নয় ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে। আমি এসকেপিস্ট। বার বার এসকেপ করেছি। কিন্তু চাকরিতে যদি পড়ে থাকি তবে একদিন না একদিন এসকেপের পথ রুদ্ধ হবে। ধরো, গান্ধীহত্যার বিচার যদি আমাকেই করতে হতো আমি কী হুকুম দিতুম? প্রাণদণ্ড নিশ্চয়। সে দণ্ড যিনি দেন তিনি একজন জৈন। আমারই সমসাময়িক। ইস্তফার অন্যান্য কারণও ছিল। একদিন সকালে উঠে হঠাৎ স্থির করি যে আধুলি টস করে মাথার পিঠটা উঠলে ইস্তফা দেব। টস করলেন আমার স্ত্রী। তিনি লিখলেন, আমি সই করলুম। পুরুষের শক্তি তার স্ত্রী। নইলে সে সাহস পেতুম কোথায়?'

'সত্যি। তিনিই আপনার শক্তি।' বিধু তার প্রশংসা করে।

'কিন্তু আমার মুক্তি অত সহজে হলো না। একজন সেক্রেটারির হঠাৎ অসুখ করে। আমার ডাক পড়ে অস্থায়ীভাবে। বিতাড়ন করেছিলেন যাঁরা তাঁরাই সমাদর করলেন। আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। কিন্তু আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে। যেদিন চার্জ দিয়ে বিদায় নেব ঠিক তার আগের দিন আমার সামনে একটি জরুরী অর্ডার রাখা হয়। তৎক্ষণাৎ সই করে জেলখানায় পাঠাতে হবে। শেষরাত্রে একটি মহাপ্রাণীর ভবলীলা সাঙ্গ। বেলা দশটায়

আমারও চাকরিলীলা সাঙ্গ। কেমন বিচিত্র যোগাযোগ! যেন আমি হাত রাঙা করবার জন্যেই এই আসনে বসেছিলুম। ফাঁসীর আসামীকে একটা দিনও ঝুলিয়ে রাখা যায় না। মুলতুবির হুকুম দেওয়া অন্যায়। এবার আমার এসকেপ নেই। দুয়ার রুদ্ধ।' এই বলে বিধুকে দাদা ঝুলিয়ে রাখেন।

সে রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'তার পর?'

'এমন সময় রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। প্রবেশ করেন শেষ ব্রিটিশ ব্যারিস্টার। তাঁকে আমি বিশেষ সমীহ করতুম। তিনি বলেন, 'আমরা আরো একবার প্রাণভিক্ষার সুযোগ প্রার্থনা করি। উপর থেকে ভরসা পেয়েছি প্রাণদণ্ড মকুব হবে।' দিলুম আরো একটা সুযোগ। লোকটা হয়তো বেঁচে যাবে। অন্তত কিছুদিন তো বাঁচবেই। পরের দিন আমিও হালকা মনে বিদায় নিই। আমার নিয়তি আমাকে সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়। আমার ভাগ্য আমাকে টেনে বার করে। বোধহয় এর অন্তর্নিহিত কারণ আমি একজন লেখক। লেখকের জন্যে এসকেপ রুট সব সময় খোলা থাকা চাই।' দাদা এইখানে শেষ করেন।

বিধু অভিভূত হয়। এত কথার পরেও আবার বলে, দাদা, মহাভারত আপনাকে লিখতেই হবে। আপনাকে লিখতে হবে।'

'কার জন্মদিন আজ মনে আছে?' দাদা হাতজোড় করে বলেন, 'এস, শ্রীঅরবিন্দকে স্মরণ করি। তাঁর 'সাবিত্রী'ই একালের মহাভারত।'

দুই জগতের মাঝখানে

রায়বাহাদুর আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'এস, ভাই, এস। স্বাগতম। সুস্বাগতম্' আর তাঁর সহধর্মিণী মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বলেন, 'বোস, বাবা বোস।'

হ্যাঁ, একজন বলতেন 'ভাই'। যদিও বয়সের ব্যবধান চোদ্দ কি পনেরো বছর। অপরজন বলতেন, 'বাবা'। কারণ, পর্দার ব্যবধান তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

গৃহিণী যান চা আনতে। কর্তা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন সোফার উপর নিজের একপাশে। আর সমস্তক্ষণ ধরে থাকেন আমার একটা হাত। পাছে পালিয়ে যাই।

বলেন, 'জানো, রিটায়ারমেন্টের পরের দিন থেকে জনমানব আসে না আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তুমিই প্রথম। তুমি তো এলে সেই সুদূর বীরভূম থেকে। কিন্তু যাঁরা এই বালীগঞ্জে বাস করেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হলে তাঁদের বাড়ি যেতে হবে। তাঁরা কষ্ট করে আসবেন না। এই সেদিনও যারা আমার চারদিকে ঘুরঘুর করত তারাও আমাকে দেখলে পাশ কাটিয়ে যায়। চাপরাশিরা সেলাম করে না। কেরানীরা উঠে দাঁড়ায় না। অফিসাররা বসতে চেয়ার অফার করেন না। গোটা সরকারী মহলটাই আমার দিকে এমন করে তাকায় আমি যেন একটা ভূত। না, ভূতকেও তো লোকে ভয় করে। আমাকে কেউ ভয় করে না। অথচ এককালে কে না করত!'

আমি সহানুভূতির সঙ্গে বলি, 'আপনি বড্ড সেনসিটিভ। রিটায়ার যাঁরা করেন তাঁরা কেনই বা প্রত্যাশা করেন যে লোকে তাঁদের পূর্বপরিচয় মনে রাখবে? একজন রিটায়ার্ড বাঘ ও একজন রিটায়ার্ড ছাগ দুজনেই ওদের চোখে সমান।'

'সাধারণ লোক তা মনে করতে পারে, কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা তো জানে আমি রায় রোহিণীকান্ত চ্যাটার্জি বাহাদুর। রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসন্‌স জজ। আমি কি একজন রিটায়ার্ড সেরেস্তাদার কি পেশকারের সঙ্গে সমান!' রায়বাহাদুর গর্জন করতে গিয়ে আর্ত স্বরে বলেন।

'সমান, সমান। সম্পূর্ণ সমান। চাকরির আগে যেমনটি ছিলেন। মনে করুন চাকরির আগের অবস্থায় ফিরে গেছেন। তাহলে শুধু একটু শিষ্টাচারই প্রত্যাশা করবেন। তার বেশি নয়। সেটুকু যে-কোনো ভদ্রলোকের পাওনা।' আমি আশ্বাস দিই।

রায়বাহাদুর ফণা নত করে বলেন, 'সত্যি বলছি, ভাই। ত্রিশ বছরের দর্প চূর্ণ হতে তিনটে মাসও লাগল না। চাপরাশি-হীন জীবন কখনো কল্পনা করতে পারিনি। ওরাই তো রোজ বাজার করে আনত। নাজির এসে দু'বেলা খবর নিত কিছু দরকার আছে কিনা। স্টেনো এসে ডিকটেশন নিয়ে যেত! এখন অভ্যেস এমন খারাপ হয়ে গেছে যে নিজের হাতে একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারিনে। একজন টাইপিস্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, সে এসে টাইপ করে দিয়ে যায়।'

আমি দুঃখ প্রকাশ করি। বলি, 'সময়ে সয়ে যাবে।'

'আরো সর্বনেশে কথা আয় অর্ধেকের নিচে। ব্যয় যেমনকে তেমন। স্টাইল একবার বাড়িয়ে দিলে নামে না, এ শিক্ষা আমার হয়নি। এখন আমি শিক্ষানবীশ। কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে, ভাই। কোনোমতেই ঠাট বজায় রাখতে পারছিনে। অথচ তুমি যে বললে চাকরির আগেকার অবস্থায় ফিরে যেতে সেটাই বা কেমন করে সম্ভব? এ বয়সে কি তেমন কষ্ট সইতে পারব?' রায়বাহাদুর আক্ষেপ করেন।

তাঁর সার্ভিসের অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে তফাত ছিল যে তিনি থাকতেন ইউরোপীয় স্টাইলে। এটা চাকরির গোড়া থেকেই। যখন তাঁর সঙ্গে এক স্টেশনে কাজ করতুম তখনি লক্ষ করেছি যে তিনি বাড়িতে ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন না কিংবা আদালতে চাপকান পায়জামা। টেবিল চেয়ার না হলে তাঁর খাওয়া হতো না। তবে আহারটা ছিল দেশী। তাঁর স্ত্রীর স্বহস্তের পাক।

'দ্যাখ হে, সবচেয়ে বড়ো দুঃখ হাতে কাজ নেই। কোর্টে যাবার জন্যে পা ছটফট করে। মামলার শুনানীর জন্যে প্রাণ আইঢাই করে। অফিসের ফাইল দেখার জন্যে চোখভরা কৌতূহল। কিন্তু কেউ ভুলেও আমাকে স্মরণ করে না। স্মরণ যা কিছু তা আমিই করি। কবে কী রায় দিয়েছি সব আমার মুখস্থ। একটু শোনাব নাকি?' রায়বাহাদুর সতৃষ্ণনয়নে তাকান।

শুনি মিনিট দশেক। 'অপূর্ব! অপূর্ব ইংরেজী!' আমি তারিফ করি। ইংরেজী তিনি এত ভালো শিখেছিলেন যে তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে বিলেত গিয়ে সেদেশেও নাম করে। তিনি নাকি স্বপ্নও দেখতেন ইংরেজীতে।

'কিন্তু কোন্ কাজে লাগছে সেই ইংরেজী! রিটায়ার্ড বলে আমি কি সব কাজের অযোগ্য? কী নিয়ে আমি বাঁচব? কেন আমি বাঁচব? সেটা কি শুধু এইজন্যে যে আমার পেনসনটা এদের কাজে লাগছে?' তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেন

আমি বলি, 'জীবন আরম্ভ হয় পঞ্চান্ন বছর বয়সে। মনে করুন এটা আপনার নবজন্ম। জগতে কি কাজের অভাব!'

'দ্বিজ কথাটার মানে জানো তো? যে দু'বার জন্মায়। তেমনি আরো একটা শব্দ বানাতে পারো। তার অর্থ যে দু'বার মরে। দ্বিমর। আমরা সরকারী কর্মচারীরা দ্বিমর। আমরা একবার মরি রিটায়ারমেন্টের সময়, আরেকবার তার কিছুদিন বাদে। অনেকেই সাটের আগে মারা যায়। আমিও যে ততদিন বাঁচব তার স্থিরতা কী? একেই কি তুমি বলবে নবজন্ম? তবে হতুম যদি উকীল, তাহলে

আশি বছর বয়স অবধি চুটিয়ে প্র্যাকটিস করতুম। গোড়ায় তো সেই ইচ্ছাই ছিল ভাই। প্রথম কয়েক বছর স্ট্রাগল করতে হয়। সেটার জন্যে কিছু অর্থসাহায্যেরও প্রয়োজন। কারো কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেব না বলেই তো মুনসেফী নিই। না বাপের কাছ থেকে, না শ্বশুরের কাছ থেকে। আমি সেল্‌ফ-মেড ম্যান। বরাবর স্কলারশিপ পেয়েছি।' তিনি স্মৃতিচারণ করেন।

'তা আপনি তো এখনো প্র্যাকটিসে নামতে পারেন। স্যার আশুতোষকেও তো পাটনা হাইকোর্টে মামলা লড়তে দেখেছি।' আমিও করি স্মৃতিচারণ।

'কার সঙ্গে কার তুলনা!' রায়বাহাদুর নম্রভাবে বলেন, 'না, ভাই, ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। আমার সাবর্ডিনেটদের 'ইওর অনার' বলে সম্বোধন করা। হাইকোর্টের জজদের বেলা অন্য কথা। কিন্তু তেমন সুযোগ তো বেশি জুটবে না। ওইসব সাবর্ডিনেটদের সামনেই দাঁড়াতে হবে আমাকে! যে আমি জজের আসনে বসেছি! যে আমি রিটায়ার্ড জজ বলে পেনসন ড্র করছি! ছি ছি ছি!'

কয়েক বছর বাদে আবার দেখা করতে যাই। 'রায়বাহাদুর' বলতেই তিনি চমকে উঠে হাত নেড়ে নিষেধ করেন।

'ভূত! ভূত! আমি এখন রায়বাহাদুর নই, রায়বাহাদুরের ভূত! জানো না, ইংরেজ যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আমলের খেতাবগুলো বাতিল হয়ে গেছে। আমি ছিলুম দ্বিমর, এখন হয়েছি ত্রিমর। ভালোই হলো যে ময়ূরপুচ্ছটা খসে গেল। তুমি বুঝবে না সে কী যন্ত্রণা। জানতেন তোমার গুরুদেব। পরতে গেলে লাগে এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে। লোকে ভাবে রায়বাহাদুর যখন খয়ের খাঁ নিশ্চয়। কী করে জানবে যে হাইকোর্টের জজদের যেমন নাইট উপাধি দেওয়া হতো জেলা ও দায়রা জজদের তেমনি রায়বাহাদুর খেতাব! তাঁদের রেকর্ড দেখে। অবশ্য আমার সার্ভিসের কথাই বলছি। এর জন্যে কারো দ্বারস্থ হতে হয়নি আমাকে। কারো ফরমাসও খাটতে হয়নি।' তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন।

'কিন্তু আপনি খুব কড়া হাকিম ছিলেন মনে আছে।' আমি উসকে দিই।

'হ্যাঁ, কোর্টে আমি ভয়ানক কড়া ছিলুম। কারো মুখ দেখে বিচার করতুম না। কী জমিদার কী মহাজন, কী স্বামীজী, কী ব্রাহ্মণ!' তিনি দেখতেন শুধু আইন।

একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম করেন যাঁর জমিদারি এস্টেটের বাকী খাজনার নালিশটা ছিল মিথ্যা। প্রজাকে অকারণে নাস্তানাবুদ হতে হয়।

'ওটা বোধহয় ওঁর জ্ঞাতসারে হয়নি। অন্যান্য শরিকের মতো উনিও সই করে দিয়ে থাকবেন। নায়েব গোমস্তার কারসাজি।' আমি ওঁর হয়ে কৈফিয়ত দিই।

'অমনি করেই তো জমিদারবাবুরা প্রজাদের হৃদয় থেকে মুছে গেলেন। থাকবেন কলকাতায়, করবেন অধ্যাপনা, লিখবেন গ্রন্থ, রাখবেন জমিদারি, মারবেন প্রজাদের অন্ন। ধর্মাধিকরণে বসে আমি এঁদের ক্ষমা করতে পারি কখনো? কড়া স্টিকচার দিই। ও রোগ সারবার নয়। তাই তো জমিদারি উঠে যাচ্ছে।' তিনি বলেন খেদের সঙ্গে।

'ওটা ইংরেজের সৃষ্টি। ইংরেজ গেলে জমিদারিও যায়।' আমি মন্তব্য করি।

'দেখলুম কেউ চিরস্থায়ী নয়, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ইংরেজ নয়, তার সাম্রাজ্যও নয়, তার করদ রাজ্য বা জমিদারিও নয়, তার আমলের নাইটহুডও নয়, রাজা উপাধিও নয়। এতদিন আমি আমার নিজের দুঃখেই কাতর হয়েছি। এখন চোখে জল আসে হতভাগা রাজন্যদের দশা দেখে। অভিজাতদের দশা দেখে। আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় পুরাতন জগতের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু নূতন জগতের জন্ম হয়নি। আমরা বাস করছি দুই জগতের মাঝখানে।' তিনি বলেন দার্শনিকের মতো।

আমিও দার্শনিকতা করি। 'এটা একটা গোধূলিকাল। বলা যেতে পারে উদয়গোধূলি। রাতের আঁধার গেছে, অথচ দিনের আলো ফোটেনি।'

তিনি মাথা নাড়েন। রাতের আঁধার যেটাকে বলছ সেইটেই ছিল দিনের আলো। সেই আলোর পরশ লেগে শতদলের এক একটি দল চোখ মেলে। কারো নাম রামমোহন, কারো নাম বিদ্যাসাগর, কারো নাম বঙ্কিম, কারো নাম রবীন্দ্র, কারো নাম বিবেকানন্দ, কারো নাম অরবিন্দ। হ্যাঁ, কারো নাম গান্ধী, কারো নাম সুভাষ। এঁরা কেউ আঁধারের শিশু নন, সকলেই আলোর শিশু।'

আমি তাঁকে আশ্বাস দিই যে ওর চেয়েও শক্তিশালী আলোকের স্পর্শে সহস্রদলের সহস্রটি দল খুলে যাবে। জনগণের উপর প্রত্যয় রাখতে হবে।

তাঁর বিশ্বাস হয় না। 'ভাই, তোমার বয়স কম। তুমি আশাবাদী। আমি কিন্তু নৈরাশ্যবাদী। সার্ভিস ট্র্যাডিশন দুই শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, এত শিগগির পড়ে যাবে না। কিন্তু পোড়ো বাড়ির মতো পড়ে যাবেই। এরা শুধু দল গড়তেই শিখেছে, আর কিছু গড়তে শেখেনি। অথচ ভাঙতে ওস্তাদ। যাক, আমার কী। আমি ততদিন বাঁচলে তো? আমিও এখন দুই জগতের মাঝখানে। ইহলোক আর পরলোক। অথচ পরলোক আছে কিনা তাও নিশ্চিত জানিনে। প্রমাণাভাব। পুজো আর্চাও করিনে, মন্দিরেও যাইনে, মঠবাড়িতেও না। গীতা চণ্ডীও পড়িনে। পড়ি ইতিহাস।'

ইহলোক ও পরলোক নিয়ে আমার মনে কোনো সমস্যা ছিল না। আমি জানতুম যে যখন যেখানেই যাব তখন সেইখানটাই হবে ইহলোক। তেমনি সেই কালটাই হবে ইহকাল। একে একে সবাই তো আমরা সে অভিমুখে যাচ্ছি। কেউ দুদিন আগে, কেউ দুদিন পরে। তবে যাদের এপারের কাজ ফুরিয়েছে, সত্যিকার কিছু করবার নেই, তাদের মনে হতে পারে যে তারা এপারেরও নন ওপারেরও নন। দুই জগতের মাঝখানে।

কিন্তু ওর আরো একটা অর্থও তো আছে। ব্যক্তির বেলা নয় সমাজের বেলা এটা যদি একটা গোধূলিকাল হয়ে থাকে তবে অস্তগোধূলি না উদয়গোধূলি। এটা কি 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' না 'হরি, দিন যে গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমায়'? সন্ধ্যা বলতে একটা যুগের সন্ধ্যা।

'পশ্চিমের মনীষীরাও ভাবতে আরম্ভ করেছেন যে সামনে আসছে একটা অন্ধকার যুগ। যে প্রদীপটার উপর তাঁদের ভরসা ছিল সেই প্রদীপটার নিচেই অন্ধকার। বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে এক বিভীষিকা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বাধে তবে এবার আসছে বায়োলজিকাল ওয়ারফেয়ার। ভারতের স্বাধীনতা যদি হয়ে থাকে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর স্বাধীনতা তাহলে ওটি একটি অমূল্য বস্তু। ওকে অতি যত্নে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু পশ্চিমের ওঁরা যে পথ নিয়েছেন সেটা সরে দাঁড়ানোর নয়। প্রতিরোধের। অন্ধকারকে প্রতিরোধ করতে হলে আলো জ্বালাতে হয়। সেটা কিসের আলো? বিজ্ঞানের আলো না ধর্মের আলো? নতুন করে অনেকেই ধর্মের শরণ নিচ্ছেন। খ্রীস্টের শরণ নিচ্ছেন। সঙ্ঘের শরণ নিচ্ছেন। এটার মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? তাঁরাও প্রতিরোধ করবেন অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রের। পরমাণু অস্ত্র দিয়ে পরমাণু অস্ত্রের। ব্যাধিবীজ দিয়ে ব্যাধিবীজের। তাহলে তো পুরোনো পিদিমটার তলায়ও অন্ধকার।' আমি স্বগতভাবেই বলি।

'আমি কিন্তু ইউরোপের কথা ভাবছিনে। ভাবছি আমার এই সনাতন স্বদেশের কথা। এই সনাতন অচলায়তনটিকে সচল করেছিল যে শক্তি সে শক্তি স্বেচ্ছায় অপসরণ করেছে। এঁদের বিশ্বাস এঁরাই সেটা ঘটিয়েছেন। সেটা সত্য হলেও অর্ধসত্য। সেইজন্যে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। ইতি জবাহরলালঃ।' তিনি হাসলেন। তাঁর হাসিটিও পরিমিত।

'আপনার কি আশঙ্কা মধ্যযুগ ফিরে আসবে?' সোজাসুজি প্রশ্ন করি।

'মধ্যযুগ গেল কবে যে ফিরে আসবে! বলতে পারো চাপা পড়েছিল, এখন মাথা তুলবে। তুমি মনে করেছ তোমার সাধের জনগণ তার সঙ্গে লড়বে? না সে কাজ রামমোহন রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরীদের। তাঁরা লড়বেন কি? লড়বার শক্তি আছে কি? ইচ্ছা আছে কি? লড়াইটা অচলায়তন বনাম সচলায়তন নয়। অচলায়তন বনাম অর্ধচলায়তন। তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।' তিনি নৈরাশ্যবাদী।

গৃহকর্ত্রী আমাকে ভিতরে নিয়ে যান। বলেন, 'ওঁর কী হয়েছে, জানো? সারাজীবন ভৃত্যের মতো খেটেছেন। বেশির ভাগ মফঃস্বলের চৌকিতে। পটিয়া আর বাউজান, হাতিয়া আর খাতড়া, এমনি কত জায়গায়। কোথায় দুদণ্ড বিশ্রাম করবেন, দার্জিলিং কি শিলং যাবেন, বেনারস কি হরিদ্বার, আগ্রা কি দিল্লী, তা তো নয়। তাঁরই মতো জনাকয়েক রিটায়ার্ড জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অতীতের জাবর কাটবেন। এঁরা ধর্মপ্রাণ নন কর্মপ্রাণ। কাজ না থাকলে ডাঙার মাছ। সমস্তক্ষণ ছটফট করেন। কিন্তু কাজ কোথায় যে করবেন? নতুন সরকার কতলোককে ট্রাইবুনালে নিচ্ছে, কিন্তু ইনি তো কোনোদিন কুর্নিশ করেননি, করবেনও না। চাকরি যতদিন ছিল দাবী ছিল। চাকরিও নেই, দাবীও নেই। ওঁর ধারণা সরকারী লোকই দরকারী লোক। উনি সরকারী নন বলে দরকারী নন। একটা কিছু দরকারী কাজে ওঁকে লাগিয়ে দেওয়া যায় না? টাকার জন্যে নয়। উনি যে একজন দরকারী লোক এই ধারণাটার জন্যে।'

আমি এর কী উত্তর দিতে পারি? বলি ভেবে দেখব।

এর পরে একদিন আমিও অকালে অবসর নিয়ে সরে পড়ি। আবার যখন দেখা মিস্টার চ্যাটার্জি—রোহিণীবাবু বললে তিনি ক্ষুণ্ণ হন—আমার সঙ্গে কোলাকুলি করেন।

বলেন, 'তুমিও দ্বিমর হয়ে আমাদের দলে ভিড়লে? কিন্তু আরো কিছুদিন থাকলে ভালো করতে। তোমার তো কচি বয়েস। বানপ্রস্থের তাড়া কিসের?'

'আমাকে আমার জীবনের কাজ সারা করে যেতে হবে। জীবিকার জন্যে কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলে তারপরে আর এনার্জি থাকত না। তাছাড়া আপনি যেমন দুই জগতের মাঝখানে আমিও ছিলুম তেমনি। কিন্তু আরেক অর্থে। সাবেক আমলের কর্মচারী হাল আমলে মানিয়ে চলতে জানে না। মানে মানে সরে যাওয়াই শ্রেয়। সময় থাকতে সরে যাওয়াই বিজ্ঞতা।' আমি কৈফিয়ত দিই।

'কিন্তু তোমার সাধের জনগণের প্রতিও তো একটা কর্তব্য ছিল। তারা চায় সুবিচার, তারা চায় সুশাসন, এটাও একপ্রকার বিট্রেয়াল।' তিনি মৃদু ভর্ৎসনা করেন।

'কই আমাকে তো ওরা জানতে দেয়নি যে আমি একজন দরকারী লোক? সরকারকেও তো জানায়নি। তাছাড়া জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক তো আমি চুকিয়ে দিচ্ছিনে। দিচ্ছি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক। জনগণের সেবা অন্যভাবে করব।' তাঁকে আশ্বাস দিই।

ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সরকারী কর্মচারী বা দ্বিমর রূপে নয়। সারস্বত রূপে আমরা একসঙ্গে সভাসমিতিতে যাই। আলাপ-আলোচনায় যোগ দিই। তাঁর উৎসাহের জোয়ার আসে। নৈরাশ্যবাদ চাপা পড়ে যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি সভাপতিত্বের আহ্বান পান। কিংবা উপসভাপতিত্বের। সরকারী না হলেও তিনি হন একজন দরকারী লোক। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এর স্বীকৃতি দেয়। কমিটির মেম্বর করে। তিনি আর পুরোনো দিনের জাবর কাটেন না।

আমি তো ভেবেছিলাম নতুন জমানার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়ে গেছে। তা নয়। বছর কয়েক বাদে একবার তাঁর অতিথি হতে হয়। তখন কথাবার্তার অখণ্ড অবসর মেলে। জিজ্ঞাসা করি আশা

করবার মতো কিছু দেখছেন কিনা।

'জানি তোমার মনে কষ্ট হবে। সেইজন্যে ও প্রসঙ্গ তুলিনে। কিন্তু তুমি যখন নিজেই তুলেছ তখন আমার কথাটা আমি খুলেই বলি।' তিনি চুপ করে ভাবেন, তারপর জোর দিলে বলেন, 'না। নতুন জগতের কিছুমাত্র পূর্বাভাস পাচ্ছিনে। শুধু, পুরোনো জগৎটাই একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। একে একে নিবিছে দেউটি।'

আমি তাঁকে বাধা দিইনে। প্রাণ খুলতে দিই।

'দেউটি আরো নিববে। দেউটি সব নিবে যাবে । বয়স তো বাড়ছে। মানুষ তো অমর নয়। তার জন্যে আপসোস করে কী হবে? ওটা আমি সভাসমিতির জন্যে তুলে রেখে দিয়েছি। অপূরণীয় ক্ষতি। যদুনাথ সরকার, রাজশেখর বসু এঁদের স্থান শূন্যই থেকে যাবে। শতবার্ষিকীর হিড়িক পড়ে গেছে। সেখানেও আরেক দফা কাঁদুনি গেয়ে আসি। শতবার্ষিকী ঘুরেফিরে আসবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর একটিবারও আসবেন না। লোকের ভালো লাগে শুনতে। আমারও ভালো লাগে বলতে। কিন্তু নবাগত যাঁরা তাঁদের নতুন জগতের অগ্রদূত বলে চিনতেই পারিনে। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে তাঁরাও বর্ণচোরা পুরাতন। তাঁদের নূতনত্ব কেবল শব্দে আর ভঙ্গীতে আর কৌশলে আর মেজাজে। সেটা বাসি হতে কতক্ষণ! খবরের কাগজ কে দু'বার পড়ে!' তিনি বকবক করেন।

আমি এবার একটু অস্ফুট প্রতিবাদ করি। 'তবু নূতনত্ব কি একেবারে নেই?'

'থাকবে না কেন? দেশে শিল্পবিপ্লব হলে বিস্তর নতুন সমস্যা ওঠে। তেমনি কমিউনিজম হলে বিস্তর নতুন মুখ দেখা যায়। একেই যদি তুমি বল নূতনত্ব তবে তুমিই ঠিক। আমিই বেঠিক। কিন্তু এটাও তোমাকে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এদের কারো শতবার্ষিকী কোনোদিন অনুষ্ঠিত হবে না। এমনকি অর্ধশতবার্ষিকীও না। সিকি শতবার্ষিকীও হয় কিনা দেখো। তুমি তো ততদিন বেঁচে থাকবেই।' তিনি সহাস্যে বলেন।

আমি আর কথা বাড়াইনে। অন্দরে গিয়ে দিদির সঙ্গে গল্প করি। তিনি বলেন, 'ওঁর দু'জন বন্ধু আছেন রায়সাহেব আর এম. বি. ই। তিনজনে মিলে রোজ লেকের ধারে বেড়ান আর আড্ডা দেন। ওঁরা বলেন 'রায়বাহাদুর'। ইনি বলেন 'রায়সাহেব' বা 'মিস্টার'। মান্ধাতার আমলের মতো। আর ওদিকে ওঁর যে ভাইটি তিনি তো এখন থেকেই একটা লাল ঝাণ্ডা যোগাড় করে লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁর ছেলেদেরও তালিম দিচ্ছেন চ্যাটার্জির বদলে চটস্কি বলে পরিচয় দিতে।'

'হা হা হা!' আমি হেসে বলি, 'তা এতে দোষের কী আছে? চাটুজ্যে যদি চ্যাটার্জি হতে পারল তবে চ্যাটার্জি কেন চটস্কি হবে না?'

'তুমি তো হাসছ। ওঁর কিন্তু রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। ওঁকেও কি শেষ বয়সে চটস্কি সাজতে হবে? আর ওই যে লাল ঝাণ্ডা ওটা যেন ষাঁড়ের সামনে লাল ন্যাকড়া। বাড়িটা কোন্‌দিন না বাজেয়াপ্ত করে! সারাজীবনের সঞ্চয়। চোরাকারবারের টাকা তো নয়। তফাতটা কি ওরা বুঝবে? স্বর্গে গিয়েও উনি শান্তি পাবেন না। যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে। বলেন তো স্বর্গ নরক উনি মানেন না। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। কিন্তু শ্রাদ্ধ না করলে ওঁর আত্মার তৃপ্তি হবে না এটাও জানিয়ে রেখেছেন।' দিদির মুখে স্মিত হাসি।

মানুষমাত্রেই জটিল। অসঙ্গতিতে ভরা। আমি এর জন্যে কাউকে দোষ দিইনে। কিন্তু কথাটি কি সত্যি? নতুন জগতের কি পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে না ? কোথায় গেলে পূর্বাভাষ পাব? ভিলাইতে না মাইথনে, চণ্ডীগড়ে না ভাকরা নাঙ্গালে? দিল্লীতে না কেরলে? গ্রামে না বস্তিতে? কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পাব? যারা হঠাৎ বড়লোক না রাতারাতি গরিব? আঙুল ফুলে কলাগাছ না কলাগাছ শুকিয়ে সলতে? ছাত্ররা যদি একটা শ্রেণী বলে গণ্য হয় তো তারা একই কালে ইংরেজী

উঠিয়ে দিচ্ছে ও সাহেবী পোশাক পরছে। এর মধ্যে কোন্‌টা নতুন? মেয়েরা যদি একটা শ্রেণী বলে মান্য হয় তবে ওরা একই কালে পর্দা ছেড়ে দিচ্ছে ও নাকছাবি বা নথ পরছে। দিকে দিকে কালীপূজার ধুম পড়ে গেছে। শীতলা, শনি কেই বা পূজা না পাচ্ছেন! অপর পক্ষে আজ ধর্মঘট কাল ঘেরাও পরশু মিছিল। লাল ঝাণ্ডার ছড়াছড়ি। দেখলে মনে হবে কলকাতা নয় মস্কো।

পরের বার যখন দেখা করতে যাই লক্ষ করি যে একতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। স্বামী স্ত্রী দু'জনের মুখে দুর্দিনের ছায়া। টাকার দাম পড়ে গেছে, পেনসনে কুলয় না। মিস্টার চ্যাটার্জি এই ভেবে অস্থির যে তিনি যদি হঠাৎ চোখ বোজেন পেনসনটা বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে ভাবনার কথা তাঁর গৃহিণীকে বলা হবে ল্যাণ্ডলেডী। ভাড়াটেরা ওছাড়া আর কী বলবে! ছি ছি ছি!

একদিন আমার স্ত্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গেটের ফলকে খোদাই ছিল রায় রোহিণীকান্ত চ্যাটার্জি বাহাদুর। সে ফলক কোথায়? তার জায়গায় নতুন ফলকে খোদাই পি কে চ্যাটার্জি। এটা কি ল্যাণ্ডলেডী সমস্যার সমাধান?

এরপরে দিদির মুখে হাসি নেই। যে মুখে হাসি সব সময় লেগে থাকত। দারুণ পুত্রশোকের পরেও। তাঁর নিগূঢ় বেদনা তিনি কাউকে জানতে দিতেন না। এবার কিন্তু আমাকে বলেন আর বইতে পারছেন না। ছোট নাতিটির দুরারোগ্য ব্যাধি। নিজেরও শরীর ভেঙে পড়ছে। সংসারে অশান্তি। কর্তার বিরুদ্ধেও মৃদু অভিযোগ। এই প্রথম বিদ্রোহ।

পরে একদিন শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই দুপুরবেলা তিনি সেই যে শুতে যান তার পরে আর ওঠেন না। ঘুমের মধ্যেই চলে যান। তাঁর স্বামী টের পান না। যদিও পাশের খাটে শুয়ে বই পড়ছিলেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত!

গভীর সমবেদনায় অভিভূত হই। ভদ্রলোক কোনোমতে অশ্রুসম্বরণ করেন। মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বলেন, 'চলে গেল। বলে গেল না। এত অভিমান!'

তিনি সভাসমিতিতে যাওয়া ছেড়ে দেন। অথচ গীতা উপনিষদ নিয়েও বসেন না। আমি তাঁকে ধর্মের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে পরামর্শ দিই। তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, 'শোক কি আমার জীবনে এই প্রথম? মনে নেই সেবারকার দুর্ঘটনা? চব্বিশ ঘন্টা যেন বায়োস্কোপ দেখি। অমন কৃতী ছেলে যশস্বী ছেলে কেমন করে চলে যায়! ঈশ্বর থাকলে সমস্তই তাঁর ইচ্ছায় ঘটে। কিংবা তাঁরই অমোঘ নিয়মে। আর যদি কর্মে বিশ্বাস করি যে যার কর্মফল ভোগ করতে এসেছে, ভোগের শেষে দেহ রেখে যাবে। কোথায়? এর ঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেনি ও পারবে না। ওপার থেকে তো কেউ ফিরে আসেনি।'

মাঝে মাঝে যাই। দেখা করি। জন্মদিনে শুভকামনা জানালে বলেন, 'দুই জগতের মাঝখানে আর কদ্দিন পড়ে থাকি! ঘরেরও নই ঘাটেরও নই।'

'আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। নতুন জগতের পূর্বাভাষ দেখে যাবেন। দ্য বেস্ট ইজ ইয়েট টু বী।' আমি ব্রাউনিং থেকে উদ্ধার করি।

'না, ভাই। এ আঁধার আরো ঘন হবে। দ্য ওয়ারস্ট ইজ ইয়েট টু বী। তখন আমার কথা মনে থাকবে তো?' তিনি হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় দেন।

একদিন শুনি তাঁর শ্রাদ্ধ। অথচ মৃত্যুর খবরটাই আমার অজানা। যাবার সময় নাকি বড়ো নাতির হাতে একটি উপহার দিয়ে বিলিতী কায়দায় হ্যাণ্ডশেক করে বলেন, 'গুডবাই। ভালো ছেলে হবে। কেমন?'

পথি নারী বিবর্জিতা

এক যে ছিলেন রাজা। রাজা একদিন মৃগয়ায় গিয়ে দেখেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা গহন বনে বসে কাঁদছে। তিনি তাকে দয়া করে উদ্ধার করেন। রাজবাড়িতে নিয়ে যান। তারপরে একদিন হলো কী—

ওটা হলো রূপকথা। ওরকম রূপকথা কে না শুনেছে ছেলেবেলায় ঠাকুমা দিদিমার মুখে? কিন্তু বড়ো হয়ে আমি যা শুনেছি তা রূপকথা নয়, রূপকথার চেয়েও বিচিত্র। এক নবপরিচিত বন্ধুর মুখে। শুনে ব্যথিত হয়েছি। সেই গৌরবর্ণ আবক্ষধব সুপুরুষের জন্যে। চল্লিশ বছর বয়সেও যিনি অবিবাহিত।

সিংহলে তাঁর সঙ্গে আলাপ। সেখানে তখন তিনি উচ্চপদারূঢ় রাজকর্মচারী। ব্রিটিশ শাসন তখনো শেষ হয়নি। তাঁর মতো আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে কলম্বোর বাঙালী সমাজ। দিন দশেকের জন্যে সপরিবারে বেড়াতে গিয়ে ওঁদের সকলের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। সকলেই আমাদের সাহায্য করেন। এক একজন এক একভাবে। ইচ্ছা তো ছিল আরো কিছুদিন থেকে সিংহল দ্বীপটাকে আর তার বৌদ্ধ সমাজটিকে ভালো করে চিনব। শুধু কয়েকটা দৃশ্য দেখাই তো দেশকে চেনা বা মানুষকে চেনা নয়।

কিন্তু অনবরত ঘোরাঘুরি করা একজনের পক্ষে ক্লান্তিকর না হলেও স্ত্রীর পক্ষে ছেলেমেয়েদের পক্ষে কষ্টকর। তা ছাড়া যাঁদের অতিথি আমরা তাদেরও তো বিব্রত করা হয়। আবার আমরা নিজেরাও তো বিব্রত বোধ করতে পারি। তাই কলম্বো ক্যান্ডি, পোলান্নারুয়া, সিগিরিয়া দর্শন করেই ক্ষান্ত হই। অনুরাধপুর—অনুরাধা নয়। অনুরাধ—রয়ে যায় দৃষ্টির বাইরে। যেখানে বোধিদ্রুমের শাখা বহন করে নিয়ে যান সংঘমিত্রা ও মহীন্দ্র। এখনো সে জীবিত। এতদিনে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

'চলুন না আমিই আপনাদের ঘুরিয়ে আনব।' প্রস্তাব করেন সেই নব পরিচিত বন্ধু বিনায়ক ভঞ্জ। 'আমার বাড়িতেই থাকবেন আপনারা। ঘরগুলো খালি পড়ে রয়েছে। আমার তো শূন্য মন্দির।'

'না ধন্যবাদ। এবার আর নয়। আমরা আজ রাত্রেই ট্রেন ধরতে চাই। পরে আবার আসব। সিংহল হচ্ছে বৌদ্ধদের শেষ আশ্রয়। যেমন দাক্ষিণাত্য হচ্ছে দ্রাবিড়দের শেষ আশ্রয়। প্রাচীন ভারতে যারা চতুর্দিকে ছড়িয়েছিল তারা এখন এক একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ। এবার আমি সিংহলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলুম, দাক্ষিণাত্যের উপরেও নিয়েছি ও নেব। পরে আবার খুঁটিয়ে দেখব।' আমি তার প্রস্তাবের উত্তরে বলি।

'তাহলে আজকের বিকেলটা আমাকে দিন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।' তিনি আমাকে অনুরোধ করেন।

বুঝতে পারি যে কথাটা শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই। তিনি আর আমি দু'জনে মিলে স্থির করি যে বিকেলে একসঙ্গে বেড়াতে বেরোব রথ দেখতে ও কলা বেচতে। রবারের বাগান দেখতে ও কথাবার্তা বলতে। আমার স্ত্রীর তাতে আগ্রহ ছিল না। তিনি যান দোকান দেখতে ও উপহার কিনতে। বাচ্চাদের সেনগুপ্তদের ওখানে রেখে।

ড্রাইভ করেন গাড়ির মালিক স্বয়ং। মোটরে আমরা পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে চলি।

চড়াই আর উৎরাই। চমৎকার পিচদেওয়া রাস্তা। সিংহলের সর্বত্র তেমনি। মোটরে করে এই কদিনে আমরা বেড়ানোর আরাম পেয়েছি। পথে কিন্তু হোটেল পাইনি। রেস্টোরান্ট পাইনি। সেইজন্যে টুরিস্ট তেমন কিছু দেখিনি।

চালাতে চালাতে বিনায়ক বলেন, 'কেমন সুন্দর দেশ দেখছেন তো? এদেশে কাজ করেও আনন্দ আছে। লোকেও খুব ফ্রেণ্ডলি। আমি যে বিজয়সিংহের দেশ থেকে এসেছি এর জন্যে আমার কত সমাদর! সেদিন একটা মানপত্র দিয়েছে দেখেছেন? লিখেছে ওরা আর আমরা পরস্পরের জ্ঞাতি। কারণ আমাদের একই পূর্বপুরুষ।'

'তা নেহাৎ ভুল নয়। চেহারায় কিছু কিছু মিল নেই কি? তবে ভাষা'র কথা বলতে পারব না।' আমি সে বিষয়ে অজ্ঞ।

'না ভাষার কথা আলাদা। তবে সংস্কৃত শব্দ প্রচুর ব্যবহার করে। আর একটা জিনিস লক্ষ করেছি। ওরা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চায় না। ওদের ধর্মের মতো ওদের সংস্কৃতিও উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত।' বিনায়ক আলোকপাত করেন।

'তা তো হবেই। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের সময় থেকেই যোগাযোগ। রামায়ণ যদিও ইতিহাস নয় তবু ঐতিহ্যেরও মূল্য আছে। আর সেই যে আমাদের ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর তারা কি কেবল বাণিজ্য করতে আসত, সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে আসত না? নিয়েও যেত লঙ্কার সংস্কৃতি। লঙ্কামরিচ না হলে আমাদের রান্নাই হয় না। রন্ধনও তো একটা কলা। সংস্কৃতির অঙ্গ।' আমি পরিহাস করি।

তিনি চালাতে চালাতে এক সময় বলেন, 'আচ্ছা, শহর ছাড়িয়ে মাইল পনেরো ষোল পথ অতিক্রম করে এলুম। এর মধ্যে ক'জন পথিককে আপনি পায়ে হাঁটতে দেখলেন?'

আমার খেয়াল ছিল না। মনে করে বলি, 'বেশি নয়। পাঁচ সাত জন।'

'তবু তো এটা কলম্বোর নিকটবর্তী অঞ্চল। সুদূর নয়।' তিনি মন্তব্য করেন। 'কেন? সুদূর হলে কী হতো?' আমি জানতে চাই।

'তাহলে আরো কম দেখতেন। যাচ্ছি তো আমরা আরো দূরে। নজর রাখুন। কমতে কমতে একটি কি দুটিতে ঠেকবে।' তিনি আমাকে জানান।

আমি এ রহস্য ভেদ করতে পারিনে। অনেকক্ষণ রাস্তার উপর নজর রেখে বলি, 'কী ব্যাপার বলুন দেখি? এমন জনবিরল কেন?'

'শুনুন তাহলে একদিন কী হয়েছিল। এ রাস্তা নয়, এমনি এক রাস্তা দিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছিলুম ডাকবাংলোয়। আমার পরিদর্শনের কাজ সেরে। গাড়িতে আমি ভিন্ন আর কেউ ছিল না। আমিই আরোহী আমিই চালক। অমন তো হামেশাই হয়ে থাকে। আমরা এদেশে চাপরাশি নিয়ে ঘুরিনে আপনাদের ওদেশের মতো।' তিনি শুরু করেন বলতে।

'তারপর?' আমার কৌতূহল জাগে।

'পথের দুধারে বনজঙ্গল। লোকালয় নেই। থাকলেও অনেকটা দূরে। লোক চলাচল খুবই কম। বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ সামনে দেখি একটি মেয়েমানুষ—রাস্তার ধারে বসে কাঁদছে। আমি গাড়ি থামিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করি, কাঁদছ কেন? কোথায় যাবে? তোমার সঙ্গের লোকজন কোথায়? সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কেবল কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যতদূর দৃষ্টি যায় দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নজরে পড়ে না। এমনও হতে পারে যে তার সঙ্গের মানুষটি জঙ্গলে ঢুকেছে।' আর কিছুক্ষণ বাদে এসে হাজির হবে। আমি ডাকাডাকি করি। সাড়া পাইনে। ওদিকে আঁধার হয়ে আসছে। একটা সিদ্ধান্ত না নিলেই নয়। একটি অসহায় স্ত্রীলোককে একলা ফেলে রেখে গাড়ি

হাঁকিয়ে চলে যাওয়া তো মনুষ্যত্ব নয়। তার চেয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া যাক ডাকবাংলোয়। সেখান থেকে ওর গ্রামে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। যদি সন্ধান মেলে। আমার তখন ধারণা ছিল ডাকবাংলোয় আরো লোকজন থাকবে, তারা ওর ভাষা আমার চেয়ে ভালো বুঝবে, ওর স্বদেশবাসীর কাছে ও নিঃসঙ্কোচে কথা বলবে। এইসব ভেবে আমি ওকে আমার গাড়িতে উঠতে বলি। ওর পোঁটলা-পুঁটলি তুলতে বলি। ওসব দেখে মনে হচ্ছিল হাট থেকে ফিরছে। সঙ্গের লোক এগিয়ে গেছে। ও পেছিয়ে পড়েছে। কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর টের পাই ওর মুখে মদের গন্ধ।' তিনি বলে যান।

আমি তো হাঁ। চমৎকার একটা রোমান্সের স্বাদ পাচ্ছিলুম। হঠাৎ এ কী রসভঙ্গ!

'দেখতে কেমন? পরমা সুন্দরী কন্যা? নবযৌবনা?' আমি রসিকতা করি।

'আরে, না, না। সুন্দরীও নয় যুবতীও নয়। এদেশের অতি সাধারণ দেহাতী কালো মেয়ে। বয়স হয়েছে। আমার চেয়ে বড়ো।' তিনি কাষ্ঠহাসি হাসেন।

তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেছিলেন। আমারই সমসাময়িক। তবে কখনো দেখা হয়নি। তাঁর শিক্ষার স্থান ছিল গ্লাসগো আর আমার শিক্ষানবীশীর স্থান লণ্ডন। পড়াশুনার পর নানা দেশে ও নানা পদে কাজকর্ম করে বছর দুই আগে সিংহল সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। চুক্তি আরো তিন বছর বাকী।

'তাহলে হিচ-হাইকিং নয়?' আমি রগড় করি।

তিনি তা শুনে কোথায় আমোদ পাবেন না উল্টো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। বলেন, 'এমনি করেই মানুষ নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনে।'

'বিপদ!' আমি চমকে উঠি। 'বিপদ কিসের? বরং আপনিই তো একটি অসহায় নারীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।'

'শুনুন তো আগে সবটা'। তিনি আস্তে আস্তে গাড়ি চালান যাতে আমি ভালো করে শুনতে পাই। স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যখন ডাকবাংলোয় পৌঁছই তখন দেখি যে অন্যান্য অতিথিরা প্রস্থান করেছেন। একমাত্র আমিই সেখানে অধিষ্ঠান করছি। আমার সঙ্গে আমার চাপরাশি। সে আমার জন্যে খানা তৈরি করে রেখেছে। গা ধোবার জন্যে গরম জলও তৈয়ার। আমি সকাল সকাল শুতে যাব। আর ছিল ডাকবাংলোর চৌকিদার। সে একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে যাবে। তার গ্রাম মাইলখানেক দূরে। ডাকবাংলোর অবস্থান চৌরাস্তার মোড়ে। লোকালয়ের বাইরে। যে যার চাপরাশি খানসামা নিয়ে আসেন, দুচারদিন আস্তানা গাড়েন, সারা দিন টুর করেন। রাত্রে খানার সঙ্গে পিনা।'

'আপনি তো ও রসে বঞ্চিত।' আমি তামাশা করি।

'আমি গান্ধীজীর শিষ্য। তাঁর ডাকে কলেজ ছেড়েছিলুম। জেলে গেছলুম। পরে আমার গুরুজন আমাকে বিলেত চালান করে দেন। সেখানে সবরকম প্রলোভন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলি। এখানেও চলেছি।' তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন।

'তার পরে?' আমার কৌতূহল বাগ মানে না।

'তার পরে চৌকিদার আর চাপরাশি দু'জনে মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করি স্ত্রীলোকটির নামধাম বার করতে। কিন্তু কিছুতেই পারিনে। মদের নেশায় মেয়েটি আবোল তাবোল বকে। তখন আমি হুকুম দিই ওকে চৌকিদারের গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে রাতটা ওখানে রাখতে ও পরে দরকার হলে পুলিসে খবর দিতে। হুকুমটা মাঠে মারা যায়। স্ত্রীলোকটিও নড়বে না চৌকিদার বা চাপরাশি ওর গায়ে হাত দেবে না। আমি যখন খেতে বসি ওকেও খেতে দিই। ডাকবাংলোর খালি একটা ঘরে ওকে শুতে

দেওয়া হয়। এর পর চৌকিদার যথারীতি বাড়ি যায় ও চাপরাশি বারান্দায় শোয়। আমি যাই আমার ঘরে। ভিতর থেকে খিল দিই। এক ঘুমে রাত কাবার।' তিনি তাঁর কাহিনীটা থামান।

পথের ধারে একটা চায়ের দোকান পড়ে। সেখানে গিয়ে আমরা চায়ের অর্ডার দিই। খাঁটি সিংহলী চা। চমৎকার স্বাদ। গাড়িতে আবার ওঠার আগে আমরা কিছুক্ষণ পায়চারি করি। হাত পা আড়ষ্ট বোধ হচ্ছিল।

'তারপর কী হলো?' আমি তাঁকে শুধাই।

'পরের দিন উঠে দেখি পাখি উড়ে গেছে। কেউ বলতে পারে না কখন ও কোন্ দিক। আমার এমন ভ্যাবাচাকা লাগে যে পুলিসে একটা খবর দিতেও ভুলে যাই। চাপরাশি বলে ও নিশ্চয় ওর নিজের গাঁয়ের পথ ধরেছে। ঘরমুখো গোরু। এতক্ষণে হয়তো অর্ধেক রাস্তা এগিয়ে গেছে। দৌড় দিয়েও ওর নাগাল পাওয়া যাবে না। চৌকিদারও বলে তল্লাস ছেড়ে দিতে। ও তো বিদেশী নয় যে পথ হারাবে বা পথে হারিয়ে যাবে। দিনের বেলা বিপদেও পড়বে না। তখন আমি কেবল ওর বিপদের কথাই ভেবেছি। নিজের বিপদের কথা কল্পনাই করতে পারিনি। আমার মাথায়ই আসেনি যে ডাকবাংলোর খাতায় প্রত্যেকটি অতিথির নাম ঠিকানা লিখতে হয়। ও যখন একখানা ঘরে রাত্রিবাস করছে তখন ও তো অতিথি ছাড়া আর কিছু নয়। যদি বারান্দায় শুয়ে থাকত তাহলে অন্য কথা। ভদ্রতা করতে গিয়েই আমি নিয়মভঙ্গ করেছি। চৌকিদার বলে ওর জন্যে কিছু চার্জও লাগবে। সেটা অবশ্য তুচ্ছ। কিন্তু আসল কথা হলো ওর নাম ঠিকানা।' তিনি আমাকেও ভাবিয়ে তোলেন।

'কী মুশকিল' আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলি।

'অমনি করেই মানুষ নিজের কবর নিজের হাতেই খোঁড়ে। আমি ডাকবাংলোর খাতায় কিছু না লিখে অলাদা একখানা কাগজে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উদ্দেশে লিখি একটি অসহায় নারীকে পথের বিপদ থেকে উদ্ধার করে আমি ডাকবাংলোয় আশ্রয় দিতে বাধ্য হই। সে তার নাম ঠিকানা জানায়নি। সকালে উঠে শুনি সে নিরুদ্দেশ। চার্জ হিসাবে এত টাকা চৌকিদারের হাতে দিয়েছি। চৌকিদার আমাকে নিষেধ করে ওসব লিখতে। আমি তার অর্থ করি, আমি যদি ওসব না লিখি চৌকিদার ও টাকাটা নিজের পকেটে পুরবে। একেই বলে হিতে বিপরীত।' তিনি করুণ কণ্ঠে বলেন।

'কেন? কেন?' আমি আরো উৎকণ্ঠিত হই।

'চিঠিখানা যাঁর উদ্দেশে লেখা তিনি উপরওয়ালাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা আমার উপরওয়ালাদের কাছে। এখন আমার বিরুদ্ধে চার্জ আমি কেন বেগানা নারীকে ডাকবাংলোয় ধরে নিয়ে গিয়ে বিনা অনুমতিতে সেখানে রেখেছি ও তার সঙ্গে পান আহার ও রাত্রিযাপন করেছি। তার পরে তাকে কোথায় চালান করে দিয়েছি। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আমি মাথা তুলতে পারিনে। বন্ধুদের একথা বলতে ওঁরা বলেন, তুমি তো নেহাত সুবোধ বালক হে! তুমি কি জানতে না যে ডাকবাংলোয় মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে মউজ করা হামেশা ঘটে। চৌকিদারকে মোটা বখশিশ দিলে সব চাপা পড়ে যায়। কেউ কেয়ার করে না। তুমি কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ সৃষ্টি করেছ। এখন সীতার মতো তোমাকেও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। লঙ্কায় এসেছ যখন তখন সহজে নিষ্কৃতি নেই।' তিনি কাতর স্বরে বলেন।

'সত্যি হলেও ওটা এমন কিছু দোষের নয় যে চাকরিটা যাবে। বড়জোর সেনস্যার করবে। তা আপনি চার্জের জবাবে কী লিখলেন?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'লিখলুম আমি ওকে ধরেও নিয়ে যাইনি, ওর সঙ্গে পানও করিনি, আহারও করিনি, রাত্রিযাপনও করিনি, ওকে কোথাও চালানও করে দিইনি। তবে বিনা অনুমতিতে ওকে ডাকবাংলোর

একখানা ঘরে আশ্রয় দিয়েছি এটা ঠিক। বারান্দায় শুতে বললে ওর প্রতি অন্যায় করা হতো। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হাতের কাছে থাকলে অনুমতিও নিতুম। কিন্তু তিনি থাকেন বহুদূরে। চৌকিদারকে তো জানিয়েছি। কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখতে পারেন।' তিনি আমার দিকে তাকান।

তারপর আরো বলেন, 'না, সেনসার আমি সহ্য করব না। সেনসার করলে আমি ব্যাগ ও ব্যাগেজ সমেত সিংহল ত্যাগ করব। করতে গেলুম সৎকাজ। মাথায় নিতে হবে অপবাদ! চাকরির জন্যে হীনতা স্বীকার আমার কোষ্ঠিতে লেখেনি। সিংহল ছাড়া আরো তো চাকরি আছে। ওরা যদি ছাগল দিয়ে ধান মাড়াই করতে চায় করুক গে। জানি আমি অনেকেরই ঈর্ষাভাজন। তাঁরা থাকতে একজন বিদেশী কেন এত বড়ো একটা পদ অধিকার করবে! তা নইলে সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে এত তোলপাড়! সেনসারের পর কি আমি মুখ দেখাতে পারব? সকলেই ধরে নেবে যে আমি সত্যি অমন কাজ করেছিলুম বা করতে পারি। মানুষের রেপুটেশন চুরি গেলে আর কি থাকে! এতকাল তাকে সযত্নে পাহারা দিয়ে এসেছি।'

'তাহলে তদন্ত চলছে বলুন।' আমি কৌতূহল দমন করতে পারিনে।

'চলছে কি চলছে না বোঝা শক্ত। আমাকে আর জানায়নি। যখন জানাবে তখন আমিও গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার বক্তব্য জানাব। তবে মনে মনে স্থির করে ফেলেছি যে আমাকে অবিশ্বাস করলে আমি পদত্যাগ করব।' তিনি ঘোষণা করেন।

আমি তাঁকে আরো চিন্তা করতে বলি। লোকে বলবে নিশ্চয় কিছু ঘটেছিল, নয়তো পদত্যাগ করবে কেন? বাধ্য না হলে কি কেউ পদত্যাগ করে? এটা একটা চ্যালেঞ্জ। তিনি যেন চ্যালেঞ্জের সমুচিত উত্তর দেন। ফ্লাইট নয়, ফাইট। অশুভ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। যেমন রাম করেছিলেন রাবণের সঙ্গে। এই লঙ্কায়।

ফেরবার পথে তিনি অনেকক্ষণ মৌন থাকেন। তারপর বলেন 'আমার কিন্তু মন উঠে গেছে। এ সেই হনুমতীর অভিশাপ।'

'হনুমতীর অভিশাপ!' আমি প্রতিধ্বনি করি। বিস্ময়ের সঙ্গে।

'তাহলে শুনুন সে কাহিনী। আমার কেমন যেন মনে হয় একটার সঙ্গে আরেকটার সম্বন্ধ আছে। যদিও প্রমাণ করতে পারব না যুক্তি দিয়ে।' তিনি রহস্যময় করে বলেন।

'এ তো বড়ো আশ্চর্য।' আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনি।

'একদিন ওই পথেই আমি মোটর চালিয়ে যাচ্ছিলুম। ওই ডাকবাংলোর থেকে বেরিয়ে। পথে লোকজন নেই বলে গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিই। তারপর সামনে পড়ে যায় এক হনুমান দম্পতি। ঠিক রাস্তার মাঝখানে ওরা বসেছিল। ব্রেক কষতে না কষতেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। হনুমানটা পালাতে পারে না, চাপা পড়ে মারা যায়। তখন হনুমতীটির সে কী কান্না! অবিকল মানুষের মতো। আমার কাছে এসে সে মানুষের মতো করেই ওর স্বামীর প্রাণভিক্ষা করে। দুই হাত জুড়ে অনুনয় করে বলে ওকে বাঁচিয়ে দাও! বাঁচাব কী করে? আমি কি ধন্বন্তরী? ধন্বন্তরীও কি পারতেন? আমি গাড়ি থেকে নেমে হনুমানটির অঙ্গ পরীক্ষা করি। মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। একখানা হাত বা পা নয় যে কোথাও নিয়ে গেলে সারবে। ওকে সেই অবস্থায় রেখে চলে যেতেও পা ওঠে না। গাড়িতে তুলে নিয়েই বা করব কী! অপেক্ষা করি যতক্ষণ না লোকজন জড়ো হয়। সেটা সকালবেলা। তাই লোক চলাচলের পক্ষে প্রশস্ত সময়। লোকজন এসে আমাকেই গাল পাড়ে। আমি আমার অপরাধ প্রাণ খুলে স্বীকার করি। ওদের উপরেই ছেড়ে দিই বিচারের ভার। ওরা হনুমানটিকে সরানোর ভার নেয়। জঙ্গলের মধ্যে গোর দেবে। আমি ক্ষতিপূরণ বাবদ আমার থলে উজাড় করে দিই। কিন্তু সেটা তো হনুমতীর কোনো কাজে লাগে না। সে কেঁদে কেঁদে পাগলের মতো ঘোরে। অনেকক্ষণ অবধি

আমাকে মিনতি করে বলে তুমিই মেরেছ তুমিই বাঁচাও।' তাঁর গলা ধরে আসে।

আমি সমবেদনা প্রকাশ করি। আমারও মন কেমন করে। আহা বেচারি!

'ওই রাস্তা। ওইরকম জায়গা। তাহলে ওই হনুমতী নয় কেন? ওরা কি মানুষের বেশ ধারণ করতে পারে না? দেশটা যখন লঙ্কা।' তিনি অবুঝের মতো উক্তি করেন।

'ঘটনাটা সত্যি করুণ।' আমি সান্ত্বনা দিই। 'কিন্তু তা বলে কি সেই হনুমতী মানুষের রূপ ধরে আপনাকে ছলনা করতে পারে? ওটা রূপকথার জগতেই সম্ভব। আপনি যে বাস করছেন বাস্তবজগতে।'

'কিন্তু, ভাই, আমার যে শাস্তি একটা পাওনা ছিল। হনুমানের মৃত্যুর জন্যে আমিই যে দায়ী। একভাবে না হোক আরেকভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হতোই। হোক না এইভাবেই। আমিও আমার রক্তমাখা হাত ধুয়ে ফেলে নির্মল হই। ওরা যদি আমার বয়ান বিশ্বাস না করে আমিও শাপমুক্ত হব। ফাইট নয়, ফ্লাইট।' তিনি মনে মনে প্রস্তুত।

'প্রায়শ্চিত্ত অন্যভাবেও তো হতে পারে। জীবে দয়া আপনার ব্রত হোক। জীবহত্যা করবেন না। মাছ মাংস ছেড়ে দিন। চাকরি ছাড়বেন কেন? বরং বিয়ে থা করে সংসারী হোন। জীবনে একটা স্থিতি চাই।' আমি তাঁকে পরামর্শ দিই। যদিও বয়সে তিনিই আমার অগ্রজ। তাঁর এলোমেলো জীবনযাত্রা দেখে আমি আন্তরিক দুঃখিত।

তিনি আমাদের রাতের এক্সপ্রেসে তুলে দেন। তখন লক্ষ করি তাঁর মুখে প্রগাঢ় বিষাদ। বলেন, 'আরো কিছুদিন থাকতে রাজী হলেন না। হলে কত সুখী হতুম! এই কটা দিনের আনন্দের পর আবার নিরানন্দ।'

আমি তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বলি, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' তারপর বুঝিয়ে দিই ওর মর্ম। কে বলেছিলেন কাকে। কবে কোথায়।

তাঁর মুখে হাসি ফোটে। 'আচ্ছা, আবার দেখা হবে।'

সিংহল থেকে ফেরার পর নিজের শোকেই আমি পাগল। কে কাকে উপদেশ দেয়! জানতুম না যে তিনিও দেশে ফিরে এসেছেন ও কংগ্রেস নেতারা তাঁকে একটা দায়িত্বের কাজ দিয়েছেন। নেতারা জেলে যাবার পর তিনি একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। একদিন আসে শুভবিবাহের লিপি। আমি আনন্দিত হই। সব ভালো যার শেষ ভালো।

চৌত্রিশ বছর বাদে সেদিন সিংহলের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এখন আমার বয়স বেড়েছে। তাই সেদিনকার মতো আমি অতটা নিশ্চিত নই যে ওটা শুধু রূপকথার জগতেই সম্ভব। রূপকথার জগৎ কোথায় শেষ হয়েছে বাস্তব জগৎ কোথায় শুরু হয়েছে কে আমাকে বলবে! বাস্তব সত্য যাকে ভাবি সেও নিপট রূপকথা হতে পারে। নিছক রূপকথা যাকে ঠাওরাই সেও নিরেট সত্য হতে পারে। ওই যে মেয়েটি অকস্মাৎ কোনখান থেকে এসে কোন্‌খানে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ও কি রূপকথার জগতের নয়? তাই যদি না হবে তো একটি পুরুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে কোন্ জাদুবলে? আর সেই যে হনুমতী সেই বা কেমন করে মানুষের মতো কাঁদে, হাত জোড় করে পতির প্রাণভিক্ষা করে?

যমের অরুচি

একহাতে চায়ের পেয়ালা, আরেক হাতে খবরের কাগজ। সামনে রুটি টোস্ট। পাশের চেয়ারে জীবনসঙ্গিনী। কেমন? ওমর খায়য়ামের রুবাইর সঙ্গে মিল আছে কি না? সংসারকান্তারে নন্দনকানন হয়তো অত্যুক্তি।

এমন সময় বেল বেজে ওঠে। কে ডাকে এত সকালে। ডাক্তার গুপ্তর ড্রাইভার। সাহেব গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ! নিয়োগী সাহেব গুরুতর অসুস্থ। বার বার লাহিড়ী সাহেবের নাম করছেন। লাহিড়ী যদি তৈরি থাকেন এই গাড়ি তাঁকে নিয়োগীর ওখানে পৌঁছে দেবে। ডাক্তারের গাড়ি। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

তখনো দাড়ি কামানো বাকী। রাতের কাপড়ই ছাড়া হয়নি। কিন্তু ওদিকে যে প্রিয়বন্ধু গুরুতর অসুস্থ। এতক্ষণে কী ঘটেছে কে জানে। ডাক্তার, ড্রাইভার, গাড়ি অসুখ সব মিলিয়ে দেখলে ঘোরতর জরুরী বলেই আশঙ্কা হয়।

'কী করি, বল তো? দাড়ি কামাতে গেলে মিনিট পাঁচেক দেরি হবেই। মৃত্যু কি সেই ক'মিনিট সবুর করবে?' লাহিড়ী ইতস্তত করেন।

'থাক, দাড়ি কামাতে হবে না। আঁদ্রে জিদ একদিন কি দুদিন অন্তর কামাতেন। তোমার চেয়ে ঢের বড়ো লেখক।' তাঁর স্ত্রী তাড়া দেন।

তাড়াতাড়ি রাতের কাপড় ছেড়ে দিনের কাপড় পরে চট করে গাড়িতে উঠে বসেন লাহিড়ী। জীবনে কখনো অত কম সময়ের মধ্যে বেশ পরিবর্তন করেননি। ড্রাইভারকে বলেন জোরে চালাতে। না বললেও চলত।

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে দোতলায় উঠে যান। সামনে পড়ে নিয়োগীর শোবার ঘর। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসছিল বন্ধুকন্যা লীনা। জিজ্ঞাসা করেন, 'চানু কেমন আছে?'

'ওঃ আপনি, মেসোমশায়।' প্রণাম করে লীনা। 'একটু ভালো মনে হচ্ছে। আসুন, ভিতরে আসুন।'

'আরে, এস, এস, নিকি। তোমার কথাই বার বার মুখে আসছিল। তা খবর পেলে কী করে? তোমার ওখানে তো টেলিফোন নেই। নিয়োগী শুয়ে শুয়ে স্বাগত জানান। একমুখ দাড়িগোঁফ। কতকাল কামাননি। ফ্যাকাসে চেহারা। ক্ষীণ হাসি। নিস্তেজ চাউনি।'

'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে হে।' লাহিড়ী বিছানার ধারে বসেন ও বন্ধুর হাতে হাত রাখেন। না, জ্বর নেই।

'আমি কিন্তু ভয় পাইনি। জানতুম যে যমের অরুচি।' নিয়োগী কী ভেবে বলেন।

'সে কী, হে।' শুনে অবাক হন লাহিড়ী।

'ভিতরে ভিতরে আমি তেতো হয়ে গেছি, ভাই। এতখানি তিক্ততা নিয়ে মরি কী করে? ক্ষমা করতে হবে, ভুলতে হবে। মরব যে, তার জন্যেও প্রস্তুতি চাই। তাই যম এযাত্রা ফিরে গেল। আজ সকাল থেকে বেশ ভালো বোধ করছি। তবে খুব দুর্বল। তুমি আবার একসময় এসো। কথা আছে। প্রাণের কথা কাকেই বা বলি! সেইজন্যেই তো বার বার তোমাকে মনে পড়ছিল।' নিয়োগী বলতে বলতে শ্রান্ত হয়ে পড়েন।

লাহিড়ী তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে সেদিন বিদায় নেন। বাইরে গিয়ে লীনার সঙ্গে দুটি

একটি কথা বলেন। লীনা তাঁর জন্যে খাবার সাজিয়ে রেখেছিল। তিনি বলেন, 'দূর, পাগলী! এই কি আপ্যায়নের সময়! হবে আরেক দিন।'

নিয়োগী বিপত্নীক। ছেলে বিদেশে। মেয়েও থাকে শ্বশুরবাড়িতে। খবর পেয়ে বাপের সেবা করতে এসেছে। সংসারটা চাকরবাকরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিয়োগী সভাসমিতি করে বেড়ান। এখানে সভাপতি, ওখানে প্রধান অতিথি। শরীরটা বেশ মজবুতই ছিল। কিন্তু উটের পিঠে কুটোর পর কুটো চাপালে যা হয়।

ডাক্তারের গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরেন লাহিড়ী। স্ত্রীকে বলেন, 'এখনকার মতো সঙ্কট কেটে গেছে। তবে এখন থেকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে। কিন্তু রাখবে কে? লীনা তো বেশিদিন থাকতে পারবে না। চানু বেচারার এমন দুর্ভাগ্য যে ছেলের সঙ্গে বৌমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ছেলে থাকে বিদেশে। বউমা থাকেন বাপের বাড়িতে। এই কলকাতারই আরেক পাড়ায়। নাতি থাকে তাঁরই কাছে। কিন্তু এত বড়ো অসুখেও খোকাকে নিয়ে তিনি দেখতে এলেন না।'

'কী আপসোসের কথা। কিন্তু তা বলে তুমি পরের মেয়েকে দোষ দিয়ো না। তারও তো একটা কৈফিয়ত থাকতে পারে।' গম্ভীরভাবে বলেন সহধর্মিণী।

'তা হলে কি বাড়িতে সব সময়ের জন্যে একজন নার্স রাখতে হবে? না, একজন নয়, দু'জন। ফতুর হতে কতক্ষণ!' লাহিড়ী উদ্বিগ্নস্বরে বলেন।

'তুমিও দেখবে যে নার্সের চেয়ে বউয়ের খরচ কম।' ভার্যার মন্তব্য।

'বউয়েরও তো অসুখ করতে পারে! তখন!' ভর্তার প্রত্যুক্তি।

'তখন বরই দেখবে শুনবে। তুমি থাকতে আমার ভাবনা কিসের!' এই বলে প্রসঙ্গটার যবনিকা টেনে দেন সুপ্রভা।

তাতে কিন্তু বন্ধুর চিন্তা দূর হয় না। চানু কি বাঁচবে! কে বাঁচবে!

রবিবারের তাসের আড্ডায় গুপ্তর সঙ্গে দেখা। নিয়োগীর জন্যে লাহিড়ীকে বিমর্ষ দেখে ডাক্তার বলেন, 'ভেবে কোনো ফল নেই, নিকি। চানুর কেসটা এমন যে দশ বছরও হেসে-খেলে বাঁচতে পারে, আবার দশ দিনের মধ্যেই চলে যেতে পারে। কোন্‌টা বেশি সম্ভবপর যদি জানতে চাও তবে আমি বলব মাঝামাঝি একটা সময়। ধরো, দু'বছর। মনে রেখো, এটা নিছক সম্ভবপরতা। ইচ্ছে করলে তুমি দুয়ের জায়গায় তিন করতে পারো। কিংবা এক। আমার জীবনদর্শন জানো তো। কাজ করতে করতেই আমি মরব। আর নয়তো তাস খেলতে খেলতে। অসুখে ভুগে মরতে আমার বিলক্ষণ আপত্তি। ডাক্তারের উপর ডাক্তারি করবে কে?'

দশদিনের মধ্যেই নিয়োগী চলে যেতে পারেন একথা শুনে প্রাণটা কেমন করে ওঠে তাঁর বন্ধুর। দশ বছরের সম্ভবপরতা তাঁকে আশ্বাস যোগায় না। তিনি সেইদিনই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। সন্ধ্যাবেলা।

'তোমার কথাই ভাবছিলুম, নিকি। তারপর? সব কুশল তো?' নিয়োগী তাঁর শয্যায় বালিশের উপর বলিশ পেতে হেলান দিয়ে বসে রেডিও শুনছিলেন। বন্ধুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।

'আমরা তো বেশ ভালোই আছি। তুমি আছো কেমন?' লাহিড়ী বিছানার একধারে বসে বন্ধুর হাতে হাত রাখেন।

'এযাত্রা সামলে উঠেছি। একটা লাভ হলো এই যে সারাজীবনের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া গেল। জানো, নিকি, ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা পালঙ্কের উপর আমরা রাত্রে শুতুম। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর থেকে সেটা আমাদের দুই ভাইয়ের এজমালী সম্পত্তি। বছর দশেক

বয়সে সেই পালঙ্কে শুয়ে হঠাৎ আমার মনে একটা ভাব এলো। আমি যদি এই বয়সে মরে যাই আমার হৃদয়ে একটুও খেদ থাকবে না। জীবন আমার কানায় কানায় পূর্ণ।' নিয়োগী তদ্‌গত হয়ে বলেন।

'ছেলেমানুষী! দশ বছর বয়সে জীবন কখনো পূর্ণ হয়।' লাহিড়ী উড়িয়ে দেন।

'বাইরে থেকে দেখলে নয় ভিতর থেকে দেখলে হয়। একই অনুভূতি আমার বিশ বছর বয়সেও হয়েছিল। তখন সমুদ্রের বালুকাশয্যায় শুয়ে। না, তখনো আমার জীবনে প্রেম আসেনি। অমৃতের আস্বাদন তখনো পাইনি। তা হলেও মনে হতো জীবন আমার কানায় কানায় পূর্ণ। যদি এই বয়সে যেতে হয় তবে আনন্দলোক থেকে আনন্দলোকে যাব। পূর্ণতা থেকে পূর্ণতায়। খেদ কিসের!' তিনি যেন সেই বয়সে ফিরে যান।

'আমি তখন তোমার সহপাঠী। কই, কোনোদিন তো বলনি। তবে তখনি লক্ষ করেছি যে সংসারে তোমার মন নেই। তুমি সব কিছুতে যোগ দিলেও কোনো কিছুতে লিপ্ত নও। তুমি কাছের মানুষ হয়েও দূরের মানুষ।' লাহিড়ীও অতীতে ফিরে যান।

'হ্যাঁ, স্পেস টাইমের বাইরেও আমার সত্তা আছে। ব্যবহারিক জীবনে তাকে আমি ভুলে থাকি 'কিন্তু সে যে আছে এ বিষয়ে আমি সচেতন। সংসার আমাকে ভোলাতে চায়। ভুলিয়েছেও। আমিও সংসারী মানুষ বনে গেছি।' নিয়োগী আত্মস্থ হয়ে বলেন।

'তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কী! ভালোই তো হয়েছে। আমার তো আশঙ্কা ছিল যে তুমি বিয়ে থা করবে না, চাকরি বা ওকালতী করবে না, বনবাসী বা আশ্রমবাসী হবে। প্রায়ই তো বলতে আমি বেশিদিন থাকতে আসিনি, আমি শেলী কীটস বায়রনের মতো ক্ষণজীবী। এত রাগ হতো কথা শুনে!' লাহিড়ী রাগের ভাব করেন।

'এখন তো তুমি খুশি।' নিয়োগী হাসিমুখে বলেন। দাড়িগোঁফ সাফ হয়েছে।

'খুশি বলে খুশি! ষাট পেরিয়েছে, একটু বুঝে সুঝে চললে সত্তরও পেরোবে। কিন্তু এই অসুখটা বেধে একটু সন্দেহের উদ্রেক করেছে। বউদি তো নেই। কে দেখবে শুনবে? বউমারই উচিত, কিন্তু—সবই তো জানি। তাই ভাবনায় পড়েছি। দেখি কী করতে পারি।' লাহিড়ী অন্যমনস্ক হন।

'তোমাদের মতো বন্ধুরা থাকতে দুশ্চিন্তার কী আছে? হাসপাতালেও যাবো, চিকিৎসাও হবে। তার পর যা থাকে কপালে।' নিয়োগী হোহো করে হেসে ওঠেন।

লীনা ছুটে আসেন ওঘর থেকে। 'বাবা, তোমার না বেশি কথা বলা বারণ। মেসোমশায়, প্লীজ। যা বলবার আপনিই বলবেন, ওঁকে বলতে দেবেন না।'

'লীনা, আমি বলি কী, তুমি তোমার বাবার কাছে মাসকয়েক থাকার অনুমতি শ্বশুরের কাছ থেকে নাও। তোমার মতো একজন পাহারা না দিলে কে কখন এসে ওঁকে উত্তেজনা যোগাবে। ওঁর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তো কম নয়। কত জনের উনি ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড।' লাহিড়ী বন্ধুকন্যার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকান।

'আমার যে হাত বাঁধা, মেসোমশায়। আমার সংসার দেখবে কে! এই যে ক'টা দিন এখানে রয়েছি এর জন্যেও কথা শুনতে হচ্ছে।' লীনা আঁচলে মুখ ঢাকে।

'নিকি, শুনলে তো? সংসার! সংসারী হয়ে কেমন সুখ!' নিয়োগী রঙ্গ করেন।

'তা হলে, লীনা, তুমিই বল কী উপায়। এই বৃদ্ধ বালকটিকে চোখে চোখে রাখার ভার কে নেবে? এর একটি মা চাই। মা বলতে বোঝায় মেয়ে। মা বলতে বোঝায় বউমা। এর দু'ই আছে। তবু এ অনাথ। দু'একজন অপরিণীতা ছাত্রী হয়তো বললে রাজী হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের গুরুজন

কি অনুমতি দেবেন?' লাহিড়ী মাথা নাড়েন। লীলা কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'কিছুতেই না।'

'অথচ আমি যদি বলি যে আমি বিয়ে করব তা হলে অনুমতি দেওয়া বিচিত্র নয়।' নিয়োগী আবার হেসে ওঠেন। তাঁর মুখে কৌতুক।

'হ্যাঁ, এটা একটা উপায় বটে।' লাহিড়ীও রসিকতা করেন।

তা শুনে শিউরে ওঠে লীনা। মেয়েটি সরল। যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। বলে, 'না, মেসোমশায়। কিছুতেই না। আপনি অত বড় পণ্ডিত হয়ে এ কি বলছেন!'

'দূর, পাগলী। আমি কি জানিনে তোমার বাবা তোমার মাকে ওয়ারশিপ করতেন?' মেসোমশায়ের গলা ধরে আসে।

লীনা কাঁদতে কাঁদতে ও ঘরে চলে যায়। ওর মনে খটকা বাধে।

'তা হলে, চানু, আজকের মতো উঠি।' লাহিড়ী বন্ধুর হাতে চাপ দেন।

'সে কী! কথাটা শেষ করতে দাও। তোমাকে বলেছিলুম যে বিশ বছর বয়সেও সেই একই ভাব। যদিও ততদিনে প্রেমে পড়েছি, বিয়ে করেছি, বাপ হয়েছি। জানতুম না কাকে দিয়ে যাবো আমার পরিবারের ভার!' নিয়োগী অন্তরের অতলে তলিয়ে যান।

'পাগলামি আর কাকে বলে!' লাহিড়ী হাকিমের মতো রায় দেন।

'দ্যাখ, নিকি, এটা হলো ইনটুইশনের ব্যাপার। আমার ইনটুইশন ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সতেজ ছিল। তার পর হলো কী একদিন সতুদার সঙ্গে দেখা। গান্ধীজীর সহকর্মী। জেল থেকে ফিরেছে। জেলের অভিজ্ঞতা ওর জীবনদর্শন বদলে দিয়েছে। বলে, ভগবান যারা মানে তারা জগতের ভার তাঁরই উপর ছেড়ে দিয়ে যে যার মুক্তির বা সদ্‌গতির কথাই ভাবে। জগৎটাকে তাঁর হাত থেকে উদ্ধার করে মানুষের হাতে না আনলে প্রকৃতির উৎপাতও থামবে না, শাসকের অত্যাচারও কমবে না, শোষকের উৎপীড়নও বন্ধ হবে না। বুঝলে, চানু। প্রথম পদক্ষেপেই ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও মানুষে বিশ্বাস। এটা না হলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিপ্লব। সতুদা আমার ভাব-জীবনে একটা ওলটপালট ঘটিয়ে দিয়ে যায়।' নিয়োগী চোখ বুজে স্মরণ করেন।

'কখনো শুনিনি তো!' লাহিড়ী আশ্চর্য হন।

'কাউকেই বলিনি যে আমি ঈশ্বরকে ছেড়ে মানুষকে ধরেছি। ঈশ্বরের বিধান বলিনে, বলি ইতিহাসের লিখন। ইতিহাস যেন একটা নাটক। তাতে আমারও একটা ভূমিকা আছে। আমি সেই ঐতিহাসিক ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যেই জন্মেছি, তাতেই আমার সার্থকতা। প্রেমিক বা স্বামী বা জনক হয়ে নয়। চিরন্তন পথিক হয়েও নয়। যে পথিক আনন্দলোক থেকে আনন্দলোকে চলেছে। মৃত্যু যার কাছে একটা সীমান্ত। সীমান্তের ওপারেও অপর এক দেশ।' নিয়োগী বলতে বলতে আনমনা হন।

লাহিড়ী বাধা দেন না। নীরব থাকেন। একটা সিগারেট ধরান।

'সংসার আমাকে জড়ায়নি, নিকি। সে ক্ষমতা তার ছিল না। খেদ না নিয়ে আমি মরতে পারতুম চল্লিশ বছর বয়সেও, যদি না ইতিহাস এসে আমাকে বন্দী করত। তখন ইউরোপেও চলছে মহাযুদ্ধ। আর আমি ভাবছি ভারতেও যে-কোনো দিন রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটবে। ঘটলে আমারও তাতে একটা ভূমিকা থাকবে। আমাকে বাদ দিয়ে কি তা ঘটতে পারে? কক্ষনো নয়।' নিয়োগী এক গ্লাস জল চেয়ে নেন।

'মাই গড।' লাহিড়ী হকচকিয়ে যান।

'চল্লিশ বছর বয়সে আর সে অনুভূতি জাগে না। তখন মনে হয় মরিতে চাহি না আমি বিপ্লবের আগে। যদি মরি তবে খেদ রবে।' নিয়োগীর ভাবা নাটকীয়।

'মরোনি। না মরে আমাদের কৃতার্থ করেছ। কিন্তু এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে। বিপ্লব। কী সাংঘাতিক!' লাহিড়ী সিগারেট নিবিয়ে দেন।

'আহা, বুঝলে না! সতুদা চেয়েছিল জার নিকোলাসের মতো লর্ড লিনলিথগাউ সিংহাসনচ্যুত হবেন। কেরেনস্কির মতো জবাহরলাল প্রোভিসনাল গভর্নমেন্ট গঠন করবেন। তারপর সুভাষ বোস এসে লেনিনের মতো তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন। আমারও ধারণা ছিল ইতিহাস আপনার পুনরাবৃত্তি করবে। কেন করবে না শুনি? অত্যাচার কি একই রকম নয়? শোষণ কি একই রকম নয়? কিন্তু খেয়াল ছিল না জনগণ একই রকম নয়। এরা বিপ্লবের দিন বিপ্লব করবে না, করবে ধর্মের নামে দাঙ্গা হাঙ্গামা। এরা মধ্যযুগের বাসিন্দা। মধ্যযুগে কোথাও বিপ্লব হয়নি, তা জানো। সতুদার ভুল হয়েছিল। তার সঙ্গে একমত হয়ে আমারও। ভুল যেদিন ভাঙল সেদিন দেখি দেশ ভেঙে দু'খানা। দেশের মানুষও ভাগ হয়ে যাচ্ছে। যেন দু'পাল ছাগল আর ভেড়া। ইতিহাস এমন মোড় নেবে তা তো কোনোদিন ভাবিনি। কী আমার ভূমিকা! নতুন করে ভাবতে ভাবতে পঞ্চাশ পেরিয়ে যায়।' কাতর কণ্ঠে বলেন নিয়োগী।

'তখন মরতে চাওনি তো? আমাদের মহাভাগ্য।' মন্তব্য করেন লাহিড়ী।

'কী করে মরি? মাইনরিটিকে মেজরিটির হাত থেকে বাঁচাবে কে? মরলে খেদ রয়ে যেত। ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করি যে একবার ইতিহাসের পাল্লায় পড়লে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত। একটার পর একটা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উদয় হয় আর আমি ভাবি আমারও একটা ভূমিকা আছে। বিধাতার দায় মানুষকেই বইতে হবে। সংসার আমাকে ভোলাতে পারেনি যে আমি চিরন্তন পথিক। এই দেশই একমাত্র দেশ নয়। এই যুগই একমাত্র যুগ নয়। কিন্তু ইতিহাস আমাকে তা ভুলিয়েছে। এই আমার দেশ এই আমার কাল। এই মঞ্চে আমাকে অভিনয় করতে হবে। এই সময়সীমার মধ্যে। তার আগে আমি মরতে পারব না। যদি মরি খেদ নিয়ে মরব। অথচ পাবলুম কোথায়। কতটুকুই বা পারলুম! মাঝখান থেকে মাধুরী হারালুম। তিক্ততা নিয়ে যেতে হয়।' নিয়োগী একেবারে এলিয়ে পড়েন।

'থাক, থাক। যথেষ্ট হয়েছে। বুঝতে পেরেছি তোমার বক্তব্য। পরে আবার একদিন আসব। এখন একটু শান্ত হও তো দেখি।' লাহিড়ী তার হাতে ঝাঁকানি দেন।

'মাঝে মাঝে আসবেন, মেসোমশায়।' বিদায় নিতে গিয়ে মিনতি জানায় লীনা। 'আমি এই মাসটা আছি। তারপরে পাটনা ফিরে যেতে হবে।'

তিনি ওকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'লীনা, তোমার বাবা আমার কলেজের সহপাঠী। অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সেই সুবাদে তুমিও আমার আর-একটি কন্যা। বল তো, মা, এই পরিস্থিতিতে কার উপরে ওঁর ভার দিয়ে যাবে?'

'সেকথা ভেবে আমার মনও খারাপ, মাথাও খারাপ হবার যোগাড়। কিন্তু আপনার ওই প্রস্তাব আমি কেমন করে মেনে নিই?' লীনা কাতরস্বরে বলে।

'তা হলে এক কাজ করো। তোমার বউদির সঙ্গে তোমার দাদার মিটমাট যাতে হয় তার চেষ্টা করো। তা হলে বউদি এসে এ বাড়ির ভার নেবে। কলকাতাতেই যখন আছে তখন বাপের বাড়িতে কেন, শ্বশুরবাড়িতে কেন নয়? বরাবরের জন্য বলছিনে। কিছুদিনের জন্যে।' তিনি অনুনয় করেন।

'আমাকে না বলে আপনি বরং ওকেই বলুন, মেসোমশায়। বিয়েতে তো আপনারও হাত ছিল। তখন তো ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।' লীনা মনে করিয়ে দেয়।

'অন্যায় প্রশংসা করিনি। কার সঙ্গে কার জোড় হবে, কার সঙ্গে বিজোড় তা দেবতারাও জানেন না। আমি তো সামান্য মানুষ।' তিনি হাত রগড়ান।

'থাক, ও নিয়ে পস্তাতে হবে না। এখন কথা হচ্ছে বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? আমার সাধ্য নয়, মেসোমশায়। বড়লোকের মেয়ে ঘরে আনার সময় দুবার ভাবা উচিত ছিল ও মেয়ে কি অল্পে সুখী হবে? কেন বেচারীকে অসুখের মধ্যে টেনে আনা? আরো কষ্ট পাবে। দেখছেন তো বাড়িঘরের কী ছিরি! বাবার টাকা ফুরিয়ে এসেছে, মেসোমশায়। তাই দিনও ফুরিয়ে এসেছে।' লীনা চোখ মোছে।

লাহিড়ী হাঁ করে শোনেন। তারপর পা চালিয়ে দেন।

এর পরে আবার যেদিন দেখা হয় নিয়োগী আপনা হতে বলেন, 'তুমি মিছিমিছি মন খারাপ করছ, নিকি। আমার অভাবটা সেবাযত্ন নয়। মিষ্টতার। আমার সকল সত্তা তিক্ত হয়ে গেছে। চারিদিকে স্বেচ্ছাচার আর অনাচার। তার উপরে উন্মত্ততা। একেই কি বলে ঐতিহাসিক ভূমিকা? না, না, আমি ফিরে যেতে চাই আমার ত্রিশ বছর বয়সে। যখন সতুদার জীবনদর্শন আমার জীবনদর্শনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়নি। সতুদার বলছি কেন? বলা উচিত ত্রিশের দশকের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলের। ওদেশের আর এদেশের। যুগের সঙ্গে তাল রাখতে হবে, এই হলো আমার কাছে প্রথম। ভুল, ভুল। এখন বুঝতে পারছি ভুল। চিরন্তনের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, সেই ছিল আমার কাছে প্রথম। ঠিক ঠিক। এখন বুঝতে পারছি ঠিক। কিন্তু ভুল পথে এতদূর এসে ঠিক পথে ফিরে যাওয়া কি সহজ? এর জন্যে চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছা অনুসারে কর্ম। বলিষ্ঠ কর্ম। আমার বল কোথায়, নিকি।' তিনি করুণ দৃষ্টিতে তাকান।

নানা কারণে দুই বন্ধুর মানসিক বিবর্তন দুই ভাবে হয়েছিল। হৃদয় অভিন্ন হলে কী হবে, মানস ভিন্ন। লাহিড়ী বলেন, 'তোমার ওসব উক্তি আমার কাছে গ্রীক। তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি, বল। তোমার তিক্ততা দূর হবে, মিষ্টতা ফিরে আসবে এ যদি বিলেত বা আমেরিকা গেলে সম্ভব হয় তবে আমরা পাঁচজনে মিলে তার ব্যবস্থা করব। হয়তো সুইটজারল্যাণ্ডে কিছুদিন কাটালে দেহমন সরস ও সবল হবে। যেতে চাও তো বল।'

'ক্ষেপেছ! সেই ইউরোপ কি আর আছে! না সে আমেরিকা আর আছে! এত কাল পরে যাওয়া যেন রিপ ভ্যান উইঙ্কলের প্রত্যাবর্তন। কেউ চিনতে পারে না লোকটা কে। লোকটাও চিনতে পারে না কাউকে। ট্র্যাজেডী তো ওখানেই, নিকি। মানুষ বিশ ত্রিশ বছর বাদে মানুষকে চিনতে পারে না। তা সে যতই পরিচিত হোক। চিনতে পারে প্রকৃতি। চিনতে পারে গির্জা। চিনতে পারে জাদুঘর আর আর্ট গ্যালেরি। যেতে হলে এদের জন্যেই যেতে হয়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মনের ধারা মিলবে না। তার চেয়ে ওদের লেখা পড়াই ভালো। পড়ি,যত পারি পড়ি। ওরাও আমারই মতো ইতিহাসের বন্দী! চিরন্তনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।' নিয়োগী বিছানার উপর সোজা হয়ে বসেন।

'তোমাকে তো আগের চেয়ে ভালোই দেখছি, চানু। বিদেশেই যাও আর স্বদেশেই থাক তুমি তোমার পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পেলেই আমরা নিশ্চিন্ত। পূর্বের মিষ্টতা ফিরে পাওয়া না পাওয়া তার পরের কথা। আজকের দিনে কারই বা মন মেজাজ তিক্ত নয়! যার অঢেল টাকা সেই হয়তো মিষ্টি কথা বলে, মিষ্টি ব্যবহার করে। কিংবা যে কথা বেচে খায়। তোমার অত টাকাও নেই, তুমি কথা বেচেও খাও না, তোমার পক্ষে তিক্ততাই তো স্বাভাবিক। মিষ্টতা আজকালকার ছেলেমেয়েদের স্বভাব থেকে উবে যাচ্ছে। দু'দিন বাদে দেখবে রসগোল্লাও আর মিষ্টি লাগছে না। সন্দেশও তেতো। সব স্যাকারিন দিয়ে তৈরি। তখন সেইটেই হবে স্বাভাবিক।' লাহিড়ী সিগারেটে টান দেন।

'না, না, আমাকে এ সমস্যা সমাধান করতেই হবে। নইলে মরবার সময় মনে খেদ রয়ে যাবে। যম আমাকে এক বছর কি দু'বছর গ্রেস দিয়েছে। বিলেত গিয়েও যে সিদ্ধি পাব তা নয়। পেতে পারি আরো কয়েক বছর গ্রেস। বেশ বোঝা যাচ্ছে, পশ্চাদ্অপসরণই এই ধাঁধার জবাব।

কিন্তু কী করে?' নিয়োগী নিবিড় চিন্তামগ্ন।

'তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস কি ফিরে পেতে চাও?' লাহিড়ী কৌতূহলী হন।

'চাই বইকি। কিন্তু বাধছে কোথায়, জানো, মানুষকে ভগবান নিজের সাদৃশ্যে গড়েছেন। মানুষের চেহারা দেখে মনে হবে ভগবানের চেহারা। আজকের দিনে কার দিকে তাকালে ভগবানকে দেখতে পাব, বলতে পারো?' নিয়োগীর কূট প্রশ্ন।

'আয়নার দিকে তাকালে।' লাহিড়ীর কূট উত্তর।

'তুমিই জিতলে। এস, করমর্দন করি।' নিয়োগী উৎফুল্ল হন।

'আমার নয়, তোমারই জিৎ।' লাহিড়ীও করমর্দন করেন।

এর পরে যতবার দুই বন্ধুর দেখা হয় ততবার নিয়োগীকে আরো স্নিগ্ধ, আরো মধুর দেখায়। ভিতরে ভিতরে বদলে যাচ্ছেন। অদৃশ্য এক রসায়নে।

'রোগ সারাবার জন্যে যোগ করছ নাকি?' লাহিড়ী উৎসুক হন।

'এ রোগ সারবার নয়; নিকি। আর যোগ কি গুরু ভিন্ন হয়?' নিয়োগী বলেন।

'তা হলে কি মিষ্টি হবার জন্যে মিষ্টিমুখ করছ?' সন্দেহ হয় তাঁর বন্ধুর।

'মিষ্টি তো কবে থেকে বারণ। চায়ে পর্যন্ত চিনি খাইনে।' মনে করিয়ে দেন তিনি।

'তা হলে রূপান্তরের কী মন্তর?' লাহিড়ী ভেবে উঠতে পারেন না।

'টু বি প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড ইয়েট নট টু বি প্রেজেন্ট। উপস্থিত থেকেও উপস্থিত না থাকা। যেমন পদ্মপত্রে জল। কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু লিপ্ত হচ্ছিনে। যখন সরে পড়ব তখন কোনো খেদ থাকবে না। যমেরও অরুচি হবে না।' নিয়োগী বলতে বলতে হেসে ওঠেন।

লাহিড়ীর ভালো লাগে না। তিনি মাথা নাড়েন। 'একটা ভুল শোধরাতে গিয়ে আর-একটা ভুল করছ, ভাই। তুমি যেমন মানুষ তুমি ইতিহাস থেকে সরে গেলে বাঁচবে না। ওটা তোমার দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে গেছে। এখন আর পেছনে ফেরার পথ নেই, চানু, তবে তুমি তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস ফিরে পেয়েছ এতে আমি সুখী। ঈশ্বর কি ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করছেন না?' লাহিড়ী তর্ক করেন।

'কিন্তু মানুষ যে ইতিহাসের ভিতর দিয়ে কাজ করতে গেলে ধাক্কা খায়। তিক্ত-বিরক্ত হয়। মরবার সময় তার মুখে তিক্তস্বাদ লেগে থাকে। ভাই নিকি, সংসারের বন্ধন কাটানো শক্ত নয়। কিন্তু ইতিহাসের বন্ধন যে অচ্ছেদ্য। জানি আজকাল কেউ আমার কাছে আসে না তবু বিশ্বাস করি এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যখন আমাকেই কিছু করতে হবে। না করলে কর্তব্যহানি। না পারলে ইমপোটেন্স।' নিয়োগী নিচু গলায় বলেন।

তাঁর জন্মদিনে তাঁর পক্ষপাতীরা দল বেঁধে তাঁর ওখানে গিয়ে অভিনন্দন পাঠ করে শোনান। প্রার্থনা করেন তাঁর সুদীর্ঘ ও নীরোগ জীবন।

নিয়োগী তো রসিক পুরুষ। তিনি প্রীতিভাষণে বলেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ।' তারপর একটু নাটকীয় বিরাম। 'কিন্তু আপনাদের নয়, আমার নিজেকেই। জীবনটা দেখছি বন্য হংসীর পশ্চাদ্‌ধাবন করে বৃথা কাটেনি। তা বলে সুদীর্ঘ ও নীরোগ জীবন নিয়ে আমি করি কী? পশ্চাদ্‌অপসরণ! বিশ বছর বয়সের প্রত্যয়ে?'

সবাই একে একে বিদায় নিলে লাহিড়ী বলেন বন্ধুকে, 'এই নাও তোমার জন্মদিনের উপহার। তোমার বন্ধুজায়ার স্বহস্তে বেক করা বার্থ-ডে কেক।'

'খাসা কেক।' মুখে না দিয়েই তারিফ করেন নিয়োগী। 'অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু তাঁকে নয়, তোমাকে নয়, আমার নিজেকেই। ধন্য আমি! যাবার বেলা তিক্ত স্বাদ নয় মধুর স্বাদ মুখে নিয়ে

যাচ্ছি।' কেকটা না কেটেই তিনি চাকরদের হাতে দেন।

'আস্ত কেকটাই বিলিয়ে দিলে!' অনুযোগ করেন লাহিড়ী।

'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়। আগে তো গরিবদের পেট ভরাও, তারপব দেখবে ওরাও তোমাদের পেট ভরাবে।' এই হলো নিয়োগীর গীতাভাষ্য। তথা ইতিহাসভাষ্য।

চাকররা সত্যি সত্যি দু'জনের সামনে দু'ভাগ কেক সাজিয়ে রেখে যায়। লাহিড়ী তো বেশ অপ্রতিভ। বলেন, 'তুমিই জিতলে।'

নামবার সময় নিচের তলার ভাড়াটের সঙ্গে দেখা। তাঁর মুখে শোনা গেল বন্ধুর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। কাঙাল গরিবদের সাহায্য করতে করতে তহবিল নিঃশেষ। ওঁরা অভিনন্দনপত্রের সঙ্গে একটা টাকার তোড়াও যদি দিতেন!

মাস কয়েক পরে। এক হাতে চায়েব পেয়ালা আরেক হাতে খবরের কাগজ। সামনে রুটি টোস্ট। পাশের চেযারে জীবনসঙ্গিনী। নন্দনকাননে হঠাৎ সাপ দেখে লাহিড়ী লাফ দিয়ে ওঠেন। 'সর্বনাশ হয়ে গেছে! হায হায় হায়!'

দু'জনে দুই হাত জোড় করে দু'মিনিট নীরবে দাঁড়িযে মনে মনে প্রার্থনা করেন। চিরন্তন পথিক, তোমার যাত্রা শুভ হোক।

আহারের পূর্বে প্রার্থনা

আহারের পূর্বে ক্ষণকাল প্রার্থনা করেন আমার বন্ধু। কিন্তু মুখ ফুটে নয় মনে মনে। কী বলেন তা তিনিই জানেন। অনেকবার লক্ষ করেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিনি, সঙ্কোচ বোধ করেছি। এবার আমাব কৌতূহল প্রবল হয়।

আইডিয়াটা কী? ভগবানকে নিবেদন কবে প্রসাদ পাওয়া? প্রশ্ন করে সেইসঙ্গে উত্তরেরও আভাস দিই আমি।

'না, হে। এটা আমার গ্রেস বিফোর মীট। তাঁর কি অন্নের অভাব যে তাঁকে আমি অন্ন নিবেদন করব! আমারই অভাব। আমাকে তিনি দিয়েছেন। বদান্যতাব জন্যে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বলছি, এই যে দুটি খেতে পাচ্ছি এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই বা ক'জন পাচ্ছে? এই বা ক'দিন পাব?' বন্ধু আপ্লুত স্বরে উত্তর দেন।

'ক'জন পাচ্ছে, সেটা ঠিক। কিন্তু ক'দিন পাব, একথা বলছ কেন? তোমার কি সত্যি এমন টানাটানি!' আমি সসঙ্কোচে শুধাই।

'তা নয়, হে। শোন তা হলে সব কথা। ত্রিশ বছর আগের সেই যে মন্বন্তর তখন থেকেই আমার এ প্রার্থনা। এটা নতুন কিছু নয়। চোখের সামনে ত্রিশ লক্ষ মানুষ খেতে না পেয়ে মারা গেল। তাদের তালিকায় আমার নাম ছিল না, কিন্তু থাকতেও তো পারত। পরে একদিন থাকতেও তো পারে। সে রকম পরিস্থিতি কি রাজা বদল করলেই এড়ানো যায়? রাশিয়াও তো ছিল স্বাধীন দেশ। তা হলে কেন অভিজাত পুরাঙ্গনারা পথে পথে ঘুরে বেড়ান? বলেন, এই নাও হীরা নীলা চুনী পান্না। দাও এক টুকরো রুটি। আমার তো সোনা রুপোও নেই, আছে কিছু কাগজের মুদ্রা।

যাদের মুঠিতে রুটি থাকবে তারা কি তাদের মুঠি খুলবে?' বন্ধু আবেগের সঙ্গে বলেন।

'ওসব বিপ্লবের জন্যে হয়েছিল। আমাদের এদেশে বিপ্লব হবে না, শিকদার। তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ।' আমি তাঁকে অভয় দিই।

'হয়তো তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু আসল কথাটা হলো এই যে একদিন এই দেশেরও খোরাকে টান পড়তে পারে। সেদিন প্রশ্ন উঠবে কারা আগে খাবে। যারা ফসল ফলায় তারা, না যারা তা কিনে নিয়ে আসে বা কেড়ে নিয়ে আসে তারা। কিনে নিয়ে আসা অত সহজ হবে না, ঘোষ। কেড়ে আনতে গেলে দেখবে চাষীরাই দলে ভারী। অগত্যা পথে নামতে হবে রাজার নন্দিনীদের। সোনাদানা ফেরি করতে হবে। শেকসপীয়ার কী লিখেছেন? মাই কিংডম ফর এ হর্স। একটা ঘোড়ার দাম একটা রাজ্যের চেয়েও বেশি। তেমনি এক সের চালের দাম এক ভরি সোনার চেয়েও বেশি। আমি যখন ভাতে হাত দিই তখন এই সত্যটি মনে রাখি।' আহারে মন দেন তিনি।

কথাটা আমি হেসে উড়িয়ে দিই। খেতে খেতে বলি, 'ওটা একটা সত্য নয়। সোনার দাম সর্বদেশেই সর্বকালের চালের চেয়ে বেশি।'

শিকদার আর কথা বাড়ান না। আহার সারা হলে আমরা দুই বন্ধু বসবার ঘরে গিয়ে পুরোনো দিনের গল্প করি। সাহেবী আমলের।

'ম্যাকআর্থারকে তোমার মনে আছে? তোমার আমার চেয়ে জুনিয়র। কখনো ওকে এক স্টেশনে পাইনি। তবে প্রায়ই শুনতুম ওর নাম। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। ওর সহকর্মীদের মুখে যা শুনেছি তাই তোমাকে বলছি। ম্যাকআর্থার ওর মহকুমার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যা পায় তাই খায়। না পেলে খায় না। ও খ্রীস্টের অনুশাসন মেনে চলতে চেষ্টা করে। সঞ্চয় করে না। কালকের জন্যে ভাবে না। বিয়ে করেনি, করবেও না। দায়দায়িত্ব নেই। আত্মভোলা মানুষ।' শিকদার বলে যান।

'নাম শুনেছি, কিন্তু কই, এসব তো কখনো শুনিনি।' আমি আশ্চর্য হই।

'তা হলে শোন। ম্যাকআর্থার তার এক সহকর্মীকে বলে, ক্ষুধা কাকে বলে তা আমরা কেউ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিনি। দিনে এতবার খাই যে ভালো করে খিদে কখনো পায় না। খেলে এত কিছু খাই যে পেট খালি থাকে না। কিন্তু সত্যিকার ক্ষুধা একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। একটা এলিমেন্টাল অভিজ্ঞতা। যেন বাঘের মুখে পড়া। আমাদের জীবনে হয় না। যাদের জীবনে হয় তাদের শরিক হতে হয়। এ তোমার ধর্মীয় উপবাস নয়। সেটা স্বেচ্ছাকৃত সাধনার অঙ্গ। তোমার ঘরে ভাত আছে, অথচ তুমি ইচ্ছা করে লঙ্ঘন দিচ্ছ। কিন্তু গরিব মানুষের ক্ষুধা সে জিনিস নয়। বিশেষ করে তাদের শিশু-সন্তানের। আমাকে পাগল করে দেয় এ রকম ক্ষুধা।' শিকদার বর্ণনা করেন।

'লোকটা ভালো। তবে মাথায় ছিট ছিল।' আমি মন্তব্য করি।

'ওর ছিটের ছিটেফোঁটাও কর্তাদের মাথায় থাকলে মন্বন্তর এড়াতে পারা যেত। কিন্তু শোন সবটা। ওর ওই একটাই ছিট নয়। ও তো বিয়ে করেনি। বোধহয় মনে মনে শপথ নিয়েছে। পভার্টি আর চ্যাসটিটি এই দুই শপথ। বোধহয় আইরিশম্যান ও রোমানক্যাথলিক। পভার্টির সঙ্গে সঙ্গে চ্যাসটিটিরও পরীক্ষা চালায়। কিন্তু অবশেষে পাগল হয়ে যায়। ওকে ছুটি দিয়ে গোপনে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বছরখানেক বাদে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে।' বিবরণ দেন শিকদার।

'বাঁচালে।' আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

'ওর একটা গাড়ি ছিল। স্ট্যাণ্ডার্ড টেন। সেটা ও দিয়ে যায় কারখানায় সারিয়ে বিক্রি করতে। আমার দরকার ছিল। কিনি আমি। সেইসূত্রে আমি ওর উত্তরাধিকারী। দেখিনি ওকে। তবু একটা

টান বোধ করতুম। কিন্তু দেখা হয় না ইংরেজ আমলে। সে আমল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়রা কে কোথায় ছিটকে পড়ে। কেউ কেউ এ দেশেই রয়ে যায়, কিন্তু সরকারের বাইরে। কদাচিৎ নতুন সরকারের চাকরিতে। ম্যাকআর্থারের কী যে হলো জানিনে। শুধু জানি যে গাড়িটা কাজ দিচ্ছে। তাই ওকে স্মরণ করি।' শিকদার বলতে থাকেন।

'তখন আমরা নতুন জামানার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যস্ত।' আমি কণ্ঠক্ষেপ করি।

'যুদ্ধের সময় কলকাতায় ইংরেজ কোয়েকারদের একটা সেবাকেন্দ্র ছিল, জানো। সেটা ওরা স্বাধীনতার পরেও কিছুকাল চালায়। ওদের ওখানে আমি মাঝে মাঝে যেতুম। জায়গাটা কেন্দ্রীয় বলে আমার সাহিত্যিক বন্ধুরাও জড়ো হতেন। একবার আমরা গ্যেটে দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করি। সে সময় শুনি ম্যাকআর্থার সেই বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিই। বলি, আপনার গাড়িটার আমিই ওয়ারিশ। দেখতে চান তো নিচে চলুন দেখাব। তিনি শুনে আমোদ পান। বলেন, আমিও তো আরেকজনের ওয়ারিশ ছিলুম। বুঝতে পারি যে কারখানার মালিক আমাকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বলে গছিয়েছে! আসলে থার্ড-হ্যাণ্ড।' শিকদার কৌতুক করলেও ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ।

'তোমার কিন্তু ওটার ওপর আসক্তি ছিল।' আমি ফোড়ন কাটি।

সেই সময় শুনি যে ম্যাকআর্থার দেশে ফিরে না গিয়ে মিশনারীদের সঙ্গে সেবাকর্ম করছেন। নোয়াখালিতে না বরিশালে। সেইখানেই তার শেষ পোস্টিং। সবাই তাঁকে চেনে আর চায়। তবে দেশভাগের জন্যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কলকাতার সঙ্গে যোগ রাখতে না পারলে কোণঠাসা হয়ে পড়বেন। তিনি গান্ধীজীকে চিনতেন ও ভক্তি করতেন। ভেবেছিলেন গান্ধীজী সে অঞ্চলে ফিরে যাবেন। তখন একপ্রকার যোগ স্থাপন করতে পারা যাবে।' শিকদার বলে চলেন।

'সেই শেষ দেখা?' আমি জানতে চাই।

'না, পরে আরো একবার হয়েছিল। কলকাতায় নয়। শান্তিনিকেতনে। বারো তেরো বছর বাদে। সঙ্গে একজন ফরাসীভাষিণী কানাডাবাসিনী মিশনারী মহিলা। শাড়ি পরিহিতা সমবয়সিনী। আমার গৃহিণীর সঙ্গেও আলাপ করেন। আমাদের সঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজন। সেই দিনই শুনি যে তিনি আইরিশও নন, ক্যাথলিকও নন, কর্নিশ ও অ্যাংলিকান। সঙ্গিনী কিন্তু ক্যাথলিক। পথের সাথী ভিন্ন আর কিছু নন।' শিকদার বিশদ করেন।

'আর কিছু হলেই বা ক্ষতি কার? নারীকে পূর্ণতা দেয় পুরুষ, পুরুষকে পূর্ণতা দেয় নারী। উভয়কে পূর্ণতা দেয় সন্তান।' আমি বলে উঠি।

'সকলের বেলা ওই একই নিয়ম নয়, ঘোষ। আমিও এককালে তোমার মতোই ভাবতুম, কিন্তু এখন আমি সন্ন্যাসীদের দিকটাও দেখতে পাই। কতক পুরুষ আছে তারা স্বভাবসন্ন্যাসী। ম্যাকআর্থার তাদের একজন। যদিও প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে জর্জর। এবার ওঁর মুখে একটা নতুন কথা শোনা গেল। কর্নওয়ালের আদি অধিবাসীরা নাকি ফিনিসিয়ান। জলপথে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়। ম্যাকআর্থার মনে করেন তিনিও ফিনিসিয়ান নাবিকদের বংশধর। তা নইলে এশিয়ার উপর এতখানি টান কেন? বাংলাদেশের মায়া কাটাতে পারছেন না কেন? চেহারাটাও সাধারণ ইংরেজের থেকে একটু স্বতন্ত্র।' শিকদার বলেন।

আমি চমৎকৃত হই। ফিনিসিয়া তো একালের সীরিয়া।

'এক ইংরেজের মুখে এই আমি প্রথম শুনি যে তাঁর শরীরে প্রাচ্য রক্ত আছে। যে রক্ত ইহুদী রক্ত নয়। আর সেইজন্যে তিনি এদেশকেই আপনার করে নিয়েছেন। তবে এদেশ তাঁকে ঠিক আপনার করে নিতে পারেনি। তাঁকে সেধে নিয়ে গিয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল পদে বসিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যোগ্যতার প্রশ্নের চেয়ে বড়ো স্বদেশিয়ানার প্রশ্ন। তথা সাম্প্রদায়িকতার। তিনি পদত্যাগ করেন ও মিশনে গিয়ে বাস করেন। সেখানে খোলেন একটি কারিগরি শিক্ষালয়। যারা শিখতে আসে তারা ভদ্রঘরের ছেলে নয়। ওদের সঙ্গেই তাঁর বনে ভালো। ওরা ইংরেজীও শেখে। জীবিকার যোগ্য হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ ইউরোপেও গেছে।' বন্ধু আমাকে শোনান।

ম্যাকআর্থারের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে যায় আর একজনকে। ইভান্স। তিনি ওয়েলশ। তিনি চিরকুমার। উপার্জন যা করতেন তার সামান্যই নিজের জন্যে রাখতেন। কতক পাঠাতেন তাঁর মাকে। কতক বৃত্তিরূপে দিতেন এ দেশের অভাবগ্রস্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের। তিনিই তাঁদের অভিভাবক। ভারত স্বাধীন হলে তিনিও অকালে অবসর নেন কিন্তু এদেশেই থেকে যান। শখের মাস্টারি করেন। এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে যান।

বলি, 'ইভান্সকে তোমার মনে আছে? আমাদের চেয়ে একটু সিনিয়র।'

'মনে আছে বইকি।' বন্ধু সায় দেন। 'ওঁর কাছে আমিও কিছু শিক্ষা করেছি। ওঁর শোবার ঘরে একদিন দেখি ক্যাম্পখাট। জানতে চাই, ক্যাম্পখাটে শোন কেন? বলেন, পাছে সফ্‌ট হয়ে পড়ি। সেই থেকে আমারও ক্যাম্পখাটে শোবার অভ্যাস। পরের গিন্নীরা এসে ঘরের গিন্নীকে শুধান, এ কী অঘটন! ক্যাম্পখাটে তো একজনই শুতে পারে। তখন আমাকে একটা ডবল সাইজ ক্যাম্পখাট কিনে মুখরক্ষা করতে হয়।'

আমি হাসি। 'দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পাশে প্রেয়সী নারী। আমার তো, ভাই, এ না হলে ঘুম হয় না। ইভান্স বোধহয় স্টোইক।'

'আমারও মনে হতো। আর আমিও ছিলুম তাই। যুধ্যমান জগতে বাস করে স্টোইক না হয়ে আর কী হতুম। পরে উপলব্ধি করি যে ভিতরে ভিতরে অসাড় হয়ে যাচ্ছি। অমন করে দার্শনিক হওয়া যায়, কবি হওয়া চলে না। কবির হৃদয় হবে বাল্মীকির হৃদয়। সামান্য ক্রৌঞ্চ পাখীর জন্যও তার হৃদয় কাতর হবে, আবার সেইসঙ্গে জন্মাবে ক্রোধ। নিরীহ দুটি প্রাণীর সর্বাধিক আনন্দেব মুহূর্তে তাদের একটিকে বধ করা নিষ্ঠুরতার চরম। আমার স্টোইক ভাবটা পরে কেটে যায়। কিন্তু দুগ্ধফেননিভ শয্যা আর আমাকে আকৃষ্ট করে না। আমি কঠিন তক্তপোশই পছন্দ করি। ততদিনে আমি মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে। জীবনকে সহজ সরল করে আনতে চাই। যাতে সভ্যতার ব্যাধি আমাকে আক্রমণ না করে।' শিকদার এমনি করে তাঁর নিজের কথায় আসেন।

গ্রেস বিফোর মীট থেকে আমরা অনেকদূরে সরে এসেছিলুম। ফিরে যাবার জন্যে আমি তাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা দিই। 'নিদ্রার প্রসঙ্গ পরে। এখন আহারের প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন। আমাকে বুঝিয়ে দাও সভ্যতা আর কতকাল এই স্তরে পড়ে থাকবে যে দেশের অধিকাংশ মানুষকে অভুক্ত রেখে অল্পাংশ মানুষ উচ্চতম চিন্তার, মহত্তম কল্পনার, প্রগাঢ়তম রসের, গভীরতম আনন্দের, উদারতম জ্ঞানের, দিব্যতম চেতনার, পরিপূর্ণতম জীবনের অধিকারী হবে। কেবল রুটি জুটলেই মানুষ বাঁচে না, তার উপর আরো অনেক কিছু জোটা চাই, কিন্তু যাদের রুটিই জুটল না তাদের আর সব জুটবে কী করে? কেমন করে আমি তাদের বোঝাই যে স্বাধীনতা পেয়েছ, ভোটাধিকার পেয়েছ, এখন তো রাজার জাত হয়ে জীবন সার্থক করেছ। স্থলসেনা জলসেনা আকাশসেনা ইস্পাত কারখানা আর পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র তো জুটেছে। গ্রেট পাওয়ার বলে গণ্য হচ্ছে কতক্ষণ।'

আমার বন্ধু আহত হয়ে বলেন, 'তোমার ওই প্রশ্নগুলো আমার মতো অর্ধসভ্য মানুষকে না করে সভ্যতার শীর্ষস্থানীয়দের করলে পারতে। আমি তো মোটা ভাত ছাড়া খাইনে, মোটা কাপড় ছাড়া পরিনে, জবাবদিহি চাও তো আমার কাছে কেন?'

আমি বলি, 'শুধু প্রার্থনা করে কোনো ফল নেই, শিকদার। তোমাকে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে চাষ করতে হবে, ফসল ফলাতে হবে, দেশটাকে খাদ্যপদার্থে ভরে দিতে হবে। তখন দেখবে কেউ অভুক্ত থাকবে না।'

'থাকবে, থাকবে। কারণ ক্রয়শক্তি তো সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে না। সেটা কমতে কমতে কোথায় এসে ঠেকেছে দেখতে পাচ্ছ না?' বন্ধু অধৈর্য হন।

আমি তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, বিজ্ঞানের অসাধ্য কী আছে? মানুষকে চন্দ্রলোকে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে বাণ সংবরণ করি। তার বদলে পরামর্শ চাই, 'তুমিই বল কী করলে সবাই খেতে পরতে পাবে। তারপর জ্ঞানচর্চা রূপচর্চা রসচর্চা করবে।'

'বা! আমি কি সর্বজ্ঞ নাকি! কতটুকুই বা বুঝি, কতটুকুই বা জানি! ক্ষুধার জ্বালা যতদিন না তোমরা শিক্ষিতরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারছ ততদিন এর কি কোনো প্রতিকার আছে, ঘোষ? অভুক্তের তালিকায় যতদিন না তোমাদেরও নাম উঠছে, ততদিন এর সমাধান নেই।' তিনি বলেন বিষাদের সঙ্গে।

'আমাদের এক প্রতিবেশিনী সেদিন আমাকে বললেন, আমরা কি এর পর ক্যানিবাল হব? কথাটা শুনে আমি আঁতকে উঠলুম, শিকদার। অথচ তাঁরা ভালো খান, ভালো পরেন। উচ্চ মধ্যবিত্ত। গাড়ি আছে।' আমি সে কথাটা জানাই।

'কী সর্বনেশে কথা!' বন্ধু শিউরে ওঠেন। 'হোটেলগুলোতে এর পর থেকে কী মাংস খেতে দেবে, কে জানে। ওয়াক! ওয়াক! থুঃ! পেট থেকে ভাত উঠে আসছে হে। কী কথাই না শোনালে! সেদিন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তোমাদের উচ্চতা বেড়ে গেছে। এর পর কী জানি কী মাংস খেয়ে তোমাদের নীচতা বেড়ে যাবে। কোথায় যেন পড়েছি ওর চেয়ে সুস্বাদু মাংস নাকি আর নেই। একবার খেতে শুরু করলে কে কাকে থামাবে! নীতিবোধ তো চুলোয় গেছে।'

আমারও পেটের ভাত উঠে আসছিল। কেন যে ওকথা বলতে গেলুম। কিন্তু বুভুক্ষা যে সমাজের কোন্ স্তর অবধি পৌঁছেছে সেটা জানা দরকার। আমরা একটা নির্বোধের স্বর্গে বাস করছি। ভাগাড় থেকে গোরু মোষের চর্বি নিয়ে তা দিয়ে তৈরি হচ্ছে কী? না সরকারী ছাপ মারা ঘী। মিউনিসিপাল ছাপ মারা মাংস যে কিসের মাংস তা কে জোর করে বলবে? আমরা কি শকুন হতে চলেছি?

'দ্যাখ, ঘোষ, কত লোক কত কিছুর জন্যে প্রার্থনা করে। ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশং দেহি, দ্বিষো জহি। আমার প্রার্থনা অত কিছুর জন্যে নয়। দুবেলা দুটি খেতে পেলেই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাতে যেন ভেজাল না থাকে। ঘী আমি আগেই ছেড়েছি। মাংসটাও দেখছি এর পর ছাড়তে হবে।' বিবর্ণ মুখে বলেন শিকদার।

'মানুষের উপর তোমার বিশ্বাস নেই?' আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলি।

'আছে বইকি। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' বন্ধু স্বীকার করেন।

'তা হলে মাংসটাও ছাড়বে কেন? ছাড়লে প্রোটিন কম পড়বে। ডায়াবিটিসে ধরবে। তোমাকে ওকথা বলে ভুল করেছি।' আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিতে চাই।

'না, না, ভুল করনি, ঘোষ। বড়ো ঘরের মেয়েরাও কী ভাবছেন সেটা আমার জানা দরকার ছিল। মানুষকে নিয়েই তো আমার সাহিত্য। কত বড়ো বিপদে পড়লে মানুষ অমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে! পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতাও কত সহজে ও কত কম দিনের মধ্যে বর্বরতায় পরিণত হতে চলেছে লক্ষ করে আমি আবার অসাড় হয়ে যাব না তো? সভ্যতা মানে কি উপর চটক? সেটা তো রাবণের স্বর্ণলঙ্কারও ছিল। ওদের সমৃদ্ধির ও শক্তির অবধি ছিল না, কিন্তু ওরা

মানুষ ধরে ধরে খেত। এরা ধরে ধরে খাচ্ছে না তা ঠিক, কিন্তু কিন্তু রক্ত চুষে খাচ্ছে। অথচ কেউ এদের ধরতে পারছে না। ধরলেও ছেড়ে দিচ্ছে। উকীলেরা ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। যেন ছাড়াবার জন্যেই আইন।' বন্ধু জ্বলে ওঠেন।

'কী করা যায়, বল! নিঃসন্দেহ না হলে তো কাউকে দণ্ড দেওয়া চলে না। ইংরেজরা আমাদের জন্যে যে উত্তরাধিকার রেখে গেছে এইটেই তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। এইটেই ওদের তাজমহল। পুলিস যদি সততার সঙ্গে কাজ করে, সাক্ষীরা যদি সততার সঙ্গে সাক্ষ্য দেয় তা হলে আদালত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহ হতে পারেন। দোষটা আইনের নয়, চরিত্রের।' আমি তাঁকে ঠাণ্ডা করি।

'চরিত্র হয়তো একদিন শোধরাবে, কিন্তু ঘটনা ততদিন অপেক্ষা করবে না। অন্যান্য দেশেও অপেক্ষা করেনি। এর চেয়ে বেশি খুলে বলতে আমি পারব না, আমি নিজেই জানিনে কোন্‌টা ঘটবে। কিন্তু মানুষের খাদ্য নিয়ে এই দস্যুবৃত্তি যেমন করে হোক দমন করতে হবে। তার মানে কী আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। হয়তো এমন কিছু বলে বসব যা সত্যি সত্যি ফলে যাবে। তখন আমাকেই তুমি দোষ দেবে। যেন আমার জন্যেই ফলে গেল। জানো তো টলস্টয়ের ছেলে কী বলেছিল?' বন্ধু প্রশ্ন করেন।

'কী বলেছিল?' আমি জানতুম না।

'বলেছিল বিপ্লবটা তো বাবার দোষেই ঘটল। আমাদের সর্বনাশ হলো। টলস্টয়ের অপরাধ তিনি চল্লিশ বছর ধরে চেতাবনী দিয়েছিলেন যে, বিপ্লব আসছে, তাকে ঠেকাতে চাও তো এইসব করো আর ওইসব কোরো না। চুপ করে থাকলে কি তার ছেলে তাঁকে দোষ দিত? বিপ্লবে আর বিপ্লবের পরে যুদ্ধবিগ্রহে কত লোক মরেছে তা তো জানো। ওঃ ভাবতে গেলে রক্ত হিম হয়ে যায়! যারা মরেনি তারা বন্দী হয়ে শ্রমিক শিবিরে বেগার খেটেছে। খাটতে খাটতে মারা গেছে। টলস্টয়ের কথা শুনলে এসব কি হতো? কিন্তু শুনল না তাঁর ঘরের লোক যারা তারাও। সেই দুঃখেই তো তাঁর প্রাণ গেল। মৃত্যুর পরে যখন তাঁর কথা ফলল তখন তাঁকেই দোষ দিল তাঁর ছেলে।' বন্ধু খেদোক্তি করেন।

'টলস্টয়ের বেলা যা হয়েছিল তোমার বেলা তা হবে না। কথাও ফলবে না। ছেলেও বলবে না। তোমার স্ত্রীকে তো আমি জানি, তিনিও কখনো তোমাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে রেল স্টেশনে মরতে দেবেন না। তুমি প্রোফেট নও, তুমি প্রোফেসী করতে যেয়ো না। জীবনের সত্য সাহিত্য দিয়ে যেতে চাও তো তার জন্যে আমরা কান পেতে বসে থাকব, কিন্তু তোমার প্রোফেসী বা প্রেসক্রিপশনের জন্যে নয়। তুমি হয়তো জানো না, তাই বন্ধু হিশাবে আমার কর্তব্য তোমাকে জানানো যে, অনেকের মতে তুমি একটা বোর।' আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

'বোর! আমি একটা বোর।' শিকদার বুক চাপড়ান।

'তুমি একটা প্রিগ।' আমি আর একটু সাহস পেয়ে বলি। সেই সঙ্গে জুড়ে দিই, 'অবশ্য আমার মতে নয়। অনেকের মতে।'

'আমি একটা প্রিগ!' বন্ধু মাথায় হাত দিয়ে বসেন।

'তুমি একটা কিল-জয়।' আমি আরো এক পা এগিয়ে যাই।

'আমি একটা কিল-জয়! ও হোহো!' তিনি ঢলে পড়েন।

'অবশ্য অপরের মতে। আমি তো তোমার লেখা থেকে যথেষ্ট আনন্দ পাই। তা তুমি যতটুকু পারো আনন্দ দিয়ে যাও। গান্ধীয়ানা বা টলস্টয়িয়ানা বা মুরুব্বিয়ানা তোমার মানায় না। তুমি ঢের ছোট।' আমি আরো এক পা এগোই।

'আমি ঢের ছোট!' তিনি মুষড়ে পড়েন।

'আহা! এ কি আমি বলছি! আমি শুধু রিপোর্ট করছি। তুমি তো একালের বুদ্ধিজীবীদের আড্ডায় যাও না। কফি হাউসে বা চায়ের দোকানে আমাকে ওরা কেউ চেনে না। তাই সন্দেহ করে না যে তোমার বন্ধু।' আমি কৈফিয়ত দিই।

'তুমি আমাকে একটার পর একটা শক দিলে আজ। কতকাল লাগবে মনের শান্তি ফিরে পেতে! আমি যা স্পর্শকাতর!' বন্ধু ছটফট করেন।

আমার গৃহিণী সেদিন বাড়ি ছিলেন না। থাকলে আমাকে ওসব কথা বলতে দিতেন না। সামাজিকতার নিয়ম মেনে চলতে হতো। অতিথি তো। হলেনই বা বন্ধু। অমন করে একজনকে তার মুখের উপর 'বোর' ইত্যাদি বলে আমি যা করেছি তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করি। দুঃখটা আন্তরিক।

'ভেবে দেখেছি তোমার উক্তিই যথার্থ। আমি স্পষ্টবাদিতা পছন্দ করি। তাই তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছ।' তিনি গদ্গদ স্বরে বলেন।

তখন প্রসঙ্গটা আমি পালটে দিই। পুরোনো দিনের কথা পাড়ি। অবিভক্ত বাংলার কর্নিশম্যান আর ওয়েলশম্যানের পর স্কটসম্যানের কাহিনী।

'ডানকানকে তোমার মনে পড়ে?' আমি শুধাই।

'কোন্ ডানকান? ও এম ডানকান না পি ডি ডানকান?' তিনি পাল্টা শুধান।

'ও এম। লোকে যাকে বলত পাগলা সাহেব। পাগলা নন, দিলখোলা বেপরোয়া মিশুক আমুদে রগচটা ক্ষমাশীল হস্তদন্ত। শুনেছি এককালে উনি নতুন ধরনের গোযানে চড়ে সফরে বেরোতেন। তাও সপরিবারে। নিউ মডেল গোযান দেখিনি, বেবী অস্টিন দেখেছি। ওটাও সর্বত্রগামী। তখনকার দিনে এমন রাস্তাঘাট ছিল না। সাহেবদের প্রায় সকলেরই ঘোড়া ছিল। বাঙালীদেরও অনেকের। ঘোড়া থাকলে প্রেস্টিজ থাকে। কিন্তু আসল কারণটা রাস্তার অভাব! যাক, ডানকানের সঙ্গে আমি পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি। ডাকবাংলোয় থেকেছি। সরল অকপট অক্লান্ত পুরুষ। এত জোরে জোরে হাঁটেন যে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে আমার জান বেরিয়ে যায়। তবু পাল্লা দিতে ছাড়িনি।' আমি অতীতের রোমন্থন করি।

'ও এম ছিলেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সীনিয়র।' বন্ধু বললেন।

'আর অনেক বেশি লম্বা চওড়া। ঝুনো নারকেলের ভিতরে ছিল নরম শাঁস। উপরে কড়া, ভিতরে দরদী। চাষীদের উপরে ছিল তাঁর বিশেষ দরদ। বলতেন এরা আমার স্কটল্যাণ্ডের চাষী। তেমনি পরিশ্রমী, তেমনি বুদ্ধিমান। এরাই বাংলাদেশের সম্পদ। তিনি যখন দেখেন যে ধান পাটের দাম পড়ে গেছে, চাষীদের হাতে নগদ টাকা নেই, তখন জমিদারদের আহ্বান করে তাঁদের নিয়ে সভা করেন। তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেন জেলার সব বড়ো বড়ো জমিদার। খাজনা আদায় বন্ধ রাখেন। না পারলে আধাআধি মকুব করেন। ব্যতিক্রম শুধু একজন। কে জানো? মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর বড় সাহেব। তিনি সভায় তো আসেনই না, ধমক দিয়ে চিঠি লেখেন যে জমিদার ও প্রজার মাঝখানে দাঁড়ানোর অধিকার কালেক্টারের নেই। প্রজাদের তিনি খাজনা বন্ধের উস্কানি দিচ্ছেন। জমিদারদের সন্ত্রস্ত করছেন। নীলবিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি। কোম্পানীর বড়সাহেবকে অগত্যা লাটসাহেবের শরণ নিতে হবে। চিঠি পেয়ে ডানকান তো ভয়ে কাঠ। অ্যাণ্ডারসনকে কে না ডরায়! ডানকান আমাকে একবার বলেছিলেন, হি ইজ এ হোলি টেরর! বেচারা ডানকান! সাহেবের সঙ্গে সাহেবের দাবা খেলায় কালেক্টার সাহেব চালমাৎ।' আমার গলা ধরে আসে সমবেদনায়।

'ডানকান একটা বুড়ো খোকা। কত ধানে কত চাল না জানলে ঐ রকমই হয়। মেদিনীপুর

জমিদারী কোম্পানী ছিল নীলকর কোম্পানীদেরই উত্তরাধিকারী। বাংলার চাষীকে ওরা ক্ষমা করেনি।' বন্ধু বিষণ্ণ স্বরে বলেন।

ডানকান তো হেরে গেলেন। তারপর কী হলো, শোন। ইউরোপীয় জমিদারদের দৃষ্টান্ত দেখে দেশীয় জমিদাররাও বেঁকে বসলেন। প্রজারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। অন্ধকারে আলো দেখায় কৃষক প্রজা সংগঠন। নেতারা আমাকে বলেন ওটা অসাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক। সত্যি তাই। কিন্তু পরে তাঁদেরই একজনের ভাবায় তাঁদের নেতা বনে যান বাংলার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। জয় হয় মুসলিম লীগের। দেশ হয় দুচির। জমিদারি উঠে যায়। হায় হায় কতকালের সব বনেদী বংশ।' আমি অক্ষেপ করি।

'যাঁরা বাঁচতে জানে না তাঁদের বাঁচাবে কে!' বন্ধু করুণভাবে হাসেন। 'আমিও কি হেরে যাইনি? কিন্তু ডানকান বলো শিকদার বলো এরা যেটা করতে চেয়েছিলেন সেটা উপর থেকে উপকার। অথচ উপরওয়ালাদের অমতে। সেটা বাই দ্য পীপল নয়, অফ দ্য পীপল নয়, ফর দ্য পীপল। অথচ গণপ্রতিনিধিদের ডিঙিয়ে! হা হা! হা হা! ত্রিশঙ্কু! ত্রিশঙ্কু।'

'আমি করি হায় হায়! আর উনি করেন হা হা!' এরপরে আমি আবার খেই ধরি আমার কাহিনীর। 'ডানকান যখন সফরে বেরোতেন তখন তাঁর সঙ্গে থাকত খানকয় বই। লিপিটা রোমান, ভাষাটা কিন্তু ইংরেজী বা ফরাসী নয়। কী তা হলে? গায়েলিক। হাইলাণ্ডের লোকভাষা। জানতুম না যে সে ভাষাতেও সাহিত্য আছে। তা নিয়ে ডানকানের সে কী গৌরববোধ! ডিনারের পর পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতেন। ডাকবাংলোয় তিনি আর আমি। শোনাতেন আমাকে কবেকার সব ব্যালাড বা চারণগাথা। একবার ভেবে দ্যাখ, শিকদার। কোথায় স্কটল্যাণ্ডের লোকগাথা আর কোথায় বদলগাছীর ডাকবাংলো! সাহিত্যের কি দেশকাল আছে!'

'না। মানুষ সব দেশেই মানুষ। সব যুগেই মানুষ।' তিনি স্বীকার করেন।

পরের দিন ব্রেকফাস্টে বসে ডানকান ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন, 'সরি, ঘোষ, ডিমের সঙ্গে বেকন দিতে পারছিনে। পর্ক আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমার বাবুর্চিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান। শুওরের মাংস রাঁধতে ওর ঘেন্না করে। কেন বেচারার মনে কষ্ট দেওয়া! চাকর বলে কি মানুষ নয়! শুনে আমার এত ভালো লাগে। পর্ক আমিও খাইনে। তবে তার অন্য কারণ। ডানকানকে ধন্যবাদ দিই।' আমি এইখানেই থামি।

'মানুষের মুখ চেয়ে একে একে অনেক কিছুই ছাড়তে পারা যায়, ঘোষ। তা বলে একেবারে অভুক্ত থাকতে পারা যায় না। সেই জন্যেই তো আমার প্রার্থনা, এই যে দুটি খেতে পাচ্ছি এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই বা ক'জন পাচ্ছে! আমিই বা ক'দিন পাব।' তিনি বিদায় নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেন।

মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে

ওগো, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কার সঙ্গে, জানো? আমাদের আলমোড়ার আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে। তিনি এখনো ছবি আঁকেন আর সেসব ছবির প্রদর্শনী করে বেড়ান। কলকাতায় দিন কয়েকের জন্যে

আসা। প্রদর্শনী করলে কোথায় করবেন, কেউ দেখতে আসবে কিনা, কেউ কিনতে চাইবে কিনা, খোঁজখবর নিয়ে ফিরে যাবেন। তারপর আবার আসবেন, যদি আশানুরূপ সাড়া পান।

বেশির ভাগই হিমালয়ের দৃশ্য। তুষারশীর্ষ পর্বতশ্রেণী। বনজঙ্গল। পাগলা ঝোরা। পাকদণ্ডী। পাহাড়ী পুরুষ। পর্বতকন্যা পার্বতী। বুনো হরিণ বা কাঠবেড়ালী। মঠবাড়ি। মন্দির। গিরিগুহা। সাধুজী বা যোগী। আমাকে তাঁর স্কেচবুক দেখান আর আমার অভিমত জানতে চান।

গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে আমার একটা সেমিনার ছিল। দেখি তিনিও সেখানে উপস্থিত। কিন্তু অংশ নিতে নয়। আমার সঙ্গে আলাপটা ঝালিয়ে নিতে। বলেন, 'চিনতে পারছেন?'

'চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু নামধাম মনে পড়ছে না।' আমি অপ্রস্তুত হই।

'ত্রিশ বছর পরে চিনতে পারাই আশ্চর্য। সিদ্ধেশ্বরনাথ আমার নাম। পদবীটা বাদ দিয়েছি। ধাম আলমোড়া। পেশা অঙ্কন ও চিত্রণ। আমার স্টুডিওতে সস্ত্রীক আপনার পায়ের ধুলো পড়েছিল, বাসাতেও শুভাগমন হয়েছিল।' তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

'আরে, আপনি! মিস্টার বোস।' আমি হাতে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিই।

'শুনুন, কানে কানে বলি। বাঙালী বলে পরিচয় দিলে এখন আর সর্বত্র পূজ্যতে নয়। পদবীটা চেপে যাওয়াই সুবুদ্ধি। উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, আশোকুমার যে পথে গেছেন, মহাজনো যেন গতঃ—, তিনি মুচকি হাসেন।

'আসুন না, আমাদের ওখানে পায়ের ধুলো পড়ুক।' আমি প্রস্তাব করি।

'মাফ করবেন, এযাত্রা নয়। আমাকে এবার চরকির মতো ঘুরতে হচ্ছে। কী ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি এঁদের গেস্টহাউসেই উঠেছি। আপনার যদি অধমের সঙ্গে এক পেয়ালা চা মর্জি হয় তা হলে আপনাকে জবর একটা খবর দিতে পারি। চলুন না আমার ঘরে।' এই বলে তিনি আমাকে কৌতূহলী করে তোলেন।

'জবর একটা খবর। তা হলে তো শুনতে হয়।' আমি রাজী হই।

'আগে সেমিনার সারা হোক। আমি এসে নিয়ে যাব।' তিনি অদৃশ্য হন।

ত্রিশ বছর আগে তরুণ শিল্পী সিদ্ধেশ্বরনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তিনি আলমোড়া পছন্দ করলেন কী দেখে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'কৈলাস আর মানস সরোবর যতদিন না দর্শন করেছি ততদিন এইখানেই আমার প্রতীক্ষা।'

এবার তাঁর কক্ষে চা খেতে খেতে প্রশ্ন করি, 'প্রতীক্ষা কি এখনো সার্থক হয়নি?'

'হবে কী করে? চৈনিকেরা যে সৈনিক পাঠিয়েছে। সুযোগ এসেছিল, হাতছাড়া হতে দিয়েছি এই ভেবে যে বয়সটা কৈলাসযাত্রীর উপযুক্ত হয়নি। কৈলাস দর্শন করতে হলে আর সব কিছু দেখে শেষ করতে হয়।' তিনি জবাব দেন। এরপরে সেই জবর খবরটা শোনান। বলেন, 'আপনার বন্ধু রজত নন্দীও বসে আছেন আমারই মতো প্রতীক্ষায়। আপনি কি জানেন যে তিনি এখন আলমোড়ায়?'

'না, জানতুম না তো। বছর সাতেক হলো ওর কোনো চিঠিপত্র পাইনি। শেষবার লিখেছিল ও ডেরাডুনে ডেরা বেঁধেছে।' আমি রজতের কথা ভাবি।

'ডেরাডুনে ছিলেন বটে কিছুকাল, কিন্তু ওটা তো সব জিনিসের কেন্দ্রস্থল নয়। সেইজন্যে তাঁকে আলমোড়ায় কুঁড়ে বাঁধতে হলো।' সিদ্ধেশ্বর বলেন।

'আলমোড়া কবে থেকে হলো সব জিনিসের কেন্দ্রস্থল? কেন, গভর্নর কি আজকাল নৈনিতালে যান না?' আমি বিস্মিত হই।

'ওঃ! তা হলে আপনি আসল খবরটাই রাখেন না।' তিনি দয়াপরবশ হয়ে বলেন, 'রজতদার সঙ্গে এই ছ'সাত বছরে আমার বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। বাঙালী ওখানে যাঁরা যান তাঁরা তো বারোমাস ওঁর মতো বা আমার মতো কষ্ট করে বাস করেন না। নিকট প্রতিবেশী না হলেও আমরা প্রায়ই একসঙ্গে উঠি বসি চলাফেরা করি। তিনিই আমাকে আসল খবরটা জানতে দিয়েছেন।'

'আসল খবরটা তা হলে কী?' আমি কৌতূহল বোধ করি।

'ইংরেজীতে যাকে বলে সেন্টার অফ্ থিংজ তাঁর ইচ্ছা সেইখানে থাকতে। আজীবন চেয়েছেন।' সিদ্ধেশ্বর বলেন।

'ওর মাথায় পোকা আছে। কলকাতায় পোস্টিং কত লোক কত তপস্যায় পায়। পালাবে। কলকাতা নাকি সেন্টার অফ থিংজ নয়। দিল্লীতে ওকে বার বার ডাকে। যাবে না। দিল্লী নাকি সেন্টার অফ থিংজ নয়। শেষটা কিনা আলমোড়া। আলমোড়া তো আমি গেছি। কী আছে ওখানে?' আমি বিরক্ত হয়ে বলি।

'দাদার ধারণা হিমালয় হচ্ছে সেন্টার অফ থিংজ। হিমালযের মধ্যে আলমোড়া হলো আরো সেন্ট্রাল।' ব্যাখ্যা করেন সিদ্ধেশ্বর।

'কোন্ অর্থে? ভৌগোলিক অর্থে নয় নিশ্চয়।' আমি তর্ক কবি।

'না। আধ্যাত্মিক অর্থে। আলমোড়া থেকে যাত্রীরা কৈলাস মানস সরোবরে রওনা হয়। আবহমানকাল থেকে। প্রকৃতপক্ষে আলমোড়াই হচ্ছে মহাপ্রস্থানের পথে। আর কৈলাসই হচ্ছে স্বর্গ। রজতদা বলেন উত্তরদিকে চেয়ে, সিদ্ধেশ্বর, তোমাব কি কখনো মনে হয় না যে আমরা মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে? একদিন যাত্রা হবে শুরু। অবশ্য ওটা ওঁর রসিকতা। আমিও পরিহাস করে বলি, আপনি তো একটি ভুটিয়া কুকুরও কুড়িযে পেয়েছেন। স্বয়ং ধর্মরাজ আপনাব অনুগামী হবেন।' সিদ্ধেশ্বর হাসেন।

আমার তো ধারণা ছিল হরিদ্বার হৃষীকেশের পথই মহাপ্রস্থানের পথ। পতিতপাবনী গঙ্গা যে পথ দিয়ে নেমে এসেছিলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেই পথ বেয়ে উঠে গেছলেন। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল। আধ্যাত্মিকতার তো বিভিন্ন কেন্দ্র আছে। আলমোড়াও একটি কেন্দ্র। সেখানে অত ভিড় নেই। নির্জনে বসে সাধনা করা যায়। কিন্তু আমার বন্ধু রজত যেরকম মানুষ তার জীবনের পরিণতি তো ওরকম হবার কথা নয়।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে সিদ্ধেশ্বর বলেন 'রজতদাকে দেবার মতো কোনো বার্তা থাকলে আমি বহন করে নিয়ে যেতে পারি।'

'বার্তা?' আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। বলি, 'মানস সরোবরে যাক আর কৈলাসেই যাক ওকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে পেতে চাই। মহাপ্রস্থানিকদের মতো হারাতে চাইনে। চৈনিকরা পথরোধ করে বসে আছে যতদিন ততদিন আমি নিশ্চিন্ত। তবে রজতকে তো জানি। দশ বছর অন্তর অন্তর ওর সেন্টার অফ থিংজ বদলায়। শুনেছেন বোধহয় ওর মুখে ওর ইতিকথা।'

'না তো। পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে সাধুরা যেমন নীরব রজতদাও তেমনি। ভেক ধারণ না করলেও উনিও একজন সাধু। রামকৃষ্ণ কুটিরের স্বামীজীদের সঙ্গে প্রায়ই ওঁকে দেখি। আমি আর্টিস্ট মানুষ। আমার সাধনা ভিন্ন মার্গের। আমি তাঁর পূর্বজীবন সম্বন্ধে এইটুকুই জানি যে তিনি একজন বড়ো চাকুরে ছিলেন। কিন্তু সেটা শুধু পাথেয় সংগ্রহের জন্য। পথ আর পাথেয় তাঁর বেলা একাকার হয়নি। যেমন আমার বেলা। তাই এত কষ্টও পাননি। আয়েসী অভ্যাস এখানো ছাড়তে পারছেন না। বাবুর্চি ও বেয়ারা না হলে তাঁর চলে না। কী করে যে কৈলাসযাত্রী হবেন! মহাভারতে কি লিখেছে যে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁদের ভৃত্যরাও সহযাত্রী হয়েছিল?' সিদ্ধেশ্বর কূট প্রশ্ন করেন।

ওবা দু'জনে ওব চাকুবিজীবনেব সাথী। এখনো বয়েছে শুনে খুশি হলুম আমি। জানতুম যে ওব স্ত্রীব সঙ্গে ওব বহুদিন থেকে ছাডাছাডি। তিনি মুসলমান বাবুর্চিব হাতে খাবেন না। বজতও ওব অনুগত ভৃত্যকে বিদায় দেবে না। একদিকে সংস্কাব, আবেক দিকে নীতি। নীতিব প্রশ্নে স্বামী অটল, সংস্কাবেব প্রশ্নে স্ত্রী। চাকুবিজীবনে দু'জনেব জন্যে দু'বকম বন্দোবস্ত ছিল। বাইবেব লোককে সেটা জানতে দেওয়া হত না। পবে তিনি বডো ছেলেব কাছে চলে যান। পাটনায।

'শুভদা কি একবাবও আসেন না?' একটু অন্তবঙ্গ স্ববে শুধাই।

'না, ওঁব শীত সহ্য হয না। আলমোডাব গ্রীষ্মকালেও ওঁব কাছে শীতকাল। বজতদা অবশ্য মাঝে মাঝে গিযে দেখা কবে আসেন।' সিদ্ধেশ্বব বলেন।

আমি উঠতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু শিল্পীব অনুবোধে স্কেচবুকেব পাতা ওল্টাতে হলো। ছোট মাপেব তৈবি ছবিও কযেকখানি ছিল। বেশ পাকা হাত। আমি তাবিফ কবি। বলি 'আপনি প্রদর্শনী কবলে আমবাও দেখতে আসব।'

আমবা তিন বন্ধু যেদিন ভিকটোবিযা স্টেশনেব প্ল্যাটফর্মে নেমে লণ্ডনেব মাটিতে পা দিই সেদিন বজত গদগদ স্ববে বলে, 'হাউ ওযাণ্ডাবফুল! উই আব নাউ অ্যাট দ্য সেন্টাব অফ থিংজ।' চোখে ওব পলক পডে না।

পবে আমি এই নিযে পবিহাস কবলে ও বলে, 'দ্যাখ প্রভাকব প্যাবিসেও তো কিছুক্ষণেব জন্যে নামতে হযেছিল। তখন তো আমাব মনে উদয হযনি যে আমবা এখন সব জিনিসেব কেন্দ্রস্থলে। প্যাবিসেব সঙ্গে আমাব আত্মাব আত্মীযতা। লণ্ডনেব সঙ্গে তেমন নয। তবু এখানেই আমি অনুভব কবি যে আধুনিক সভ্যতাব সামগ্রিক দর্শন এই অবস্থান থেকেই পাওযা যায। আব সব অবস্থান একপেশে।'

একজনেব অনুভূতিব সঙ্গে আবেকজনেব তর্ক কবা শোভা পায না। আমি ওব মন বাখা কথা বলি। 'হ্যা, একটি ছোটখাটো জগৎ।'

'যা বলেছ। এইখানেই বিশ্ব একনীড হযেছে। কে না আশ্রয নিযেছেন এখানে। ভলতেযাব, মাৎসিনি, কার্লমার্কস, লেনিন, সান ইযাৎ সেন। বিচিত্র উপলক্ষে এসেছেন বামমোহন, মধুসূদন, ববীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অববিন্দ, নওবোজী, গান্ধী। কত বকম আইডিযা এইখান থেকে দেশে দেশে ছডিযে পডেছে। জাতীযতাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, ফেমিনিজম, লিবাবলিজম।' বজত উচ্ছ্বসিত।

মার্কস লেনিনেব মতো ব্রিটিশ মিউজিযামই ছিল ওব প্রধান আশ্রয। সেইখানেই ওব জন্যে একটা আসন নির্দিষ্ট ছিল। অবশ্য সবকাবীভাবে নয। আসনে বসে একসঙ্গে কযেকখানা বইযেব নাম লিখে পবিচাবকেব হাতে দিত। সাবাদিন অধ্যযনে অতিবাহিত হতো। মাঝখানে আধ ঘন্টাব জন্যে বাইবে গিযে চেনা বেস্টোবান্টে এক কোর্সেব লাঞ্চ সেবে আসত, কিন্তু চাযেব সময চা খেতে যেত না।

'কেন্দ্রস্থলে বাস কবে তা হলে তোমাব লাভটা হলো কী? ঘুবে ফিবে দেখলে না তো সব জিনিস।' আমি একদিন বলি।

'তাব জন্যে তো তুমিই বযেছ। তোমাব চোখে আমিও দেখছি। তুমি বর্ণনা কব, আমি শুনি। আমাব সময় এত কম যে আমাকে বেছে বেছে দেখতে হবে, সব নির্বিচাবে দেখতে পাবব না।' বজত কৈফিযত দেয়।

তা বেছে বেছে ও যা দেখত তা দেখবাব মতো। যা শুনত তা শোনবাব মতো। এই যেমন আনা পাভলোভাব নৃত্য। শালিয়াপিনেব গান। ক্রাইসলাবেব বেহালা। বার্নার্ড শ ও বাবট্রান্ড

রাসেলের বক্তৃতা। সিবিল থর্নডাইক ও ইডিথ ইভান্সের অভিনয়। আর্ট গ্যালেরিতে বা রয়াল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী।

'না, অল-রাউণ্ড হবার অভিলাষ আমার নেই। লেওনার্দোর যুগে সেটা সম্ভব ছিল। এযুগে আর নয়। তা হলেও সমগ্র দর্শন আমার অভিষ্ট। আমি সমগ্র বিশ্বের নাগরিক।' রজত আমাকে শোনায়।

'আগে নিজের দেশ, তার পরে সমগ্র বিশ্ব। আগে ভারতের স্বাধীনতা তার পরে বিশ্বমানবের একতা।' আমার সাফ কথা।

'ভারতের স্বাধীনতা যদি আরো পঞ্চাশ বছর পরে হয় ততদিন কি আমি বেঁচে থাকব। এ জীবনে তা হলে করে গেলুম কী। মনে রেখো, প্রভাকর। একটা দেশ একশো বছর অপেক্ষা করতে পারে, একটি ব্যক্তি তা পারে না। দেশের ভার কালের উপর ছেড়ে দাও। নিজের ভার নিজের হাতে নাও। আজ তুমি আছো দশ বছর পরে নাও থাকতে পারো। এমন কিছু করে যাও যাতে তোমার আপনার তৃপ্তি।' রজত তার নিজের কথা বলে আমার বকলমে।

আমার মন তখন পড়ে আছে ভারতে। গান্ধীজীকে ঘিরে। ফি হপ্তায় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পাই ও প্রত্যেকটি লাইন পড়ি। মাঝে মাঝে রজতকে পড়ে শোনাই। হ্যাঁ, আমরা এক বাসাতেই থাকতুম। পাশাপাশি দুখানা ঘরে।

'মীন্স সম্বন্ধে গান্ধীজীর কথাই শেষ কথা। আমি ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু এণ্ডস সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ গভীর। আমি কেবল ভারতের সন্তান নই, আমি আধুনিক যুগেরও সন্তান। দেশ আমার জননী, যুগ আমার জনক। আমি মধ্যযুগের আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারব না। প্রাচীন যুগের আবহাওয়ায় তো সঙ্গে সঙ্গে মারা যাব। স্বাধীন ভারত যদি প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারত হয়, আমি ওর কোল থেকে সাত হাজার মাইল দূরে।' রজত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

আমি হেসে বলি, 'অতখানি মাতৃভক্তি তোমার নেই। অকৃতজ্ঞ সন্তান!'

'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' সেও হাসে।

বছর দুই যেতে না যেতে যেমন আমার মন কেমন করতে লাগল তেমনি রজতেরও। মাতৃভূমির জন্যে। আত্মীয়স্বজনের জন্যে। ভালোবাসার জন্যে। রজত কিন্তু সেটাকে কৌশলে ঢাকা দেয়। বলে 'সিদ্ধ বাঁধাকপি আর সিদ্ধ ফুলকপি খেতে খেতে সিদ্ধপুরুষ হয়ে গেছি। মা-কাকিমাদের হাতে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন খেতে ইচ্ছে করছে।'

'ওঃ! এইজন্যেই এত দেশপ্রেম।' আমি মস্করা করি।

দেশে ফিরে আসার পর শুরু হয় ওর কর্মজীবন। মফঃস্বলের স্টেশনে বাবুর্চি ও বেয়ারা নিয়ে সংসারযাত্রা। অ্যাংলো-মোগলাই খানা। 'ওমা, কী ঘেন্না!' মা-কাকিমা শতহস্ত দূরে থাকেন। তাঁদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা হয়, কখনো যদি কেউ বেড়াতে আসেন ওঁরাই ওর বিয়ে দেন। স্ত্রী এসে বাবুর্চিকে বিদায় দেন, কিন্তু দু'দিন বাদে বুঝতে পারেন যে চাকরির যা নিয়ম। তখন আবার সেই বাবুর্চির প্রবেশ কিন্তু ঠাকুরের প্রস্থান নয়। হিন্দু মুসলিম সহঅবস্থান। সদরে অন্দরে পার্টিশন। সতেরো বছর বাদে যা নিয়ে দেশ পার্টিশন হয়ে যায়।

আমার সঙ্গে ওর বছরে দু'বার দেখা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষার সময়। বলে ওর সেন্টার অফ থিংক্স সরে গেছে। কোথায়, সেকথা খুলে বলে না। কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমি তো অবাক।

'ক্যাপিটালিজম থাকলেই তার ব্যাধি থাকে। কখনো যুদ্ধবিগ্রহ, কখনো মন্দা। যুদ্ধ শেষ হবার বারো বছর যেতে না যেতে মন্দা ঘনিয়ে এসেছে। মন্দার জন্যে দরকার আসুরিক চিকিৎসা, ফাসিজম। তার থেকে আর একদফা যুদ্ধ। ইতিহাস চলবে বৃত্তাকারে যতদিন না মানুষ এই সংকটের

মূলোৎপাটন করতে প্রস্তুত হয়।' রজত ভেবেচিন্তে বলে।

'চরকা আর খদ্দর?' আমি সংকেত করি।

'চরকা আর খদ্দর মানে ধনতান্ত্রিক বিবর্তনের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন। পশ্চিম রাজী হবে না এতে। একটি মানুষকেও তুমি রাজী করাতে পারবে না। জার্মানীর ষাট লক্ষ বেকারকেও না। তার চেয়ে ওরা ফাসিস্ট হবে। মারবে ও মরবে। তোমার একমাত্র ভরসা ভারতের মতো দেশ। তবে ক্যাপিটালিজম এদেশেও অনেকদূর এগিয়েছে। সে কি স্বেচ্ছায় পেছিয়ে যাবে? তোমার স্বদেশের ক্যাপিটালিস্টরাও সুবোধ বালক নয়। বিদেশীরা হটে গেলে স্বদেশীরা তাদের ফাঁক ভরাবে।' রজতকে চিন্তান্বিত দেখায়।

'বেশ তো ক্ষতিটা কি। দেশের টাকা দেশে থাকবে।' আমি মন্তব্য করি।

'থাকলেই বা। মন্দা এড়াবে কী করে? যুদ্ধ ঠেকাবে কী করে? আমি তো, এখন দিশাহারা। পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন যদি সম্ভব হতো তাহলেও আমি ওতে রাজী হতুম না। আর সম্ভব নয়, প্রভাকর। সঙ্গতও নয়। নতুন করে শিং ভেঙে বাছুর হওয়া যেমন। আরো পড়তে হবে। আরো ভাবতে হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অভাব আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। কিন্তু সেখানেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বিয়ে করে বসে আছি। উনি আবার জন্মশাসনে বিশ্বাস করেন না।' রজত বলে ওর দুঃখের কাহিনী।

আমি কিন্তু দুঃখিত হইনে। বলি, 'স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেয়ো না। দু'তিনটির পরে দেখবে ওঁর ইচ্ছে থাকবে না।'

'ততদিনে আব আমার হাত-পা খোলা থাকবে না। সব জিনিসের কেন্দ্রস্থলে যাব কী করে? যদিও বুঝতে পাবছ যে, লণ্ডন আর সেন্টাব অফ থিংজ নয়। এই মন্দায় ওর অবস্থা কাহিল হয়েছে। বনেদী গণতান্ত্রিক দেশ বলে ফাসিজমটা পরিহার করতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধ ওর কপালে লেখা আছে।' রজত বলে ভাবাক্রান্ত স্বরে।

'নাঃ। যুদ্ধ আর বাধবে না। লীগ অফ নেশনস রয়েছে যে!' আমি আশাবাদী।

'ওঃ! তোমার সেই লীগ অফ নেশনস ইউনিয়ন! মড্ কেমন আছে?' ও জানতে চায়।

'চুপ! চুপ! ভুলতে চেষ্টা করছি। জানি অসম্ভব।' আমি চুপি চুপি বলি।

'এর পরে বহুকাল ওর সঙ্গে দেখা হয় না। বদলীর পর বদলী। ওরও। আমারও। শেষে একদিন ঘটনাক্রমে এক ট্রেনে ভ্রমণ। ও আসছিল উত্তর থেকে। আমি পূর্ব থেকে। পোড়াদা জংশনে দেখা। কী চমৎকার করিডর ট্রেন ছিল আসাম মেল!'

কথায় কথায় জানা গেল ওর মনের উপর তখন ওয়েব দম্পতির বিরাট গ্রন্থ 'সেভিয়েট কমিউনিজম: এ নিউ সিভিলাইজেশন' কাজ করছে। লণ্ডনে থাকতেই ফেবিয়ানদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল। ও নিজেও একজন ফেবিয়ান। তাই ওর ধর্মগুরুদের গ্রন্থ ওকে রাশিয়ার পক্ষপাতী করেছে। সব জিনিসের কেন্দ্রস্থল এখন আর লণ্ডন নয়, মস্কো।

'ছেলেবেলায় শুনেছিলুম হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে। বড়ো হয়ে মনে হলো হোয়াট ব্রিটেন থিঙ্কস টুডে। এবার আমার ধারণা হোয়াট রাশিয়া থিঙ্কস টুডে। কিন্তু মোর ডানা নাই আমি আছি একঠাঁই সেকথা যে যাই পাসরি!' সে করুণ কণ্ঠে বলে।

'খবরদার রাশিয়ায় যেয়ো না। গেলে আর ফিরতে পারবে না। এরাও ফিরতে দেবে না, ওরাও ফিরতে দেবে না।' আমি জুজুর ভয় দেখাই।

'ওসব বাজে কথা!' ও হেসে উড়িয়ে দেয়। 'লণ্ডনে আমার খুঁটির জোর আছে। গেলে তো আমি এখান থেকে সরাসরি যাব না। যাব লণ্ডন হয়ে ক্রিপস কিংবা কোল কিংবা লাস্কির পরিচয়পত্র

নিয়ে। এদেশের ইংরেজরা আমাকে চেনে না। কিন্তু ওদেশে আমি অপরিচিত নই, প্রভাকর।'

ওকে হুঁশিয়ার করে দিই যে পুলিস ওর উপরে নজর রেখেছে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছি ওর উপরওয়ালাদের উপর নির্দেশ, 'কিপ এন আই অন ইয়ং নাগুী।'

'তুমি ও যেমন! আমি কি এত বোকা যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশব! আমার আগ্রহটা এদেশে কী হচ্ছে তাতে নয়, মূল রাশিয়ায় কী হচ্ছে তাইতে। আর একখানা বই হাতে এসেছে। 'মস্কো ডায়ালগস'। মোস্ট ইন্টারেস্টিং। ঘটনা কিছু নয়, তত্ত্বই আসল। ডায়ালেকটিকস না জানলে তুমি অন্ধকারেই থাকবে। ইংরেজদের সঙ্গে ওইখানেই রাশিয়ানদের তফাত। রজত এমন করে বলে যেন রাশিয়ানরাই এককাঠি সরেশ।

আমি আর কথা বাড়াইনে। বুঝতে পারি ওকে এখন রাশিয়াতে পেয়েছে! শুধু ওকে কেন? ওয়েব দম্পতিকেও। রম্যা রলাঁকেও। আঁদ্রে জিদকেও। হয়তো বা রবীন্দ্রনাথকেও। ইংরেজদেরও সে বোলবোলাও আর নেই। হিটলার ওদের টিট করবার জন্যে পাঁয়তারা কষছে। আমার সহানুভূতিটা কিন্তু ইংরেজদের দিকেই। যদিও আমি স্বরাজ চাই।

বেচারা রজত! একদিন ওকে দেখি বিষাদের প্রতিমূর্তি। কলকাতায় একটা বিয়েবাড়িতে দেখা। কানে কানে বলে, 'কথা আছে। যেয়ো না।'

'কী ব্যপার!' নিরিবিলি পেয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ স্টালিন। আর কাউকে বাঁচতে দেবে না। বিলুপ্ত করে দেবে। প্রথমে ভেবেছিলুম ওটা প্রোপাগাণ্ডা। তা নয়। লণ্ডন থেকে কনফারমেশন পেয়েছি। এণ্ড জাস্টিফায়েস মীনস বলে কোনো সান্ত্বনা নেই, প্রভাকর। রেভোলিউশন জাস্টিফাই করা যায়। তা বলে রেন অফ টেরর কি আমি কখনো জাস্টিফাই করতে পারি? অত বড়ো স্কেলে?' রজত কাতরায়।

'ফ্রান্সেও তো বিপ্লবের পরে রেন অফ টেরর হয়েছিল। দেশটা অত বড়ো নয় বলে অত বড়ো স্কেলে নয়। মরালিটির দিক থেকে জাস্টিফাই করা যায় না, কিন্তু ইতিহাসের নিয়ামক কি মরালিটি না নেসেসিটি?' আমি পালটা প্রশ্ন করি।

ও জবাব দেয় না। তখন আমিই বলি, 'পৃথিবীতে একটিমাত্র দেশ আছে, যেখানে একজন মাত্র নেতা আছেন, যিনি যুদ্ধ আর বিপ্লবের একটা নৈতিক বিকল্প আছে কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এণ্ড জাস্টিফায়েস মীনস তাঁর নীতিবাক্য নয়। কিন্তু সব দেশের পলিটিসিয়ান ও মিলিটারিস্টদের ওটাই হলো খেলার নিয়ম। যুদ্ধের সময় ইংরেজরাও কি ন্যায়নীতি মেনে চলে?'

'তুমি যাই বলো না কেন, প্রভাকর, স্টালিনের দেশে বাস করতে আর আমি উৎসাহ বোধ করিনে। মস্কো এখন থেকে আমার সেন্টার অফ থিংজ নয়।' বেদনায় ওর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আমি খুশি হয়ে বলি 'তোমার সেন্টার অফ থিংজ তোমার নিজের দেশে। একবার দেশের দিকে দৃষ্টি ফেরাও দেখি।'

এর পর ওর সঙ্গে আবার আমার দেখা হয় বদলীর পথে কলকাতায়।

'মীনস নিয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে কোনোদিন আমার মতভেদ ছিল না, তা তো জানো। এণ্ডস নিয়েই যা-কিছু পার্থক্য। আর সেটা বেশ গভীর। এখন উনিও কতকটা পথ আমার দিকে এগিয়েছেন, আমিও কতকটা পথ ওঁর দিকে এগিয়েছি। উনিও জাতপাত মানেন না, আমিও আধুনিক বলতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বুঝিনে। তাহলেও কিছুটা ফাঁক রয়ে গেছে দু'জনের মাঝখানে। সেইজন্যে আমি গান্ধীবাদী বা গান্ধীপন্থী বলে পরিচয় দিইনে। দূরে দূরেই থাকি, তবে ইতিমধ্যে একদিন দেখা করে এসেছি।' রজত বলে।

'এখন থেকে তোমার সেন্টার অফ থিংজ তাহলে সেবাগ্রাম?' আমি বলি।

'যেখানেই গান্ধীজী, সেখানেই সেন্টার। সেন্টার এখন একটি স্থান নয়, একটি পাত্র। ইতিহাসের হীরো। প্রোফেটও বলতে পারো।' রজত বলে প্রত্যয়ের সঙ্গে।

শুনে আনন্দ হয়। রজতের এই পরিবর্তনটা আমার মনোমত।

বেচারা রজত! আট বছর বাদে একদিন ওকে কাঁদতে হলো। কেঁদে কেঁদে বলে 'এ কী হলো, ঈশ্বর! এমন তো কথা ছিল না। হানাহানি কাটাকাটি ভাগাভাগি রাগারাগির মধ্যে হঠাৎ বিদায় হয় ইংরেজ। তেমনি হঠাৎ বিদায় নিলেন গান্ধীজী। এ কী হলো, প্রভাকর!'

আমি ওর দু' হাত ধরে বলি, 'উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া ভেঙে পড়িস না রে।'

'আমি ভেঙে পড়িনি, প্রভাকর। ভেঙে পড়েছে আমার সেন্টার অফ থিংজ। এই নিয়ে বার বার তিনবার। এ বয়সে কোথায় পাই চতুর্থ একটা সেন্টার। স্থানই বা কোন্টা। পাত্রই বা কোন্ জন! চোখে আঁধার দেখছি, ভাই।' দুচোখ মোছে রজত।

'ওঃ! এই কথা! কেন, দিল্লী আর জবাহরলাল? মহাত্মার অধিষ্ঠান রাজঘাট। জবাহরলাল তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী।' আমি প্রবোধ দিই।

রজত শান্ত হয়। কিন্তু কয়েক বছর বাদে আবার যখন দেখা হয় তখন মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলে, প্রভাকর। দেশ স্বাধীন হয়েছে মানে গান্ধীজীর শাসন থেকে স্বাধীন হয়েছে। ত্রিশ বছর ধরে তিনি যত্ন করে যা শিখিয়েছিলেন তা বেবাক অগ্রাহ্য করেছে। এণ্ডস আর মীনস এ দুটোর একটাও কারো মনে দাগ রেখে যায়নি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে হেন কর্ম নেই যা ওরা করবে না। আদর্শের জন্যে দুনিয়া এখন ভারতের দিকে তাকায় না। উল্টে ভারতই তাকায় একচোখে আমেরিকার দিকে। আরেক চোখে রাশিয়ার দিকে। দরবারের ওমরাহ্ শ্রেণী এখন দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় কথায় কথায় উড়ে যান বিষ্ণুলোকে। আরেক সম্প্রদায় কথায় কথায় উড়ে যান শিবলোকে। মন তাঁদের সব সময় উড়ুউড়ু। কর্তারা থীসিস আর অ্যান্টিথীসিস মিলিয়ে একটা সীনথেসিস তৈরি করেছেন। ডিকটোডেমোক্রাসী। আরো একটা তৈরি হতে চলেছে। ক্যাপিটোসোশিয়ালিজম। সুকুমার রায় হলে বলতেন হাঁসজারু আর বকচ্ছপ। রাজনৈতিক সঙ্কটের দিন সামাল দেবে সিভিল সার্ভিস ও মিলিটারি। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিন সামাল দেবে কে?'

আমি বিলকুল বোকা বনে যাই। বোকা আর বোবা। রজত বলে যায়, 'না, দিল্লী আমার সেন্টার অফ থিংজ নয়। জবাহরলালজীকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তিনিও নন আমার সেন্টার। আমি এখন সম্পূর্ণ হতাশ আর ক্লান্ত আর ব্যর্থ। এমন ফ্রাসট্রেশন জীবনে অনুভব করিনি। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমি বানপ্রস্থ নিচ্ছি। পেনসনের টাকায় দুটো দুরকম বন্দোবস্ত পোষাবে না। বাবুর্চি আর বেয়ারা আমার পরম অনুগত ও পুরাতন ভৃত্য। অর্ধেক বেতনে ওরা রাজী। ওদের ছাড়িয়ে দেওয়া চলবে না। ঠাকুর চাকরকে ছাড়িয়ে দিলে গৃহলক্ষ্মী আমাকে ছেড়ে যাবেন। বড়ো ভাবনায় পড়েছি, ভাই।'

আমার ধারণা ছিল ওটা সাময়িক ছাড়াছাড়ি। কিন্তু মিস্টার বোসের কথা শুনে মনে হচ্ছে তা নয়। বেচারা রজত! তবু ভালো যে ও চতুর্থ একটা কেন্দ্রস্থল পেয়েছে ও শান্তিতে আছে।

গুপ্তকথা

'আহা! সৃষ্টিধর গুপ্ত লোকান্তরে গেলেন!' কাগজের আড়াল থেকে বলে ওঠেন বন্ধু।
'হ্যাঁ, বড়োই দুঃখের বিষয়।' আমি ও খবর আগেই পড়েছি।
'ভাগ্যবন্ত পুরুষ। ইংরেজ আমলের এম বি ই। আবার কংগ্রেস আমলের পদ্মশ্রী। এমন মণিকাঞ্চন যোগ ক'জনের বেলা হয়! করিতকর্মা ব্যক্তি। গুপ্ত জ্যাকসন অ্যাণ্ড শর্মা কোম্পানীর চেয়ারম্যান। অবিচুয়ারিতে ওঁর জীবনের সংক্ষিপ্তসার দিয়েছে, দেখেছ?' বন্ধু আমারই কাগজ আমাকে দেখতে দেন।

'দেখেছি। কিন্তু ওঁর জীবনের একটি অধ্যায় বাদ গেছে। সেটা লিখতে হলে আমাকেই লিখতে হয়।' এই বলে বন্ধুকে একটা চমক দিই।

'ওঃ! তুমি ওঁকে চিনতে। কই, কোনোদিন তো শুনিনি।' বন্ধু অনুযোগ করেন। সেইসঙ্গে অনুরোধ।

'শুনতে চাও তো শোন।' এই বলে আমি আরম্ভ করি। 'সৃষ্টিধরের ওটা প্রথম চাকরি। তার আগেই তাঁর বিয়ে হয়েছে। বিয়ে না করলে বিলেত যাবার সুযোগ পেতেন না। বৌ নিয়েই তিনি বলভদ্রপুর যান। বলভদ্রপুর ছিল তখনকার দিনেব যুক্তপ্রদেশের এক বিখ্যাত তালুকা। মালিক মুসলমান। কিন্তু উপাধি রাজা। পরে বোধ হয় মহারাজা। যেমন সম্ভ্রান্ত তেমনি ভদ্র। তাঁর দেওয়ান ছিলেন কানওয়াব যশবন্ত সিং। তিনি রাজবংশীয়। তবে তাঁর মাতৃকুল বাঙালী খ্রীস্টান। বাঙালী বলে সৃষ্টিধরকে ও তার স্ত্রী নীলিমাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন। হপ্তায় একদিন ওঁদের বাংলোয় এসে সন্ধ্যাবেলাটা আড্ডা দিয়ে কাটাতেন। তাঁদের যাতে অর্থনাশ না হয় সেকথা ভেবে ভর্তি একবোতল স্কচ নিয়ে আসতেন। সেটা খুলে তিনজনের গ্লাসে ঢালতেন। গ্লাস খালি হলে আবার ভরে দিতেন। বোতল খালি হলেই গা তুলতেন।'

'খাসা লোক তো!' বন্ধু তারিফ করেন।

'খানদানী লোক, বল। কানওয়ারনী থাকতেন মুসৌরিতে না নৈনিতালে সারা গ্রীষ্মকাল। শীতকালে নিচে নামলে ডিনার দিতেন। গুপ্তদের ডাকতেন। সৃষ্টিধর তো সুখেই ছিলেন ওদেশে কিন্তু স্বস্তিতে নয়। যে পথ দিয়ে তিনি আপিসে যেতেন তার দু'ধারে লোক জমে যেত তাঁকে দেখতে। তাঁর চেহারার জন্যে কি? হতেও পারে। চেহারা নিয়ে তাঁর একটু গর্ব ছিল। কালো? তা সে যতই কালো হোক, নিপুণ হাতের খোদাই নটবর মূর্তি। কিন্তু যা ভেবেছিলেন তা নয়। এক একটা শব্দ তাঁর কানে আসে। জিগ-স পাজলের মতো জুড়তে জুড়তে যা দাঁড়ায় তার মর্ম, কী আশ্চর্য জীব এই বাঙালী! এ নাকি রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়!' বলতে বলতে আমি হেসে ফেলি।

'এ্যাঁ! বল কী হে! সত্যি।' বন্ধু তো হাঁ।

'আহা, আমি কি বানিয়ে বলছি। যেমনটি শুনেছি তেমনটি শোনাচ্ছি। সৃষ্টিধর তো দারুণ শক পান। স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়াটাও আশ্চর্য ঘটনা। এ কী মল্লুক রে, বাবা! তিনি তাঁর কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ককে বিশ্বাস করে শুধান, ওরা কেন অমন কথা বলে? কেরানীটি ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, এদেশের স্বামীরা বাড়ির বাইরে রাস্তার উপর চারপাই পেতে শোয়। বৃষ্টি পড়লে বারান্দায় ওঠে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে অন্দরে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে শোয় না। সৃষ্টিধর তো তাজ্জব বনে যান। কোথায় এসেছি রে, বাবা! এখন এদের কাছে মুখ দেখাই কী করে? ওঁর ছিল

টেনিস খেলার অভ্যাস। স্ত্রীকেও শিখিয়ে ছিলেন খেলতে। অন্য কোনো পার্টনার না জুটলে দু'জনাতে খেলতেন। কাছেই ক্লাব। পায়ে হেঁটে যেতেন দু'জনে। সেটা এমন কী দৃশ্য যা দেখতে পথের দুধারে লোক জমে যাবে! ওঁদের দিকে হাঁ করে তাকাবে! মাথা নেড়ে বলবে, বঙ্গালী অওর বঙ্গালীন। রাত্রে এক বিছানায় শোয়। দু'জনের দু'জোড়া কান লাল হয়ে ওঠে। সৃষ্টিধরের ইচ্ছে করে সব ক'টাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করতে। কিন্তু তা যদি করতে যান তবে চারদিকে টিটি পড়ে যাবে যে ওঁরা স্বামী স্ত্রীতে রাত্রে এক বিছানায় শোন। নালিশ করা মানেও তো নিজের গালে নিজে চুনকালি মাখা। নীলিমা পায়ে হেঁটে যেতে নারাজ। মোটর তো নেই, টাঙ্গা ভাড়া করতে হয়। টাঙ্গায় চড়ে এমন ভাব দেখান যেন শুনতেই পাননি।' বলে আমি প্রাণপণে হাসি চাপি।

'সত্যি বলছ না গুল দিচ্ছ?' বন্ধু অবিশ্বাসের হাসি হাসেন।

'শোন সবটা। একদিন কানওয়ার সাহেব হুইস্কি খেতে খেতে প্রসঙ্গটা পাড়েন। বলেন, এখানকার লোকগুলো বাঙালীদের নামে যা তা কী সব রটাচ্ছে। হিংসুটে আর কাকে বলে? বাঙালীদের একটা সিভিলাইজিং মিশন আছে। ওরা কি চাকরি করতে আসে? ওরা আসে সভ্যতা বিস্তার করতে। ওদের মেয়েরা যে-রকম স্টাইলে শাড়ি পরে আর-সব মেয়ে সেই রকম স্টাইলে শাড়ি পরতে শেখে। সারা দেশকে ওরা সন্দেশ আর রসগোল্লা খেতে শেখাচ্ছে। বোমা ছুঁড়ে বিপ্লবও তো ওদেরই অবদান। এককথায় বাঙালী হলো ভারতবর্ষের ফ্রেঞ্চম্যান। আমি কি ভুলতে পারি যে আমার দাদামশাই ছিলেন বাঙালী? ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সিভিলাইজিং মিশন নিয়ে! সেই বাঙালীর নামে এ কী ভিত্তিহীন রটনা! ছি ছি! কী লজ্জার কথা! তখন সৃষ্টিধর বলে, 'কথাটা তো মিথ্যে নয়, সার। তা বলে লজ্জার কথা কেন হবে?' কানওয়ার সাহেব লাল হয়ে বলেন, 'হবে না? শোওয়া মানে কি শুধু শোওয়া? না, না, একজন মহিলার সামনে আমি ওকথা উচ্চারণ করতে পারব না। আই বেগ ইওর পার্ডন, মিসেস গুপ্ত।' এই বলে তিনি হো হো করে হেসে ওঠেন। আর নীলিমার মুখখানি কালিমায় ছেয়ে যায়। বেচারী উঠে দৌড় দেন। সৃষ্টিধর বেকায়দায় পড়ে হাত পা কামড়ায়। কী ইতর এরা! ভেবেছে রোজ রাত্রে!' বলতে বলতে আমিও হেসে উঠি।

'হা হা হা হা! এসব তো আমার জানা ছিল না। হিন্দুস্থানীর সঙ্গে বাঙালীদের এইখানে এক মৌলিক পার্থক্য।' বন্ধু পরিহাস করেন।

'তারপর কানওয়ার সাহেব আশ্বাস দেন জনরব আপনি ক্রমে থেমে যাবে। মাই ডিয়ার গুপ্ত, ডোন্ট টেক এনি নোটিস। মাস কয়েক বাদে তাই হলো। কিন্তু সৃষ্টিধরের গায়ের ঝাল কি মেটে! তিনি চান মুখের মতো জবাব দিতে। একদিন তাঁর হাতে পড়ে এক হিন্দী মাসিকপত্র। সেই সংখ্যায় ছিল একটি কাহিনী। তাতে স্ত্রী বলছেন স্বামীকে, 'আপনি'। আর স্বামী বলছেন স্ত্রীকে, 'তুই'। সৃষ্টিধর তো স্তম্ভিত! স্বামী আর স্ত্রী কি মাস্টার আর স্লেভ। এটা কি স্লেভ সোসাইটি! বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে স্লেভারি। পরের দিন কনফিডেনশিয়াল ক্লার্কের কাছে অনাবৃত করেন তাঁর অন্তর। কেরানীটি নরম মানুষ কিন্তু সেও গরম হয়ে ওঠে। বলে, হুজুর এমন এক জায়গায় ঘা দিয়েছেন যেখানে হিন্দু মুসলমান একদিল। হুজুরের ভালোর জন্যেই বান্দার আরজ, হুজুরকে হুঁশিয়ার হতে হবে। সৃষ্টিধর কিন্তু হুঁশিয়ার হন না। মুখের মতো জবাব খুঁজে পেয়েছেন। বলেন, কী বিচিত্র ব্যাপার! স্বামী বলে, স্ত্রীকে 'তুই'। আর স্ত্রী বলে স্বামীকে, 'আপনি!' জবাবটা মুখে মুখে প্লাবিত হতে হতে স্বয়ং রাজা সাহেবের কর্ণগোচর হয়। এরা নাকি গোলামের জাত। দরবার থেকে দেওয়ান সাহেবের উপর হুকুম দেওয়া হয় তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে।' আমি এইপর্যন্ত এসে একটু দম নিই।

'বল, বল, ঝুলিয়ে রেখো না।' বন্ধু অধীর হন।

'দেওয়ান সাহেব ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে সেলাম পাঠান। খাশ কামরায় বসে সরকারী

প্রসঙ্গের মাঝখানে হঠাৎ বেসরকারী প্রসঙ্গটা তোলেন। ভালো কথা, গুপ্ত, তোমার নামে আবার এ কী কুৎসা রটনা শুনছি। তুমি কি বলেছ যে আমরা গোলামের জাত? সৃষ্টিধর বিস্মিত হয়ে বলেন, সে কী! গোলামের জাত কবে বললুম? আমি শুধু বলেছি, এটা কি গোলামের সমাজ! কানওয়ার সাহেব রেগে গিয়ে টেবিল চাপড়ে বলেন, ডিসগ্রেসফুল! তারপর হুকুম করেন, উইথড্র ইট, সৃষ্টিধর। মুখের মতো জবাবটা মুখে ফিরিয়ে নিয়ে গিলতে হলো। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বাংলোয় ফিরে এসে স্ত্রীকে বলেন, এখানকার পাট গুটিয়ে নাও। আমি ইস্তফা দিতে চাই। তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেন। সেদিন সন্ধ্যায় কানওয়ার সাহেব এসে দেখেন দু'জনের মুখ অন্ধকার। তিনি আঁচতে পেরে বলেন, গুপ্ত, ওটা আমার লোকদেখানো রাগ। তুমি যে এদের মুখের মতো জবাব দিতে চেয়েছিলে সেটা কি আমি বুঝিনি? বাঙালীর রক্ত আমার দেহেও কি নেই? তোমার কিন্তু স্থান নির্বাচনে ভুল হয়েছিল। তুমি যদি তোমার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে পালটা দিতে তা হলে কেউ কিছু করতে পারত না। দিয়েছিলে ওদের জায়গায় বসে। ওরা কি তোমাকে অমনি ছেড়ে দিত? চাকরি থেকে কিক আউট করত। সৃষ্টিধর বলে 'আমি ইস্তফা দিতে চাই, স্যার। নিজেকে ডিসগ্রেস করতে চাইনে।' কানওয়ার সাহেব ওর গেলাস ভরে দিতে দিতে বলেন, 'এস, হুইস্কির পাত্রে ডুবিয়ে দাও তোমার মনের ব্যথা। এহেন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেউ ইস্তফা দেয়? দরবারকে আমি যে রিপোর্ট দিয়েছি তাতে লিখেছি অভিযোগটা ভিত্তিহীন।' আমি এবার একটু দম নিই।

বন্ধু বলেন, 'তা হলে ওইখানেই ইতি?'

'সামান্য বাকী। জন্মদিনে রাজা সাহেব যে পার্টি দেন তাতে সৃষ্টিধরকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করা হয়। খানা পিনার পর একসময় রাজা সাহেব ওঁকে আর রাণী সাহেব ওঁর স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে বলেন, বাঙালীদের আমরা খুবই অ্যাডমায়ার করি। আশা করি আমাদের মধ্যেও অ্যাডমায়ার করার মতো কিছু আছে। বিপদে আপদে যখনি দরকার হবে তখনি যেন আমাদের জানানো হয়। বিপদ আপদের জন্যে অপেক্ষা না করে সৃষ্টিধর ইতিমধ্যেই অন্য একটা চাকরির জন্যে চিঠি লিখেছিল। ওখানে কানওয়ার সাহেব ভিন্ন তাঁর আর-কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই আর তিনিও বেশিদিন থাকবেন না। প্রদেশের গভর্নমেন্ট সার্ভিসে ফিরে যাবেন। অবশেষে বলভদ্রপুরে যবনিকা পতন। গুপ্ত সাহেবের বিদায়সভায় যথেষ্ট লোক হয়েছিল। মাতব্বররা একবাক্যে তাঁর গুণগান করেন। সেইসঙ্গে বাঙালীদের প্রশংসা। আশ্বাস দেন যে আজ বাঙালীরা যেটা করছে কাল আর সকলে সেটা করবে। সৃষ্টিধর একখানি স্বাক্ষরিত থালা উপহার পান। সোনার জলে ধোওয়া রুপোর।

ঢাকায় চাকরি নিয়ে পরে আমার কাছে অনুতাপ করেন যে অমন সুখের চাকরি ছেড়ে আসার সত্যি কোনো দরকার ছিল না। হ্যাঁ, ঢাকাতেই আমাদের আলাপ।' আমি নতুন করে সূত্রপাত করি।

'না, সত্যি কোনো দরকার ছিল না।' বন্ধু রায় দেন।

'ঢাকায় তাঁকে দেখি বেশ মনমরা ও বিরক্ত। অত বড়ো শহরে কেউ তাঁকে পাত্তা দেয় না। ঢাকা ক্লাবে কোনো কালা আদমীকেই বা ঢুকতে দেয়, বাবুর্চি খানসামা বাদে? তুমি কমিশনার হতে পারো, কালেক্টার হতে পারো, জজ হতে পারো, নবাব বা রাজা হতে পারো, কিন্তু ক্লাবের মেম্বর হতে চাইলে সায়েবরা ব্ল্যাকবল করবে। কোথায় লাগে দক্ষিণ আফ্রিকা! বিলেতফেরতাদের আঁতে ঘা লাগে। বেচারার টেনিসটা মাটি। কোথাও খেলতে পারে না, যদি না প্রাইভেট বন্দোবস্ত হয়। ছিল তেমন এক বন্দোবস্ত। আমিও খেলতুম। আমরা ছিলুম একই নৌকায়। সেইসূত্রে আলাপ ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি। আমি ওঁকে আশ্বাস দিয়ে বলি, দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন আমরাই হব ক্লাবের কর্তা। ওরা মেম্বর হতে চাইলে আমরাই করব ব্ল্যাকবল। সৃষ্টিধর শুষ্ক কণ্ঠে বলেন,

'দেশ স্বাধীন হলে তো মদ্যপান বন্ধ হবে। ক্লাবে গেলে খালি নেম্বু পানী বা নারঙ্গী পাণী খেতে দেবে।' আমি রসিয়ে রসিয়ে বলি।

'ঢাকায় কেউ বাড়ি বয়ে এসে মদ খান না? খাওয়ান না? তা হলে ওঁর সন্ধ্যাবেলাটা কাটে কী করে।' বন্ধু পরিহাস করেন।

'অতি কষ্টে। ঢাকায় তাঁকে সময়ে অসময়ে ডিউটিতে যেতে হতো। সন্ধ্যায়ও নিস্তার নেই। ফলে কাজের লোক বলে ওঁর নামডাক হয়। কিন্তু বলভদ্রপুরে যেমন হিন্দুস্থানী, ঢাকায় তেমনি ইউরোপীয়ান।' একদিন কথায় কথায় বলেন, 'কী আজব চিড়িয়া এই ইংরেজ। যেখানে এর হোম সেইখানেই এর মন। আর সাম্রাজ্যটা এর ওড়ার আকাশ. পাশাপাশি উড়তে উড়তে এদের সঙ্গে আমাদের কাজ কারবার। সম্পর্কটা পুরোপুরি বিজনেস রিলেশন। কী ইনহিউমান।' আমিও আপসোস করি।

'তা হলে পরে উনি এম.বি ই হলেন কী করে।' বন্ধু জেরা করেন।

'বোধহয় কাজের লোক হিশাবে।' আমি অনুমান করি।

'ওহে শরদিন্দু, কোবরেজী ওষুধে কি অমনি ফল হয়, যদি সঙ্গে না থাকে অনুপান? তেমনি, কর্মদক্ষতায় কি অমনি ফল হয়, যদি সঙ্গে না থাকে সুরাপান? পান করতেও হয়, করাতেও হয়। সেকালে তো এইটেই ছিল ফলপ্রদ পদ্ধতি। একালে কি পালাবদল হয়েছে?' তিনি অর্থপূর্ণভাবে তাকান।

'কী জানি, ভাই অনিমেষ, আমি তো দীর্ঘকাল আউট অফ টাচ।' আমি হাসি।

'হুঁ, হুঁ। তুমি জানো সবই, কিন্তু বলবে না। একালের ওষুধের মাত্রা কমেছে। অনুপানের মাত্রা বেড়েছে। ইংরেজ নেই, এখন সব জায়গায় স্কচ।' তিনি পান করেন।

একটু পরে আমি আবার খেই ধরি। 'ঢাকায় একদিন আমি হঠাৎ বাসাছাড়া হই। কোথাও বাসান্তর খুঁজে পাইনে। সেই দুর্দিনে হাত বাড়িয়ে দেন গুপ্ত। তাঁর বাসার একখানা ঘর খালি করে দেন। তারপর যোগাড় করে দেন একটা বাসা। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে শেষ মুহূর্তে তুচ্ছ একটা কথা নিয়ে গৃহিণীতে গৃহিণীতে হয় আড়ি। কর্তারা যে যার গৃহিণীর পক্ষ নেন। ঘটে যায় চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। আমি বদলী হয়ে যাই। গুপ্ত উন্নতি করতে করতে বিভিন্ন স্থান ঘুরতে ঘুরতে একদিন হন এম বি ই। আর ওঁর নামটি ইংরেজ আমলের শেষবারের খেতাবের তালিকায় লক্ষ করে পুলকিত হই আমি।'

'তার পর পদ্মশ্রীর কী ইতিহাস। না পদ্মিনী উপাখ্যান?' বন্ধু আবার পান করেন।

আমি বিশেষ কিছু জানলে তো বলব! যেটুকু শুনেছিলুম সেইটুকুই বলি। 'ইংরেজরা চলে গেলে তাদের ফার্মগুলো একে একে ভোল ফেরায়। দেশী পার্টনার নেই। কোনো কোনোটার নামটা বিদেশী, প্রাণটা স্বদেশী। তেমনি এক ফার্মের পার্টনার হন গুপ্ত। তখন নামান্তর হয় গুপ্ত অ্যাণ্ড জ্যাকসন। দিল্লী থেকে লাইসেন্স পারমিট সংগ্রহ করতে ও সেই বাবদ মুক্তহস্তে দান খয়রাত করতে পরে আবার একজন হিন্দুস্থানী পার্টনার প্রয়োজন হয়। ফের ভোল পাল্টিয়ে নয়া নামকরণ হয় গুপ্ত জ্যাকসন অ্যাণ্ড শর্মা।'

'মজাটা কোন্‌খানে, বল তো?' আমি বলতে বলতে হাসি চাপি।

'মজা এর মধ্যে কোথায়? এ তো নিছক ব্যবসাদারি।' বন্ধু একটি বুদ্ধু।

'কী আশ্চর্য জীব এই বাঙালী! কী বিচিত্র প্রাণী এই হিন্দুস্থানী! আর কী আজব চিড়িয়া এই ইংরেজ! সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং বাং ইং। এই মন্ত্রের যিনি স্রষ্টা তিনি পদ্মশ্রী হবেন না তো হবেন কী? এম বি ই তো এযুগে বাতিল।' আমি থামি।

আমার পরম উপকারী বান্ধবের জন্যে আমার চোখে জল। মুখে হাসি মসকরা, মনে মনে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা।

অনিকেত

আত্মীয় নন, কেউ নন, কোথায় বাড়ি তাও অজানা, ফী বছর একবার করে আসতেন আর রাজবাড়িতে হরিকথা শুনিয়ে যেতেন। বলবার ভঙ্গীটি ছিল অতি মনোরম। আর মানুষটিও তেমনি হৃদয়বান। বাবার সঙ্গে ছিল আত্মার সম্পর্ক। সেই জন্যে আমরা তাঁকে ডাকতুম জ্যাঠামশায়। সেটা তাঁরই ইচ্ছায়।

'না, না, মেসোমশাই না। মাসিমা কোথায় যে মেসোমশাই হব? তার চেয়ে বল জ্যাঠামশাই। সুশান্ত, তুমি তো রবিবাবুর ভক্ত শুনেছি। 'চতুরঙ্গ' পড়েছ নিশ্চয়ই। আমিই সেই জ্যাঠামশাই। সেই নাস্তিক জগমোহন।' প্রথম পরিচয়ে তিনি এই বলে সম্পর্কটার পত্তন করেন।

'কিন্তু, জ্যাঠামশাই, আপনি যে নাস্তিক নন, পরম বৈষ্ণব।' আমি বিস্মিত হয়ে প্রতিবাদ করি। 'আপনার কপালে ও নাকে তিলক। মুখে হরিনাম।'

'তার মানে আমি এখন নেতি নেতি থেকে ইতি ইতিতে পৌঁছেছি। মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে আর মানুষের ভালোবাসা পেতে পেতে আমার প্রত্যয় হয়েছে যে, সব ভালোবাসাই একজনের ভালোবাসা আর সেই একজনকে যার যাতে রুচি সেই নামে ডাকলেই হলো। ঈশ্বর বা ভগবান বা গড বা আল্লা বা মনের মানুষ। প্রেমকে যদি স্বীকার করি তো প্রেমময়কেও স্বীকার করতে হয়। কী বল, বিরাজ?' এই বলে তিনি আমার বাবার দিকে তাকান।

'তা তুমি যে নাস্তিক ছিলে এটা তো আমি জানতুম না।' বাবা বলেন। 'আর তোমার নাম তো জগমোহন নয়, মুকুন্দ।'

'জগমোহন বলার একটা অর্থ আছে। জানো তো তিনি একটি বিপন্ন বালিকাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। পারলেন না যদিও বাঁচাতে। অসাধারণ সৎসাহস ছিল তাঁর। লোকে নিন্দা করত দুর্নাম রটাত, তবুও তিনি অদম্য। আমিও সেইরকম একটা কিছু করতে চেষ্টা করেছি। পারি আর না পারি। পেরেছি বললে বাড়িয়ে বলা হবে, পারিনি বললে কমিয়ে বলা হবে। কিন্তু আজ নয়, পরে একদিন। শুধু মনে রেখো যে বৈষ্ণব আমি একদিনে হইনি। গোড়ায় ছিলুম সমাজকর্মী। সমাজ সংস্কারকও বলতে পারো।' এই বলে তিনি একটা আভাস দিয়ে রাখেন।

নানা কারণে তাঁর সঙ্গে পরে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। যে সময় তিনি আসতেন সে সময় আমি ভিন্ন স্থানে। প্রথমটা কলেজে তারপরে বিলেতে। আরো পরে আমার কর্মস্থলে। তবে বাবার বা ভাইদের চিঠিতে তাঁর খবর পেতুম। ভারতময় তিনি ঘুরে বেড়াতেন। এক এক মাসে এক এক প্রদেশ। কোথাও বাঁধা আস্তানা ছিল না। বলতেন, 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।'

আবার যে তাঁর সঙ্গে দেখা এটা আমার গণনার মধ্যে ছিল না। ছুটি পেলে বাবার সঙ্গে দু'চারদিন কাটিয়ে আসি, কিন্তু কর্মস্থল থেকে দূর তো বড়ো কম নয়। আর ছুটিই বা আমাকে দিচ্ছে

কে? সরকারী প্রশাসনের দায়িত্ব আমার উপরে। বাড়ি গেলে শুনি তিনি এসেছিলেন, আমার খোঁজ করেছিলেন। জানতেন আমি প্রেমে পড়ে ভিন দেশের মেয়ে বিয়ে করেছি। ভিন্ন ধর্মেরও বটে। সমর্থন করতেন। বলতেন, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। সবই তো রাধাপ্রেম বা কৃষ্ণপ্রেম।'

হঠাৎ একদিন বজ্রপাত হয়। বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম পাই বাবা চলে গেছেন। ষাট বছর একটা বয়সই নয়। শরীরও বেশ শক্ত ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব হয়ে অবধি আমিষ ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ মিষ্টান্নের আসক্তি কাটাতে পারেননি। ফলে ডায়াবিটিস। রথযাত্রার সময় পুরী গিয়ে রামদাস বাবাজীর সঙ্গে সমস্ত পথ কীর্তন করে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরতে না ফিরতেই রাজমাতার আমন্ত্রণ ও রাজবাড়িতে গিয়ে কীর্তন ও প্রসাদ সেবা। পরিণামে সেই রাত্রেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি। ডাক্তারের মতে ডায়াবিটিক কোমা।

মনটা আমার বিষাদে ম্রিয়মাণ। শেষ বয়সে তাঁর কোনো কাজেই লাগলুম না। শেষ দেখাটাও হলো না। ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলুম শ্রাদ্ধ করতে। সস্ত্রীক ও সপুত্রক। বাবার তো ভেদবুদ্ধি ছিল না। আমরা সবাই তাঁর কাছে সমান প্রিয়। আর থাকবেই বা কী করে? শুধু ধর্মে নয়, তিনি ছিলেন কর্মেও বৈষ্ণব। শুধু নামে রুচি নয়, জীবে দয়া বা ভালোবাসাও ছিল তাঁর সাধনার অঙ্গ। বাড়িতে ছিল খ্রীস্টান, মুসলমানের আনাগোনা।

বাবা নেই। শূন্য মন্দির। তারই মধ্যে শ্রাদ্ধের আয়োজন চলেছে। এমন সময় আমার দুই ভাই এসে পাশে বসে ও আমাকে শোকের উপরে শক দেয়। স্থানীয় ব্রাহ্মণরা সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছেন, কিন্তু একজনও নাকি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। তাঁরা কেউ এ শ্রাদ্ধে যোগ দেবেন না। বাবার অপরাধ তিনি জেষ্ঠপুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করেননি। পুত্রবধূকে অস্বীকার করেননি। তাদের ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন। বউমার হাতে খেয়েছেন। প্রায়শ্চিত্ত করেননি। যে গৃহে এমন অপরাধ সে গৃহে ব্রাহ্মণভোজন!

আমি তো শুনে থ! এঁদের মধ্যে ছিলেন বাবার আজীবন বন্ধু অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। ওখানে এমন লোক ছিল না যে তাঁর কাছে কিছু না কিছু উপকার পায়নি। চাকরির উমেদারি, মামলার পরামর্শ, রাজার অনুগ্রহ এমনি কত রকম উপলক্ষে ওরা আসত আর বারান্দায় পড়ে থাকত। ভয় আর ভক্তি দুটোই করত। এখন ভয়ও গেছে, ভক্তিও গেছে।

কী করা যায়! দুনিয়ার নিয়মই এই। ব্রাহ্মণভোজনের আশা ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আর এক ক্যাঁকড়া বেরোয়। কুলপুরোহিত স্থানীয় ব্রাহ্মণ নন। তিনি অপেক্ষাকৃত উদার। তিনিও জেষ্ঠপুত্রকে এককভাবে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করতে দেবেন না। তিন ভাই এক আসনে বসে একসঙ্গে মন্ত্রপাঠ ও পিণ্ডদান করবে। আমি বুঝতে পারি যে তিনি সমালোচনা এড়াতে চান। তাঁরও তো সমাজ আছে।

মনটা আরো খারাপ হয়ে যায়। নিঃশব্দে পরিপাক করি সব অবমাননা। ভাইদেরও মনে দুঃখ। মেজভাই প্রশান্ত বলে, 'শোন দাদা, ব্রাহ্মণরা আসবে না তো কী হয়েছে? মুসলমানরা তো আসবে।'

'মুসলমানরা?' আমি চমকে উঠি।

'হ্যাঁ, আমরা মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করেছি। বাবা চলে গেছেন শুনে ওরাই সকলের আগে আসে, শোক প্রকাশ করে। বলে এমন সুবিচার আর কারো কাছে পায়নি ও পাবে না। ওরা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাই আমাদেরও কর্তব্য ওদের ডাকা।' সে অকুতোভয়।

ব্রাহ্মণভোজনের পরিবর্তে হবে মুসলিমভোজন। শুধু তাই নয় ভিতরের বারান্দায় বসে পঙ্‌ক্তিভোজন। আইডিয়াটা আমার নয় কিন্তু। আমি শুধু সায় দিয়েই ক্ষান্ত।

এই যখন পরিস্থিতি তখন আশমান থেকে জ্যাঠামশাইয়ের আবির্ভাব। সমস্ত ব্যাপার শুনে তিনি মর্মাহত হন। বলেন, 'আত্মার তৃপ্তির জন্যেই শ্রাদ্ধ। এতে তাঁর তৃপ্তি হবে। আর আমি তো রয়েছি। আমার ভোজনও তো ব্রাহ্মণভোজন।'

'কিন্তু, জ্যাঠামশাই, মুসলমানদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসা কি আপনার পক্ষে সমাজসম্মত হবে? অন্যান্য ব্রাহ্মণরা কী মনে করবেন?' আমি প্রশ্ন করি।

'তার জন্যে আমার মাথাব্যথা থাকলে কি আমি জগমোহন হতুম? কী না গেছে আমার মাথার উপর দিয়ে? তা তোমার মুসলমান অতিথিরাও কি এ বাড়ির বিধি মেনে নিরামিষ আহার করবেন?' জ্যাঠামশাই পালটা প্রশ্ন করেন।

'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। বাবা থাকতে এ বাড়িতে মাছমাংস চলত না। তাঁর শ্রাদ্ধের সময় চলবে, তা কি হয়!' আমি আশ্বাস দিই।

তিনি বলেন, 'মুসলমানরা দিনে পাঁচবার উপাসনা করে। ওদের মতো ভক্ত আর কে? যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ভগবানের যারা প্রিয় আমারও তারা প্রিয়। তা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে।'

আমি কৌতূহল প্রকাশ করি। 'শুনতে পাই?'

'আমার পদবীটা গৌড়ের সুলতানদের দেওয়া। আমার পূর্বপুরুষ সে আমলে রূপ সনাতনের মতো উচ্চপদস্থ ছিলেন। পদবীটা বহন করব অথচ বিদ্বেষ পুষে রাখব, তাও জনকতক দুর্জনের বিরুদ্ধে নয়, কোটি কোটি নিরীহ জনের বিরুদ্ধে। ছি ছি! প্রেমই পরকে আপন করে। ঘৃণাই আপনকে পর করে দেয়। আমি ওদের সঙ্গে একসারিতে বসে প্রেমসে ভোজন করব। কিন্তু, তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'মানুষকে ভালোবাসি বলে জীবকে হিংসা করতে পারিনে।'

মুসলমানদেরও তাতে আপত্তি দেখা গেল না। বরং উৎসাহ লক্ষিত হলো। হিন্দুরা কেউ কখনো তাদের ডাকে না। এটাই প্রথম নিমন্ত্রণ। মিষ্টান্নেরও আধিক্য ছিল। জ্যাঠামশাই পরিহাস করে বলেন, 'বিরাজের মতো আমিও শহীদ হব নাকি? ময়রাদের হাতে শহীদ।'

পঙ্‌ক্তিভোজনে তাঁরই ঠাঁই ছিল সকলের আগে। আমাকে তিনি টেনে নিয়ে পাশে বসান। পরিবেশিকাদের মধ্যে ছিলেন বাড়ির বড়ো বউমা। সবাই তাতে খুশি। খেতে খেতে জ্যাঠামশাই হাঁক দেন, 'প্রেমসে বোলো বিরাজবাবুকী জয়।' অমনি সবাই জয়ধ্বনি করে ওঠে।

'দেখছ তো, কেমন প্রেমের সঙ্গে ওরা খাচ্ছে!' মুসলমানদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন। 'এ কি তোমার প্রাণহীন ব্রাহ্মণভোজন!'

জানতেন আমার মনে হুল ফুটে রয়েছে। আমি ভুলতে পারছিনে যে আমার দোষে আমার বাবার শ্রাদ্ধ শাস্ত্রমতে পণ্ড হয়েছে। আমাকে ওইভাবে সান্ত্বনা দেন। পিতৃশোকের সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু অকৃতজ্ঞতার নয়। বাবা ওঁদের জন্যে কী না করেছিলেন! অন্তত ভদ্রতার খাতিরে ওঁরা একবার দেখা দিয়ে যেতে পারতেন।

'সুশান্ত, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ।' ভোজনের পর তিনি আমাকে বলেন, 'তোমাকে যারা ক্ষমা করেনি তুমি তাদের ক্ষমা করবে। সমাজ চিরদিন এমন অনড়, এমন নির্বোধ থাকবে না। তোমরাই হবে এর নেতা। তোমাদের দৃষ্টান্ত আরো দশজন অনুসরণ করবে। তুমি সমাজত্যাগ করনি। সমাজও তোমাকে ত্যাগ করেনি। তোমাকে যারা ত্যাগ করেছে তারা নিজেরাই ত্যক্ত হয়েছে।'

জ্যাঠামশাই কখন কোথায় থাকেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। পরে তাঁর সঙ্গে আবার কবে কোথায় দেখা হবে কে জানে। আমি আমার মহকুমার প্রশাসনে ফিরে যাই ও কাজকর্মের জালে জড়িয়ে পড়ি। নদীগুলোতে তখন জলোচ্ছ্বাস। দেখতে দেখতে প্লাবন। লোকের যেমন কন্যাদায় আমার তেমনি বন্যাদায়।

তারই মাঝখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্যত্র যান। তাঁর শূন্য স্থান আমাকেই পূরণ করতে হয়।

কেবল মহকুমার বন্যাদায় নয়, জেলারও বন্যাদায়। আমার তো স্থির হয়ে বসারও উপায় নেই। লোকে সাক্ষাৎ করতে আসে। আমি অনুপস্থিত।

একদিন কুঠির আপিস কামরায় বসে কাজ করছি, চাপরাশি এসে বলে, 'হুজুরের সঙ্গে মোলাকাত করতে একজন বাবাজী বার বার এসেছেন, বার বার ঘুরে গেছেন। হুজুরের কি আজ মর্জি হবে।'

বাবাজীদের জন্যে আমার সময় কোথায়! তবে বার বার ঘুরে গেছেন শুনে এক মিনিট সময় দিতে রাজী হই।

'আরে, এ কী। আপনি! জ্যাঠামশাই!' আমি যেমন অবাক তেমনি অপ্রতিভ। 'আপনিই বার বার ফিরে গেছেন!' আমি তাঁকে প্রণাম করি।

'থাক, থাক। ও কী! আমি তো জ্যাঠামশাই রূপে আসিনি। এলে ফিরে যেতুম কেন? বউমা তো রয়েছেন।' তিনি গম্ভীরভাবে বলেন, 'এসেছি উপযাচক রূপে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সকাশে। তবে এক মিনিট শুনে ভয় পাচ্ছি।'

'চলুন, আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাই। আপনার বউমার সঙ্গে গল্প করবেন। ততক্ষণ আমি আমার হাতের কাজটা সেরে নিই।' এই বলে তাঁকে আটক করি।

এর পরে অবসরমতো তাঁর আর্জিটাতে কান দিই। তিনি সংক্ষেপ করেননি, কিন্তু আমাকে সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে। তাঁর প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। অথচ মানুষ সম্বন্ধে আদর্শবাদী। মানুষের দুঃখ দেখলে সাধ্যমতো দূর করতেন। একদিন তিনি খবর পান যে একটি বিধবা মেয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। কারণ সমাজ তার আবার বিয়ে দেবে না। বিবাহটা জরুরী, কেননা সে অন্তঃসত্ত্বা। তিনি প্রথমে চেষ্টা করেন তার বিয়ে দিতে। কিন্তু যে ছেলেটা তাকে কথা দিয়েছিল সে ইতিমধ্যে সুবোধ ছেলে হয়েছে। বাপ মার অমতে কী করে বিয়ে করবে!

একজনের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে অপর একজনকে বিবাহ করতে কন্যাটির নিজেরই অমত ছিল। শচীশের মতো আদর্শবাদী পাত্রও জ্যাঠামশাইয়ের হাতে ছিল না। তিনি ভেবে দেখলেন তাঁর প্রথম কর্তব্য বিদ্যাসাগরের মতো বিধবার বিবাহদান নয়, তার ও তার সন্তানের প্রাণরক্ষা। এমন একটি স্থানে তাকে রাখতে হবে যেখানে তার সন্তান হবে ও যতদিন প্রয়োজন ততদিন তারা থাকবে। দেশে বিধবাদের জন্যে আশ্রম আছে, কিন্তু অন্তঃসত্ত্বাদের জন্যে নেই। দেশে বিবাহিতাদের জন্যে ম্যাটার্নিটি হোম আছে, কিন্তু অবিবাহিতাদের জন্যে নেই। জ্যাঠামশাই নেতৃস্থানীয়দের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দেন। তাঁরা বড়ো জোর অর্থ সাহায্য করবেন। দায়িত্ব নিতে নারাজ।

তখন তাঁকেই উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হলো মাতৃসদন। যে কোনো নারী সেখানে গিয়ে সন্তানের মুখ দেখতে পারবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না সে বিবাহিতা, না অবিবাহিতা, সধবা না বিধবা। সুরবালাই হলো তার প্রথম আশ্রমিকা। সে সুশিক্ষিতা, সদ্‌বংশীয়া ব্রাহ্মণকন্যা। বিড়ম্বিতা না হলে সচ্চরিত্রাও বলতে পারা যেত। জ্যাঠামশাই তো মনে করেন সে চরিত্রবতী। প্রেম থেকেই তার এ বিপদ। প্রেম কি অন্যায়? আর সন্তানও তো নারীমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা। চমৎকার একটি শিশু যদি জন্মায় তবে সে হয়তো হবে আর একজন কর্ণ। মহাভারতের বীর।

কিন্তু তাকে ভাসিয়ে দেওয়া চলবে না। জ্যাঠামশাই তাকে যেমন করে হোক পালন করবেন। সে যে ভগবানের দান। ভগবান? তিনি কি ভগবান মানতে প্রস্তুত? একটু একটু করে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসীতে পরিণত হন। এর মূলে সেই অভাগিনী সুরবালা। মাতৃসদনে সেই প্রথম আশ্রমিকা ও তার কন্যাসন্তানই প্রথম আশ্রমশিশু। তাদের জন্যে তিনি অন্য ব্যবস্থা করতে চান, কিন্তু পারেন

না। সুরবালা ওর মেয়েকে ছাড়বে না। ছাড়লে বাঁচবে না। মেয়েও কি বাঁচবে? জ্যাঠামশাই ওর ট্রেনিংএর বন্দোবস্ত করেন। ওই হয় মেট্রন। এতদিনে ওই হয়েছে মালিক। ওর হাতে শত শত কুমারী ও বিধবা মা হয়েছে। বাইরে থেকেও কল পায়।

এই কিছুদিন আগে ওর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বেশ ভালো বিয়ে। সমাজ যে খুব একটা উদার হয়েছে তা নয়। ছেলেরা মার্সিনারি হয়েছে। তাদের বাপেরাও টাকার অঙ্ক দেখে বিচার করে। কুলমর্যাদা দেখে নয়। তা হলে সমস্যাটা এখন কোথায়? কেনই বা জ্যাঠামশাই এখন সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে হাকিমের সকাশে উপস্থিত? সমাজঘটিত ব্যাপারে হাকিমই বা হস্তক্ষেপ করবেন কেন?

'শোন, সুশান্ত' জ্যাঠামশাই চিন্তাকুলভাবে বলেন, 'একটা সমস্যার সমাধান আমরা পেয়েছি, কিন্তু আরেকটার পাইনি। অন্তঃসত্ত্বা হলে অভাগিনীরা কোথায় গিয়ে মা হবে তার একটা সদুত্তর পাওয়া গেছে। আগেকার দিনে বাধ্য হয়ে ভ্রূণহত্যা করত কিংবা তীর্থ করতে গিয়ে পথে ঘাটে সন্তান বিসর্জন দিত। তুমি যদি আমাদের মাতৃসদনে যাও তো দেখবে বাপ মা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, একমাসের জন্যে দিয়ে যাচ্ছেন, পরে এসে নিয়ে যাবেন। কিন্তু --'

'কিন্তু?' আমি জানতে উৎসুক হই।

'কিন্তু শিশুকে নিয়ে যাবেন না। শিশুটি যেন তাঁদের কেউ নয়। বেচারী মা। সে কি তার সন্তানকে ফেলে যেতে চায়? কিন্তু যেতে বাধ্য। না গেলে মা-বাপের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ। যেমন সুরবালার বেলা হয়েছে। সে যদি কুমারী হয়ে থাকে মা-বাপ তার সুপাত্রে বিয়ে দেবেন। কেউ টেরও পাবে না সে একটি কুন্তি। আর যদি বিধবা হয়ে থাকে তা হলেও তার একটা চাকরি জুটে যেতে পারে। কেউ খোঁজও নেবে না সে একটি মন্দোদরী। শিশুকে ছাড়ব না এমন দুর্জয় পণ আমরা উনিশ বিশ বছরে দুটি তিনটির বেশি দেখিনি। সদনেই তারা রয়ে গেছে। সাধারণত এই দেখি যে মায়েরা চলে যায় কাঁদতে কাঁদতে। আর ফিরে আসে না। শিশুরা থেকে যায় আমাদের ভাবিয়ে তুলতে। আমাদের কোথায় এত সম্বল যে সব ক'টিকেই আশ্রয় দিয়ে মানুষ করি!' জ্যাঠামশাই আমাকেও ভাবিয়ে তোলেন।

'তা হলে উপায়?' আমি হদিস পাইনে।

'দ্যাখ, সুশান্ত, তোমার খুব খারাপ লাগবে শুনতে। আমরা প্রত্যেকটি হিন্দু অনাথাশ্রমের দ্বারস্থ হয়েছি। জায়গা থাকলেও কেউ জায়গা দেবে না। জানতে চাইবে বাপের নাম কী? কোন্ জাত? মুসলমানের বাচ্চা নয় তো? বল, এখন কী উত্তর দিই? আমাদের নিয়ম হলো বাপের নাম জিজ্ঞাসা না করা। করলে হয়তো একটা মিথ্যা উত্তর দিয়ে একজন নির্দোষ পুরুষকে জড়াবে। সেকালে অবশ্য নির্ভয়ে বলতে পারা যেত পিতার নাম ইন্দ্র বা পবন বা ধর্ম। লোকে বিশ্বাস করত। সে যুগ কি আর আছে? শুনছি স্বরাজের পর রামরাজত্ব ফিরে আসবে। তা হলে তো বাঁচা যায়। বার্থ রেজিস্টারে লেখাব বাপের নাম বিশ্বামিত্র মায়ের নাম মেনকা। এখন তার জো নেই। মায়ের নাম খালি রাখা চলে না, মেয়েরা ভর্তি হবার সময় যে নাম লেখায় সেই নাম লেখা হয়। বাপের নাম অজ্ঞাত।' জ্যাঠামশাই বলেন।

'কিন্তু জ্যাঠামশাই,' আমি আশ্চর্য হই, 'সমস্যাটা তো আজকের নয়, আদ্যিকালের। সমাজ কি এ নিয়ে আগে কখনো ভাবেনি? কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি?'

'তা যদি বল, বৈষ্ণবরা এর একটা কিনারা করেছেন। তোমার হাতের কাছেই তো এর উদাহরণ রয়েছে।' জ্যাঠামশাই বলেন, 'বামুনের ঘরের একটি বিধবা পালিয়ে গিয়ে এক চাষীর ঘর করে। তাদের একটি মেয়ে হয়। চাষী মারা যায়। শরিকরা ওদের তাড়িয়ে দেয়। আশ্রয় দেন তোমার বাবা। এক বৈষ্ণবের কন্যাকে মালা বদল করে বিয়ে করেছিল এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাদের একটি

ছেলে হয়। ব্রাহ্মণ কোথায় চলে যায়। বৈষ্ণবী তার ছেলেটিকে নিয়ে নিরাশ্রয় হয়। তখন তাদেরও আশ্রয় দেন তোমার বাবা। ব্রাহ্মণীর কন্যা আর বৈষ্ণবীর পুত্র এদের যখন বিয়ের বয়স হয় তখন কথা ওঠে, এদের বিয়ে হবে কোন্ সমাজে ও কোন্ মতে? তখন তোমার বাবা ওদের দু'জনকে বৈষ্ণব দীক্ষা দিয়ে বৈষ্ণব করে নেন ও বৈষ্ণব মতে বিয়ে দেন। জীবিকারও একটা ব্যবস্থা করে দেন তিনি। বোষ্টম সমাজ মেনে নেয়।'

'এই তো কেমন চমৎকার সমাধান।' আমি গদ্‌গদ স্বরে বলি। 'এ দৃষ্টান্ত আপনারাও কি অনুসরণ করতে পারতেন না, জ্যাঠামশায়?'

'কিন্তু আমাদের মাতৃসদন তো সেভাবে কাজ করতে পারে না। ফেলে চলে যাওয়া শিশুদের আশ্রয় দিয়ে বিবাহযোগ্য করতে কতকাল লাগে ভেবে দ্যাখ। ততকাল কে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবে? পরে জীবিকাই বা জুটিয়ে দেবে কে? তার জন্যে চাই বিরাট সংগঠন। মিশনারীদের মতো জনবল, ধনবল ও কর্মবৈচিত্র্য কি আর কারো আছে? সেইজন্যেই আমরা মিশনারীদের শরণ নিই ফেলে যাওয়া শিশুদের ওদের হাতে সঁপে দিই। দিয়ে নিশ্চিন্ত হই যে, কেউ বেশ্যালয়ে চালান যাবে না, কেউ ভিখিরিদের দলে বিকলাঙ্গ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে না। এখন আবার উলটে শুনতে হচ্ছে যে, আমরা হিন্দুর সন্তানকে খ্রীস্টানদের কাছে বিক্রি করছি। মা ধরণী, দ্বিধা হও! সুরবালাকে তখনি আমি সতর্ক করে দিয়েছিলুম যে, মেয়ের বিয়েতে যেন বেশি খরচ না করে। কানে তোলেনি ওকথা। মেয়েকে অসবর্ণ পাত্রে দেবে না, চড়া পণ দিয়ে ব্রাহ্মণ পাত্র কিনবে। মোটা প্রণামী দিয়ে কলকাতা থেকে ব্রাহ্মণদের আনাবে। স্থানীয়রা তো অপবাদ বটাবেই। সুরো এখন জেদ ধরেছে আমার প্রতিষ্ঠান আমাকে দিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে মাধুকরী করবে। এ বয়সে আমি আর ও দায়িত্ব বইতে পারিনে। শুনেছি তুমি নাকি একটা ম্যাটার্নিটি হোম স্থাপন করেছ। এটার ভারও তুমিই নাও।' তিনি অনুরোধ করেন।

'না, জ্যাঠামশাই,' আমি সমবেদনার সঙ্গে বলি, 'প্রশ্নটা তো ম্যাটার্নিটির নয়, প্যাটার্নিটির। আমার হাতে, মানে সরকারের হাতে, তুলে দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন, কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন সন্তানদের নিয়ে সরকার কী করতে পারেন? বাপের নাম না জানালে ইস্কুলে ভর্তি করবে না, করতে গেলে অন্যান্য অভিভাবকরা অসহযোগ করবেন। আর একপ্রস্থ ইস্কুল খুলতে হবে। পরে আবার বাপের নাম না জানালে চাকরিতে ভর্তি কববে না। ভর্তি করলে অন্যান্য চাকুরেরা অসহযোগ করবেন। আর এক প্রস্থ চাকরি সৃষ্টি করতে হবে। যার মা-বাপের ঠিক নেই তার বিয়েও হবে না। ছেলেরা না হয় চিরকুমার হবে, কিন্তু মেয়েরা কি বর চাইবে না, ঘর চাইবে না, মা হতে চাইবে না? সরকার কী করে এসব ব্যবস্থা করবেন, যদি সমাজ অসহযোগ করে?'

'তার মানে ষাট মন ঘি পুড়বে, রাধা নাচবে। আমি চোখে দেখে যেতে পারব না।' তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'তা হলে এইটুকু অন্তত তুমি করো। একবারটি নবদ্বীপ গিয়ে মাতৃসদনটা পরিদর্শন করে এস। পরিদর্শনের বইতে তোমার মন্তব্যের গুরুত্ব অশেষ। তুমি যদি দয়া করে একছত্র লেখ যে সদনের নামে অমন অপবাদ অযথা তাতেই নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হবে।'

নবদ্বীপে টুরে যাবার প্রোগ্রাম তৈরি ছিল। তাতে মাতৃসদনটাও জুড়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কি লিখব না লিখব সেটা আমার ডিসক্রেশন। বাড়িতে আমি সুশান্ত, কিন্তু বাইরে আমি এ জেলার প্রশাসক। কারো দ্বারা প্রভাবিত হইনে। জ্যাঠামশাইকে প্রতিশ্রুতি দিই যে পরিদর্শন করব, কিন্তু কী লিখব না লিখব তার অঙ্গীকার দিতে পারিনে।

তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, 'অনেক আগেই আমি আমার কীর্তির মায়া কাটিয়েছি, কিন্তু সেই যে একটা কথা আছে কমলীকে ছাড়তে চাইলেও কমলী নেহি ছোড়তি। আমারও হয়েছে সেই

দশা। সদনটা যেদিন উঠে যাবে সেইদিন আমি মুক্ত হব, কিন্তু কত শিশু পথে ঘাটে জন্মাবে ও বেঁচে থাকলে অমানুষ হবে সে কথা ভেবে নিরস্ত হই।'

'না, না, উঠে যাবে কেন? মিশনারীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেই হলো।' আমি তাঁকে ভরসা দিই।

'না, বাবা। মিশনারীরা হাত গুটিয়ে নিলে আমাকেও হাত গুটিয়ে নিতে হবে। শিশুদের ওরা দীক্ষিতই করুক আর নাই করুক ভালোবাসে, আদরযত্ন করে, গোপালের মতো অন্নভোগ দেয়, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে, জীবিকা জোটায়, বিবাহ দেয়, সমাজে মাথা তুলে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কোন্‌টা শ্রেয়? হিন্দু হয়ে অমানুষ না খ্রীস্টান হয়ে মানুষ? খ্রীস্টানও তো তাঁরই ভক্ত। যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। তাঁর প্রিয় হলে আমারও প্রিয়।' এই বলে তিনি বিদায় নেন।

ভেবেছিলুম নবদ্বীপে আবার দেখা হবে। শুনলুম 'গুরুদেব' ভাগলপুরে না কোথায় হরিকথা শোনাতে গেছেন। সারা বছরই তো নানান জায়গায় এই করে বেড়ান। যেখানে যা পান সদনের জন্যে পাঠিয়ে দেন। বহতা নদী, রমতা সাধু। অনিকেত।

সুরবালা দেবীর ম্যানেজমেন্ট সুনিপুণ। মানুষটি পরিণতবয়সী ও পরিপক্ক। তবে কেমন যেন শুকিয়ে গেছেন। ঝুনো নারকেল। উনিশ কুড়ি বছর ধরে পোড় খেলে যা হয়। বলেন, 'যাদের শিশু তারা যদি জলে ভাসিয়ে দিয়ে যায় আর আমরা যদি কর্ণের মতো পালন করতে না পারি তবে যারা পারবে তাদের হাতে তুলে দেওয়া কি অন্যায়? সবাই জানে, সবাই বোঝে, সবাই মানে মিশনারী বিনে গতি নেই। তবু যা নয় তাই রটাবে। এই যে এতকাল আমি দিবারাত্র পরিশ্রম করছি, শত শত শিশু আমার হাতে হয়েছে, প্রসূতিরাও নিরাপদে ফিরে গেছে এর দরুন আমার কি কোনো পারিশ্রমিক নেই? পুরস্কার নেই? আমার সঞ্চয়ের টাকায় আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, পরের টাকায় দিইনি। দাদা, আপনি হিশেবের খাতাগুলো দেখুন না দয়া করে।'

হ্যাঁ, মোটা টাকা দক্ষিণা দিয়ে গেছেন কলিকাতার মুখার্জি, ব্যানার্জি, ঘোষ, বোস, সেনগুপ্ত, দাসগুপ্ত প্রভৃতি মাননীয় ভদ্রলোকগণ। তার একাংশ অবশ্যই সুরবালা দেবীর পাওনা। উনিশ কুড়ি বছরে উনিশ কুড়ি হাজার টাকা এমন কিছু বেশি নয়। আমি বলি, 'হিশেবের খাতা নিখুঁত। কিন্তু, দিদি, এঁরা কেমনতর মানুষ! কন্যাদের জন্যে এন্তার টাকা খরচ, কিন্তু দৌহিত্র দৌহিত্রীদের বেলা কানাকড়িও না! আশ্রয় না পেলে তাদের কেউ বা হবে বেশ্যা, কেউ বা হবে বাঁদি, কেউ বা হবে ভিক্ষুকের পাল্লায় পড়ে অন্ধ কি খঞ্জ কি নুলো। আপন রক্তমাংসের উপর লেশমাত্র মায়ামমতা নেই! নিরীহ অসহায়ের প্রতি মানবোচিত করুণা নেই। বিদেশ থেকে মিশনারী আসবে, তারাই নেবে দায়! যত অনর্থের মূল ওই যে সব পুরুষ, যাদের নাম লিখেছেন 'অজ্ঞাত' ওরাও কি মানুষ না পাথর না পিশাচ! পৃথিবীতে যাদের এনেছে তাদের জন্যে বিন্দুমাত্র বেদনাবোধ নেই! আর মায়েরাই বা কেমন!'

এর পরে আমি বাচ্চাদের দেখতে চাই। সন্তান জন্মালেই টেলিগ্রাম যায়, অভিভাবক এসে প্রসূতিকে নিয়ে যান, মিশনারী এসে শিশুকে। সেদিন ছিল একটিমাত্র শিশু। কন্যাসন্তান। তাকে কোলে নিয়ে আদর করি। প্রকৃতি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোথাও দেগে দেয়নি যে, অবৈধ। ওটা সমাজেরই লিখন। সমাজ ইচ্ছা করলে 'অ' অক্ষরটা মুছে ফেলতে পারে। সেইটেই হবে সত্যিকার সমাধান।

পুরানো পাপী

সেবার এক আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে চিন্ময় চৌধুরীর বরাত খুলে যায়। দিল্লীর হরেক দূতাবাস থেকে সান্ধ্য নিমন্ত্রণ। কোনো কোনোদিন একাধিক। চেনা অচেনা শতখানেক নরনারীর ভিড়। এক একজনের এক হাতে একটি সুধাপাত্র। তাতে নানা রং-এর পানীয়। আর একহাতে রকমারি চাট। অতিথিরা এক একঠাঁই এক একটি মণ্ডলী রচনা করে দণ্ডায়মান।

চিন্ময় তো হংসো মধ্যে বকো যথা। তার এক হাতে এক গ্লাস আপেল জুস বা পাইনেপল জুস। আর এক হাতে কাজুবাদাম। তার মণ্ডলীটি ছোটখাট হলেও অস্পৃশ্য নয়। ফরাসী দূতাবাসের ককটেল পার্টিতে কী নিয়ে সেদিন কথা হচ্ছিল মনে পড়ে না। চিন্ময় চেয়ে দেখে কে একজন সুধাপাত্রধারী নিজের মণ্ডলী ছেড়ে তার মণ্ডলীতে ভিড়ে গেছেন ও কথা কেড়ে নিয়ে বিষয়টার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন। তাঁর মতে সাহিত্য একটা বিচ্ছিন্ন কক্ষ নয়, শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের এমন নিবিড় সম্বন্ধ যে শিল্পে যখন যে ইজম চলতি হয় সাহিত্যেও তখন সেই ইজম চলতি। অন্তত ফরাসীদের বেলা এই তো নিয়ম। তিনি চিন্ময়কে সাক্ষী মানেন।

তার পর হঠাৎ তার সঙ্গে গ্লাস ঠোকাঠুকি করে বলেন, 'চিনতে পারছেন? সেই পুরানো পাপী। পারলেন না? প্যারিসের সেই রাশিয়ান রেস্তোরাঁ? বাঙালীরা যেখানে রোজ সন্ধ্যাবেলা জমায়েৎ হতো? উত্তম গুপ্ত, প্রণব ভট্টাচার্য, পান্না চক্রবর্তী, অবনী নাগ, সব ভুলে গেছেন। তা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। কবেকার কথা! সাতাশ সালের না আটাশ সালের আমারই স্মরণ নেই।'

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চিন্ময় আঁধারে ঢিল ছোঁড়ে। 'আপনি কি শিল্পী সর্বেশ রায়?'

'সর্বেশ নয়, সর্বাণীশ। ওরা তামাশা করে বলত সর্বনাশ রায়। আপনি তো চিন্ময় চৌধুরী। আমার ঠিক মনে আছে। জানতুম একদিন কোথাও না কোথাও পুনর্দর্শন হবে। এতদিন যে হয়নি তার কারণ আমি তার পরেও আরো বারো বছর প্যারিসে থেকে আমার টেকনিকটা পারফেক্ট করি। ইচ্ছে তো ছিল আরো কয়েক বছর থাকতে ও আরো নাম করতে। দেশে যখন ফিরতুম তখন বিদেশবিখ্যাত হয়ে ফিরতুম। কিন্তু প্যারিসের পতন আসন্ন দেখে পদব্রজে প্রস্থান করি। অনেক ঘুরে ফিরে বম্বেতে অবতরণ। সেইখানেই একটা চাকরি জুটে যায়। কাজ কম, অবসর বেশি। তাই বম্বের মায়া কাটাতে পারিনে। কলকাতায় তো আপনারা ঘোর জাতীয়তাবাদী, মডার্ন আর্টকে মনে করেন বিজাতীয় আর্ট। সম্প্রতি হাওয়া একটু ঘুরেছে। তখনকার দিনে কলকাতায় গেলে আমাকে মন্বন্তরে মরতে হতো। শুধু আমাকে নয় আমার মাদামকেও। না, ফরাসিনী নন, বাঙালীর মেয়ে, বম্বেতেই আলাপ। যাক, চলে যাচ্ছে একরকম। বাট নাথিং লাইক প্যারিস।'

চিন্ময়ের একটু একটু করে সেকালের স্মৃতি ফিরে আসে। এঁকে মিস্টার রায় বললে ইনি বিরক্ত হতেন। বলতে হতো মসিয়ে রোয়া। প্রথম পরিচয়ের পূর্বে সাতটি বছর ইনি প্যারিসের বাসিন্দা। চেহারাটাও বাঙালীর পক্ষে অসাধারণ ফরসা। ইহুদী বলে ভ্রম হয়। চলাচল হাবভাব দস্তুরমতো ফরাসী।

'পুলকিত হলুম, মসিয়ে রোয়া। এদেশেও নাথিং লাইক বম্বে। আপনি ঠিক জায়গাতেই আছেন। আমি যদি শিল্পী হতুম তা হলে আমারও কর্মস্থল হতো বম্বে।' চিন্ময় তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। জানে যে প্যারিস থেকে বিদায়ের সান্ত্বনা নেই।

'তা হলে শোন, ভাই চৌধুরী। চুপি চুপি বলি তোমাকে। দিল্লীতে চলে আসার তালে আছি। নিখরচায় বিলিতী ড্রিঙ্কস যদি চাও তবে নাথিং লাইক ডেলহি। চাণক্যপুরীর দূতাবাসগুলো বিনা শুল্কে দামী দামী মাল আনায়। পালা করে পার্টি দেয়। সকলের মন এইখানে বাঁধা। কাদের তুমি মীট করতে চাও? যার নাম করবে তাকেই তুমি হাতের কাছে পাবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কার্ড দেখিয়ে চাপরাশি পুলিসবেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করতে হবে না। আমার প্রধান খদ্দের তো দূতাবাসের সাহেব মেমরাই। তাঁদের দেখাদেখি দিল্লীর একালের আমীর ওমরাহ্। যাদের টাকা আছে তাদের রুচি নেই। যাদের রুচি আছে তাদের টাকা নেই। কী করে আমি আমাদের জগৎ শেঠদের বোঝাব যে আমি হচ্ছি প্যারিসের রোয়া। ওদেশে আমার নামে বই বেরিয়েছে। যে সিরিজে পিকাসো, ব্রাক, মোদিলিয়ানির নামে বই সেই সিরিজে রোয়ার নামেও বই। ভাবতে পারে এরা? আহা, কতকাল পরে নিজের নামটা নিজের কানে শুনতে পেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। ধন্যবাদ তোমাকে, চৌধুরী। আমিও পুলকিত যে সেদিনকার সেই তালপাতার সেপাই আজ একজন গণ্যমান্য সাহিত্যিক। আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে যাকে ডাক পড়ে। কোথায় তলিয়ে গেছে আর সবাই। ভেসে আছি তুমি আর আমি। তা তুমি কি জুস ছাড়া আর কিছুই পান কর না? এরা কিন্তু খাঁটি শ্যাম্পেন দেয়। তিনি তৃতীয়বার পানপাত্র ভরেন।

প্রথম পরিচয়ের দিন মসিয়ে রোয়া চিন্ময়কে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, 'শুনে সুখী হলুম আপনি একজন কবি। জানতে পারি কি আপনার প্রেরণার উৎস কী? কী পান করে আপনি উদ্দীপনা বা উন্মাদনা বোধ করেন? অ্যাবসিস্থ?'

চিন্ময় তো চিত্তির। উত্তর দিয়েছিল, 'ঘোলের শরবত, ডাবের জল, দুধ মেশানো চা, কফি মেশানো দুধ। এই আমার দৌড়। প্যারিসে এসে কোকোলা খেয়ে মধুর রসের কবিতা লিখছি।'

'কোনোটাতে এক ফোঁটা অ্যালকোহল নেই। তা হলেই হয়েছে আপনার কবি হওয়া। কবিতা লিখলেই কবি হয় না। কবি হতে হলে ওমর খায়য়ামের ধারা ধরতে হয়। তবে সাকী বলতে এখানে সখী বুঝতে হবে। ইরানের সাকীরা ছিল কিশোরী নয়, কিশোর।' মসিয়ে রোয়া চিন্ময়কে কবি হবার কৌশল বলেছিলেন।

তারপর নিজের বহুমূল্য সময় নষ্ট করে প্যারিসের মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালেরিগুলো ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। কারণ শিল্পের সঙ্গে কাব্যের একটা সহজাত সম্বন্ধ আছে। এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মডার্ন আর্ট বস্তুটা কী। আর কী নয়। ছাই পাঁশ আঁকলেই মডার্ন হওয়া যায় না। তাই যদি হতো তবে শিশুমাত্রই মডার্ন আঁকিয়ে। তাঁর নিজের স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে নিজের কাজও দেখিয়েছিলেন। আফসোস করে বলেছিলেন এসব ছবি এত মডার্ন যে খুব কম লোকেই এর মর্ম বোঝে। তাই বিক্রি হচ্ছে না। দেশের জমিদারি থেকে মাসোহারা আসে। নইলে প্যারিসের পাট তুলে দিতে হয়।

তাঁর তো শত্রুর অভাব ছিল না। সকলেই স্বজাতীয়। ওঁরা চিন্ময়কে হুঁশিয়ার করে দিতেন। 'কেন মশাই কুসঙ্গে মিশছেন? দেখছেন না আমরা কেমন ওঁকে এড়িয়ে চলি। আমাদের মজিয়েছে। শেষে একদিন আপনাকেও মজাবে।'

চিন্ময় ভয় পেয়েছিল। 'আমাকে! মজাবেন!'

'তা হলে আরো খোলসা করতে হয়। এক একটা বেআইনী অপারেশনে কত খরচ হয়, জানেন? এত টাকা জোটাবে কী করে? মাসোহারার তো একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। আপনাকেই বলবে, চৌধুরী ভাই, কিছু টাকা দিতে পারো? সামনের মাসেই শোধ করে দেব। সামনের মাস গিয়ে সামনের বছর। তখন আবার টাকার টানাটানি। কেন? সেইজন্যে।' ওঁরা রসিয়ে রসিয়ে

বলতেন।

তামাশা করে নয়, এই সব দেখেশুনে ওঁরা তাঁর নাম রেখেছিলেন সর্বনাশ রায়। আগুন যেমন পতঙ্গের সর্বনাশ করে তিনিও নাকি তেমনি তাঁর মডেলের সর্বনাশ করতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর মডেল হতে উৎসুক তরুণীর অভাব হতো না। তিনি পরম সমাদরে তাদের প্রতিকৃতি চিত্রণ করতেন। তারাও বিশ্বাস করত যে তারা অমর হয়ে বিরাজ করবে। প্যারিসের প্রখ্যাত শিল্পীরা কত নাম-না-জানা নারীকে অমর করে দিয়েছেন। তাঁরা না আঁকলে কেই বা তাদের মনে রাখত! অমরত্বের জন্যে অবশ্য কিছু মূল্য দিতে হয়। যেখানে দু'পক্ষই সম্মত সেখানে অনিষ্ট কোথায়? মাঝখান থেকে লাভ হয়ে গেল শিল্পীর ও শিল্পরসিকের।

কিন্তু ব্যাপারটা তো দু' পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব ঘটে যে! ওইখানেই প্রকৃতির জিত। তাকে তার জন্ম থেকে বঞ্চিত করতে গেলে সেও কি প্রতিশোধ নেবে না? শিল্পীরা তা হলে বিয়ে করেন না কেন? বিয়ে করলে তো আর বেআইনী অপারেশনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিয়ে করলে কি বোহেমিয়ান জীবন যাপন করা চলে? শিল্পীর পক্ষে বোহেমিয়ান জীবনই স্বধর্ম। অন্তত যতদিন যৌবন থাকে। যৌবনের আগুন জ্বলে। আগুন জ্বলতে থাকলে পতঙ্গও পুড়তে থাকবে, কিন্তু নিবে গেলে যে আর্টের সর্বনাশ। আগুন যখন নিবে আসবে, আর্টের মহত্তর কীর্তিগুলো নিঃশেষ হয়ে আসবে, তখনি আসবে বিবাহের সুসময়।

উন্নতকায় গৌরবর্ণ সদ্বংশীয় সুপুরুষ। তাঁর সন্তান হবে না তো হবে কার? প্রকৃতিই করেছে তার জন্যে ষড়যন্ত্র। কিন্তু মানুষের বিকৃত বুদ্ধি তাকে বাধা দিচ্ছে। এর ফল কখনো ভালো হতে পারে না, কদাপি ভালো হতে পারে না। চিন্ময় ছিল এর বেলা রম্যা রলার শিষ্য। তাঁর তৎকালীন উপন্যাস 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা' সে পড়েছিল। প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন প্রেমিকার বিবাহ হয়ে ওঠে না। কিন্তু সে সমাজের ভয়ে ভীত না হয়ে প্রেমের নির্দেশে তার সন্তানের জন্ম দেয়। অমনি করে প্রেম পায় পূর্ণতা। তারপর নেমে আসে লোকনিন্দা, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, সমাজের শাসন, কতরকম বিপত্তি। তবু সে আঁকড়ে ধরে থাকে তার পুত্রকে। তিল তিল করে তাকে গড়ে তোলে। প্রকৃতির জয় হয়, জয় হয় মনুষ্যত্বের।

সর্বাণীশ রায় ছিলেন চিন্ময়ের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। কথাটা পাড়তে তার সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল। একদিন দু'জনায় মিলে কাফেতে বসে আড্ডা দিতে দিতে কেমন করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'মসিয়ে রোয়া, আপনি তো একজন স্রষ্টা। সৃষ্টি সম্পূর্ণ হোক এটাই তো আপনার অন্তরের কামনা। কিন্তু সৃষ্টি যদি মাঝপথে অসম্পূর্ণ থেকে যায়? কেউ যদি আপনার ক্যানভাস কাঁচি দিয়ে কেটে দেয়?'

'তাকে খুন করব।' তিনি গর্জে উঠেছিলেন।

'তা হলেই ভেবে দেখুন, প্রকৃতির সৃষ্টি কুঁড়িতে ছিঁড়ে ফেলা কত বড়ো অন্যায়। প্রকৃতি কি ক্ষমা করবে।' আবেগের সঙ্গে বলেছিল চিন্ময়।

'অমন ধাঁধার মতো করে বলছ কেন, ভাই। সোজা কথায় বল।' তিনি ওকে কখন একসময় 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলেন।

যা শুনেছিল চিন্ময় তাই শোনায় একটু মোলায়েম করে। কিন্তু হাজার মোলায়েম করলে কী হবে, কথাটা তো রূঢ়। শক খেয়ে তিনি টলে পড়েছিলেন।

'তুমি আমাকে কী ভেবেছ, জানিনে। কিন্তু তোমার কাছে আমি আত্মরক্ষা করব না, ভাই চৌধুরী। হ্যাঁ, সত্যি। আই প্লীড গিলটি। আমার জবাবদিহি এই যে সবরকম সতর্কতা সত্ত্বেও

অ্যাকসিডেন্ট ঘটে। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। তখন চিকিৎসকের শরণ নিতে হয়। বেআইনী? হ্যাঁ, বেআইনী। কিন্তু কতদিন বেআইনী থাকবে? সভ্য সমাজকে একদিন না একদিন মনস্থির করতে হবে। আপাতত একটা মিথ্যা সাফাই দিতে হচ্ছে। রোগিণীর প্রাণ বিপন্ন। পুলিস যদি এটা মেনে নেয় তা হলে আর বেআইনী নয়। তা খরচ তো কিছু হবেই।' তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন।

চিন্ময় লণ্ডন থেকে এসেছিল। সে জানত সেখানে কী হয়। আদালতে গিয়ে নোট করেছিল পুলিসের পাকা ঘুঁটি ডাক্তার আসামীর কাউন্সেল সার হেনরি কার্টিস-বেনেট কেমন করে কাঁচিয়ে দিলেন। রোগিণীর প্রাণ বিপন্ন প্রমাণ করতে পারলেই হলো। ডাক্তারের কর্তব্য রোগিনীর প্রাণরক্ষা। নীতিরক্ষা তো যাজকের কাজ।

বলতে বলতে গরম হয়ে উঠেছিলেন মসিয়ে রোয়া। 'যারা আমার নিন্দায় পঞ্চমুখ তারা কী করে, বলব? তারা রেড লাইট এলাকায় রাত কাটায়। সেখানেও অ্যাকসিডেন্ট ঘটে কি না সে খবরে তাদের কী! সে দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে হয় না। কাজেই তারা এক একজন অনারেবল ম্যান। ভাই চৌধুরী, আমি কি ওদের মতো ভালগার হতে পারি? আমি যে রাজা সর্বাধীশ রায়ের প্রপৌত্র! আমরা আর কারো সঙ্গে শেয়ার করিনে। বাইজীরাই আমাদের আলয়ে আসেন। আমরা ওঁদের আলয়ে যাইনে। বিদেশেও সেই তেজ বজায় রেখেছি।'

॥ দুই ॥

প্যারিসের পর দিল্লীতে পুনর্দর্শন। মিনিট পনেরোর আলাপ। হাতে হাতে মিলিয়ে মসিয়ে রোয়া বলেন, 'দিল্লীর চাকরিটা যদি আকাশকুসুম না হয় তা হলে মাঝে মাঝে আবার আমাদের দেখা হবে, চৌধুরী। একটা না একটা সম্মেলন বা সেমিনার তো লেগেই আছে।'

কিন্তু বছর তিন-চার আর কোনো যোগাযোগ ঘটে না। না দিল্লীতে, না বম্বেতে, না কলকাতায়। শেষে একদিন শান্তিনিকেতনে পুনরায় দর্শন।

রতনকুঠিতে চিন্ময়ের কী একটা কাজ ছিল। হঠাৎ সর্বাণীশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ। 'আরে আপনি! মসিয়ে রোয়া।'

'চৌধুরী না?' তিনি তাঁর ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন, 'মিস্টার চৌধুরী। মাদাম রোয়া।'

প্রায় অর্ধেকবয়সী এক তন্বী রূপসীর স্বামী প্রায় পক্ককেশ এক ভগ্নদেহ পুরুষ। রাজযোটক নয়। দু'চার কথার পর রোয়া বলেন, 'সেবার দিল্লীতে আপনার মুখেই শুনেছিলুম আপনি শান্তিনিকেতনে ডেরা বেঁধেছেন। কথাটা আমার মনে ছিল। তাই আপনার সন্ধানেই বেরোব'ভাবছিলুম। নর্মদা, তুমি তৈরি?'

এরপর চিন্ময়ের ডেরায় গিয়ে মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় পর্ব। চারজনে মিলে বাগানে গিয়ে বসেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

'কবে এলেন তা তো আমাকে জানতে দিলেন না, মসিয়ে রোয়া। ডিনারের আয়োজন করতুম। আর পাঁচজনকে ডাকতুম।' চিন্ময় অনুযোগ করে।

'কালকেই হোক না?' মিসেস চৌধুরী প্রস্তাব করেন।

'আমরা যে কাল সকালেই ফিরে যাচ্ছি।' মাদাম রোয়া জবাব দেন।

'একদিনের জন্যেই আসা। আজ সকালের ট্রেনেই পৌঁছেছি। ওসব ফর্মালিটির কী দরকার, ভাই চৌধুরী? কতকাল পরে দেখা! প্রাণ জুড়িয়ে গেল তোমার মুখে রোয়া নামনি শুনে। মনে পড়ে গেল প্যারিসের সেই দিনগুলির কথা। তখন তোমার গাইড ছিলুম আমি। আর আমার ফিলসফার ছিলে তুমি। ফ্রেণ্ড ছিলুম দু'জনে দু'জনার। সেসব দিন কি আর ফিরে পাব!' রোয়া চোখ বুজে ধ্যান করেন।

'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।' চিন্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

রোয়া এবার বলেন কেন শান্তিনিকেতনে এসেছেন। সেই দিল্লীর লাড্ডুটা আরেকজনের ভাগ্যে জোটে। একালে যাদের মুরুব্বির জোর তারা জমিদারের ছেলে নয়, সওদাগরের জামাই বা পলিটিসিয়ানের নেফিউ। রোয়া তাঁর ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'ভাগ্যিস ব্রিটিশ আমলে দেশে ফিরেছিলুম। মন্ত্রীরা তখন জেলে। গভর্নরস রুল। লাটসাহেবকে ছবি উপহার দিই। ছবি দেখে তিনি তন্ময়। সঙ্গে সঙ্গে চাকরির অফার। নাৎসীদের থাবা থেকে রেফিউজী, এই যথেষ্ট সুপারিশ। আমার নামে বই বেরিয়েছে এই যথেষ্ট যোগ্যতা। আর রাজা সর্বাধীশ রায়ের প্রপৌত্র এই যথেষ্ট রেফারেন্স। লাটসাহেবের কলমের এক খোঁচায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'আপনি বম্বেতে থাকেন জানলে বছর দশেক আগেই দেখা করতুম। সেখানে যেতে হয়েছিল ছেলেকে জাহাজে তুলে দিতে।' চিন্ময় আক্ষেপ করে।

'সেটা তোমার দোষ নয়, চৌধুরী। মডার্ন আর্ট এদেশে কেউ জানে না, কেউ বোঝে না, কেউ চায় না। নয়তো আমি নিজ বাসভূমে পরবাসী হতুম না। সচিত্র পত্রিকায় আমার ছবি ছাপে না। দৈনিক পত্রিকায় আমার নাম বেরোয় না। বহুদিন একা একা সংগ্রাম করেছি। ক্রমে ক্রমে লোকের রুচি বদলেছে। জাতীয়তাবাদের মোহ কেটেছে। এপথে আরো অনেকে এসেছেন। অথচ আমি নিজে এখন আউট অফ ডেট। কারণ প্যারিসের সঙ্গে আউট অফ টাচ। আর্টের সাধনা নিঃসঙ্গ মানুষের একক সাধনা নয়। পাখিদের মতো আমাদেরও একসঙ্গে থাকা চাই। পরস্পরের উপর নজর রাখতে হয়। কে কেমন আঁকছে। আমারও তো সংশোধন আবশ্যক। মডার্নের আরো মডার্ন আছে। আমি বুঝতে পারি যে শেষে ফিরে এসে আমি পেছিয়ে পড়ছি। আমি নিরুপায়। এখন চাকরিটারও মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। চটপট একটা আস্তানা যোগাড় করতে হবে। তারই খোঁজে বেরিয়েছি। নর্মদা তো রবীন্দ্রনাথ বলতে অজ্ঞান। তার চিরদিনের সাধ শান্তিনিকেতনে বাস। আজ তাই সারাদিন টহল দিয়েছি সাইট দেখতে নয়, সাইট দেখাতে।' তিনি বুঝিয়ে দেন দৃশ্য নয়, জমি।

'সাইট পছন্দ হয়েছে?' মিসেস চৌধুরী শুধান।

'আমি তো মনে করি শান্তিনিকেতনের প্রতি ধূলিকণাই পবিত্র। যেখানে কবিগুরুর শ্রীচরণের পরশ।' মাদাম রোয়া ভক্তিতে গদ্‌গদ।

'তা হলে আর কী! বম্বে ছেড়ে চলে আসুন। আপাতত একটা ডেরা ঠিক করে দিচ্ছি। সেইখানে থেকে মনের মতো বাড়ি বানাবেন। নিজের পছন্দমতো স্টুডিও।'

'গুরুদেবেরও তো ইচ্ছা ছিল যে শিল্পীরা গুণীরা সাহিত্যিকরা দলে দলে এখানে এসে বসবাস করেন। গড়ে ওঠে একটি উপনিবেশ।' উৎসাহ দেয় চিন্ময়।

মসিয়ে রোয়া ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন। 'স্ট্রেঞ্জ ক্রীচার্স! এতজনের সঙ্গে দেখা হলো, একজনও শোনেনি যে রোয়া বলে কোনো শিল্পী আছেন। প্যারিস থেকে যাঁর নামে বই বেরিয়েছে। এক রামকিঙ্করই আমাকে চিনলেন। নিজে মডার্ন আর্টিস্ট কিনা। শুধু ওই একজনের খাতিরেই তো এই

অজ্ঞদের রাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে পারিনে। হ্যাঁ, থাকতেন যদি টেগোর। উনি আমাকে ঠিক ধরে রাখতেন। প্যারিসে কি ওঁর সঙ্গে কম দহরম মহরম করেছি! রাজা সর্বাধীশের প্রপৌত্র শুনে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।'

আমি দুঃখিত হয়ে বলি, 'তা হলে আপনি প্যারিসেই ফিরে যান না কেন? এই পোড়া দেশে আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে কজন আর কোথায়?'

এর উত্তরে তিনি গম্ভীর হয়ে যান, বলেন, 'বছর দুই আগে প্যারিস ঘুরে এসেছি। বিলকুল বদলে গেছে। কোথায় সেইসব স্টুডিও! কোথায় সেই সব কাফে! কোথায় সেইসব রেস্তোরাঁ! কোথায় সেই সব হোটেল! আমার সেকালের বন্ধু বা পরিচিতরা কেউ ফৌত হয়েছে, কেউ ছড়িয়ে পড়েছে। যে দু'চারজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তাঁরা আরো মডার্ন হয়েছেন। তাঁদের তুলনায় আমি আউট অফ ডেট। একালের শিল্পীরা আমার নামই শোনেনি। আমার নামের বইখানাও আর ছাপে না। একালের সমঝদারদের কাছে আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা হয়। তাঁরা সাফ বলে দেন, আপনাদের যুগ গেছে। যেখানেই যাই সেখানেই মনে হয় আমি যেন যুদ্ধপূর্ব যুগের এক ভূত। চেহারাটাও ভূতের মতো হয়েছে। প্রাণটা জুড়িয়ে গেল যখন আমারই মতো এক ভূত আমাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মসিয়ে রোযা। এতদিন ছিলে কোথায়? তারও জীবন দুর্বহ। সব জিনিস আগুন। অথচ কত সস্তা ছিল যুদ্ধের আগে।'

চিন্ময় চুপ করে শুনে যায়। কথা বাড়ায় না। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেন মিসেস চৌধুরী। মাদামকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের ছেলেমেয়ে ক'টি?'

উত্তর পান, 'আমরা, ভাই, নিঃসন্তান।'

রোয়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'চৌধুরী, চল তোমার বাগান ঘুরে দেখি। ওঁরা মেয়েলি গল্প জুড়ে দিয়েছেন। পুরুষদের শোনার কী দরকার।'

মহিলাদের শ্রবণসীমার বাইরে গিয়ে তিনি বলেন, 'মেয়েদের মুখে আর কোনো প্রশ্ন নেই! ছেলেমেয়ে ক'টি। তোমার উনি না জেনে কতবড়ো আঘাত দিলেন আমার প্রাণে! যখনি যেখানেই এমনতর প্রশ্ন শুনি, শুনে আমার মন শুধু নয়, আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। নর্মদা তার উত্তরে যা বলেছে তাও না জেনে বলা। সে নিজে অবশ্য নিঃসন্তান, তা বলে আমি তো ঠিক নিঃসন্তান নই। আমার সন্তানদের যদি আমি জন্মাতে দিতুম তা হলে ওদের সংখ্যা হতো দুই। না, না, যত রটে তত বটে নয়। বহু নারীর সংসর্গে এসেছি, কিন্তু সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে মাত্র দুটিবার।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, মসিয়ে রোয়া।' চিন্ময় বলে আর্দ্র স্বরে।

'ধন্যবাদ, ভাই চৌধুরী। এই বা ক'জন করে! তা হলে শোন, তোমাকেও আমি বিশ্বাস করে বলি, ভগবান আমার কাছে যাদের পাঠিয়েছিলেন সেই দুই দেবদূত স্বর্গে ফিরে গিয়ে তাঁকে হয়তো জানিয়েছে যে, আমি ছেলেমেয়ে ভালোবাসিনে। তাই ভগবান আমাকে এ জন্মে আর ছেলেমেয়ে দিলেন না। দিলে কত খুশি হতুম! পরের ছেলেমেয়েদের আমি কত ভালোবাসি! নিজের ছেলেমেয়েদের ভালোবাসতুম না? কিন্তু না চাইতে যাদের পাওয়া যায় ফিরিয়ে দিয়ে শত চাইলেও তাদের পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়ে হচ্ছে বিধাতার দান। আমরাই সৃষ্টি করি, এ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। যখন চাইব তখন হবে এটা নির্বোধের দুরাশা। বেচারী নর্মদা! ও তো ছেলেমেয়ের জন্যে কাঙাল। আহা, ওকে কী বলে সান্ত্বনা দিই! আমার কর্মফল আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। তা বলে ওকে ভোগ করতে হবে কেন? অনেকবার ভেবেছি ওকে ছেড়ে দিই। ও আবার বিয়ে করুক। যা হোক। কিন্তু আমার পূর্ব ইতিহাস শোনাতে সাহস পাইনে। হিন্দুর মেয়ে, ও তো পাগল হয়ে

যাবেই, আমাকেও পাগল করে ছাড়বে। দোহাই তোমার, চৌধুরী, তুমি যেন তোমার মিসেসকে আমার পূর্ব কাহিনী বলতে যেয়ো না। কে জানে তিনি হয়তো একদিন আমার মাদামের কানে তুলবেন, যদি আবার কোথাও কোনোদিন দেখা হয়। শান্তিনিকেতনে না থাকার এটাও একটা কারণ। জানি এ অপরাধের মার্জনা নেই।' তিনি কাতর কণ্ঠে বলেন।

এরপরে যা ঘটে তা অভাবনীয়।

'এই আমি আমার দুই কান মলছি। এই আমি আমার নাক মলছি। অমন কর্ম আর কোনো জন্মে করব না।' তিনি সত্যি সত্যি নিজের হাতে নিজের নাক কান মলেন।

চিন্ময় তাঁর হাত চেপে ধরে। বলে, 'ক্ষমা আছে। ক্ষমা আছে।'

বৃহন্নলা

সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনার পর কে যেন প্রশ্ন করেছিল, সীতা মেয়ে না পুরুষ? তেমনি এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল সেদিন আমাদের ঘরোয়া আড্ডায়। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে আমরা ছিলুম বারোজন নরনারী।

নারীপ্রগতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এবার জলযোগের আয়োজন, এমন সময় রসভঙ্গ করেন আমাদের বর্ষীয়ান বন্ধু শিশিরদা।

'তোমরা যে নারীদের জন্যে ভেবে আকুল হচ্ছ, আগে ডিফাইন কর তো, নারী বলতে কী বোঝায়? কাকে বোঝায়?'

সকলেই স্তম্ভিত। মহিলারা বিক্ষুব্ধ। আলোচনার সেইখানে ইতি। যিনি বলছিলেন তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে যায়। কথা কেড়ে নেন শিশিরদা।

'আহা, এতে উত্তেজিত হবার কী আছে। আমি কি ইঙ্গিত করেছি যে স্ল্যাক পরে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা মেয়েছেলে নয়? কিংবা হিপিদের মতো যারা চুল ছেড়ে দেয় তারা বেটাছেলে নয়? শোন, তোমাদের আমি এক এক করে তিনটি প্রশ্ন করছি। যদি একবাক্যে প্রত্যেকটির যথার্থ উত্তর দিতে পারো তবে আমিই বোকা বনে যাব। নয়তো বোকা বনবে তোমাদের একাংশ।' এই বলে তিনি সকলের কৌতূহল জাগিয়ে দেন।

তারপর শুনিয়ে যান এক এক করে তাঁর তিনটি প্রশ্ন। বার বার পুনরুক্তি করেন।

নবদ্বীপের বিশাখা সখী কি নারী? পার্বত্য চট্টগ্রামের মঙ্ রাজা নানুমা কি পুরুষ? প্রতাপগড়ের মুরলী দাস কি বৃহন্নলা?

এ খেলার নিয়ম হচ্ছে এক কথায় উত্তর দিতে হবে। হ্যাঁ কিংবা না। তৃতীয় কোনো উত্তর নেই। থাকলে বিধাতার জানা। উত্তরের নিচে নাম লিখতে হবে না।

এর পরে আমরা কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে যাই ও উত্তর লিখে শিশিরদার হাতে গুঁজে দিই। কিন্তু কাউকে জানতে দিইনে কে কী লিখেছি।

শিশিরদা ঘোষণা করেন, 'প্রথম প্রশ্ন ছিল, বিশাখা সখী কি নারী? ছ'জন লিখেছেন, হ্যাঁ। পাঁচজন লিখেছেন, না। বাকী একজন লিখেছেন, আঁা! নপুংসক! এ উত্তর বাতিল। এটা ফেয়ার

গেম নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, মঙ্ রাজা নানুমা কি পুরুষ? সাতজন লিখেছেন, হ্যাঁ। চারজন লিখেছেন, না। বাকী একজন আবার সেই—নপুংসক। এটা মানহানিকর। ক্ষমাপ্রার্থনা চাই। এই বলে তিনি একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকান। কেউ ধরাছোঁয়া দিলে তো?

তারপর তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, প্রতাপগড়ের মুরলী দাস কি বৃহন্নলা? এর উত্তরে চারজন লিখেছেন, হ্যাঁ। সাতজন লিখেছেন, না। হা ভগবান! বাকী একজন ফের সেই কথা—নপুংসক! যাকে নিয়ে সারা শহর তোলপাড়, আদালত গুলজার, সে হলো কিনা নপুংসক!' শিশিরদা মাথায় হাত দিয়ে বসেন।

আমরা তখন তাঁকে হাতে পায়ে ধরে সাধি—'উত্তরগুলো ঠিক হয়েছে কি না বলুন না দয়া করে।'

'ঠিক হবে কী করে? সব ক'টাই পরস্পরবিরোধী। ভোটের ওপর ছেড়ে দিলে বিশাখা সখী হন নারী। যা আদৌ সত্য নয়। মঙ্ রাজা নানুমা হন পুরুষ। যা শুধু কাগজে কলমে। আর মুরলী দাস হয় না বৃহন্নলা। তা হলে সে কী? নারী? এই নিয়ে অনর্থ বেধে যায় আমার ছেলেবেলায়। পারিবারিক শান্তিরক্ষার খাতিরে মামলাটা ধামাচাপা দেওয়া হয়। ডাক্তারি পরীক্ষায় যদি ধরা পড়ে ও পুরুষ তা হলেও ফ্যাসাদ। যদি বোঝা যায় যে সে নারী তা হলেও ফ্যাসাদ। হয় স্ত্রীর নামে কলঙ্ক লাগে, নয় স্বামীর গালে চুনকালি পড়ে। সে এক সেনসেশনাল কেস।' এই বলে শিশিরদা মুখ টিপে হাসেন।

তখন আমরা সকলেই তাঁকে চেপে ধরি—'বলতেই হবে আপনাকে। শুধু ওই একটা নয়, তিনটে গল্পই। দাদা, এ তো বড় রঙ্গ, দাদা, এ তো বড় রঙ্গ। তিন গল্প বলতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।'

জলযোগের আয়োজন ছিল। দেখতে দেখতে চা এসে পড়ল।

শিশিরদা বলেন, 'তিনটে গল্প জানলে তো তিনটেই শোনাব? প্রথম দুটো ছুঁয়ে যাব। তিনের -টাই আসল।'

এর পরে কথাবস্তু। শিশিরদার জবানীতেই বলা। নিচে তার ধারাবিবরণী।

॥ দুই ॥

আমার বাবা আমাকে লিখেছিলেন, 'তুমি যদি কর্মোপলক্ষে নবদ্বীপে যাও তা হলে একবার বিশাখা সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আমার তিনি বিশাখা দিদি।' কিছুদিন পরে একদিন নবদ্বীপ যাত্রার সুযোগ পাই। সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে বিশাখাকুঞ্জে হাজির হই। বিশাখা সখী আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠান। বাপের বয়সী হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুরুষ দেখে হকচকিয়ে যাই। পরনে শাড়ি, মুখে ঘোমটা। ঘোমটার আড়ালে প্রকাণ্ড এক নথ। কথা বলেন মেয়েলি ঢঙে নথ নাড়া দিয়ে। হাবভাব অবিকল মেয়েদের মতো। তেমনি কটাক্ষপাত। শ্রীরাধার অষ্টসহচরীদের বয়স তো কখনো বাড়ে না। ষাট ছাড়িয়ে গেলেও ষোড়শী। ওদিকে ক্ষৌরকর্ম সত্ত্বেও দাড়ি গোঁফ ফুটে বেরোচ্ছে। বিশাখা সখী তাঁর সাধনার খাতিরে শুধু যে নারীবেশ ধারণ করেছেন তাই নয়, কায়মনোবাক্যে নারী হয়ে গেছেন বা হতে চেয়েছেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে পুরুষ ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। একে ওকে তাকে

ডাক দিয়ে হুকুম যখন করেন তখন পুরোদস্তুর মঠাধীশ। কথাবার্তাও বিষয়ী লোকের মতো। আমার সঙ্গে আধ্যাত্মিক নয়, আধিভৌতিক প্রসঙ্গেই আলাপ। আমার পরিচয় আমি একজন রাজকর্মচারী। পরে আমি অনুসন্ধান করে জেনেছিলুম যে বিশাখা সখী লোক ভালো। তাঁর বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ নেই। বৈষ্ণবদের মতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। তিনি বৈষ্ণবী।

আমার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল সেটা এই যে তিনি পুরুষ হয়েও আর সকলের দিদি। আমার তো সম্পর্কে পিসি। আমার কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে হয়তো ডেকে বসতুম, পিসি। না, তাঁকে দিদি বলেও ডাকিনি। সখী বলেও না। পরে উল্লেখ করার সময় কী বলেছিলুম মনে পড়ে না। ভদ্রলোক না ভদ্রমহিলা? ইংরেজীতে টুর ডায়েরি লিখতে গিয়ে হী লিখেছিলুম না শী?

এই একই সমস্যায় পড়ি পার্বত্য চট্টগ্রামের মঙ্ ট্রাইবের রাজার সঙ্গে মোলাকাত করতে গিয়ে। না, তিনি রাণী নন। রাজার উত্তরাধিকারী হিশাবে তিনি রাজা। যদিও তিনি পুরুষই নন। সর্বতোভাবে নারী। পরনে বর্মী মহিলাদের মতো লুঙ্গী ও ব্লাউজ। মহামুনি মেলায় তিনি যোগ দিতে এসেছেন শুনে আমরা স্বামী-স্ত্রী গিয়ে সৌজন্য প্রদর্শন করি। বৌদ্ধদের সেই বিখ্যাত মেলা যেখানে অনুষ্ঠিত হয় সেটা তাঁর নিজের এলাকায় পড়ে না। তাই রাজবেশ ধারণ করেননি। সাদাসিধে পোশাকেই আমাদের রিসিভ করেন। একটা মাচার ওপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। সেখানেই অস্থায়ী ডেরা। পরিকরদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার রাজোচিত। বেশ বোঝা যায় অথরিটি আছে। নারী বলে কেউ তাঁকে রাজার চেয়ে হীন মনে করতে সাহস পায় না। রাজত্বের বেলা তিনি পুরুষ। তাঁর যদি কোনো সাধনা থাকে তবে সেটা নারী হবার নয়, পুরুষ হবার। অথচ তিনি তাঁর গৃহজীবনে জায়া ও জননী। আমরা তাকে সেইরূপেই দেখি। সেদিন তিনি আমাদের সহজভাবে দেখা দেন। বুঝতে পারি তিনি নারী ভিন্ন আর কিছু নন। ফিরে এসে টুর ডায়েরিতে কী লিখি তা কি মনে আছে? হী না শী?

এই যে পর পর দুটি অভিজ্ঞতার কাহিনী ছুঁয়ে গেলুম এ দুটি অপেক্ষাকৃত সরল। নবদ্বীপের সবাই জানত যে বিশাখা সখী নারী নন, পুরুষ। কারো মনে কোনো সংশয় ছিল না। তেমনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সবাই জানত যে মঙ্ রাজা নানুমা পুরুষ নন, নারী। যেমন মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ছিলেন পুরুষবেশে নারী। কারো মনে কোনো সংশয় ছিল না। আমিও নিঃসংশয়।

কিন্তু সে-কথা কি বলতে পারি মুরলী দাসের বেলা? তখন আমি খুবই ছেলেমানুষ। বয়স কত হবে! দশ কি এগারো। কে যে নারী কে যে পুরুষ মুখ দেখে বা বুক দেখে চেনার বয়স সেটা নয়। দুখী বলে একটি মেয়ে আমাদের খেলার সাথী ছিল। সে কিন্তু সব সময় পরে থাকত ছেলেদের মতো ধুতি। আমরা ওকে ভিন্ন ভাবতুম না। একদিন শোনা গেল দুখীকে আর ছেলেদের সঙ্গে খেলতে দেওয়া হবে না। যদিও সে দারুণ পুরুষালী। পরে ওর বিয়ে হয়ে যায়।

মুরলী যে কবে কোন্ সুদূর থেকে এসে অবতীর্ণ হয় তা আমার স্মরণ নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সে প্রতাপগড়ের অধিবাসী নয়। শহরের বাবুদের একটা অ্যামেচার থিয়েটার দল ছিল। তাতে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় যারা করত তারা কেউ মেয়ে নয়। রং পাউডার মেখে এক একটি সং সাজত। গুঁফোবাও গোঁফ কামাত না, শাড়ি পরে সেটার আঁচল দিয়ে গোঁফ ঢাকত। হঠাৎ মুরলীকে পেয়ে দলের লোক স্বর্গ হাতে পায়। ওর বয়স হয়েছে, অথচ গোঁফ দাড়ি গজায়নি। ওকে সব সময় বুক ঢেকে রাখতে দেখা যেত। বুকটা বেশ উঁচু হয়ে থাকত। পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করত না মুরলী। থিয়েটারের সময় ওর নারীবেশ। অন্য সময় পুরুষবেশ। পশ্চিমাদের মতো পিরাণ ও চুড়িদার পায়জামা। মাথায় একরাশ বাবরী চুল। সেকালে ওটাই ছিল ফ্যাশন।

থিয়েটার তো রোজ রাত্রে হয় না। মেয়েদের জন্যে পৃথক বন্দোবস্ত না থাকায় ভদ্রঘরের

মহিলারা যেতে পারেন না। তখন তাঁদের জন্যে তাঁদের নিজেদের বাড়ির আঙিনায় দুটো একটা দৃশ্য অভিনয় করে দেখানো হয়। মুরলী তাতে থাকবেই। নয়তো নাচবে গাইবে কে? অমনি করে ওখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে মুরলীর জন্যে অনেকগুলি দরজা খুলে যায়। অন্দরেও তার প্রবেশ অবারিত। তার বয়স তখন কতই বা! আঠারো উনিশ। বাড়ির ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে সেও ভিতরে গিয়ে আসন পেতে খায়, আসরে বসে গায়। সাধাসাধি করলে পকেট থেকে ঘুঙুর বার করে। নাচে।

আমার ঠাকুমা ক্রমে ক্রমে ওর মুখ থেকে ওর মনের কথা টেনে বার করেন। ওর পড়াশুনায় তেমন মন নেই যেমন নাচ গানে। সেইজন্যে পড়াশুনা বেশিদূর এগোয়নি। বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে। উপার্জনের ধান্দায় শহরে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও এক বছর, কোথাও ছ'মাস। এখানে যদি একটা চাকরি জুটে যায় তো বরাবরের মতো থেকে যাবে।

ঠাকুমা একদিন বাবাকে বলেন, এত লোকের চাকরি হয়, মুরলীর হয় না? ও কি সব কাজের অযোগ্য! বাবা উত্তর দেন, ও যে লেখাপড়া শেখেনি, লেখাপড়ার কাজ কি ওকে দিয়ে হবে? পিয়ন চাপরাশি দপ্তরীর কাজ দিতে পারি, কিন্তু তা হলে ও কি বাবুদের সঙ্গে বাবুয়ানা করতে পারবে? ও যে কোথাকার লোক, কী জাত, কোন্ বংশ, কার ছেলে সবই তো অজানা। না, আমি ওকে আশা দিতে পারব না। আর কোথাও চেষ্টা করতে বল। ঠাকুমা মনে দুঃখ পান। আহা, বেচারা কোথায়ই বা যাবে! লেখাপড়া যখন জানে না তখন যেখানেই যাক একই উত্তর শুনবে। ওকে আবার ইস্কুলেই দেওয়া উচিত, কিন্তু এত বয়সে সেখানেও কেউ নেবে না।

শেষে ওকে কপিস্ট বা নকলনবিশের কাজ দেওয়া হয়। রোজ আপিসে গিয়ে এত পৃষ্ঠা লেখে। এত সিকে পায়। তখনকার দিনে একজন নিম্নপদস্থ কেরানীর সমান আয়। সমাজেও সমান মর্যাদা। মুরলী তো বর্তে যায়। টিকে থাকলে ভার্নাকুলার ডিপার্টমেন্টে কেরানীর পদও ভাগ্যে জুটত। কিন্তু একদিন আপিসের সেরেস্তাদার ওকে ডেকে শাসিয়ে দেন যে আপিসে বসে আপিসের টাইমে গান করা চলবে না। মুরলীর কৈফিয়ত গান তো সে আর পাঁচজনের উপরোধে গেয়েছে। নিজের থেকে গায়নি। সেটা তিনি সরাসরি অগ্রাহ্য করেন, যদিও সেটা সত্য। তখন মুরলী তাঁর মুখের উপর শুনিয়ে দেয়, সার, আমি অফিসারও নই, কেরানীও নই, চাপরাশি বা পিয়নও নই। আমার কোনো মাইনেও নেই, চেয়ারও নেই, বেঞ্চিও নেই। আমি গাছতলায় মাদুর পেতে বসে দলিল নকল করি। দিনের শেষে এক টাকা কি পাঁচসিকে পাই। পান সিগারেট যারা বেচে তারাও আরো বেশি রোজগার করে। আগে আমাকে একটা পায়া দিন, তারপরে পায়া কেড়ে নেবার ভয় দেখাবেন। আমিও ভয় পাব। আমি একটা নগণ্য আরশুলা। আরশুলা আবার পাখী! তার আবার বন্ধনের ভয়! চাইনে আমি এ বন্ধন। এই বলে সে বেরিয়ে যায়। সেরেস্তাদার চুপ।

মুরলীর যারা শুভানুধ্যায়ী তারা ওকে বোঝান যে উপরওয়ালার কথা মাথা পেতে না নিলে চাকরি করা চলে না। তা সে যে চাকরি হোক। মুরলী অবুঝ। সে বলে, গান করতে বললে আমি গান করি। আপিসও জানিনে, টাইমও জানিনে। গান করতে বললে আবার করব। না করে থাকতে পারব না। গানই আমার প্রাণ।

তখন এক ভদ্রলোক ওকে নিজের বৈঠকখানার একপাশে একটি ঘরে আশ্রয় দেন। সেখান থেকে ও গান শিখিয়ে বেড়ায়। বাবুকেও হারমোনিয়াম বাজাতে শেখায়। সন্ধ্যাবেলা যে আসর বসে তাতে ওকে নাচতে বললে ও নাচে। অন্দর থেকে খাবার আর জলখাবার আসে। গৃহিণীর স্বহস্তের পাক। মুরলীর মতো ভাগ্যবান কে? কিন্তু বাবুর একটু পানদোষ ছিল। সন্ধ্যাবেলা গানের সঙ্গে সঙ্গে পানও চলত। হয়তো কিছু বেলেল্লাপনাও ছিল তার আনুষঙ্গিক। বলতে ভুলে গেছি যে নাচ গানের

সময় মুরলীকে নারীবেশ ধারণ করতে হতো। কেবল এই বাড়িতে নয়, সব বাড়িতেই। আমাদের বাড়িতেও আমি ওর মোহিনী মূর্তি দেখেছি। পুরুষ বেশটা ওর ছিল ঘোরাঘুরির বেশ। নাচ গানের বেশ নয়। নাট্যের বেশ নয়। এমনও হতে পারে যে দিনের বেলা ও পুরুষ, রাতের বেলা নারী। আমি তখন নেহাত ছেলেমানুষ। মানুষ চেনা আমার সাধ্য নয়।

মাস কয়েক বাদে কানাঘুষা শোনা গেল মুরলীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? ও তো ভবঘুরে। কিন্তু একই কালে আর একজনও নিখোঁজ। তিনি অভিরামবাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। কেমন মুখরোচক গুজব! দুই আর দুই মিলিয়ে চার হয়। লোকের মুখে হাত চাপা দেওয়া যায় না। কেউ বলে ভদ্রমহিলা মুরলীর সঙ্গে ইলোপ করেছেন। কেউ বলে মুরলী কি পুরুষমানুষ যে ওর পৌরুষ দেখে কোনো মেয়েমানুষ ভুলবে? আছে এর পেছনে কোনো গভীর রহস্য।

এতে মুরলীরও সম্মানহানি হয়। যারা ওর পক্ষপাতী তারা বলেন মুরলী কি তেমনি ছেলে যে ও রকম দুষ্কর্ম করবে! নাচ গান বাজনা নিয়ে থাকে। সেটা তো খারাপ কিছু নয়। এর উত্তরে প্রতিপক্ষ থেকে বলা হয়, ও যে বেটাছেলেই নয়। বেটাছেলে হলে দুষ্কর্মের প্রশ্ন উঠত। না হলে তো সে প্রশ্নই ওঠে না! অভিরামবাবুর স্ত্রীর কলঙ্ক ক্ষালন করতে গিয়ে তাঁরা পরোক্ষে ওর আশ্রয়দাতা অভিরাম বাবুকেই দোষ দেন। অথচ কারো হাতে কোনো প্রমাণ নেই। সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য। মুরলী মেয়ে না পুরুষ?

অভিরামবাবু প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে তাঁর স্ত্রী ইলোপ করেছেন, তাও মুরলীর সঙ্গে। অসম্ভব বলে তিনি সেই সম্ভাবনাটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজের দশজনের কাছে মুখরক্ষার খাতিরে তাঁকে পুলিসের শরণ নিতে হলো। তাও প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। পুলিসের লোক সত্যি সত্যি একদিন ধরে নিয়ে আসে দু'জনকে। দু'জনেরই নারীবেশ। আদালতে নয়, হাকিমের খাস কামরায় নিয়ে গিয়ে হাজির করে দেয় ওদের। অভিরামবাবুর স্ত্রী বলেন তিনি সব কথা খুলে জানাতে রাজী, কিন্তু কেবলমাত্র হাকিমের সম্মুখে। তখন খাস কামরা থেকে আর সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়, মুরলীকেও। হাকিম লিখতে শুরু করলে ভদ্রমহিলা তাঁকে বারণ করেন। তিনি কলম থামান। কাজেই বয়ানের কোনো রেকর্ড থাকে না। বয়ানের মর্ম : অভিরামবাবুর স্ত্রী স্বামীর মতিগতি দেখে ক্রমে ক্রমে উত্যক্ত হয়ে ওঠেন। মুরলীর সঙ্গে শোওয়া-বসা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে শুনে তাঁর সন্দেহ জন্মায় যে মুরলী হয়তো পুরুষের বেশে নারী। তাই যদি হয়ে থাকে তবে মুরলী যেমন তাঁর স্বামীকে সুখী করতে পারবে তিনি কি তেমন পারবেন? নাচ গান বাজনা এর কোনোটাই তিনি জানেন না। শিখতে চাইলে মুরলীর কাছেই শিখতে হয়। চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কর্তা বিমুখ। ঘরের বৌকে নাচ গান বাজনা শিখতে দিলে সে কি আর বৌ হয়ে থাকবে? সে হবে বাইজী। কী ঘেন্না! এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে বিরোধ বেধে যায়। তখন তিনি একদিন কাউকে না জানিয়ে রাত থাকতে পুরী যাবার জন্যে রওনা হন। অবাক হন যখন বেশ কিছুদূর গিয়ে আবিষ্কার করেন যে তাঁর অনুসরণ করছে আর কেউ নয়, মুরলী। তার রাতের বেলার নারী-সাজ সে ছাড়েনি। দিনের বেলার পুরুষ-সাজ পরেনি। পায়ে হেঁটে তাঁরা রেলস্টেশনে যান, সেখানে পুরীর ট্রেন ধরেন। পুরীর এক ধর্মশালায় পুলিস গিয়ে তাঁদের পাকড়ায়।

হাকিম অভিরামবাবুকে ডেকে পাঠান। সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, মুরলীকে যদি ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয় তা হলে যা দাঁড়াবে তার জন্যে কি তিনি প্রস্তুত? ভদ্রলোক আর্তনাদ করে ওঠেন—না, না, ধর্মাবতার, অমন কাজটি করবেন না। আমার স্ত্রীকে আমি ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর করে রাখব। মুরলীকে আপনি ছেড়ে দিন। ও যেন এ তল্লাট ছেড়ে বরাবরের মতো চলে যায়। পাথেয় যা লাগবে

আমি যোগাব।

হাকিম ভেবে দেখেন ওর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। পারিবারিক শান্তি ওইভাবেই ফিরে আসতে পারে। ডাক্তার যদি বলেন যে মুরলী নারী নয় পুরুষ তা হলে অসতী বলে ভদ্রমহিলার কলঙ্ক রটবে। স্বামীর কী। আবার বিয়ে করবেন। আর যদি পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে মুরলী পুরুষ নয় নারী তা হলে ভদ্রলোকের মাথা কাটা যাবে।

পুলিস যদি চার্জ শীট দেয় প্রধান সাক্ষী তো হবেন অভিরামবাবুর স্ত্রী। তাঁর উক্তি সত্য হলে মুরলীর কী অপরাধ? আর মিথ্যা হলে মিথ্যাবাদিনীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে কি? আর অভিরামবাবু যদি সাক্ষী দিতে দাঁড়ান কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে না তো? আদালত সত্য উদ্ধার করতে চান, কিন্তু সত্য যেখানে সাপ সেখানে একটা ধামা এনে চাপা দেওয়াই নিরাপদ নয় কি? নইলে পরিবারটা উৎসন্ন যাবে। মুরলীর এমন কী ক্ষতি হবে।

ছোট শহর। একটা সেনসেশনাল কেসের জন্যে সবাই উদগ্রীব। কিন্তু কেস আর হলো কোথায়। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। পুলিস দিল ফাইনাল রিপোর্ট। মুরলী পেল ছাড়া। পেয়ে নিরুদ্দেশ। অভিরামবাবুর স্ত্রী হলেন কলঙ্কমুক্ত। অভিরামবাবু রইলেন অনিন্দিত। কিন্তু শুরু হয়ে গেল রাস্তায় ঘাটে বৈঠকখানায় অন্দরে বাদ প্রতিবাদ। একপক্ষ বলে পরের বৌঝিকে বার করে নিয়ে যাবে, তার কোনো শাস্তি হবে না? অপরপক্ষ বলে ফুসলানির মামলায় যার শাস্তি হয় সে নারী নয়, পুরুষ। মুরলী কি পুরুষ? একপক্ষ বলে, বেশ তো ডাক্তারের কাছে পাঠালেই হতো অপরপক্ষ বলে, ডাক্তার যদি রিপোর্ট দিত মুরলী নারী, তা হলে সাজানো মামলার জন্যে অভিরামবাবুর হতো শ্রীঘর। একপক্ষ বলে, যদি রিপোর্ট দিত মুরলী পুরুষ তা হলে? অপরপক্ষ বলে তা হলে অভিরাম হতেন রামায়ণের রাম। সীতাকে কখনো ঘরে নিতেন না। ধর্মশালা তো অশোককানন নয়। একপক্ষ বলে অন্যায়কে ধামাচাপা দেওয়াটাও অন্যায়। অপরপক্ষ বলে অন্যায় তো মুরলার উপরেই হয়েছে। স্বামীস্ত্রী দু'জনেই তাকে দুইভাবে ব্যবহার করেছেন।

আমাদের সংসারে আমার ঠাকুমার মতই চূড়ান্ত। তিনি বলেন ও ছিল মহাভারতের বৃহন্নলা। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অজ্ঞাতবাস করছিল। অর্জুনও তো নৃত্যগীত শেখাতেন। কলিযুগের উত্তরা হচ্ছে অভিরামের বৌ চপলা। তৃতীয় পক্ষ বলে ভারী অভিমানী। হারমোনিয়াম বাজাতে চেয়েছিল। বাজাতে দিল না বলেই তো এ বিভ্রাট।

এই মহাভারতীয় ব্যাখ্যা আমাদের পাশের বাড়ির মাসিমাদের হাসির খোরাক। তাঁরা বলেন, সব সময় বুকে কাপড় বেঁধে রাখে কোন বেটাছেলে? লুকিয়ে থাকে দিব্যি গোলগাল দুটি ডালিম। আর চাউনিটিও ডাইনীর মতো। মা গো, মা। কী কাণ্ড। মুনিদেরও মন টলে। অভিরামবাবু তো তুচ্ছ প্রাণী। তা বলে গৃহত্যাগও তো ভালো নয়। কেন যে ও কর্ম করতে গেল বৌটা। ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

হয়তো মাসিমাদের অনুমান ভুল। কিন্তু তাই যদি হবে তো প্রকাশ্য দিবালোকে কেউ কোনোদিন মুরলীকে পুকুরে বা কুয়োতলায় নাইতে দেখেনি কেন?

॥ তিন ॥

কথা সাঙ্গ হলে মণ্টুদা হেসে বলেন, 'এটা কিন্তু গল্প নয়। গুল্প।'

তা শুনে শশধর তেড়ে আসেন—'কেন? এ রকম তো আজকাল হামেশা ঘটছে। এই তো সেদিন রাজশাহীর একটি কলেজ বয় অপারেশনের পর কলেজ গার্ল বনে যায়। তার পরে ওর এক সহপাঠীর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে না, সাদী।'

'পয়েন্ট সেটা নয়।' তর্ক করেন মণ্টুদা। 'মুরলীকে নারী বানাবার জন্যে খোদার উপর খোদকারীর দরকার ছিল না। সে নারী হয়েই জন্মেছিল। নিরাপদে চলাফেরার জন্যে জীবিকার সন্ধানের জন্যে ওকে সাজতে হয়েছিল পুরুষ। এই তো সেদিন কাগজে পড়লুম কে একজন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় সারাজীবন পুরুষের দলে পুরুষরূপে খেলে গেল, ধরা পড়ল মৃত্যুর পরে সে নারী। হ্যাঁ, এ রকমও মাঝে মাঝে হয়।'

অনুপম তর্কে যোগ দেন। 'তাই যদি হয় এটা তবে গুল্প হতে যাবে কেন?'

'হবে এইজন্যে যে, নারীকে হাজার মোহনরূপে সাজালেও আর একটি নারী স্বামী ও সংসার ছেড়ে তার সঙ্গে ইলোপ করবে না।' মণ্টুদা সবজান্তার মতো বলেন।

তা শুনে বাণীদি ফোঁস করে ওঠেন। 'ইলোপ করা বলতে কী বোঝায়? আমি যদি আমার স্বামীর ওপর রাগ করে হাওড়া স্টেশনে যাই আর আপনি যদি আমাকে ফিরিয়ে আনতে আমার পিছু পিছু যান তা হলে সেটাও কি হবে ইলোপমেণ্ট?'

'হুঁ! পুরীর ধর্মশালায় একত্রবাস কিসের ইঙ্গিত!' মণ্টুদার শ্লেষ।

মিসেস দত্ত জ্বলে ওঠেন।—'বাণী আর আমি যদি দার্জিলিং মেলে দার্জিলিং যাই আর একই বোর্ডিং হাউসে একই ঘরে সীট পাই তা হলে তুমি কি বলবে আমরা ইলোপ করেছি।'

মণ্টুদা সবিনয়ে বলেন, 'কিন্তু বৌদি, আপনি যে নিঃসন্দেহে নারী।'

দত্তসাহেব ফোড়ন দেন, 'কিন্তু আমি যদি বলি যে আমি নিঃসন্দেহ নই?'

সঙ্গে সঙ্গে বেধে যায় ফ্রী ফাইট। মারামারি নয়। চেঁচামেচি। কান্নাকাটি। মুরলী নারী না পুরুষ থেকে মণ্টুদা পুরুষ না নারী, বাণীদি নারী না পুরুষ ইত্যাদি বিষম বিষম প্রশ্ন। সকলেই সকলের দিকে সন্দেহের চোখে তাকান। দত্তসাহেব উস্কে দেন।

পরিস্থিতিটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে শিশিরদা শান্তিজল ছিটান। —'ভেবে দেখছি আমার ঠাকুমার কথাই ঠিক। মুরলী ছিল মহাভারতের বৃহন্নলা। যুগটা কিন্তু দ্বাপর নয়, কলি। তাই উত্তরা করল তার অনুসরণ। মনে রেখ, অর্জুন ছিলেন অজ্ঞাতবাস কালে উর্বশীর অভিশাপে পুরুষত্বহীন। ধর্মশালায় অজ্ঞাতবাসও তার আওতায় আসে। উত্তরা নিরাপদ।'

তখন আমাদের সকলের মুখে হাসি ফিরে আসে।

সব শেষের জন

আমার ছোট মেয়ে তোতা আমাকে বকুনি দেয়। 'বাবা, তুমিও কি ওর মতো এক চোখ কানা? আরেক চোখে ছানি? এই দ্যাখ কেমন টেরাবাঁকা সেলাই করেছে। হা হা হা। এই জুতা পায়ে দিয়ে তুমি বেরোবে?'

বড় মেয়ে মিতা বলে, 'শুনবেন, জ্যাঠামশায়, বাবার কাণ্ড। নতুন জুতো কিনে দিলে বাবা তুলে রাখবেন, পরবেন না। ওই পুরানো জুতো আমরা কতবার ফেলে দিয়েছি। উনি কুড়িয়ে এনে পরবেন। মাহাঙ্গুকে দিয়ে সারাবেন। ওই তো কাজের ছিরি। ওই পুরানো জুতো সারাতে যত খরচা হয়েছে তা দিয়ে দু'জোড়া নতুন জুতো কেনা যায়।'

জ্যাঠামশায় অর্থাৎ আমার বন্ধু লেনিন হেসে বলেন, 'ওকে গান্ধীবাদে পেয়েছে। ওই বুর্জোয়া বিভ্রান্তি থেকে ওকে মুক্ত করতে না পারলে নতুন জুতো কি ও কোনো দিন পায়ে দেবে? নতুন সমাজও তেমনি আকাশে তোলা থাকবে। মাটিতে নামবে না। এই তালি দেওয়া সমাজের গায়ে তালির পর তালি পড়বে।'

তোতা-মিতার মা ততক্ষণ ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন। জুতোর দিকে নজর পড়ায় তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'মাহাঙ্গুর কীর্তি জাদুঘরে রাখবার মতো। গৃহস্থের সংসারে মানায় না। জানেন, দিদি, মাহাঙ্গু হচ্ছে একটি হিন্দুস্থানী মুচি। এক চোখ কানা। আর এক চোখে ছানি। কাজ পায় না, উনিই যোগান। যোগাবেন কী করে, যদি পুরানো জুতো পায়ে না দেন, যদি সে জুতো সাতদিন অন্তর সারাতে না হয়। আর সব মুচি যার জন্যে আট আনা পায় মাহাঙ্গু পায় তার জন্যে এক টাকা। কারণ তার সময় লেগেছে দুগুণ। উনি বলেন, দোষটা তো ওর নয়। ও ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করেনি। কাজেই ওটা ওর নায্য পাওনা। আমি যদি বলি যে ওটা আমাদের ন্যায্য দেনা নয় তা হলে উনি রাস্‌কিনের দোহাই দেবেন।'

'রাসকিন ওটা পান যীশুর কাছ থেকে। আর গান্ধীজী ওটা পান রাসকিনের কাছ থেকে। আর অনাদি ওটা পেয়েছে গান্ধীজীর কাছ থেকে। দু'হাজার বছরের পুরানো মতবাদ। খাপ খাবে কেন নয়া দুনিয়ার গায়ে? বা পায়ে?' ক্রুপস্কায়া হেসে উড়িয়ে দেন।

আমি আপনভোলা অন্যমনস্ক মানুষ। লেখার কাজ নিয়ে যখন ব্যাপৃত থাকি তখন কেউ আমার ধ্যানভঙ্গ করলে আমি বিষম রাগ করি। রুইদাসরা—আমি ওদের মুচি বলিনে, ওটা অপমানকর—আমাকে জ্বালায়। কেবল একজন বাদে। সে ওই মাহাঙ্গু! আমি ঘরে বসে কাজ করছি, বারান্দা খালি, সে বারান্দায় পা দিতেও সাহস পায় না, পাছে আমার বাড়ি অশুচি হয়। যদিও আমি ওকে অভয় দিয়েছি যে আমরা কেউ জাত মানিনে তবু ও তো মানে। মানে বলেই গাছতলায় ওর ঝোলাটি কাঁধ থেকে নামায় ও কখন আমার সময় হবে তার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করে। একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর এক সময় আমার কানে আসে। 'মাহাঙ্গু।'

'ওঃ! মাহাঙ্গু? আচ্ছা, হাম আতেহেঁ। বলে আমি আরো পাঁচ সাত মিনিট ওকে খাড়া রাখি। তারপর দু' তিন জোড়া জুতো বার করে দিই। পালিশের কাজ। দরকার হলে সারানোর কাজ। ফী বারেই ও একটা না একটা মেরামতির কাজ খুঁজে পাবেই। শুকতলা ক্ষয়ে গেছে। সেলাই খুলে গেছে। চামড়া ফেটে গেছে। এমনি সব বৈকল্য ওর কানা চোখে ধরা না পড়ুক ছানি-পড়া চোখ এড়ায় না। আমি বলি, আচ্ছা, বানাও। ও তখন অখণ্ড মনোযোগে বানায়। আমিও ফিরে এসে

আমার বানানোর কাজে অখণ্ড মনোযোগ দিই।

আমারই মতো ওর কাঁচাপাকা চুল। তবে আমাকে ওর মতো সারাদিন কাজের ধান্দায় টহল দিয়ে ঘুরতে হয় না। সারা অঙ্গে খরা বর্ষা শীত পোহাতে হয় না। খাবার যথাকালে আমার মুখের সামনে পৌঁছয়। আমার যা অভাব তা সময়ের অভাব। আর ও বেচারার সময় যেন ফুরোতেই চায় না। কাজ কোথায়? কে দিচ্ছে? দিলে তো তখুনি বিদায় দিয়ে দেবে। ধরিয়ে দেবে দু'আনা কি চার আনা। তাতে কি অত বড়ো সংসারের পেট ভরে? আমার সঙ্গে ওর একটা অলিখিত বন্দোবস্ত। ও যত ইচ্ছা সময় নেবে। কাজ সারা হলেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাকে ডাকবে না। জানালা দিয়ে তাকালে পরে নজরে পড়বে কয়েক জোড়া জুতো বারান্দায় তোলা। একটি মানুষ গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। নিচে মাটির উপরে পাতা একটা লোহার ফর্মা। চামড়া, পেরেক ইত্যাদি টুকিটাকি। কয়েক কৌটো বুট পালিশ। একটা পুরানো ময়লা ঝোলা, মোটা ক্যানভাসের কি চটের।

'ক্যা মাহাঙ্গু? কাম খতম?' আমি বাইরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'হুজুর।' বলে ও একটি শব্দে উত্তর দেয়।

আমি অত খুঁটিয়ে দেখি নে সেলাইটা সিধে না বাঁকা, শুকতলাটা পুরো মাপের না খাটো, তালিটা নতুন চামড়ার না পুরানো চামড়ার। আমার অত সময় কোথায়? আর মাহাঙ্গু লোকটা অক্ষম হতে পারে, অসাধু নয়। ওর যেটুকু বিদ্যে তাতে ওর চেয়ে ভালো আশা করা যায় না। ও তো শহরের বা কারখানার কারিগর নয়। বেহারের মুঙ্গের বা ভাগলপুরের দেহাতী চর্মকার। এখন নিবাস বোলপুর।

সময়ের দাম কাকে বলে ও জানে না। আমি জানি। তাই ওকে আমি আমার হিশাবমতো পারিশ্রমিক দিই, সেটা হয়তো অন্যের তুলনায় বেশি। কিন্তু এটাও কি ঠিক নয় যে ও আমাকে অবাধে লিখতে দিয়েছে, মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমার লেখা মাটি করেনি, যেটা কমবয়সী রুইদাসরা অবুঝের মতো করে। ওরা আসে ঘোড়ায় চড়ে। চড়াও হয় যখন তখন। আমি ওদের সাফ বলে দিই যে মাহাঙ্গু থাকতে আর কেউ আমার পছন্দ নয়। মাহাঙ্গুকে ওরা দেখতে পারে না। ওর বিরুদ্ধে যা তা বলে। আমি ভাগিয়ে দিই।

কিন্তু ছিল এর পেছনে আরও একটা কথা। সেটা একটা তত্ত্ব। আমি বিশ্বাস করি যে মাহাঙ্গুর জীবনই আদর্শ জীবন। ও কাউকে শোষণ করে না। কারো কাছে বিবেক বাঁধা দেয় না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন আনে দিন খায়। কাল কী খাবে তা চিন্তা করে না। যীশুখ্রীস্ট যেমনটি চেয়েছিলেন। আর গান্ধীজী যেমনটি চান। যীশু যাদের বলেছেন সব শেষের জন মাহাঙ্গু হচ্ছে তাদেরই একজন। তারা কাজ করতে চাইলেও কাজ পায় না, পায় বেলাশেষে। তবু তারাও পাবে সকলের সমান মজুরি। দৈনিক আয় হবে সকলের সমান। কেউ যদি কানা হয়ে থাকে বসে থাকাটা তার ইচ্ছার অভাব নয়, তার ক্ষমতার অভাব। তার দরুন তার রোজগারের কমতি যেন না হয়। দিনের শেষে যেন হয় সব শ্রমিকের সারাদিনের রোজগারের সমান।

রাসকিনের 'আনটু দিস লাস্ট' পড়ে গান্ধীজীর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি তার অনুবাদের নাম রাখেন 'সর্বোদয়'। তা না রেখে রাখা উচিত ছিল 'সব শেষের জন'। কেননা জোর দেওয়া হচ্ছে সমাজের দুর্বলতম অংশের উপরে, যারা মেহনত করতে রাজী অথচ মেহনতের সুযোগ যাদের কম কিংবা তার বিনিময়ে প্রাপ্তি যাদের যথেষ্ট নয়। মাহাঙ্গু একটা প্রতীক। কিংবা একজন প্রতিনিধি। আমি চেষ্টা করছি ওকে অন্যান্য রুইদাসের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতে। নইলে ও হেরে যাবে। না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

আমার কৈফিয়ত শুনে বৌদি বলেন, 'এটা কিন্তু ঠিক নয় যে মাহাঙ্গু সেলাই টেরাবাঁকা

কবেও সমান মজুবি পাবে। আজকাল এমন মিস্ত্রী তুমি ক'জন পাবে যে ইচ্ছে কবে কামাই কবে না, দেবিতে আসে না, ফাঁকি দেয না? অক্ষম বলে মাহাঙ্গুকে তুমি ছাড দিতে পাবো কিন্তু ফাঁকিবাজবাও অক্ষম বলে তোমাব দাক্ষিণ্যেব সুযোগ নেবে, অনাদি। মাহাঙ্গুকে তুমি বাঁচাতে চাও বাঁচাও। কিন্তু ওটা তোমাব ব্যক্তিগত নীতি। সমষ্টিগত নীতি অত নবম হলে চলবে না।'

দাদা তাব লেনিন-মার্কা দাডিতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'হিন্দু সমাজ যাদেব পাযেব তলায বেখেছে আব বুর্জোযা শ্রেণী যাদেব বক্ত চুষে ফুলছে তাদেব সমস্যা কি ওভাবে মিটতে পাবে কখনো? করুণাসাগব বিদ্যাসাগব হযে তুমি কযেকজনকে বাঁচিযে বাখতে পাবো। কিন্তু কযেক কোটিকে বাঁচাতে পাববে কী কবে? আব সেই কযেকজনকেই বা সমাজে তুলতে পাববে কি শুধু হবিজন আখ্যা দিযে? চেযে দ্যাখ সাঁওতালদেবও কর্মাভাব ও অন্নাভাব কিন্তু হিন্দু সমাজেব নিচেব তলা না হযে ওবা ওদেব সমাজেবই একমাত্র তলা। তাই আব কাবো কাছে ওদেব মাথা হেঁট নয। ওই যে সাঁওতাল মেঝেন তোমাদেব বান্নাঘবেও ঢোকে ও যদি মাহাঙ্গুব বৌ হতো তাহলে কি ওব অত সাহস হতো?'

মাহাঙ্গু তখনো বাইবে দাঁডিযে অপেক্ষা কবছিল। আমি ওকে ডেকে বলি, 'সিলহাই সিধা নেহি হুযা। খোলকে ফিব ভি বনাও।'

আমাব হিন্দী শুনে সবাই হেসে ওঠে। মাহাঙ্গুব মাথা আবো হেঁট হয। ও যে ঠিকমতো সেলাই কবতেও পাবে না এটা ওব পক্ষে লজ্জাব কথা।

আমি আমাব ছেলেবেলায ফিবে যাই। তখনকাব দিনে আমাদেব শহবেব মুচিবাই আমাদেব জুতোব মাপ নিযে যেত আব তাই দেখে নতুন জুতো বানিযে দিত। খুব যে আবাম হতো পবে তা নয তবু জিনিসটা খাঁটি স্বদেশী বলে বাবাব কাছে পেতো সমাদব। কাবো কাবো মতে প্রশ্রয। পবে অবশ্য চীনাবাডিব তৈবি জুতোও পবেছি। খুব আবামেব। কিন্তু ইদানীং কাবখানায তৈবি জুতোই পবি। দুঃখ হয এ কথা ভেবে যে দেশেব কাবিগব শ্রেণীটাই লুপ্ত হযে যাচ্ছে। শুধু মেবামতি কবেই তো কাবিগব হওযা যায না। কিংবা শুধু জুতো পালিশ কবে। কাবিগবকে শ্রমিক বানিযে কি উন্নতি হয না অবনতি? ঘোডা পিটিযে গাধা?

আমাদেব দুই বন্ধুব চিন্তা একদা একই খাতে বইত। কিন্তু স্বাধীনতাব পব থেকে ববেনদা ঝুঁকেছেন শিল্পবিপ্লবেব দিকে, পবেব ধাপ সমাজবিপ্লবেব দিকে। আব নিভাদিকেও ভজিযেছেন যে রুশদেশে টলস্টয যা পাবলেন না লেনিন তা পাবলেন। অতএব ভাবতকেও টলস্টয মার্গ বা গান্ধী মার্গ ত্যাগ করে লেনিন মার্গ ববণ কবতে হবে। তবে ওবা কেউ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেননি। ওঁবা যে ১৯৪২ সালেব আগস্ট আন্দোলনেব যোদ্ধা। অযোদ্ধাদেব সঙ্গে ওদেব মিলতে বাধা। এখনো ওঁবা জবাহবলালেব সঙ্গেই আছেন। একদিন ওঁকেও লাল কববেন এই আশায।

'আমি করুণাসাগবও নই, বিদ্যাসাগবও নই, তবে আমি নিজে একজন কাবিগব বলে কাবিগব শ্রেণীটাকে ভালোবাসি। তাই শিল্পবিপ্লবকে মনে কবি পবধর্ম। আব সমাজবিপ্লবকে ভযাবহ। তোমাব সঙ্গে মিল হবে কী কবে, ববেনদা? আমবা যে দিন দিন দূবে চলে যাচ্ছি পবস্পবেব কাছ থেকে।' আমি আক্ষেপ কবি।

'তুমি যদি শিল্পবিপ্লব রুখতে না পেবে থাক তবে সমাজবিপ্লবকেও রুখতে পাববে না, অনাদি। এ জলতবঙ্গ বোধিবে কে? তোমাব ওই মাহাঙ্গুবেব জন্যে আমাব মাথায অন্য পবিকল্পনা আছে। ওকে আব ওব মতো সবাইকে বিক্রুট কবে আমবা একটা লেবাব আর্মি গঠন কবব। তেমনি চাষীদেব নিযে একটা ল্যাণ্ড আর্মি। দেশে সবশুদ্ধ তিনটে আর্মি থাকবে। একটা তো সৈনিকদেব আর্মি। আব একটা শ্রমিকদেব। আবও একটা কৃষকদেব। কোনোটাতেই জাতপাত মানা হবে না।

কে যে বামুন কে যে মেথর তা চেনবার উপায় থাকবে না। ইউনিফর্মের আড়ালে পৈতে রাখলেও রাখতে পারো, টুপির আড়ালে টিকি। কিন্তু সবাইকে সব কাজে হাত লাগাতে হবে, যখন যেটা দরকার। শুচি অশুচির প্রশ্ন তুললেই জেল। জেলে গেলে সকলেই সমান। কয়েদীর পোশাক পরে মেথরের কাজও করতে হবে বামুনের ছেলেকে। আর রান্নার ভার থাকবে মুসলমানের উপরে। পরিবেশনের ভার খ্রীস্টানদের উপরে। অনশন করলে সেটাও হবে একটা অপরাধ। সকলে যা খাবে তুমিও তাই খাবে। তবে গোরু শুওরের বাছবিচার থাকবে। কিন্তু ওটাও যুদ্ধকালে নয়। যুদ্ধে বার বার হেরে ওটুকু যদি আমরা শিখে না থাকি তো আবার পরাধীন হব। যে এতে বাধা দেবে তাকে কোর্ট মার্শাল করে বিশ্বাসঘাতকের যে শাস্তি সেই শাস্তি দেওয়া হবে। হাসছ যে?' দাদা বৌদিকে শাসান।

'যুদ্ধকালেও আমি গোমাংস খাব না, তোমার জন্যে রাঁধতেও পারব না, কমরেড। আমার কপালে আছে ফায়ারিং স্কোয়াড। আর তোমার কপালে বিপত্নীক দশা। সাময়িকভাবে অবশ্য।' বৌদি তামাশা করেন।

ওদিকে মাহাঙ্গুর উপর কড়া নজর রেখেছিল তোতা। সে এসে খবর দেয় যে সেলাই এইবার সিধে হয়েছে। আমি যাই, ওর পাওনা চুকিয়ে দিই। দু'বার সেলাই করেছে বলে ও কিছু উপরি প্রত্যাশা করেছিল। দোষটা তো ওর নয়, চোখের। আমি ওর প্রত্যাশা পূরণ করি। ও সেলাম ঠুকে ঝোলাটি কাঁধে তুলে নেয়।

উপরি পাওনার খবরটা জানাজানি হয়ে যায়। মিতা বলে 'আমি জানতুম। ভুল করলেও মজুরি কাটা যায় না, বরং মজুরি বাড়িয়ে নেওয়া যায়। বাবা, এখন থেকে তুমি এসব মার হাতে ছেড়ে দাও। মারও দয়ার শরীর কিন্তু মা তোমার মতো নরম নন। চ্যারিটি করতে চাও চ্যারিটি করো। বলো, আমি দান করলুম। কিন্তু তা তো নয়, এটা হলো দেনাপাওনার ব্যাপার।'

'আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু শুনছে কে? সকলের মুখেই এক কথা। কাজটা যেমন হবে মজুরিটাও তেমনি হবে। ভুল কাজের জন্য খেসারত দেবে যে ভুল করেছে সে। উল্টে আমি যদি দিই তবে ওর শিক্ষা হবে কী করে? ও সাবধান হবে কেন?'

'আমার লেবার আর্মিতে আমি কড়া হব। নরম হব না।' বরেনদা বলেন। দৃষ্টিক্ষীণতার দরুন মাহাঙ্গুকে মোটা কাজ দেওয়া হবে। সূক্ষ্ম কাজ না। কিন্তু কাজ অনুসারেই পাওনা। শ্রমিকদের দিতে হবে ফ্রুট অব লেবার। তার কমও না, তার বেশিও না। ধনিকরা কম দেয়, সেইজন্যে ধনতন্ত্র খারাপ। কিন্তু ধার্মিকরা যদি বেশি দেয় তবে ধর্মতন্ত্রও কি ভালো? কর্ম অনুসারে ফল কর্মফল। এইটেই শাশ্বত নীতি। এই নীতি কোনো পক্ষই লঙ্ঘন করতে পারবে না।'

'শ্রমিক যদি অন্ধ হয়, অক্ষম হয় তাহলেও না?' আমি আপত্তি জানাই।

'আহা, শোন সবটা।' বরেনদা দাড়িতে হাত বুলোন। 'কর্ম অনুসারে ফল মেনে নিলেও একটা ন্যূনতম মজুরি থাকবে। তার সঙ্গে মিলিয়ে একটা ন্যূনতম খাটুনিও। আলসেমি আমি বরদাস্ত করব না। তোমাকে ডাকবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানবে এটা খাটুনির মধ্যেও পড়ে না অবসরের মধ্যেও না। এটা হচ্ছে আশকারা। চাই ডিসিপ্লিন।'

ডিসিপ্লিন শুনে আমি শিউরে উঠি। 'তোমরা কি ইন্টেলেকচুয়ালদেরও ডিসিপ্লিন শেখাবে?'

'আলবৎ। তোমাকে আর তোমার মতো সাহিত্যিকদেরও।' বরেনদা হাসেন। 'তবে তোমাদের নিয়ে আরও একটা আর্মি গঠন করা হবে না। তাহলে তো সব ক'টাতেই কোর্ট মার্শাল করতে হয়। তোমাদের নিয়ে রাইটার্স ইউনিয়ন।'

'তার চেয়ে', আমি মিতার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলি, 'ফায়ারিং স্কোয়াডই শ্রেয়।'

'না, শ্রেয় নয়।' তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, 'তুমি লিখতেই ভুলে যাবে। পাস্টেরনাকের মতো।'

॥ দুই ॥

এর পরে আমার বিদেশযাত্রা। সে সময় যে নতুন জুতো কেনা হয় সে জুতো পুরানো হতে বেশ কয়েক বছর লাগে। আগেকার পুরানো জুতো আমার মাসেকের অনুপস্থিতিতে কী জানি কেমন করে হাওয়া হয়ে যায়।

বেচারা মাহাঙ্গু! পুরানো জুতো না থাকলে বা নতুন জুতো পুরানো না হলে তো মেরামতির প্রশ্নই ওঠে না। কী নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাবে? ভুল করারই বা উপলক্ষ কোথায়? নতুন জুতোয় কালি লাগায়, তাও আমারই দেওয়া কালি। বুরুষ করে, তাও আমারই দেওয়া বুরুষ। তার রোজগার আর পাঁচজনের চেয়ে কম নয়, বরং বেশি। কিন্তু কতটুকু বেশি? চার আনার জায়গায় আট আনা। এক টাকা দু টাকা তো নয়। পুরানো জুতোই ছিল লক্ষ্মী। পুরানোর উপর নতুন তালি লাগিয়েই ওর নবান্ন।

রোজগার বাড়ানোর জন্যে রোজ রোজ আসাও আমি পছন্দ করিনে। ওতে আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটে। আমিও তো একজন কর্মী। হপ্তায় একবার কি দুবার আসতে বলি। পরে একদিন লক্ষ করি যে তার আর তেমন চাড় নেই। সে কখনো আসে, কখনো কামাই করে, কখনো নিঃশব্দে চলে যায়। যা পায় তার জন্যে অতদূর আসা বা অতক্ষণ থাকা বোধহয় পোষায় না। বিশেষত খরা বর্ষায়।

মাহাঙ্গুর কি অসুখ করেছে, অনেক দিন ওকে দেখিনি। ভজুয়া রুইদাসের মুখে শুনি মাহাঙ্গু আজকাল বোলপুরের আশে পাশে যা পায় তাই দিয়ে দিন গুজরান করে। কমজোরী আদমী। তাকত নেই। মাথা ঘোরে। ইচ্ছা করে ওকে ডেকে পাঠাতে। কিন্তু কোথায় সেসব পুরানো জুতো! আমার হারানিধি! নতুনের তো পুরানো হতে ঢের দেরি। অসময়ে ওর হাতে পড়লে ও ফুঁড়ে ফুঁড়ে নষ্ট করবে।

মাহাঙ্গুর কথা একরকম ভুলেই গেছি। সব শেষের জন বলতে ওই একজনই ছিল আমার সামনে। ওর চেয়ে অক্ষম, ওর চেয়ে অবনমিত, ওর চেয়ে শোষিত মানুষ শত শত আছে কিন্তু একই সঙ্গে অক্ষম তথা অবনমিত তথা শোষিত একটি মানুষকে প্রত্যক্ষ করলে তো বলব, এই আমার সব শেষের জন। তাছাড়া আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই অপরাজিত মানুষ, যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খায়। কারো কাছে হাত পাতে না। আমার কাছে যা পেত তা ওর মেহনতের ফল। আমার দাক্ষিণ্য নয়। লোভ আমি ওর মধ্যে লক্ষ করিনি। আর আলস্য? না, আলস্যও নয়। আমাকে বিরক্ত করতে চায় না বলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মিলটনের উক্তি—'He also serves who stands and waits.'

আমাদের পাড়ার বৈজু মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠালেও আসে না। গেট ভাঙা পড়ে রয়েছে। বাগানে গোরু ছাগল ঢুকছে। হঠাৎ মিস্ত্রির দর্শন পেয়ে আমি মন্তব্য করি, 'পূবের সূর্য আজ পশ্চিমে উদয় যে!'

সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'সত্যানাশ হয়ে গেছে হুজুর।'

'কার সত্যানাশ? তোমার?' আমি তো হাঁ।

'না, মালিক, আমার নয়। আমার আপনার জেলার ভাই বেরাদরের সত্যানাশ। এখন ওরা খাবে কী? কেমন করে ওদের পেট চলবে? সব কটাই তো নাবালোগ। ওই একজনই ছিল রোজগেরে মরদ। জনানালোগ কি ঘর ছেড়ে বেরোতে পাবে? হুজুর ওকে অনুগ্রহ করতেন। এই বিপদে হুজুরই ভরসা।' বৈজু আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে।

'কার কথা বলছ, মিস্ত্রী?' আমি উদ্বেগে অস্থির।

'কেন, মাহাঙ্গুর। ও হো হো হো। বলা যায় না, হুজুর। বলা যায় না। চোখেও দেখা যায় না। এইমাত্র আমি ওর লাশ দেখে আসছি। চাপা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে কী যে করে রেখে গেছে মোটর লরি! ও কি মাহাঙ্গু? মাহাঙ্গু বলে কি চেনা যায়? পুলিস এসে তদন্ত করছে। নিয়ে যাবে লাশ কাটা ঘরে। আহা রে, বেচারা! অমন সাচ্চা আদমি আমি দেখিনি, মালিক। ওর কপালে এই ছিল!' মিস্ত্রি আমার পা জড়িয়ে ধরে।

'তা কী করে ঘটনাটা ঘটল?' আমি সামলে নিয়ে শুধাই।

'হুজুরকে বলতে শরম লাগে। বেশি নয়, মাহাঙ্গু একটু-আধটু শরাব পিত। বেশি নয়, রোজ দশ আনার। কাল ছিল ঝড়-বৃষ্টি অন্ধকার। কানা মানুষ টলতে টলতে বাড়ি ফিরছিল। নেশার ঘোরে বেহুঁশ। হঠাৎ মোটর লরির সঙ্গে মুখোমুখি। লরির সামনের বাতী দুটো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। অন্ধো লোকটা দুই বাহু তুলে হুঙ্কার ছেড়ে লরির দিকেই এগিয়ে গেল। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল যাদের একটু হুঁশ ছিল। ওকে টেনে সরিয়ে নেবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। ডেরাইভার শালা গাড়ী নিয়ে উধাও। নম্বরটাও কেউ টুকে নেয়নি। ও রাস্তা দিয়ে তো কাঁহা কাঁহা মুলুকের লরি যাওয়া আসা করে। কে জানে কার লরি!' সে এক নিশ্বাসে বলে যায় আর চোখের জল মোছে।

আমার মুখ দিয়ে কথা সরে না। আমি যেন পাথর হয়ে গেছি। এর কি কোনো প্রতিকার আছে? এই অন্যায়ের? ড্রাইভারটাকে ধরতে পারলে বছর দুয়েকের মতো ফাটক। কিন্তু মাহাঙ্গু তো আর প্রাণ ফিরে পাবে না। হায়, হায়, কেন এমন হলো!

'হুজুর তো জজ ছিলেন। হুজুর এক লাইন লিখে দিলেই কাজ হবে। পুলিস ও শালাকে পাকড়িয়ে এনে হাজতে পুরবে। নয়তো আমরাই পাকড়াব আর বদলা নেব। আমরা এখন আজাদী পেয়ে গেছি। আমরাই ওকে ফাঁসিতে লটকাব।' সে রাগে গজরাতে থাকে। মাহাঙ্গুরই সমবয়সী। তেমনি কাঁচাপাকা চুল। কিন্তু বলিষ্ঠ পুরুষ।

আমি ওকে ঠাণ্ডা করি। আশ্বাস দিই যে পুলিস নিশ্চয়ই লোকটাকে পাকড়াবে ও হাকিম নিশ্চয়ই জেলে পাঠাবেন।

'কেন, হুজুর? ফাঁসি হবে না কেন? মানুষ মারবে, নিজে মরবে না? তা হলে বলেছে কেন, যেমন কর্ম তেমনি ফল?' সে জবর প্রশ্ন করে।

আমি এখন এর কী জবাব দিই। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর শুধাই, 'আচ্ছা, বৈজু, দশ আনার মাল টেনে কি অত নেশা হয়? তুমি ঠিক জানো দশ আনা?'

'ঠিক জানি, হুজুর। ও খুব হিশাবী আদমি ছিল। একটুকুও এদিক ওদিক হতো না। দেশী মালে নেশা বেশি হুজুর।' সে সবজানতার মতো বলে।

আমার মাথায় তখন ঘুরছে, মাহাঙ্গু যে রোজ দশ আনা খরচ করত তার কী পরিমাণ আমার দেওয়া মজুরি? মদ খেয়ে ওড়াবে জানলে কি আমি অমন মুক্তহস্ত হতুম? হয়ে কি ওর ভালো করেছি? আবার ভাবি, ওড়াবে না-ই বা কেন, যদি হকের পাওনা হয়ে থাকে? আমি বিচার করবার কে? জজ হয়েছি বলে কি পাপপুণ্যের জজ হয়েছি?

ওর আত্মার সদ্‌গতি হোক। এপারের পাপ এপারেই পড়ে থাক। এপারের পুণ্য ওপারের সাথী হোক। আমি মনে মনে প্রার্থনা করি।

মাঝে মাঝে ভাবি মাহাঙ্গুর কথা। পরনে খাটো ধুতি, খাটো কুর্তা। তার উপর একটা চাদর জড়ানো। মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ বোধহয় গেছে মায়ের কৃপায়। বসন্তকে গ্রামের লোক বলে মায়ের কৃপা। মা শীতলার। মাহাঙ্গু তার হ্যাণ্ডিক্যাপ নিয়ে লড়াই করে গেছে আজীবন। এমন যোদ্ধা কজন আছে যাদের পানদোষ নেই? সেইজন্যেই তার প্রাণ যাবে এটা কিন্তু আমি মেনে নিতে পারিনে। কী নিষ্ঠুর নিয়তি।

(১৯৭৬)

বিনা প্রেমসে না মিলে

এটা বরযাত্রীদের ডেরা। বিয়ে হয়ে গেছে। বাসি বিয়ের দিন বাসায় একা শুয়ে শুয়ে শান্তিনিকেতনের কথা ভাবছি। বৌভাত সেখানেই হবে। এমন সময় তাঁর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। দেখে চমকে উঠি। আমার ছেলেবেলার হেডমাস্টারমশায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

অবনত হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করি। সত্যি, এমন মানুষ আর হয় না। নিমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়নি। থাকেন কোন্ সুদূর পল্লীগ্রামে। চিকিৎসার জন্যে মাঝে মাঝে কলকাতা আসেন। কিন্তু আমি তো কলকাতা থেকে দূরে। দেখাসাক্ষাৎ হয় না। ছেলেবেলায় যেমনটি দেখেছি তেমনি ছিপছিপে গড়ন, তেমনি দীর্ঘ সরলরেখা, চলাফেরায় তেমনি ফরফরে ভাব। চুলে অবশ্য রুপোর ছোঁয়া লেগেছে, তবে বয়সের অনুপাতে কিছু নয়। গত বিশ বছরের মধ্যে মাত্র একবার দর্শন দিয়েছিলেন, সেও এই কলকাতায়। সেবার তিনি ও আমি সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাঁরও সময় ছিল না, আমারও না, সেইজন্যে একটা কথা অব্যক্ত রয়ে গেল। স্বর্গে যাবার আগে বাবা তাঁকে আমার সম্বন্ধে ও আমাকে জানাবার জন্যে কী বলেছিলেন। চিঠিপত্রে ঠিকমতো বোঝানো যায় না। সুদিনের অপেক্ষায় ওটা তিনি মনের শিকেয় তুলে রেখে দেন।

নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছি বলে বার বার করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। বলি, 'স্যার যদি একটা দিন আগে আসতেন তা হলে স্যারকে ধরে নিয়ে গিয়ে বরকর্তার আসনে বসিয়ে দেওয়া যেত। স্যার থাকতে আমার কি ওটা মানায়?' আক্ষেপ করি আমি।

'খবরটা তো সবে আজ সকালে পাই। পুটুদের ওখানে। তাছাড়া এই তিয়াত্তর বছর বয়সে ওসব নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার সাধ্যে কুলোয় না। জানো তো আমি চিরকালই একাহারী। রাত্রে শুধু খইদুধ খাই।' তিনি সহাস্যে বলেন।

মনে ছিল আমাদের উনি শিক্ষা দিয়েছিলেন জীবনযাত্রা সরল ও সাদাসিধে করতে। আমরা খালি পায়ে স্কুলে যেতুম। জামার দরকার কী, ধুতির উপর চাদরই যথেষ্ট। তাও যদি না জোটে তা হলে ধুতির একপ্রান্ত চাদরের মতো জড়ালেও চলবে। তিনিও তাই করতেন। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়। তবে স্কুলটা তো তাঁর নয়। যাঁদের স্কুল তাঁরা অতটা আটপৌরে হতে বারণ করে থাকবেন। কে জানে কখন ইনস্পেকটার সাহেব এসে পড়েন। আমরাও সেই ভয়ে একে একে জামা জুতো পরি। একসপেরিমেন্টটা যুদ্ধের সময় বছর কয়েক চলেছিল। তাতে আমাদের অভিভাবকদের

খরচ বেঁচেছিল। হেডমাস্টারের উপর তাঁরা খুশি।

আমার মনে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করেন আমার বাবা। চারাগাছে জল সেচন করেন হেডমাস্টারমশায়। কিন্তু বয়স যতই বাড়ে ততই আমি এঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাই। আমার কথাবার্তা শুনে কার্যকলাপ দেখে এঁরা আমার ভবিষ্যতের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। স্কুলের পর কলেজের ছ' বছর আমি অন্যত্র পড়াশুনা করি। ছুটিতে বাড়ি আসি। বাবার মনের নাগাল পাইনে। মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করি, বাবা কী ভাবছেন। তাঁর মুখেই শুনি। তিনিও জানতে চান আমি কী ভাবছি। তাঁকে জানাই। তাঁর মারফত বাবাকে। তিনি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ বেড়াতে যান। বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বাবা জিজ্ঞাসা করেন, 'হেমেনবাবু, আপনার শিষ্যকে কেমন দেখছেন? ও কি শেষকালে আর একটা কালাপাহাড় হবে?' মাস্টারমশায় বলেন, 'হ্যাঁ, আইকোনোক্লাস্ট। তবে তলোয়ারের জোরে নয়, কলমের জোরে। আপনি ভাববেন না চন্দ্রবাবু, চারু কেবল ভাঙতে নয়, গড়তেও চায়। গড়তে চায় বলেই ভাঙতে চায়। কালাপাহাড় কি গড়ার জন্যে ভাঙত? না ভাঙার জন্যে ভাঙত?'

কলেজে গিয়ে আমি টুর্গেনেভের 'ফাদারস অ্যাণ্ড সান্‌স' পড়ি। হয়ে উঠি আর একটি বাজারভ। তবে ঠিক নাইহিলিস্ট নয়। অ্যানারকিস্ট। শব্দটার অপব্যবহার হয়েছে। বোমার সঙ্গে রিভলভারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তরুণ যখন অধৈর্য হয় তখন যে-কোনো উপায়কেই মনে করে ফেয়ার মীনস। তা যদি হয় তবে আনফেয়ার মীন্‌স বলে কিছু থাকে না। না, আনফেয়ার মীনস আমি সমর্থন করিনে। তার বেলা আমি বাপকা বেটা। মাস্টারমশাইকে, তাঁর মারফত বাবাকে, অভয় দিই যে অন্যায় উপায়ে আমি কোনো প্রকার ওলটপালট ঘটাব না। না সমাজের, না রাষ্ট্রের, না ধর্মের, না নীতির। তা বলে নিষ্ক্রিয়ও থাকব না।

এক এক সময় আমার মনে হতো যে বাজারভের মতোই আমার অকালমৃত্যু হবে। কিছুই করে যেতে, কিছুই দেখে যেতে পারব না। ব্যর্থ, পরাজিত গৃহপ্রত্যাগত পুত্র। আমার পিতার নীড়ই আমার শেষ আশ্রয়। প্রিয়া আমাকে ধরা দেবে না, বন্ধুরা যে যার পথ ধরবে, আপনার বলতে আমার আর কে থাকবে! ওই নিষ্ঠাবান প্রৌঢ় বৈষ্ণব। একদিন ওঁরই কোলে মাথা রেখে আমাকে বলতে হবে, 'বাবা, আমি হেরে গেছি। আমি আর বাঁচতে চাইনে।' তখন আর মাস্টারমশায়ের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হবে না। পিতাপুত্রের মিলন হবে। কিন্তু সে মিলন বিয়োগান্ত।

মা আমার মতিগতি জানতেন, তাই নোটিশ দিয়ে রেখেছিলেন যে আমি কলেজে পড়তে গেলে তিনিও আমার সঙ্গে যাবেন ও কলেজের কাছেই আমাকে নিয়ে বাসা করে থাকবেন। কিন্তু আমার ম্যাট্রিকের পরেই তিনি স্বর্গে চলে যান। আমার তো মনে হলো তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়ে গেলেন। নইলে মাতৃস্নেহের উৎপাত থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারত না। পিতৃস্নেহ সেদিক থেকে উদার। আমি যে আর-একটা কালাপাহাড় হতে চলেছি এতে তিনি দুঃখিত। কিন্তু বাধা দিতে অনিচ্ছুক। কখনো তিনি বলতেন না যে তাঁর মতটাই মেনে নিতে হবে। তর্কের গন্ধ পেলেই তখনকার মতো চেপে যেতেন। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণের সময় দেখা হলে তাঁর সঙ্গে নিতেন। আমার কথাটা তাঁকে শোনাতেন। নিজের কথাটাও। তাঁকেই বলতেন আমাকে একটু বোঝাতে। তা শুনে আমিও মাস্টারমশায়কে বলতুম বাবাকে একটু বোঝাতে। বোঝাপড়া যা হবার সেইভাবেই হতো। নয়তো নয়।

মাস্টারমশায় আমাকে জানাতেন যে আমার কেরিয়ার নিয়ে আমার বাবা আমাকে একটি কথাও বলবেন না। আমি আমার ইচ্ছামতো কেরিয়ার বেছে নেব ও ভুল করলে পস্তাব। তবে আমি যদি পরের চাকর হই তা হলে তিনি মনে কষ্ট পাবেন। উপার্জন যতই সামান্য হোক না কেন স্বাধীন

জীবিকাই শ্রেয়। উপার্জন যত বেশিই হোক না কেন পরাধীন জীবিকা হেয়।

আমি বলতুম, 'মতভেদ তো তা নিয়ে নয়, স্যার। বাবাকে আমরা যখনি প্রণাম করি তিনি মালাঝুলিতে হাত গলিয়ে মালা গড়াতে গড়াতে আশীর্বাদ করেন, কৃষ্ণে মতি হোক। আমি ঈশ্বর মানি বলে যে অবতার মানি তা নয়। কেন উনি সোজাসুজি বলেন না যে ঈশ্বরে মতি হোক। মা যেমন বলতেন, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। আমি উপনিষদ পড়ি। তাতে কৃষ্ণ কোথায়? সে যুগে যদি জন্ম নিতুম ঋষিরা কি আশীর্বাদ করতেন, কৃষ্ণে মতি হোক? আমি এখন মনে মনে ব্রাহ্ম হয়ে গেছি, মাস্টারমশায়। মুসলমানদের সঙ্গে খ্রীস্টানদের সঙ্গে মিল কোথায়, অমিল কেন, এসব চিন্তা করছি। অবতারবাদ নয়, একেশ্বরবাদই আমাদের মেলাবে। কিন্তু বৌদ্ধদের তো একেশ্বরবাদী বলতে পারিনে। ওরা ঈশ্বরবাদী নয়। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলাও তো অবতারবাদ। যারা বিষ্ণুই মানে না, তারা কেন স্বীকার করবে যে বুদ্ধ ছিলেন বিষ্ণুর অবতার? তা সত্ত্বেও দেখি বেশ কিছু মিল রয়েছে।'

'তা তো থাকবেই,' তিনি বলতেন, 'চারশো বছর আগেও বাংলাদেশের বহু কায়স্থ পরিবার বৌদ্ধশাস্ত্র ঘরে রাখত। এখনো কায়স্থদের বংশপদবীতে তার রেশ রয়ে গেছে। মাইকেল মধুসূদন যেমন খ্রীস্টান হয়েও 'দত্তকুলোদ্ভব' রাধাকান্ত, কালীপদ, ভূতনাথও তেমনি শাক্ত বা বৈষ্ণব বা শৈব হয়েও ঘোষ বা মিত্র বা পাল বা সেন বা পালিত বা রক্ষিত বা ধর কুলোদ্ভব। আর এটা শুধু কায়স্থদেব বেলা নয়, বৈদ্য ও নবশাখদের বেলাও লক্ষ করবে। শীল পদবী তুমি উত্তরভারতে পাবে না, পাবে বৌদ্ধগ্রন্থে। সেখানে সেটা পদবী নয়, নামের শেষভাগ। পাল পদবী তুমি বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও দেখবে। যেটা ছিল নামের শেষভাগ সেটাই এখন পদবী। বাঙালীরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রীস্টান হয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ কুলোদ্ভব। তাই বৌদ্ধদের সঙ্গে এত মিল।' মাস্টারমশায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্মিতহাসির সঙ্গে বলতেন।

তার মুখেই শুনতুম একটি সংস্কৃত শ্লোক। তার একাংশ মনে আছে। 'অন্তঃশৈবঃ বহিঃশাক্তঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।' ভিতরে শৈব, বাইরে শাক্ত, সভায় বৈষ্ণব। বাঙালী জাতি এইভাবেই একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মুসলমানদের বেলা ব্যর্থ হলো। জাতি তখন থেকেই দু'ভাগ। ইতিহাসে দু'ভাগ হলে ভূগোলেও দু'ভাগ হতে হয়। এটা অবশ্য তাঁর উক্তি নয়, আমারই সিদ্ধান্ত। তৎকালীন নয়, পরবর্তীকালীন।

'এখন ফিরে চল তোমার মূল প্রশ্নে। কৃষ্ণে মতি কেন? ঈশ্বরে মতি কেন নয়?' এর উত্তর তোমাদের রবি ঠাকুরই দিয়ে রেখেছেন। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে মানুষ তার প্রিয় করবে কী করে? তাই তাঁকে সাকার ও সগুণ করতে হয়। প্রথমে চতুর্ভুজ, পরে মানুষ। অন্যদিক থেকেও দেখা যায়। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। কে না তাঁকে ভালোবাসত! যিনি সকলের প্রিয় তিনিই সকলের দেবতা। যেই কৃষ্ণ সেই বিষ্ণু। যেই বিষ্ণু সেই ভগবান। অতএব যেই কৃষ্ণ সেই ভগবান। এ যুক্তি যদি মেনে নাও, এটা যদি বিশ্বাস কর তবে কৃষ্ণে মতি মানে ভগবানে মতি।'

বাবার সঙ্গে আমার মতবিরোধ কেবল এই একটা মূল প্রশ্ন নিয়ে নয়। সাত্ত্বিক আর রাজসিক আহার ও জীবনধারা নিয়েও দু'জনার দুই মত। আমিষ বলে তিনি শুধু মাছ মাংস নয়, পেঁয়াজ, রসুন, মুসুরের ডাল ইত্যাদি কত রকম খাদ্য বর্জন করেছিলেন। বিধবাদের জন্যে যে বিধান বৈষ্ণবদের জন্যেও সেই বিধান। তার সঙ্গে যদি ব্রহ্মচর্যকেও জুড়ে দেওয়া হয় তবে বিধবায় আর বৈষ্ণবে তফাতটা কোথায়? আমি ছিলুম ব্রহ্মচর্য বিমুখ। একই কারণে গান্ধীজীর সঙ্গেও মতবিরোধ। বৈধব্যসাধনে যে স্বরাজ সে আমার নয়।

॥ দুই ॥

'তোমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে তিনিই হতেন বরকর্তা। খুশি হয়েই হতেন।' সেদিন মাস্টারমশায় আমাকে অবাক করে দেন।

'কিন্তু আমি যতদূর জানি তিনি আমার বিয়েতেই আন্তরিক সুখী হননি, যদিও তাঁর বৌমাকে পরে গ্রহণ করেছিলেন।' আমি মুখ ফুটে বলি।

'ওটা তোমার ভুল ধারণা, চারু।' তিনি মৃদু হেসে তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলেন, 'কত বড়ো একটা ভুল ধারণা এতকাল ধরে পোষণ করছ তুমি! তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আমার অনেকবার কথা হয়েছিল। তোমার বিবাহ তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বৌমাকে তো তিনি মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন। তাঁর মনে কেবল এই একটি আশঙ্কা ছিল যে তোমাদের ছেলেমেয়েদের হিন্দুসমাজে বিয়ে হবে না। বেঁচে থাকলে দেখে যেতেন তাও কেমন করে সম্ভব হলো। অন্তত তাঁর বড়ো নাতির বেলা।'

হ্যাঁ, এ নিয়ে তাঁর মনে একটা সত্যিকার দুর্ভাবনা ছিল। ধর্মগত কারণে নয়, বর্ণগত কারণে নয়, দেশগত কারণে নয়, আমার বিয়েতে তাঁর একটিমাত্র কারণে আপত্তি ছিল। 'তোদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হবে কোন্ সমাজে?'

মাস্টারমশায় বলেন, 'শেষের দিকে লক্ষ করেছি তিনি তোমার বিয়েতে সম্পূর্ণ সুখী হয়েছিলেন। তাঁর নাতিরা তাঁর বংশরক্ষা করেছে এতেই তাঁর আনন্দ। ভগবান তাদের বাঁচিয়ে রাখুন, এই তাঁর প্রার্থনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই চির আশীর্বাদ, কৃষ্ণে মতি হোক।'

আমি জানতুম না যে বাবা আমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছিলেন। কাজটা তো হয়েছিল বিদ্রোহীর মতো। তাঁর মানা না মেনে আত্মীয়স্বজনদের কোনো খবর না দিয়ে। তাদের যোগদানের একটা সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে। পরে আমরা গিয়ে তাঁর পায়ে প্রণাম করেছি, তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি, তাঁর সঙ্গে থেকেছি, তিনিও থেকেছেন আমাদের সঙ্গে, তবু আমি কখনো তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিনি, তিনি কি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট? মাস্টারমশায়ের কাছে শুনতে পাওয়া যেত, যদি দেখা হতো। যে কারণেই হোক সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমার বদলির চাকরি। কদাচ কখনো ছুটি পেলে বাবার সঙ্গে দু'চারদিন কাটিয়ে আসি। মাস্টারমশায়ের খোঁজ নেবার আগেই আমার ছুটি ফুরিয়ে যায়।

'কিন্তু তাঁর মনে অন্য একটা কারণে অশান্তি ছিল, চারু। সেটা পারিবারিক বা সামাজিক কারণ নয়। কারণটা আধ্যাত্মিক।' মাস্টারমশায় আমাকে সংবাদ দেন। এই প্রথম সংবাদ।

'কেন অশান্তি কেন?' আমি বিস্মিত হই।

'হবে না? তুমি নিজে বাপ হয়েছ, বছর কয় বাদে ঠাকুরদা হবে। তুমি কি বোঝ না যে সন্তানকে পিতামাতা যা দিয়ে যান তা কেবল দেহ নয়, প্রাণ নয়, তা গভীরতম বিশ্বাস, নিগূঢ়তম সত্য? তোমার বাবা যখন বলতেন, কৃষ্ণে মতি হোক, তখন তিনি আশা করতেন যে তাঁর জীবনের পরম উপলব্ধি তোমার জীবনেও প্রবাহিত হবে। কৃষ্ণ না হয়ে ঈশ্বর হলেও তার মনে লাগত না, কিন্তু তুমি যখন বিদেশ থেকে ফিরে এলে তখন তোমার বন্ধুদের মুখে তিনি শুনলেন যে তুমি তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস হারিয়ে এসেছ। তুমি নাকি সংশয়বাদী। ঈশ্বর আছেন কি না এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত নও। এটা তো ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের মতো কথা নয়। তিনি আঘাত পান। আমাকে বলেন সূর্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তো কারো সংশয় নেই। যত সংশয় ঈশ্বরকে নিয়ে। বছর কয়েক বাদে তোমার

বন্ধুদের মুখে আবার শুনতে পান, তুমি নাকি নিঃসংশয় যে জগৎ সত্য ব্রহ্ম মায়া। এ যে এক উল্টো বেদান্ত! এতে তিনি আরো আঘাত পান। কে যেন ওঁর কানে তোলে যে তুমি নাকি মার্কসবাদী হতে চলেছ। মার্কসবাদীরা নাকি কালাপাহাড়ের চেয়েও খারাপ। কালাপাহাড় ধ্বংস করেছিল মূর্তি। এরা নাকি ধর্ম জিনিসটাকেই ধ্বংস করতে চায়। বলে, ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম। শেষ বয়সে তোমার বাবাও তো আফিম ধরেছিলেন। ওষুধ হিশাবে। এসব শুনে তিনি রীতিমতো শক পান।' মাস্টারমশায় টিপে টিপে হাসেন।

'এই কথা! এর জন্যেই অশান্তি!' আমি তো অবাক।

'হবে না? তুমি নিজেই একদিন বুঝবে। ঈশ্বর না থাকলে আলো নিবে যায়। মানুষ অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ায়। জল শুকিয়ে যায়। মানুষ মাছের মতো ছটফট করে। তোমার বাবা তোমার জন্যে কাঁদতেন। বলতেন, এ কী হলো হেমেনবাবু! ও ছেলে তো অমন ছিল না। বৌটিও তো ভালো। এই কৃষ্ণময় সংসারে কৃষ্ণ যদি না থাকলেন তো আমি ভালোবাসব কাকে? সব ভালোবাসাই তো তাঁকেই ভালোবাসা। মানুষ যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে না পারল তবে কেমন করে তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসবে? সর্বজীবকে ভালোবাসবে কী করে? কৃষ্ণহীন সংসার হচ্ছে প্রেমহীন সংসার। হিংসাই সেখানকার নিয়ম। চারু কি তাহলে কংস হয়ে যাবে! তোমার বাবা এই বলে বিলাপ করতেন।' মাস্টারমশায় হাসি চাপেন।

আমি অতীতের দিকে ফিরে তাকাই। আমার পারিবারিক জীবন সুখের ছিল, তবু আমার অন্তরে সুখ ছিল না। সেটা দেশের ও দুনিয়ার ভাবনা ভেবে। দেশের তরুণতরুণীরা নিয়েছে সন্ত্রাসবাদের পথ। বিষে বিষক্ষয় এই নীতি অনুসারে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের অ্যান্টিডোট হয়েছে হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিবাদ। যাতে তৃতীয় পক্ষ রক্ষা পায়। আশ্চর্য হয়ে যাই দেখে যে সন্ত্রাসবাদের সমর্থকরা সাম্প্রদায়িকতাবাদেরও সমর্থক হয়ে ওঠে, তার ফলে সাম্প্রদায়িকতাই সন্ত্রাসবাদের চেয়ে প্রবল হয় ও শাসকদের বাঁচায়। ধন্য ধন্য রাজনীতি! বাংলাদেশটাকে থালায় করে তুলে দেওয়া হলো মুসলমানদের পাতে। ও দিকে ইউরোপে যা ঘটে চলেছে তা আরো চমৎকার। বিষে বিষক্ষয় এই নীতি অনুসারে কমিউনিজমের অ্যান্টিডোট হয়েছে ফাসিজম। যাতে তৃতীয় পক্ষ রক্ষা পায়। যারা ফাসিস্টদের সঙ্গে লড়তে চায় তারা সমর্থন পায় না। পায় কিনা যারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়তে চায়। ধন্য ধন্য রাজনীতি! হিটলার মুসোলিনি একটার পর একটা রাজ্য গ্রাস করে। আমার সহানুভূতি গোড়ায় কমিউনিস্টদের উপর ছিল না। কিন্তু ফাসিস্টরা যে ওদের চেয়েও খারাপ এই প্রত্যয় থেকে আমি কমিউনিস্টদের উপর সহানুভূতি বোধ করি। কই, ওরা তো ঈশ্বরবাদী নয়। কী আসে যায় যদি ওদের উদ্দেশ্য মহৎ হয়? কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হলে কি সাতখুন মাফ? স্টালিনের সাত হাজার খুনও কি মাফ করতে হবে? দারুণ এক নৈতিক সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যেতে হয় আমাকে। একই কালে নিদারুণ আধ্যাত্মিক সংকট। ঈশ্বর থাকলে হিটলার থাকে কী করে? মার্কসবাদীরা তো তাঁর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাহলে তারা ঈশ্বরভক্ত রাশিয়ানদের হারিয়ে দিল তাড়িয়ে দিল কী করে? কারণ ঈশ্বরভক্তিটা হলো আফিম। ভক্তরা যত সব আফিমখোর। পারবে কেন সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে!

সব ধর্মের সারতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে করতে আমি উপনীত হই সব ধর্মের অসারত্বে। বাবা আমাকে ছেলেবেলা থেকেই প্রার্থনা করতে ও ধ্যান করতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস থাকলে তো প্রার্থনা করব! ধ্যান করব! বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলি। একদিনে নয়, একটু একটু করে। প্রথমে হই সংশয়বাদী, তারপরে নিরীশ্বরবাদী। প্রথমে বন্ধ করে দিই প্রার্থনা। ভগবানকে বলি, তুমি তো অন্তর্যামী। তুমি জানো আমার প্রার্থনাটা কী। মুখ ফুটে জানাতে হবে কেন? তুমি তো তোমার

পরিশিষ্ট

নিয়মের বাইরে যাবে না। কেন তাহলে তোমাকে বলি পাপতাপ ক্ষমা করতে! কেন বলি এটা দিতে ওটা দিতে? প্রার্থনা বন্ধ করলেও ধ্যানটা ছেড়ে দিইনে। যখন সেটাও বন্ধ করার সময় আসে তখন অতি অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করি যে একজন আছেন যাঁর সঙ্গে আমার মরমী সম্পর্ক আর সে সম্পর্কটা অহেতুক।

বাবাকে নিয়মিত চিঠি লিখি। শরীরের সমাচার দিই, কিন্তু মনের সমাচার চেপে রাখি। তাঁর মতো প্রাচীনপন্থীদের বোঝানো যাবে না আধুনিক জগতের ব্যাধিটা কী। আর কেনই বা সে ব্যাধি অহিংসা দিয়ে সারানো যাবে না। কেউটে সাপের সামনে প্রেমের বাঁশি বাজানো নিষ্ফল। সে ছোবল মারবে না এটা দুরাশা। হাতিয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধে নামতেই হবে। আমার সেই নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক সঙ্কট আমাকে দিনরাত দহন করছিল। আমি যে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হচ্ছি এটা আমি কেমন করে তাঁকে বোঝাব? বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হলে ভিতরের তাপটা সঞ্চারিত করে দিই। কিন্তু আমার ভিতরে কি শুধু তাপই ছিল? আলো একেবারে ছিল না? ছিল, কিন্তু অতি অস্পষ্ট। ছিল বলেই আমি ঠিক নিরীশ্বরবাদী ছিলুম না। ছিলুম না মার্কসবাদীও। উদ্দেশ্য আর উপায় নিয়ে যে তর্ক তাতে কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমি একমত ছিলুম না। যেমন ছিলুম না সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও। ইংরেজ আমার চোখে মূর্তিমান সাম্রাজ্যবাদ নয়, আমারই মতো একটা জীবন্ত মানুষ। তেমনি জমিদার বা পুঁজিপতি আমার চোখে মূর্তিমান ফিউডালিজম বা ক্যাপিটালিজম নয়। আমারই মতো একজন জীবন্ত মানুষ। মানুষের সামনে দাঁড়ালে আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনে যে, এ মানুষ নয়, কেউটে সাপ। একে প্রেমের বাঁশি বাজিয়ে ভোলানো যাবে না। একে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে হবে।

এক এক সময় মনে হতো বৃহত্তর সংসারের প্রতি আমার কী যেন একটা কর্তব্য আছে। সিদ্ধার্থের মতো আমার সুখের সংসার ফেলে গৃহত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তা যদি করি তবে আমার স্ত্রীর, আমার শিশুদের ভার কার উপর দিয়ে যাব? বাবার উপরে? যাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। যাঁর স্বাস্থ্য ভালো নয়। সিদ্ধার্থের তো সে ভাবনা ছিল না। আমার ছিল। যদিও আমার স্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তোমার সিদ্ধান্তে আমি বাধা দেব না।

'প্রাচীনপন্থীদের প্রতি তোমার মনোভাব অসঙ্গত ছিল, চারু।' আমার নিজের জবানীতে আমার অতীতকাহিনী শুনে মাস্টারমশায় বলেন, 'ওঁরা জানতেন যে, মানুষের বহনের অসাধ্য যে ভার সে ভার বিধাতার। যেটুকু তুমি বইতে পারো সেইটুকুই তোমার। তুমি যে ভিতরে ভিতরে দেশের জন্যে বা দুনিয়ার জন্যে জ্বলছ এটা আমরা জানব কেমন করে? জানতুম এই পর্যন্ত যে তুমি ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে মার্কসের উপর সে বিশ্বাস পাত্রান্তরিত করেছ। তোমার বাবা শুনে অশান্ত হতেন। বলতেন, রাহুলকে বুদ্ধ কী দিয়ে যান! কেবল দেহ নয় প্রাণ নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি তাঁর বোধি। তেমনি চারুকে আমি দিয়ে যেতে চেয়েছি আমার জীবনের সার সত্য, আমার কৃষ্ণে প্রীতি ও জীবে দয়া। ওর বয়সে আমিও তো জীবহিংসা করেছি, মাছ মাংস খেয়েছি। একদিন এককথায় ছেড়ে দিই। যেদিন আমার বাবাকে হারাই। কৃষ্ণকে ভালোবাসলে কৃষ্ণের জীবকেও দয়া করতে হয়। একটা মাছিকেও মারিনে, একটা পিঁপড়েকেও বাঁচিয়ে দিই। দেখলে তো চারু। বুদ্ধের করুণা কেমন করে বৈষ্ণবের জীবে দয়ায় পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণব হলেও বাঙালীরা ভিতরে ভিতরে বৌদ্ধ রয়ে গেছে।'

'বাবা আর কী বলেছিলেন, স্যার। আমি বাবার কথাই শুনতে চাই।'

'বাবা বলেছিলেন, কৃষ্ণকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে যদি ভালোবাসতে না পারো তবে তোমার বিদ্যা, তোমার বুদ্ধি, তোমার তর্ক, তোমার যুক্তি কোনোখানেই তোমাকে নিয়ে যাবে না। হিংসা তো

নয়ই। ভালোবাসতে পারা চাই। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। এখানে যার কথা বলা হচ্ছে তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন। তোমার যদি নন্দলালার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না থাকে তবে তুমি বলতে পারো বিনা প্রেমসে না মিলে পরমাত্মা। না তাতেও তোমার আপত্তি?' মাস্টারমশায় শুধান।

'না, স্যার, পরমাত্মায় আমার আপত্তি নেই। ইতিমধ্যে আমার বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি।' আমি উত্তর দিই। 'কিন্তু যখনকার কথা হচ্ছে তখন পরমাত্মাও মানতুম না। আমার আত্মা আছে আর সে আত্মা শরীরের বিনাশের পরেও যে অবিনশ্বর এসব আমার কাছে মনে হতো মিথ্যা মায়া। কিন্তু পুত্রশোকের অনলের আভায় দেখি মায়া যাকে ভাবছি তাই সত্য। তারপর একালের সভ্য মানুষদের কাণ্ডকারখানার সাক্ষী হই সারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জুড়ে। একপ্রকার মোহভঙ্গ থেকে জন্মেছিল ঈশ্বরে অবিশ্বাস, আরেক প্রকার মোহভঙ্গ থেকে জন্মায় ঈশ্বরে বিশ্বাস। এতদিনে আমি বাবার কাছাকাছি এসেছি। তাই বাবার শেষ বয়সের কথা শুনতে এত ভালো লাগছে। আহা, সে সময় যদি শুনতে পেতুম! তা হলে হয়তো ওঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত।'

'তোমার হয়ে আমিও ওঁকে বুঝিয়েছি, চারু, যে তুমি সত্যিকার নিরীশ্বরবাদী নও। সংশয়বাদীও নও। মানুষকে ভালোবাসো। মানুষকে যে ভালোবাসে সে তার অন্তরে স্থিত ভগবানকেও ভালোবাসে। কেউ ভগবানকে ভালোবাসতে বাসতে মানুষকে ভালোবাসে, কেউ মানুষকে ভালোবাসতে বাসতে ভগবানকে। হবে দবে একই কথা নয় কি? তোমার বাবা শান্ত হন। বলেন, নিরীশ্বরবাদও ঈশ্বরবাদ যদি প্রেম থাকে অনির্বাণ। চারুর ভিতরে যে আগুন জ্বলছে সে আগুন যদি প্রেমের আগুন হয় তবে আর ভাবনা কিসের! প্রেমই ওকে দগ্ধ করতে শেখাবে যে প্রেমময় বলে একজন আছেন। তিনি থাকতে এ জগৎ প্রেমহীন নয়। সব অন্যায়ের প্রতিকার প্রেম দিয়ে হবে। চারুকে বলবেন একথা।' মাস্টারমশায় আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান।

'তাহলে শান্তিতেই ওঁর জীবনাবসান হয়।' আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

'শান্তিতেই ওঁর জীবনাবসান হয়।' তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন।

'পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার আর কোনো ক্ষোভ থাকে না?' আমি নিশ্চয়তা চাই।

'আর কোনো ক্ষোভ বা খেদ থাকে না তাঁর।' তিনি আশ্বাস দেন।

আমি ধন্যবাদ দিই মনে মনে ভগবানকে ও মুখ ফুটে মাস্টারমশায়কে।

'যাক, তোমার বাবার বার্তা আমি বিশ বছর ধরে বহন করে এনে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে খালাস হলুম আজ। এখন বল তোমার কোনো বার্তা আছে কি না, যা বয়ে নিয়ে গিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারি। আমি তোমাদের দুজনের মাঝখানে বার্তাবহ। এই আমার ভূমিকা।' তিনি সকৌতুকে বলেন।

'ও কী বলছেন, স্যার।' আমি থতমত খেয়ে বলি, 'বাবাকে আপনি পাবেন কোথায় যে ওঁর কাছে পৌঁছে দেবেন আমার বার্তা?'

এবার তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কেন? পরলোকে। চারুশীল, আমারও তো দিন ফুরিয়ে এল। তাই আমি তোমার মতো প্রিয়শিষ্যদের সঙ্গে একে একে দেখা করে বিদায় নিচ্ছি। এ জন্মে এই হয়তো শেষ দেখা।'

মনটা বিষাদে ভরে যায়। বলি, 'স্যার, আমি আপনার শতবর্ষ পরমায়ু কামনা করি। তার আগে যদি আপনি যান ও বার্তা যদি আপনার সঙ্গে যায় তা হলে এই বার্তাই আমি এপার থেকে ওপারে পাঠাতে চাই যে, এ জগৎ যাঁর দেহ তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মার সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক অমৃতের সঙ্গে অমৃতের পুত্রের। তাঁর পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা

মিলিয়ে নেওয়া, তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টি মিলিয়ে নেওয়া, এই আমার ধর্ম ও এই আমার কর্ম। মেলাতে পারা কিন্তু সহজ নয়, স্যার। কোন্‌টা যে তাঁর ইচ্ছা আর কোন্‌টা নয় কেমন করে জানব?'

মাস্টারমশায় মুচকি হেসে বলেন, 'বড়ো কঠিন প্রশ্ন। আজ আসি। আমার আশীর্বাদ রইল। জানিয়ো তোমার ছেলে বৌমাকে। আর আমার বৌমাকে। জীবন মধুময় হোক তোমাদের সকলের।'

বর

গ্রন্থ নয়, পর্যায়।

এই পর্যায়ের গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৬৩-৬৬

প্রস্তাবিত উৎসর্গপত্র — কিরণ বসুর স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র — বর / হাজারদুয়ারী / লখীন্দরের ভেলা / নাকের বদলে / ডুমুরের ফুল / অন্তরাল / শরশয্যা / বিষ হয়ে গেছে অমৃত / সখা সুদামা

গল্পগুলি প্রথম গ্রথিত হয় 'কথা' গল্প-সঙ্কলনে।

গল্পগুলি রচনাবলীতে ছাপা হয়েছে 'কথা' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অনুসারে।

'কথা' সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রচনাবলীর নবম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে।

জন্মদিনে

গ্রন্থ নয়, পর্যায়।

এই পর্যায়ের গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৬৭-৭০

প্রস্তাবিত উৎসর্গপত্র — গুরুদয়াল মল্লিকের স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র — জন্মদিনে / এক'দোকা / রাবণের সিঁড়ি / সাঁঝের অতিথি / সব চেয়ে দুঃখের / সোনার ঠাকুর মাটির পা / বারুণী

গল্পগুলি প্রথম গ্রথিত হয় 'কথা' গল্প-সঙ্কলনে।

গল্পগুলি রচনাবলীতে ছাপা হয়েছে 'কথা' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অনুসারে। 'কথা' সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত লেখকের ভূমিকা রচনাবলীর নবম খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

কাহিনী

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮ এ, টেমার লেন

কলকাতা- ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী

কুড়ি টাকা

উৎসর্গ - শ্রীমতী গীতা রায়

বড়ো বউমা

কল্যাণীয়াসু

রচনাবলীতে বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে, সেই সংস্করণের ভূমিকা নিচে দেওয়া হলো--

ভূমিকা

আমার প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। খণ্ডগুলির নাম 'প্রকৃতির পরিহাস', 'মন পবন' ও 'যৌবনজ্বালা'। পরে সেই তিনটি খণ্ডকে একত্র করে একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়। তার নাম রাখা হয় 'গল্প'।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ছোটগল্পগুলির কতক প্রকাশিত হয় 'কামিনীকাঞ্চন' ও 'রূপের দায়' এই দুই নামে। অন্যান্যগুলি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত থাকে। পরে সব ক'টিকে একত্র করে আর একটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়। তার নাম রাখা হয় 'কথা'।

এবার তৃতীয় পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ না করে আরো একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হচ্ছে। এর নাম রাখা হচ্ছে 'কাহিনী'।

এর পরে আর আমি ছোটগল্পে হাত দিইনি। মনে হয় আমার গল্পের পুঁজি ফুরিয়ে গেছে। জোর করে লেখা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আবার যদি কখনো গল্প লেখার প্রেরণা আসে তো তার রূপ ও রস অন্যপ্রকার হবে। ইতিমধ্যে আমি আবার একটি বৃহৎ উপন্যাসে মন দিয়েছি। এটি যতদিন না সমাপ্ত হচ্ছে ততদিন আমি আমার সমস্ত শক্তিকে সংহত করতে চাই। সম্ভবত এই আমার শেষ গল্প সঙ্কলন।

অন্নদাশঙ্কর রায়